শতবার্ষিক জয়ন্তী উৎসর্গ

শতবার্ষিক জয়ন্তী উৎসর্গ

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

পশ্চিমবঙ্গ রবীন্দ্র শতাব্দী জয়ন্তী সমিতির পক্ষে বঙ্গীয় প্রকাশক
ও পুস্তক বিক্রেতা সভা কর্তৃক প্রকাশিত

প্রকাশকঃ
শ্রীজানকীনাথ বসু
বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তকবিক্রেতা সভা
৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭

মূল্যঃ পাঁচ টাকা

মুদ্রাকরঃ
শ্রীকালীচরণ পাল
নবজীবন প্রেস
৬৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

শতবার্ষিক জয়ন্তী উৎসর্গ

ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গ রবীন্দ্র শতাব্দী জয়ন্তী সমিতির উদ্‌যোগে 'শতবার্ষিক জয়ন্তী উৎসর্গ' প্রকাশিত হইল।

গত বৎসর ৮ এপ্রিল তারিখে শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের ২২৭/২ লোয়ার সার্কুলার রোড ভবনে শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রকাশন উপসমিতির সভায় কবির জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে একটি স্মারক-গ্রন্থ প্রণয়নের প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং এই প্রস্তাবকে কার্যে রূপ দিবার জন্য ঐ সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে লইয়া একটি সম্পাদকমণ্ডলী গঠন করা হয়ঃ শ্রীরাজশেখর বসু (সভাপতি), শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুকুমার সেন, শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত, শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন, শ্রীগোপাল হালদার, শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ, শ্রীকানাই সামন্ত, শ্রীরাধারাণী দেবী ও শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য (সম্পাদকমণ্ডলীর কর্মাধ্যক্ষ)।

ইহার অচিরকালমধ্যেই শ্রীরাজশেখর বসু লোকান্তরিত হন এবং তাঁহার স্থলে শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। আমাদের দুর্ভাগ্য-ক্রমে সম্পাদনার কাজ সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্তও পরলোক গমন করিলেন। এবার সভাপতিত্বের ভার পড়িয়াছে বর্তমান ভূমিকালেখকের উপরে, সম্পাদকমণ্ডলী তাঁহার আপত্তিতে কর্ণপাত করেন নাই। স্মারক-গ্রন্থটি প্রকাশিত হইবার পূর্বেই চতুর্থ সভাপতি নিয়োগের প্রয়োজন হইলে আশা করি তাঁহারা তৃতীয় সভাপতির উপর বিরক্ত হইবেন না। ইতিমধ্যে সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহও অকালে দেহত্যাগ করিলেন। শতবার্ষিক জয়ন্তী উৎসর্গ প্রকাশের প্রাক্‌কালে স্বর্গত রাজশেখর বসু, অতুলচন্দ্র গুপ্ত ও বিমলচন্দ্র সিংহের নাম বেদনার্ত হৃদয়ে এবং শ্রদ্ধানত-চিত্তে স্মরণ করি।

শতবার্ষিক জয়ন্তী উৎসর্গের জন্য প্রবন্ধ আহ্বান করিয়া বিশিষ্ট লেখক-বর্গের নিকট অনুরোধপত্র প্রেরিত হইয়াছিল। তদুত্তরে যে কয়টি প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছে প্রায় সবগুলিই প্রকাশিত হইল। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'রবীন্দ্র-সংগীত' নামক প্রবন্ধটি দিনেন্দ্ররচনাবলি হইতে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থের একটি বিশেষত্ব পাঠকগণের চোখে পড়িবে। গ্রন্থটি আদ্যন্ত বড় অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। শিশুপাঠ্য পুস্তকে বড় হরফ ব্যবহার করা হয় কিন্তু বয়স্কপাঠ্যের বেলায় প্রকাশকরা ক্ষুদ্র টাইপের নির্লেড ঠাসবুনানি বুনিয়া যান—বৃদ্ধগুলাও যে দৃষ্টিশক্তির দিক দিয়া শিশুর মতই করুণার পাত্র একথা তাঁহাদের মনে থাকে না। আমার সমবয়সীদের আমি যে ভুলি নাই শতবার্ষিক জয়ন্তী উৎসর্গ-এর টাইপ তাহার সাক্ষ্য দিবে।

এই স্মারকগ্রন্থের জন্য প্রবন্ধ ও পরামর্শাদি দিয়া যাঁহারা পশ্চিমবঙ্গ রবীন্দ্র শতাব্দী জয়ন্তী সমিতির এই উদ্‌যোগকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন তাঁহারা আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র। বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তকবিক্রেতা সভার সম্পাদক শ্রীজানকীনাথ বসু প্রকাশনকার্যে আমাদের বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। প্রবন্ধ সংগ্রহ ও সংকলনের গুরুভার কর্মাধ্যক্ষ শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য একাকী বহন করিয়াছেন, তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই শতবার্ষিক জয়ন্তী উৎসর্গ প্রকাশ করা সম্ভব হইল।

২৫ বৈশাখ ১৩৬৮ | শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

সূচীপত্র

রবীন্দ্র-সংগীত

দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

কোন গীতিকবি বা শিল্পীর শিল্প-সৃষ্টির সম্বন্ধে বিচার করবার সময় তাঁর সমগ্র আত্মপ্রকাশের অন্তর্গত ক্রমবিকাশের রূপ সমজদার বিচারকের চোখে ধরা দেয়। বাহিরের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের তরঙ্গাঘাত শিল্পীর মর্মবীণার তারে যে স্পন্দন জাগিয়ে তোলে তা' তাঁর অনুভূতির আনন্দরসে অভিষিক্ত হয়ে নানা রস-সৃষ্টির উৎসধারায় উৎসারিত হয়। অন্তরের ভাবলোকের এবং বাহিরের সৌন্দর্যলোকের মিলনে যে পুণ্য-সঙ্গমতীর্থ রচিত হয় তারই কেন্দ্রস্থলে সকল প্রয়োজনাতীত অনির্বচনীয় রূপসৃষ্টিগুলি আপনার পূর্ণ মাধুর্যে বিকশিত হয়ে বলে "অয়ম্ অহম্ ভো"—এই আমিই সেই। যখন এই প্রাণবান সত্তা বর্তিয়া থাকার আনন্দের বিজয়বার্তা ঘোষণা করে তখন শাশ্বত আনন্দলোকে তার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত। বাহিরের প্রভাব তখন তার অন্তরকে স্পর্শ করে কিন্তু ক্ষুব্ধ করে না।

শিল্প-সৃষ্টি নিয়ে পৃথিবীতে যে তর্কজাল বোনা হয়েছে তাতে আবদ্ধ হয়ে বন্ধনদশাকাতর অনেক লোক অনেক আর্তনাদ করেছে; অনুভব করবার জিনিসকে বোধগম্য করবার চেষ্টা করেছে, in-definable কে define করবার চেষ্টা করেছে। বুদ্ধির দ্বারা তার ব্যবচ্ছেদ করেছে, অনুভূতির দ্বারা সেই রসসৃষ্টির সুষমার অপূর্ব সৌষ্ঠব তারা উপলব্ধি করতে পারে নি।

রবীন্দ্রনাথের সংগীতের অভিব্যক্তির ধারা আলোচনা করে দেখবার সুযোগ আমার হয়েছে। প্রথম থেকে এ-পর্যন্ত তাঁর নব নব সুরসৃষ্টির ক্রমবিকাশের ইতিহাস লিখতে গেলে যে দূরদৃষ্টি ও শক্তির প্রয়োজন, তা আমার নেই; তবে আমার ক্ষুদ্রশক্তির দ্বারা

যতটুকু বুঝেছি তা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করছি। এ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে উদাহরণের সাহায্যে আলোচনা করবার ইচ্ছা আছে।

বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথ পারিবারিক সাহিত্যের আবহাওয়ার মধ্যে বাস করতেন এবং সাহিত্য আলোচনা ও রচনায় উৎসাহিত হতেন একথা তাঁর জীবনস্মৃতিতে তিনি লিখেছেন। বঙ্কিমযুগের নব-জাগরণের প্রথম প্রভাতে অরুণালোক স্পর্শে তাঁর প্রতিভার উদ্বোধন হয়েছিল এবং পিতা, ভাই, ভগ্নী সকলের স্নেহচ্ছায়ে ও উৎসাহের অনুকূল বায়ুতে তাঁর নবউন্মেষিত প্রতিভা উদ্দীপ্ত হয়েছিল।

সংগীতে তাঁর অনুরাগ, রসানুভূতি ও আত্মপ্রকাশ সম্বন্ধেও ঠিক ঐ কথাই বলা চলে। আমাদের পরিবারে গান বাজনার চর্চা বড় কম ছিল না। বড়-বড় ওস্তাদ এসে সেরা সেরা হিন্দি গান (বেশীর ভাগ ধ্রুপদ) গাইতেন আর সেই সুরগুলোতে বাঙলা কথা বসিয়ে ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক উপাসনার জন্য গান রচনা করতেন দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তখন সংগীত শাস্ত্র অধ্যয়নমগ্ন, পিয়ানোতে বিশুদ্ধ রাগরাগিণীর গত বাজাচ্ছেন আর তাতে কথা বসিয়ে গান তৈরি করছেন কবি নিজে। এই হল গীত রচনার ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়। বাহিরের প্রভাব এবং tradition-এর ধারা যুগপৎ তাঁকে রসের খোরাক জোটাতে লাগল। মাঝে মাঝে স্বকীয় প্রতিভার রশ্মি tradition এবং ওস্তাদির গবাক্ষদ্বারের ভিতর দিয়ে উঁকিঝুঁকি মেরেছিল কিন্তু আবরণ বিদীর্ণ করে নিজস্ব প্রতিভার দীপ্তি তখনও উদ্ভাসিত হয়নি। ব্রাহ্ম-সমাজের তৎকালীন পাপক্ষয় করবার একান্ত আগ্রহ দেখে রবীন্দ্রনাথও ভাবাবেগে গান লিখলেন "আমায় ছজনায় মিলে পথ দেখায় বলে পদে পদে পথ ভুলি হে।" ছজনার তাড়নায় কত ভাবপ্রবণ অশ্রুবিলাসী শ্রোতাদের তিনি মুগ্ধ করেছিলেন কিন্তু বীণাপাণির আসন তখনও শূন্য ছিল। একথা লিখলাম বলে পাঠক ভাববেন না যে তিনি সে সময়ে উচ্চদরের সংগীত রচনা করেন নি। পরবর্তীকালে যদুভট্ট এবং রাধিকা

গোস্বামীর কাছ থেকে সুর আদায় করে তাতে কথা বসিয়ে যেসব ব্রহ্মসংগীত তিনি রচনা করেছিলেন তা অপূর্ব বাক্য যোজনায় এবং বীর্যদ্যোতনায় অননুকরণীয় সম্পদে মহীয়ান।

এরপরে দেখা যায় classical সুরগুলির বিশিষ্টরস আত্মসাৎ করে তিনি গীতিকবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত হয়েছেন। বাল্মীকি প্রতিভা ও মায়ার খেলার গানে classical প্রভাব সুস্পষ্ট। এই গীতিনাট্য দু'টির গানগুলি কথা ও সুরের হরগৌরীমিলনের অপূর্ব উদাহরণ। এইসময় আরও কতগুলি গান রচিত হয় যার lyrical beauty-র তুলনা নেই। বাল্যকালে আমি সে গানগুলি শুনে মুগ্ধ হতুম, তৃপ্ত হতুম আর আপন মনে গেয়ে যে কি আনন্দলাভ করতুম তা কথায় বোঝাবার শক্তি আমার নেই। পৃথিবীর সমস্ত একান্ত intimate সম্বন্ধ অতিক্রম করে কোন্ স্বপ্নালোকে উত্তীর্ণ হতুম কে জানে! গানগুলি হচ্ছে, 'আকুল কেশে আসে', 'আহা জাগি পোহাল বিভাবরী', 'আজি শরত তপনে', 'মম যৌবন নিকুঞ্জে', 'তোমার গোপন কথাটি' ইত্যাদি। কথার অর্থ আমার কাছে এত অকিঞ্চিৎকর ছিল যে সে সময়কার কোন রবীন্দ্র বিদ্বেষী যখন আমাকে বললেন যে রবীন্দ্রনাথ 'আহা জাগি পোহাল বিভাবরী' এ গানটি কোন প্রেমিকাকে উদ্দেশ করে লিখেছেন, তখন যে কী আহত হয়েছিলাম বলতে পারি না। রবীন্দ্রনাথের সংগীতের এরূপ বস্তুতান্ত্রিক অর্থ তখন অনেকেই করত।

রবীন্দ্রনাথ এ পর্যায়ের গানগুলিকে emotional আখ্যা দিয়েছেন। emotional ত বটেই। lyric মাত্রই emotional কিন্তু সে emotion intimate নয়। এ যেন ক্ষণস্থায়ী সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্বের অতীত কোন্ এক অক্ষুব্ধ সরসীনীরে বিকশিত শতদল "তার বাঁধন যে নাই।" এই detachment হল art-এর মূলকথা।

কবির সমস্ত কাব্যজীবনের ধারার মধ্যে দেখতে পাই তিনি অধ্যাত্মজগতের এমন এক স্তরে গিয়ে পৌঁছেছেন যেখানে তাঁর দৃষ্টি বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎকে অতিক্রম করে শাশ্বত আলোকের

আনন্দে উদ্ভাসিত। এ দৃষ্টি ভারতবর্ষের নিজস্ব সম্পদ। এই দৃষ্টির সাহায্যে আবিষ্কৃত সত্যবাণীর অব্যাহত স্রোত বৈদিকযুগ থেকে একাল পর্যন্ত বয়ে আসছে এবং নানাযুগের নানা সমস্যার ঘাত প্রতিঘাতে নানা সমাধানে উপনীত হয়েছে। এর সঙ্গে মিলিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ human interest। আমার তো মনে হয় রবীন্দ্রকাব্য থেকে কবিকে বিচার করলে একথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে তিনি intensely human। আর এক দিকে দেখতে পাই তাঁর প্রকৃতি-প্রীতি। যা কিছু প্রাণবান, যা কিছু আপনার আনন্দবেগের প্রেরণায় আপনাকে নিঃশেষে দান করছে এবং নবনব জীবনের পূর্ণতায় বিকশিত হচ্ছে তাকেই তিনি একান্ত আপনার করে নিয়েছেন। তাঁর রচিত "ছিন্নপত্র" বইটি যিনি পড়েছেন তিনিই বুঝতে পারবেন আমি কেন একথা বলছি। অধ্যাত্মজীবনের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাছে মানুষ এবং প্রকৃতির ব্যবধানের বাঁধ ভেঙে গেছে আবার দুইই তাঁর পরমাত্মীয় হয়ে উঠেছে।

সত্যের চরম উপলব্ধির শাশ্বত আনন্দলোকে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি যখন বাণীর বরপুত্রের আসনে আসীন তখন তাঁর সুরশিল্প সাধনার পূর্ণ পরিণতি দেখতে পাই। যে কথা নানারূপে, নানাছন্দে প্রকাশিত হয়েছে তা সুরের ব্যঞ্জনায় অরূপমূর্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে আনন্দলোকের রহস্যের দ্বার অবারিত করে দিয়েছে। ধ্যান-সমাহিতচিত্ত সুরের উৎসধারার সন্ধান পেয়েছে বলে অন্তরের সুরের নির্ঝরিণী কলস্বরে ধাবমান "কার সাধ্য রোধে তার গতি।"

কবির আধ্যাত্মিক গরিমালব্ধ অপূর্ব বাণীর সঙ্গে ভারতের মধ্যযুগের সাধকদের বাণীর ভাবের মিল আছে একথা সর্ববাদি-সম্মত। কিন্তু বাণী এবং সুরের অপূর্ব মিলনে শিল্পসৃষ্টি হিসাবে আদর্শস্থানীয় হয়েছে কবির আধুনিক গানগুলি যার আরম্ভ গীতিবীথিকায়। পরবর্তী রচনায় নবগীতিকা এবং গীত-মালিকার গানগুলিতে এ আদর্শের চরম পরিণতি পরম সৌষ্ঠবে

অপূর্ব শ্রীসম্পন্ন হয়ে উঠেছে। এ গানগুলিতে দেখতে পাই সুরের surprises। শৈলারোহণের সময় মোড় ফিরে অপ্রত্যাশিত প্রকৃতিমাধুর্য দেখে মনটা যেমন চম্‌কে ওঠে এও সেইরকম। কথা-গুলো ভালমানুষের মত মগজের এক কোণে চুপ করে পড়েছিল। সুরগুলো নৃত্য-চপল ভঙ্গীতে ঘিরে ঘিরে তাকে এমন একটি অপ্রত্যাশিত রূপদান করলে যা দেখে রসিক চিত্ত বললে "বাঃ এ-রকমটি ভাবিনি।" আমার মনে হয় কবি হয়ত নিজেই জানেন না কেমন করে সুরগুলো আপন গতিবেগের প্রেরণায় আপনি decorative designগুলি তৈরি করল যার আরম্ভও নেই শেষও নেই। যে সুরটা গড়ে উঠল সেটা কালোয়াতি নয় বাউলও নয় তা সম্পূর্ণ খেয়ালী।

গান তৈরি করবার সময় তাঁর কাছে বসে থেকে আমার বারবার মনে হয়েছে যে সুরের পাগলামিকে তিনি কিছুতেই দাবিয়ে রাখতে পারছেন না, খাবার তাড়ায়ও না—কাজের তাড়ায়ও না। একটা গানের সুর দিচ্ছিলেন সেটা হচ্ছে "এক্‌টুকু ছোঁওয়া লাগে।" সুর অভিমানিনী প্রেয়সীর মত মুখ ঘুরিয়ে বসল। মানভঞ্জনের পালা শেষ করে কবির মন যখন সুরকে লক্ষ্য করে বললে "আচ্ছা, নাও তোমার হাতে আমার বাণী সমর্পণ করলুম"—অম্‌নি গানটি তৈরি হল। কথা বললে আমি ধন্য—সুর বললে আমি পূর্ণ। আমার মূল বক্তব্য এই গানগুলির সম্বন্ধে এই যে মধ্যযুগের কবিদের সঙ্গে বাণীর ভাবের মিল থাকতে পারে কিন্তু গান হিসেবে অর্থাৎ শিল্প-সৃষ্টি হিসেবে কবির গানগুলিকে বোধহয় আরও উচ্চ স্থান দেওয়া যেতে পারে। অন্ততঃ আমার এই মনে হয়, আর "বুঝিবে কী-ধন রসিক যে জন।"

ঋতু সংগীত সম্বন্ধে দুচার কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করব। 'বসন্ত' ও 'সুন্দর' এদুটি গীতিনাট্য কবির অপূর্ব সৃষ্টি। অনেক কবি প্রকৃতির শোভা দেখে মুগ্ধ হয়ে তার জয়গান করেছেন শতমুখে কিন্তু প্রকৃতির সৌন্দর্যলীলার রসমাধুর্য উপভোগ করে

তার সঙ্গে এমন নিবিড় আত্মীয়তার সম্বন্ধ স্থাপন এবং তার রহস্য-লোকের দ্বার উদ্ঘাটন আর কোনও কবি করেছেন কিনা জানিনা! প্রত্যেক কিশলয়ের অব্যক্ত কলকাকলিতে প্রতি কুসুমের বর্ণগন্ধময় আত্মনিবেদনে, প্রতি ঋতুসমাগম ও অবসানের মিলন বিরহের বেদনায়, কবির মন আনন্দে আকুল ও বিরহে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। বাইরের বিরহমিলনের অন্তরালে তার যে মায়াময় রহস্যলোক রয়েছে তার অরূপমাধুর্যের সন্ধান, পাওয়া না পাওয়ার অনির্বচনীয় আনন্দের আস্বাদন পেয়ে কবির মন গেয়ে উঠল "ও কি এল ও কি এল না।" গভীর অনুভূতির আনন্দ যেমন মানুষকে সুখদুঃখের মিলন-বিরহের, জন্মমৃত্যুর অতীত অতীন্দ্রিয় আনন্দলোকে উত্তীর্ণ করে —তেমনি প্রকৃতিও অন্তর্নিহিত গভীর সত্তার পরিব্যাপ্ত চৈতন্যে উদ্বোধিত হয়ে প্রাণের নবনব প্রকাশে জয়-পরাজয়ের বাণী নিত্য-নিয়ত ঘোষণা করছে। এই বিজয়বার্তার সান্ত্বনার বাণী—এই একান্ত আত্মীয়তার রূপ কবির গানে ঋতুসংগীতে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

বিশ্বমনাঃ বাক্‌পতি

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

উত ত্বঃ পশ্যন্ ন দদর্শ বাচম্ ;
উত ত্বঃ শৃণ্বন্ ন শৃণোতি এনাম্।
উতো তুঅস্মৈ তনুঅং বি সস্রে—
জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ॥

দৃষ্টিশক্তি থাকলেই মানুষ বাক্‌কে দেখতে পায় না, শ্রবণক্ষমতার অধিকারী হলেই তাকে শুনতে পায় না ; কিন্তু সুবেশা পতিগত-প্রাণা পত্নী যেমন নিজের স্বামীর কাছে আপনাকে প্রকাশ করে, কোন কোন মানুষের নিকট বাক্ তেমনি নিজ সৌন্দর্য উদ্‌ঘাটিত করেছে।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সেই অনন্য ও বিরল চরিত্রের মানুষ যেখানে মানবমহিমা পূর্ণ মাত্রায় ও অখণ্ডস্বভাবে বিরাজমান ; সেই বিপুল মানসিকতার অধিকারী যার প্রসার সুদূরতম দেশে। জীবনকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন তার সমগ্ররূপে ; সমগ্ররূপেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন জীবনকে। তাঁর এই উপলব্ধির বিভিন্ন দিককে তিনি বিচিত্র মাধ্যমে প্রকাশ করে গেছেন। জীবনের সঙ্গে নানা ঘাত-প্রতিঘাতে তাঁর যে নানা অভিজ্ঞতা জন্মেছে, তার পরিণত প্রকাশকে তিনি মানুষের ভাণ্ডারে "চিরকালের ধন" করে রেখে গেছেন। তিনি শুধুমাত্র একজন সাহিত্যিকই ছিলেন না ; তিনি ছিলেন তারও চেয়ে বেশী। স সর্বজ্ঞঃ, সর্বম্ আবিবেশ—"সকলকে জেনে, সবকিছুরই অন্তরে তিনি প্রবিষ্ট হয়েছিলেন।" তিনি ছিলেন একাধারে কবি ও গীতিকার, সংগীতবিদ্ ও সুরস্রষ্টা। নরনারীর জীবনের আশানিরাশা, সুখদুঃখ, জিজ্ঞাসাসমস্যা এবং সুপ্তজাগ্রত নানা উদ্দেশ্য-অভিপ্রায় তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন ;

এরই বর্ণনা ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর কাব্যে উপন্যাসে গল্পে ছবিতে। খ্রীস্টীয় নবমশতকের সংস্কৃত কবি ও সমালোচক রাজশেখর কথিত কারয়িত্রী প্রতিভা এবং ভাবয়িত্রী প্রতিভা—দুটিরই তুল্য অধিকারী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। প্রাচীনকাল থেকে যে ক্রমবহমান সাহিত্যের ধারা পৃথিবীর মহত্তম কবি ও দ্রষ্টাগণের দানে পুষ্ট হয়ে এসেছে, সৃজনশীল লেখকরূপে সে বিভাগে উল্লেখযোগ্য এবং কালজয়ী ভূমিকা গ্রহণ করে তিনি যেমন গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত, সাহিত্যের সমালোচকরূপে তেমনই তাঁর আসন প্রথম সারিতে। মানবজীবনের রহস্যের মতো ভৌতবিজ্ঞানের রহস্যে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। অধিগত করেছিলেন বিজ্ঞানের কতকগুলি মৌল তত্ত্ব। আপন অননুকরণীয় ভঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথ সেই তত্ত্বকে আবার শিশু ও বয়স্ক সাধারণ পাঠকগণের উপযোগী করে পরিবেশন করে গেছেন। ভাষা ও সাহিত্যের সম্মুখীন হয়েছিলেন তিনি বিজ্ঞানীর দৃষ্টি ও অনুসন্ধিৎসা নিয়ে। বিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তিনি একবার বলেছিলেন; বিজ্ঞান বলতে বোঝায় একটি একক সত্তাকে (entity) ভেঙে তার উপাদানগুলিকে একটি একটি করে বিচার করে এই অখণ্ড বিশ্বসংগঠনে তারা কি ভূমিকা গ্রহণ করেছে সেই তথ্যকে পরিজ্ঞাত হওয়া। এ হল বিজ্ঞানের বিশ্লেষণের দিক। অন্যদিকে বিজ্ঞান আবার সংশ্লেষণীও। কোনো বস্তু বা ভাব বা পদ্ধতির বিভিন্ন অংশ বা স্তর কিভাবে একটি সংহত সম্পূর্ণরূপ লাভ করেছে, এই সম্পূর্ণতায় তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও স্থান কি তার সত্যানুসন্ধানও বিজ্ঞান। কবির সৃজনশীল সাহিত্যেও এই বিজ্ঞানী দৃষ্টি পরিদৃষ্ট হয়; কিন্তু সব থেকে বেশী স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর সমালোচনা সাহিত্যে। সাহিত্যের যত বিভিন্ন শ্রেণীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল প্রত্যেকটিতে তাঁর প্রয়াস ধাবিত হয়েছে এবং নিজেও কয়েকটি নূতন শ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্টি করে গিয়েছেন। সাহিত্যের আঙিনায় তিনি কী বিচিত্র ফসল না ফলিয়েছেন। গীতি-কবিতা, দীর্ঘ-কবিতা, সামাজিক-ঐতিহাসিক-

সাংকেতিক নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প, গদ্য-কবিতা, সাহিত্যিক-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রবন্ধাবলী; আর কী অজস্র সেই ফলন! রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে এ কথা জোর দিয়েই বলা যেতে পারে যে, "সাহিত্যের এমন কোনো রূপ ছিল না যা তাঁর প্রতিভার স্পর্শ পায় নি এবং যাকে তিনি ঋদ্ধ করতে পারেন নি এমন কিছুই তিনি স্পর্শ করেন নি।" কবির সাংগীতিক প্রতিভা ও সিদ্ধি—দুটিই ছিল অনন্য। তাঁর উদ্ভাবিত গায়নরীতি ও সুরশৈলী বর্তমানে 'রবীন্দ্র সংগীত' নামে প্রখ্যাত হয়েছে। বস্তুতঃ, ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসে তাঁর নাম হরিদাস স্বামী, গোপাল নায়ক, আমীর খসরু, তানসেন ও ত্যাগরাজের সঙ্গেই উল্লেখ করতে হয়। জীবনের অপরাহ্ণে তিনি চিত্রকলার দিকে ঝুঁকেছিলেন; এই প্রবণতা এসেছে তাঁর পারিবারিক এবং পারিপার্শ্বিক ঐতিহ্য থেকে। আত্মপ্রকাশের মাধ্যমরূপে এর তাগিদ তিনি অস্বীকার করতে পারেন নি। কলমের আঁচড়ে ফুটিয়ে তোলা হিজিবিজি ছবি ও স্কেচ্, রঙিন চিত্র ও কম্পোজিশন রেখার উপর তাঁর আধিপত্যের এবং বর্ণ ও আঙ্গিকের উপর একরকমের রহস্যময় আকর্ষণের যে পরিচয় বহন করে এনেছে ভারতের আধুনিক শিল্পকলার ইতিহাসে তা রবীন্দ্রনাথের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান নির্দিষ্ট করে রেখেছে। তাছাড়া, অভিনয়কলায়ও তিনি ছিলেন সিদ্ধশিল্পী, নাট্যরচনায় ও নাটক প্রযোজনায় পরম উৎসাহী। আধুনিক ভারতীয় নৃত্যকলা তাঁরই উৎসাহ ও প্রবর্তনায় পুনরুজ্জীবন ও পুনর্বিকাশ লাভ করেছে।

এই সব এবং আরো অনেক কিছু শিল্পকলা ও নন্দনতত্ত্বের জগতে রবীন্দ্রনাথের নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভার পরিচয়বাহী। ঋষিসুলভ প্রজ্ঞাদৃষ্টির অধিকারী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ; লাভ করেছিলেন ইন্দ্রিয়াতীত অপ্রত্যক্ষগোচর সত্তার আভাস। মরমী ও ভক্ত কবি রূপে ভারত ও বিশ্বের মহত্তম দ্রষ্টা, ঋষি ও ভক্তগোষ্ঠীর একাসনে তিনি অধিষ্ঠিত। মানুষের মহিমাকে তিনি সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন, উপলব্ধি করেছেন মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশে দেবত্বের

স্বরূপ। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের এবং সাহিত্যসৃষ্টির এই বিশেষ দিকটিই বর্তমান যুগের মানুষের কাছে গভীরতম আবেদন বহন করে এনেছে বলে মনে হয়। আলোর অভাবে এ যুগের মানুষ পথভ্রষ্ট এবং যে পরম সত্তাকে সে দেখতে পায়না বা গভীরভাবে হৃদয়ংগম করতে পারেনা, তাকে অস্পষ্টভাবে অনুভব করছে মাত্র। এখানে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে যে বাণী উচ্চারিত হয়েছে সে শুধু তাঁর একলারই নয়। এর পিছনে রয়েছে তাঁর দেশের প্রাচীন মনীষার বাণী, সে বাণী রয়েছে উপনিষদের বেদান্ত দর্শনে, রয়েছে ভগবদ্-গীতায়। তিনি কেবল প্রাচীন ভারতের সনাতন ধর্ম বা 'শাশ্বত দর্শন' মানবসাধারণের জন্য সহজবোধ্য করে ব্যাখ্যা করে গিয়েছেন।

রবীন্দ্র ব্যক্তিত্বের বাস্তবদিকগুলিও এড়িয়ে যাওয়া অথবা লঘু করে দেখা উচিত হবে না। প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন শিক্ষাব্রতী। সে সময় দেশের মানুষের সেবার চিন্তা তাঁকে গভীর-ভাবে অধিকার করেছিল। ১৯০১ সালে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্ম-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তারপর সেই প্রতিষ্ঠান ১৯২১ সালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হওয়ার সংগে সংগে শিক্ষা দান এবং মানস ও অধ্যাত্ম চর্চার ক্ষেত্রে মৌলিক ভাব ও চিন্তা বিস্তারের গতিশীল কেন্দ্ররূপে শান্তিনিকেতন পৃথিবীর সাংস্কৃতিক মানচিত্রে স্থান লাভ করে। দেশের মানুষের আর্থিক সচ্ছলতা যে তার সাংস্কৃতিক ও মানসিক অগ্রগতির বনিয়াদ একথা রবীন্দ্রনাথ বিস্মৃত হন নি। তাই দেশের সাধারণ মানুষের সাহায্যের উদ্দেশ্য নিয়ে শান্তিনিকেতনের নিকটে শ্রীনিকেতনে একটি শিল্পাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। এর নানা উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্যতম হল গ্রামীণ শিল্পকলার উন্নতির মাধ্যমে গ্রামের অর্থনৈতিক কাঠামোটি সুদৃঢ় রাখা। ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সকল আন্দোলনের সংগে তিনি সর্বদাই মনে প্রাণে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কর্মসূত্রে জড়িত ছিলেন।

রাজনীতির ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের আসন ছিল পুরোভাগে।

ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা এবং ১৯০৫ সালে বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথ হয়ে উঠেছিলেন জননায়ক। বিবিধ রচনায় ও ভাষণে এবং সর্বোপরি স্বদেশপ্রেমমূলক গানে তিনি সমগ্রজনচিত্ত অনুপ্রাণিত করে তুলেছিলেন এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের এমন একটি আদর্শগত পটভূমিকা রচনা করেছিলেন যার অভাবে এই আন্দোলন নিরর্থক ও প্রাণহীন হয়ে উঠতে পারত। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্রতী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কোন একটি বাৎসরিক অধিবেশন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরকে ভারতের ভাগ্যবিধাতারূপে কল্পনা করে ভারতের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্যবিধান এবং তাঁর নানা ধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্যে সাম্য রক্ষার জন্য ভারতকে আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব দানের আহ্বান জানিয়ে যে প্রার্থনা সংগীত রচনা করেছিলেন স্বাধীন ভারতে সেই গানটিকে জাতীয় সংগীতের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। বৃটিশ ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদিগণের অসাম্য, নিষ্ঠুরতা ও শোষণের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের বলিষ্ঠ প্রতিবাদও ইতিহাসে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে।

আন্তর্জাতিকতার অন্যতম প্রধান পুরোধা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। জাতীয়তার বোধ যার গভীর নয়, যথার্থ আন্তর্জাতিক চেতনাসম্পন্ন হওয়া তার পক্ষে কখনই সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের জীবনে এই উক্তির সার্থকতার নিদর্শন প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। হোমার, ভার্জিল, কালিদাস, শেক্সপীয়ার, গ্যয়টে প্রভৃতির মতো পৃথিবীর মহৎ কবি ও চিন্তানায়কগণের মধ্যে এর সারবত্তা লক্ষিত হয়েছে। তেমনি রবীন্দ্রনাথও ছিলেন গভীর জাতীয়তাবোধসম্পন্ন একজন ভারতীয় এবং এমনই একজন ভারতীয় যাঁর মাতৃভাষা ছিল বাংলা। ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতি এবং ভারতের সঙ্গে সম্পৃক্ত যাবতীয় মহৎ, শুভ ও স্থায়ী বস্তুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক ছিল গভীর ও নিবিড়। কিন্তু উন্নাসিকতা তাঁর ছিল না। "ভ্রান্ত হোক, অভ্রান্ত হোক, আমার দেশ আমারই" বা "আমার জাতি ইতিহাসের

প্রাচীনতম ও মহত্তম''—এমন অনুদার দৃষ্টিভঙ্গী ছিল না তাঁর কোন দিন। পৃথিবীর অন্যান্য দেশ ও জাতি থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রেখে আত্মসন্তুষ্টির গজদন্তমিনারে ভারতকে বসিয়ে অপূর্ব স্বাতন্ত্র্যবোধের গৌরব ভুঞ্জনের কোন রকম স্পৃহা ছিল না রবীন্দ্রনাথের। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে যে সব মহত্তম বাণী ও কর্ম উচ্চারিত ও সাধিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাদের ভারতে আবাহন করে আনার পক্ষে। পাশ্চাত্যের ভৌতবিজ্ঞান কি কারিগরী বিদ্যা বা কেবলমাত্র পাশ্চাত্য বুদ্ধিচর্চাকেই নয়, পার্থিব ব্যাপারে, বুদ্ধির ক্ষেত্রে এবং অধ্যাত্মবিষয়ে ভারতকে সমৃদ্ধ করে তুলতে রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্যের অধ্যাত্ম উপলব্ধিকেও গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর স্বপ্নের ভারত, বস্তুত ইতিহাসেরই ভারত; এই ভারতে সকল সংস্কৃতি, সকল ভাষা ও সকল বিশ্বাস সমাদৃত, এক বিশ্বজনীন সুরসংগতি সৃষ্টির জন্য এখানে তাদের জন্য বিছানো এক গৌরবময় আসন।

এমনই বহুমুখী ছিল রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব। বেদ যাকে বলেছেন—বিশ্বমনাঃ—''যিনি নিখিলব্যাপ্ত মানস, যিনি সার্বিক বোধসম্পন্ন''—রবীন্দ্রনাথকে সেই অভিধায় যথার্থরূপে বর্ণনা করা যেতে পারে। তিনি ছিলেন যথার্থই বিশ্বম্ভর—''যিনি আপন ব্যক্তিত্বে মনুষ্য জগতের সকল কিছুকেই ধারণ করেন।'' একটি বহুকোণসমন্বিত অতিকায় হীরকখণ্ডের মতোই ছিল রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব—যার প্রতিটি কোণ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে আলোর কণা। এই বিচ্ছুরিত ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে যারাই এসেছে আলোকিত হয়ে উঠেছে। তাই নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ নাট্যরসিক ও নাট্যানুরাগীদের সঙ্গে তাদের আপন ক্ষেত্রে মিলতে পারতেন। জীবনের ব্রত হিসাবে যারা শিক্ষাকে কি সমাজসেবাকে একান্তভাবে গ্রহণ করেছে, সেই সমস্ত শিক্ষক ও সমাজবিজ্ঞানীরাও তাই সমাজসেবী রবীন্দ্রনাথ বা শিক্ষাব্রতী রবীন্দ্রনাথের গুণগ্রাহী ও অনুবর্তী হয়েছে। রাজনীতি ও জাতিগঠন সম্বন্ধে তাঁর সুস্থ চিন্তাধারা থেকে রাজ-

নীতিক প্রেরণা সঞ্চয় করতে পারে, সংকীর্ণ চিত্ত জাতীয়তাবাদী পারে সাধারণ মানুষের হিতের জন্য, সে হিত অবশ্যই ভারতের মানুষকে বাদ দিয়ে নয়, বিভিন্ন জাতিসমূহের মধ্যে সহযোগিতা-মূলক মনোভাব গ্রহণের মতো উচ্চতর চিন্তাস্তরে উঠতে। রবীন্দ্র-প্রতিভার এই সর্বগ্রাহী বৈশিষ্ট্যই হল সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় এবং আমার মনে হয় এর পটভূমিতে রয়েছে মানুষের প্রতি তাঁর অপরিসীম প্রীতি।

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের এত সব বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও নিজের সম্বন্ধে তিনি প্রায়ই বলে এসেছেন যে তাঁর সর্বপ্রথম এবং সর্ব-প্রধান পরিচয় এই যে তিনি কবি, তিনি গায়ক—মানুষের সুখদুঃখ, আশা-নিরাশা, ব্যর্থতা বেদনা, স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষার গান গেয়েছেন তিনি, গান গেয়েছেন তার, প্রিয় বলে মানুষ যাকে বুকে আঁকড়ে ধরেছে এবং বর্জনীয় বলে রাখতে চেয়েছে দূরে। কবিরূপে ভাষার মাধ্যমেই তাঁকে আত্মপ্রকাশ করতে হয়। আর খুব স্বাভাবিক কারণে মাতৃভাষা বাংলাকেই তিনি অবলম্বন করেছিলেন। ভারতের চিন্তা ও সংস্কৃতির ভাণ্ডার সংস্কৃত ভাষার উপরও তাঁর আধিপত্য ছিল। সংস্কৃতকে তিনি পেয়েছিলেন অতীতের উত্তরাধিকাররূপে। ইংরেজী ভাষার সঙ্গে তাঁর পরিচয়ও ছিল ঘনিষ্ঠ। বিশ্বের সর্বাধিক ব্যবহৃত ভাষা এই ইংরেজী বহির্জগতের আলোহাওয়া বহন করে এনেছিল ভারতের অচলায়তনের অভ্যন্তরে। এই ভাষা-চর্চায় তিনি যুগপৎ আনন্দ ও ফললাভ করেছিলেন। ইংরেজী ভাষার সাহায্যেই বৃটেন, ইউরোপ এবং সমগ্র পৃথিবীর বিশাল সাহিত্যের বিপুল ধনভাণ্ডারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় সাধিত হয়েছিল।

কিন্তু মাতৃভাষাই ছিল তাঁর আত্মপ্রকাশের সর্বাধিক উপযোগী ও শক্তিশালী বাহন। কবির উচ্চতম চিন্তা, মহত্তম অনুভূতি ও অপূর্ব সুন্দর ভাবরাজি, তাঁর কবিতা ও সমালোচনা এবং চিন্তনে-গঠনে-সংহতিতে-উপলব্ধিতে সমুজ্জ্বল উপন্যাস-

সমূহের অনবদ্য গীতিময় পংক্তিগুলি কবির মাতৃভাষাতেই রচিত। বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম ভাষাশিল্পীদের তিনি ছিলেন অন্যতম। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পূর্বে বাংলাভাষা ভারতের একটি প্রাদেশিক ভাষামাত্র ছিল, তিনি তার সকল সুপ্তশক্তিকে জাগিয়ে তোলেন। যে মাতৃভাষা ছিল পিতলের মতো ম্লানদ্যুতি তাকেই স্বর্ণকান্তিতে উজ্জ্বল করে দিয়ে যান রবীন্দ্রনাথ। মধ্যযুগীয় স্থবিরত্ব যে ভাষার প্রায় সর্বাঙ্গ বেষ্টন করে রেখেছিল সেই ভাষারই অবসন্ন ধমনীতে প্রচুর প্রাণরক্ত ও জীবনীশক্তি সঞ্চার করে রবীন্দ্রনাথ তাকে আধুনিক ভাবপ্রকাশে বিশ্বের সকল প্রাগ্রসর ভাষার সমকক্ষ করে তুলেছিলেন। এর জন্যে একদিকে যেমন আমরা রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা ও শিল্প-নৈপুণ্যের কাছে ঋণী, তেমনি অন্যদিকে (ইংরেজী সাহিত্যের মাধ্যমে ইউরোপীয় চিন্তাধারার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত) বাংলাভাষী মানুষের উপর পাশ্চাত্য চিন্তা ও সংস্কৃতির অভিঘাতের নিকটেও। এই দিক থেকে রবীন্দ্রনাথকে দেবগুরু বৃহস্পতির সম্বন্ধে প্রযুক্ত 'বাক্‌পতি' বা 'বাক্যাধিরাজ' নামে ভূষিত করলেই তাঁর কৃতিত্বের পূর্ণ মর্যাদা দেওয়া হয়।

বস্তুতঃ তিনি ছিলেন যথার্থই 'বাক্যাধিরাজ'। যে 'বাচম্‌' তার সকল সুপ্ত শক্তি, সকল তেজ, সকল সৌন্দর্য নিয়ে সর্বপ্রথম তাঁর কাছে ধরা দিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ যে তাকে অত্যন্ত সার্থকতার সঙ্গে ব্যবহার করেছিলেন তাই নয়, বাংলাভাষার চরিত্রবৈশিষ্ট্য ও ইতিহাসের উপর আলোক ক্ষেপণে যে কয়জন পূর্বসূরী সাফল্য লাভ করেছিলেন, তিনি তাঁদের অন্যতম। ১৯২৬ সালে আমার ইংরেজী গ্রন্থ 'The Origin and Development of Bengali Language'-এর ভূমিকায় যা লিখেছিলাম এখানে তা থেকে উদ্ধৃত করছি ঃ "বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে যে প্রথম বাঙালী মনীষী ভাষা সমস্যার দিকে চোখ ফিরিয়েছিলেন তিনি কবি রবীন্দ্রনাথ। ভাষাতত্ত্বের অনুরাগীদের কাছে শ্লাঘার বিষয় যে, ইনি একদিকে বাংলাভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক এবং সর্বকালের শ্রেষ্ঠ কবি

ও দ্রষ্টা; অন্যদিকে একজন তীক্ষ্ণধী ভাষাতাত্ত্বিক, যিনি ভাষা-রহস্যের সত্য সন্ধানে প্রগাঢ় নিষ্ঠাবান এবং আধুনিক পাশ্চাত্য ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণের বিচারপদ্ধতি ও আবিষ্কারসমূহের গুণগ্রাহী। বাংলা ধ্বনিবিজ্ঞান, বাংলা ধ্বন্যাত্মক শব্দ (nomato-poetics) বাংলা বিশেষ্য পদ ও অন্যান্য বিষয়ের উপর রবীন্দ্রনাথের গবেষণা কয়েকটি প্রবন্ধের আকারে (বর্তমানে একটি গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট) বাহির হয়—এদের প্রথমটির আবির্ভাব ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এবং মাত্র কয়েক বৎসর আগে আরো কতক-গুলি নূতন প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রবন্ধগুলি বাঙালীর কাছে তার ভাষা সমস্যা সমাধানের সঠিক পথ নির্দেশ করে দিয়েছে বলা যেতে পারে।"

আধুনিক ভারতের মহৎ চিন্তানায়কগণের অগ্রণী রামমোহন রায়ও বাংলা ভাষার প্রতি মনোনিবেশ করেছিলেন। তাঁর ব্যাকরণে (১৮২৬ এবং ১৮৩৬ সালে প্রকাশিত) কতকগুলি অত্যন্ত মূল্য-বান তথ্য তিনি লিপিবদ্ধ করে যান। কিছুটা সত্যদৃষ্টিসম্পন্ন আর কয়েকজন বাঙালী লেখক অবশ্য ছিলেন, কিন্তু তাঁদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। তাঁদের মধ্যে চিন্তামণি গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮৫), নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ (১৮৯৮) এবং হৃষীকেশ শাস্ত্রী (১৯০০) নাম কয়টি উল্লেখ করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের বয়োজ্যেষ্ঠ সমসাময়িক বাংলাদেশের আর দুটি সুসন্তান বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক রামেন্দ্র-সুন্দর ত্রিবেদী এবং ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁদের প্রবন্ধাবলীতে বাংলাভাষা চর্চায় একটি যুক্তিপ্রবণ দৃষ্টিভঙ্গী প্রবর্তনের প্রয়াস করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সহজেই রামেন্দ্রসুন্দর ও হরপ্রসাদের পথের অনুবর্তী হন এবং বাংলা সাহিত্যের সর্বজন-স্বীকৃত শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকরূপে তাঁর প্রভাব দিয়ে মাতৃভাষা ও তার গতিপ্রকৃতির সঠিক মূল্যায়নে আগ্রহী বুদ্ধিমান বাঙালী সাধারণের মানসিকতা প্রস্তুতিতে সাহায্য করে—অবশ্য গোঁড়া মানসিকতাসম্পন্ন পণ্ডিতেরা দূরত্ব বজায় রেখেই চলেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের বলেছেন যে, বাংলা তাঁর মাতৃভাষা বলে এবং চেনা পরিবেশ থেকে সচেতন প্রয়াস ছাড়াই তাকে গ্রহণ করেছিলেন বলে তিনি ধরেই নিয়েছিলেন যে এ ভাষা সকলের পক্ষেই সহজবোধ্য। কিন্তু কোন এক সময় জনৈক অবাঙালীকে এই ভাষা শেখাতে গিয়ে তিনি দেখতে পান যে, এই সহজ ভাষাটিরই নানা অব্যাখ্যাত জটিলতা মাথা ঠেলে দাঁড়াতে শুরু করেছে। এই সমস্যা তাঁকে ভাবিয়ে তুলল। তখনই তিনি এ সম্পর্কে তথ্য ও উদাহরণ সংগ্রহে লেগে যান। তাঁর এই গবেষণা থেকেই সর্বপ্রথম বাংলা ভাষার প্রামাণিক কথ্যরূপের ধ্বনিবিজ্ঞানের মৌল নিয়মগুলি নির্দিষ্ট হয়। বাংলাভাষার ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি একটি বিশেষ স্বভাবের বাগ্‌রীতি ; এই রীতি ইন্দো-আর্য ভাষাগোষ্ঠীর অন্যান্য শাখা এবং দ্রাবিড়ীয় ও অষ্ট্রীয় ভাষাসমূহেও দৃষ্টিগোচর হয়। রবীন্দ্রনাথই প্রথম এই শ্রেণীর শব্দগুলির প্রকৃতি ও কার্যকলাপ নিরূপণ করেন। এই গবেষণায় রবীন্দ্রনাথের মৌলিক প্রবন্ধটি অন্য আর এক দিক থেকে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী কর্তৃক সার্থক-ভাবে সম্পূরিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের এই প্রাথমিক প্রচেষ্টার খুঁটিনাটির মধ্যে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। হয়তো এই বিভাগে তাঁর সত্যকার দানের পরিমাণ খুব বেশী নয়—মোটামুটি একটি যোগ-সূত্রে গ্রথিত কয়েকটি এলোমেলো প্রবন্ধের সমষ্টি। এই উল্লেখিত প্রবন্ধগুলি পরবর্তী কালে 'শব্দতত্ত্ব' নামে পুস্তকাকারে ১৯০৯ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। কিন্তু প্রবন্ধগুলির মূল্য ভাষাচর্চার সূত্রপাতে এবং সঠিক পথনির্দেশনায়। এখানেই রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব। আধুনিক ইন্দো-আর্য ভাষাসমূহের প্রথম তুলনামূলক ব্যাকরণ রচনা করে যিনি "আধুনিক ইন্দো-আর্য ভাষাবিজ্ঞানের জনক" পদবাচ্য সেই John Beames কৃত বাংলা ব্যাকরণের একটি রসপূর্ণ সমালোচনাও করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কী গভীর নিষ্ঠায় যে রবীন্দ্রনাথ ভাষাবিজ্ঞান এবং ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাসমূহের তুলনামূলক ব্যাকরণ চর্চা করেছিলেন তার উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ

করা যেতে পারে যে, এই বিষয়ে শিখিত বিখ্যাত জার্মান পণ্ডিত Karl Brugmann কৃত চার খণ্ডে সমাপ্ত বিরাট গ্রন্থটির ইংরেজী অনুবাদ তিনি পড়েছিলেন। কবির নিজের হাতে পেনসিল চিহ্ন দেওয়া ও মন্তব্য লেখা সেই গ্রন্থের একটি খণ্ড শান্তিনিকেতন গ্রন্থাগারে আমি দেখেছি।

প্রসঙ্গত বলা উচিত যে বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘজীবনে কোনসময়ই ক্ষুণ্ণ হয়নি। বালক বয়সেই বিজ্ঞানে তাঁর হাতে খড়ি। এই সময় কবির পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আকাশের গ্রহনক্ষত্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। ১৯২৭ সালে তিনি মালয়, ইন্দোনেশিয়া ও শ্যামদেশ ভ্রমণে বহির্গত হন, সে সময় তাঁর ভ্রমণসঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এই ভ্রমণে বেরিয়ে পড়াশুনো করার জন্যে তিনি কলকাতার বড়ো বড়ো বই-এর দোকান ঘেঁটে বহু বই কিনেছিলেন। এর মধ্যে ছিল Today and Tomorrow গ্রন্থমালার আঠারো থেকে কুড়ি খণ্ড বই। ইংরেজীতে লেখা বিজ্ঞান-বিষয়ক এই ক্ষুদ্র গ্রন্থমালায় ভৌতবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের সর্বাধুনিক তথ্যের আলোচনা থাকত। কবির এই জ্ঞানলিপ্সা আমাতেও সংক্রামিত হয় এবং আমি এদের মধ্যে অন্তত আধ-ডজন বই পড়ে ফেলার সময় ও সুযোগ পেয়েছিলাম।

বাংলা ভাষাতত্ত্ব ও সমস্যার চর্চায় রবীন্দ্রনাথ কখনই ক্ষান্ত হননি এবং সময় ও সুযোগ মতো এই বিষয়ে ভাবনা-রসোজ্জ্বল প্রবন্ধ রচনা করে এসেছেন। বাংলা ছন্দের জটিল প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা করেছেন আপন বিশিষ্ট ভঙ্গীতে। কবির আলাপ-আলোচনায়. বিশেষ করে আমি যখন তাঁর সঙ্গে থাকতাম, বাংলা ব্যাকরণের নানা বৈশিষ্ট্য ও সমস্যার অবতারণা হত এবং আমরা সর্বদাই কবির মতামত ও উক্তি থেকে নতুন আলোকলাভের অপেক্ষায় থাকতাম ; কবিও সরস কৌতুকচ্ছুরিত অনবদ্য ভঙ্গীতে সর্বদা আমাদের আশা চরিতার্থ করতেন। আমার লেখা The Origin

and Development of the Bengali Language গ্রন্থখানি পাঠ করে কবি আমার প্রতি পরম সম্মান প্রদর্শন করেছেন। আমার পক্ষে অত্যন্ত গৌরবের কথা এই যে, এই গ্রন্থে অনুসৃত আমার দৃষ্টিভঙ্গী, বিচারপদ্ধতি ও গৃহীত সিদ্ধান্ত কবির প্রশংসা অর্জন ও সমর্থন লাভ করেছে। কতকগুলি রচনায় কবি তা প্রকাশও করেছেন। আমার এই কাজের জন্য যে তিনি আমার প্রতি বিশেষ স্নেহ পোষণ করতেন তার প্রচুর নিদর্শন আমি পেয়েছি।

কবির এই স্নেহ আমার জীবনে এক পরম গৌরব। কিন্তু আমার বিশ্বাস কবির স্নেহের উৎস রসবর্জিত শুষ্ক পাণ্ডিত্যে নয়, বরং, মানুষ ও তার পরিবেশের প্রতি আগ্রহই যে আমার ভাষা-চর্চার সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত এই ধারণাই তাঁর স্নেহের মূলে। এ বিষয়ে আমার নিজের স্পষ্ট কোনো ধারণা ছিল না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথেরই প্রথমে এদিকে দৃষ্টি পড়ে এবং তখনই আমি এ বিষয়ে সচেতন হই। আমার এত সব কথা বলার উদ্দেশ্য হল, মানবপ্রীতিই যে কবিকে ভাষার উদ্ভব ও কার্যকলাপের প্রতি আগ্রহ-শীল করে তোলে সেই সত্যটির উপর গুরুত্ব আরোপ করা।

বাংলাভাষা সম্বন্ধে কবির পরবর্তী কালের আলোচনা ১৯৩৮ সালে গ্রন্থাকারে 'বাংলাভাষা পরিচয়' নামে প্রকাশিত হয়। বইটি কবি আমার নামে উৎসর্গ করেন এবং উৎসর্গপত্রে আমাকে 'ভাষা-চার্য' বলে আখ্যাত করেন। কবির দেওয়া এই অনুষ্ঠানহীন উপাধি আমি পরম মূল্যবান জ্ঞান করে সগর্বে নিজের নামের সঙ্গে ব্যবহার করে আসছি। যথার্থ পণ্ডিতজনোচিত বিনয় প্রকাশ করে কবি এই গ্রন্থে নিজেকে "পায়ে-চলা পথের ভ্রমণকারী" বলে পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ভাষারাজ্যের রাজপথ ও গলিপথে বিচরণ করে তিনি আপন মতামত ব্যক্ত করে চলেছেন, উদ্দেশ্য পাঠকগোষ্ঠীর মধ্যে ভাষারাজ্যের অনুরূপ ভ্রমণরসিক গড়ে তোলা। গ্রন্থটির সূচনায় তিনি লিখেছেন,

"মানুষের মনোভব ভাষাজগতের
যে অদ্ভুত রহস্য আমার
মনকে বিস্ময়ে অভিভূত করে
তারই ব্যাখ্যা করে এই
বইটি আরম্ভ করেছি।"

তাই দেখি, কবির মধ্যে বাক্‌রহস্যের প্রতি বিস্ময়বোধ যেমন বিদ্যমান, তেমনি সেই রহস্যকে ভেদ করবার সচেতন ইচ্ছা ও প্রয়াস। অন্যান্য আর অনেক বিষয়ের মতোই ভাষারাজ্যেও রবীন্দ্রনাথ তাই সমান মরমী, সমান চিন্তাশীল, সমান বিজ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্ন।

প্রবন্ধের প্রথম উদ্ধৃত ঋগ্বেদের সূক্তটির অনুপম বর্ণনা অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথ সত্যকার অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বাক্‌কে দর্শন ও শ্রবণ করেছিলেন এবং বাক্‌ ও তার সকল মাধুর্যে মণ্ডিত হয়ে, পতি ও বল্লভ সকাশে প্রেমমুগ্ধা জায়ার মতোই কবির কাছে ধরা দিয়েছিলেন। সকল দিক দিয়ে তিনি তাই বাক্‌পতি, বাগ্‌বল্লভ। বিশ্বের যা কিছু মানুষের কৌতূহলের সামগ্রী সে সমস্ত দিকেই ধাবিত হয়েছে কবির বাধামুক্ত মন ; বাক্‌প্রীতি কবির সেই বিপুল বিস্তৃত মানসিকতারই একটি অঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ তাই বিশ্বমনাঃ, আবার বাক্‌পতিও॥

রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

ইংরেজীতে 'নেশন' বা 'ন্যাশনালিজম্' বলিলে যাহা বুঝায় আমাদের দেশে ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে তাহার সম্বন্ধে কোন ধারণা ছিল না। সুতরাং সংস্কৃত অথবা প্রাকৃত ও দেশী ভাষায় তাহার কোন প্রতিশব্দ নাই। প্রধানতঃ আমরা 'জাতি' ও 'জাতীয়তাবাদ' এই দুইটি শব্দই ঐ অর্থে ব্যবহার করি। কিন্তু জাতিশব্দ ব্রাহ্মণাদি সামাজিক শ্রেণী-বিভাগের সংজ্ঞারূপেই আমাদের নিকট চির-পরিচিত। 'তুমি কোন্ জাতি' এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলি 'ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, মাহিষ্য' ইত্যাদি—হিন্দু বা ভারতীয় বলি না। কিন্তু অন্য কোন শব্দের অভাবে বর্তমান প্রবন্ধে ইংরেজী 'নেশন' বা 'ন্যাশনালিজম্'—এই অর্থে 'জাতি' ও 'জাতীয়তাবাদ' এই দুইটি প্রতিশব্দ ব্যবহার করিব। রবীন্দ্রনাথ 'নেশন' কথাটিই তাঁহার বাংলা প্রবন্ধে অনেক স্থলে ব্যবহার করিয়াছেন।

জাতীয়তার সংজ্ঞা ও স্বরূপ লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা এই প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে। কিন্তু কয়েকটি বিশেষত্ব বর্তমান না থাকিলে এক বা একাধিক মনুষ্যগোষ্ঠীকে একটি নির্দিষ্ট জাতিরূপে গণ্য করা যায় না। রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও স্বাধীনতা—ইহার মধ্যে সর্বপ্রধান। অর্থাৎ যে সমুদয় মানবগোষ্ঠী এক জাতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিচিত হইতে চায় তাহাদের সকলের মনেই এই ইচ্ছা বলবতী হইবে যে তাহারা একই রাষ্ট্রের অধীনে থাকিবে এবং এই বিভিন্ন গোষ্ঠীর কোন একটিই এই রাষ্ট্রের বহির্ভূত অন্য কোন গোষ্ঠী বা জাতির সহিত নিজ রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত যে কোন গোষ্ঠী অপেক্ষা অধিকতর ঘনিষ্ঠ

সম্বন্ধ স্থাপন করিবে না। অর্থাৎ যে কোন জাতির স্বার্থ বা অভিপ্রায় অন্য কোন জাতির স্বার্থ বা অভিপ্রায়ের পরিপন্থী হইলে প্রত্যেকেই স্বীয় জাতির স্বার্থ বা অভিপ্রায়ের সপক্ষে থাকিবে। ইংরেজ জাতির মধ্যে নানা প্রকার দলভেদ আছে। কিন্তু যদি ইংরেজের সহিত ফরাসী বা জার্মানের যুদ্ধ বাধে তবে প্রত্যেক ইংরেজই নিজের জাতির পক্ষ হইয়া লড়িবে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এমন অনেক লোক আছে যাহারা দুই-তিন পুরুষ পূর্বে জার্মান বা ইতালিয়ান ছিল। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইহারা জার্মান ও ইতালিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল। ভাল হউক বা মন্দ হউক, ন্যায় হউক কি অন্যায় হউক, অন্য জাতির সম্পর্কে আমার জাতীয় গভর্নমেণ্ট যাহা করিবে আমি তাহার সমর্থন করিব —ইহাই জাতীয়তাবাদীর ধর্ম।

য়ুরোপে এই জাতীয়তাবাদের ফলে ফরাসী, ইংরেজ, জার্মান প্রভৃতি শক্তিশালী রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে এবং তাহারা সমগ্র পৃথিবীকে পদানত করিয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের দেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তনের ফলে এই জাতীয়তাবাদের ধারণা আমাদের মনে প্রথম জাগরূক হয়। বঙ্গদেশেই ইংরেজী শিক্ষা প্রথম প্রসার লাভ করে। সুতরাং বঙ্গদেশেই জাতীয়তাবাদের প্রথম উন্মেষ হয়। রবীন্দ্রনাথ যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেন—অর্থাৎ একশত বৎসর পূর্বে—রাজনারায়ণ বসু এই প্রকার জাতীয়তা-বাদের প্রথম প্রচার করেন। তাঁহার শিষ্য নবগোপাল মিত্র হিন্দু-মেলার অনুষ্ঠান ও "ন্যাশনাল পেপার" পত্রিকার মাধ্যমে এই জাতীয়তাবাদের আদর্শ ও স্বরূপ বাঙ্গালী হিন্দু সমাজে প্রচার করেন। হিন্দুধর্ম ও হিন্দুর প্রাচীন সংস্কৃতি ও গৌরবময় ঐতিহ্যের ভিত্তির উপর এই জাতীয়তার সৌধ প্রতিষ্ঠিত হয়। আচারে, ব্যবহারে, ভাষায় ও চিন্তায় যাহাতে ইংরেজের অনুকরণ না করিয়া নিজের দেশের স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে একত্র মিলিত হইয়া এক স্বাধীন জাতি গঠন করিতে পারি ইহাই ছিল এই জাতীয়তা-

বাদীদের লক্ষ্য। রাজনারায়ণ বসু এই উদ্দেশ্যে গুপ্ত সমিতি গঠন করেন। রবীন্দ্রনাথ এই সমিতিতে যোগদান করেন এবং রাজনারায়ণ বসুর নিকট ‘‘ভারত উদ্ধারের দীক্ষা’’ গ্রহণ করেন। হিন্দু-মেলা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেনঃ ‘‘ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম হয়। মেজদাদা (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর) সেই সময়ে বিখ্যাত জাতীয়-সংগীত ‘‘মিলে সবে ভারতসন্তান’’ রচনা করিয়াছিলেন। এই মেলায় দেশের স্তবগান গীত, দেশানুরাগের কবিতা পঠিত, দেশী শিল্প ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত ও দেশী গুণী লোক পুরস্কৃত হইত।’’[১] ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমে এই জাতীয়তাবাদ সমগ্র ভারতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং আমাদের রাজনৈতিক জীবনের আদর্শ বলিয়া সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। কিন্তু প্রৌঢ় বয়সে রবীন্দ্রনাথ ক্রমে এই জাতীয়তাবাদের আদর্শ ত্যাগ করিয়া এক নূতন মতবাদ প্রচার করেন। তাঁহার জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি এই নূতন মতের সমর্থনেই লেখনী ধারণ করিয়াছেন। ষাট বৎসর পূর্বে অর্থাৎ চল্লিশ বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

“প্রত্যেক জাতির যেমন একটি জাতিধর্ম আছে, তেমনি জাতিধর্মের অতীত একটি শ্রেষ্ঠ ধর্ম আছে তাহা মানবসাধারণের। আমাদের দেশে বর্ণাশ্রম ধর্মে যখন সেই উচ্চতর ধর্মকে আঘাত করিল, তখন ধর্ম তাহাকে আঘাত করিল।

* * *

“রাষ্ট্রীয় স্বার্থকে য়ুরোপীয় সভ্যতা এতই আত্যন্তিক প্রাধান্য দিতেছে যে, সে ক্রমশই স্পর্ধিত হইয়া ধ্রুবধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছে।......প্রাচীন গ্রীক ও রোমক সভ্যতারও মূলে এই রাষ্ট্রীয় স্বার্থ ছিল। সেই জন্য রাষ্ট্রীয় মহত্ত্ব বিলোপের সঙ্গে

১. জীবনস্মৃতি, ১৪৭ পৃঃ।

সঙ্গেই গ্রীক ও রোমক সভ্যতার অধঃপতন হইয়াছে। হিন্দুসভ্যতা রাষ্ট্রীয় ঐক্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে। সেই জন্য আমরা স্বাধীন হইয়া পরাধীন থাকি, হিন্দুসভ্যতাকে সমাজের ভিতর হইতে পুনরায় সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে পারি, এ আশা ত্যাগ করিবার নহে।

"'নেশন' শব্দ আমাদের ভাষায় নাই, আমাদের দেশে ছিল না। সম্প্রতি য়ুরোপীয় শিক্ষাগুণে ন্যাশনাল মহত্ত্বকে আমরা অত্যধিক আদর দিতে শিখিয়াছি। অথচ তাহার আদর্শ আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যে নাই। আমাদের ইতিহাস, আমাদের ধর্ম, আমাদের সমাজ, আমাদের গৃহ, কিছুই নেশনগঠনের প্রাধান্য স্বীকার করেন না। য়ুরোপে স্বাধীনতাকে যে স্থান দেয়, আমরা মুক্তিকে সেই স্থান দিই। আত্মার স্বাধীনতা ছাড়া অন্য স্বাধীনতার মাহাত্ম্য আমরা মানি না। রিপুর বন্ধনই প্রধান বন্ধন, তাহা ছেদন করিতে পারিলে রাজামহারাজার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদ লাভ করি। আমাদের গৃহস্থের কর্তব্যের মধ্যে সমস্ত জগতের প্রতি কর্তব্য জড়িত রহিয়াছে। আমাদের গৃহের মধ্যেই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডপতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। আমাদের সর্বপ্রধান কর্তব্যের আদর্শ এই একটি মন্ত্রেই রহিয়াছে।

ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃস্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্ যৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্ব্রহ্মাণি সমর্পয়েৎ॥

এই আদর্শ যথার্থভাবে রক্ষা করা ন্যাশনাল কর্তব্য অপেক্ষা দুরূহ এবং মহত্তর। এক্ষণে এই আদর্শ আমাদের সমাজের মধ্যে সজীব নাই বলিয়াই, আমরা য়ুরোপকে ঈর্ষা করিতেছি।

"নেশনই যে সভ্যতার অভিব্যক্তি তাহার চরম পরীক্ষা হয় নাই। কিন্তু ইহা দেখিতেছি, তাহার চারিত্র আদর্শ উচ্চতম নহে। তাহা অন্যায়, অবিচার ও মিথ্যার দ্বারা আকীর্ণ এবং তাহার মজ্জার মধ্যে একটি ভীষণ নিষ্ঠুরতা আছে।

"এই ন্যাশনাল আদর্শকেই আমাদের আদর্শরূপে বরণ করাতে আমাদের মধ্যেও কি মিথ্যার প্রভাব স্থান পায় নাই? আমাদের রাষ্ট্রীয় সভাগুলির মধ্যে কি নানা প্রকার মিথ্যা চাতুরী ও আত্ম-

গোপনের প্রাদুর্ভাব নাই, আমরা কি পরস্পর বলাবলি করি না যে নিজের স্বার্থের জন্য যাহা দূষনীয়, রাষ্ট্রীয় স্বার্থের জন্য তাহা গর্হিত নহে। বস্তুত প্রত্যেক সভ্যতারই একটি মূল আশ্রয় আছে। সেই আশ্রয়টি ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত কিনা, তাহাই বিচার্য। যদি তাহা উদার ব্যাপক না হয়, যদি তাহা ধর্মকে পীড়িত করিয়া বর্ধিত হয়, তবে তাহার আপাত উন্নতি দেখিয়া আমরা তাহাকে যেন ঈর্ষা এবং তাহাকেই একমাত্র ঈপ্সিত বলিয়া বরণ না করি।

"আমাদের হিন্দুসভ্যতার মূলে সমাজ, য়ুরোপীয় সভ্যতার মূলে রাষ্ট্রনীতি। সামাজিক মহত্ত্বেও মানুষ মাহাত্ম্য লাভ করিতে পারে, রাষ্ট্রনীতিক মহত্ত্বেও পারে। কিন্তু আমরা যদি মনে করি, য়ুরোপীয় ছাঁদে নেশন্ গড়িয়া তোলাই সভ্যতার একমাত্র প্রকৃতি এবং মনুষ্যত্বের একমাত্র লক্ষ্য তবে আমরা ভুল বুঝিব।"[২]

সুতরাং রবীন্দ্রনাথের মতে রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও সংগঠনের পরিবর্তে সামাজিক ঐক্য ও সংগঠনের ভিত্তিতে ভারতে জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা শ্রেয়স্কর। "ন্যাশনালিজম্" নামক ইংরেজীতে লিখিত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই মত আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। ইহার কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। স্বাধীনতার চেষ্টাকে তিনি বলিয়াছেন, "to build a political miracle of freedom upon the quick-sands of social slavery."[৩]

জাতীয়তা সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেনঃ

"Nation—what is it? It is the aspect of a whole people as an organised power. This organisation incessantly keeps up the insistence of population on becoming strong and efficient. But the strenuous efforts after strength and efficiency drains man's energy from his higher nature where he is self-sacrificing and creative. Man's power of sacrifice is diverted from his ultimate object which is

২. স্বদেশ—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা, ৭৮-৭৯ পৃঃ

৩. Nationalism, p. 122.

moral to the maintenance of the organisation which is mechanical.

"Nationalism is a great menace. It is the particular thing which for years has been at the bottom of Indian troubles."

খিত মন্তব্যগুলির অনুরূপ আরও বহু উক্তি রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী ও বাংলা রচনা হইতে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। এইগুলি পড়িলে বেশ বোঝা যায় যে, যে সময় সমগ্র ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায় য়ুরোপীয় জাতীয়তাবাদে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল স্বাধীন ভারতরাষ্ট্রের ভিত্তির উপর একটি মহাজাতি সংগঠনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন—তখন রবীন্দ্রনাথ একাকী ইহার বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি আদর্শ প্রচার করিতেছিলেন। রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা তাঁহার মতে নিতান্তই মূল্যহীন, এমন কি অনিষ্টকর। সুতরাং সেই আলেয়ার পশ্চাতে ধাবমান হওয়া নিতান্তই মূর্খতা।

যে সময়ে রবীন্দ্রনাথ এই আদর্শ প্রচার করিতেছিলেন ঠিক সেই সময়েই শ্রীঅরবিন্দ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত মত জোরের সহিত ঘোষণা করেন। তিনি বলেনঃ

"Political freedom is the life-breath of a nation; to attempt social reform, education reform, industrial expansion, the moral improvement of the race without aiming first and foremost at political freedom, is the very height of ignorance and futility." ৫

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেনঃ

"God commands to be free and you must be free...It is not our work but that of something mightier that compels

৪. ঐ

৫. *India's Fight for Freedom,* by Prof. Haridas Mukherjee and Prof. Uma Mukherjee, pp. 173-4.

us to go on until all bondage is swept away and India stands free before the world." ৬

ইহার কয়েকদিন পরে আর এক বক্তৃতায় তিনি বলেনঃ

"Foreign rule can never be for the good of a nation, never work for its true progress and life, but must always work towards its disintegration and death." ৭

লাজপৎ রায়ও ঐ সময়ে বলেনঃ

"A subject people has no soul, just as a slave can have none...A man without a soul is a mere animal. A nation without a soul is only a herd of 'dumb driven cattle.' ৮

ভারতবাসী যে রবীন্দ্রনাথের আদর্শ গ্রহণ না করিয়া শ্রীঅরবিন্দের মতই সমর্থন করিয়াছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তামূলক প্রবন্ধাবলীর অপরূপ সাহিত্যিক রসধারা সত্ত্বেও তাহা ভারতবাসীর প্রাণে কোন সাড়া জাগায় নাই। ইহার কারণ সম্ভবতঃ এই যে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা সম্বন্ধে যে মত পোষণ করিতেন তাহা বাস্তব সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে এই প্রকার ধারণা করা খুব দুঃসাহসের কাজ। সুতরাং এ সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার মতের অনুকূলে মারাঠা ও শিখজাতির ইতিহাস সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। কারণ তাঁহার জাতীয়তাবাদের আদর্শের ন্যায় এই দুই জাতির সম্বন্ধে তাঁহার সিদ্ধান্তও ভারতবাসী সমর্থন করে নাই—কখনও করিবে এরূপ সম্ভাবনাও কম।

৬. শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রণীত ভারত-পুরুষ শ্রীঅরবিন্দ, ১০১ পৃঃ

৭. ঐ

৮. *Young India* by Lajpat Rai, p. 86.

শিবাজী যে মারাঠা জাতির সৃষ্টি করিয়াছিলেন ভারতের ইতিহাসে তাহা এক চিরস্মরণীয় এবং গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে। এই সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেনঃ

> "ফুটা পাত্রে জল ভরিয়া উঠিতে পারে কিন্তু তাহাতে জল থাকে না।... ভারতবর্ষের সমাজ ছিদ্রে পূর্ণ, কোনো ভাবকে তাহা ধরিয়া রাখিতে পারে না, এই জন্য সমাজে প্রাণময়ভাবের পরিবর্তে শুষ্ক নির্জীব আচারের এমন নিদারুণ প্রাদুর্ভাব।...শিবাজী সেই ভাবের আধারটিকে পাকা করিয়া তুলিতে পারেন নাই, এমন কি চেষ্টামাত্র করেন নাই। সমাজের বড়ো বড়ো ছিদ্রগুলির দিকে না তাকাইয়া তাহাকে লইয়া ক্ষুব্ধ সমুদ্রে পাড়ি দিলেন।......এই ছিদ্রকেই পার করা তাঁহার লক্ষ্য ছিল। শিবাজী যে হিন্দুসমাজকে মোগল-আক্রমণের বিরুদ্ধে জয়যুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, আচারবিচারগত বিভাগমূলক ধর্মসমাজকেই তিনি সমস্ত ভারতবর্ষে জয়ী করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাকেই বলে বালির বাঁধ বাঁধা, ইহাই অসাধ্য-সাধন।......শিবাজী এমন কোনো ভাবকে আশ্রয় ও প্রচার করেন নাই যাহা হিন্দুসমাজের মূলগত ছিদ্র-গুলিকে পরিপূর্ণ করিয়া দিতে পারে।"৯

রবীন্দ্রনাথের এই সমুদয় উক্তি আদর্শের দিক দিয়া খুব উচ্চ দরের সন্দেহ নাই। কিন্তু ইতিহাসের কষ্টিপাথরে যাচাই করিলে তাহার মূল্য কতটুকু দাঁড়ায় তাহা বিচার করা উচিত। শিবাজীর পূর্বে মহারাষ্ট্রে অনেক সমাজ ও ধর্মসংস্কারক জন্মিয়াছিলেন। শিবাজী যদি কেবলমাত্র তাঁহাদের দলবৃদ্ধি করিতেন তাহা হইলে মারাঠাদের অবস্থা যে পূর্বাপেক্ষা বেশী উন্নত হইত এরূপ মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। বিজাপুর, আহম্মদনগর অথবা মুঘলের পদানত হইয়াই তাহাদের জীবন কাটিত। এই অবস্থায় মারাঠাদের দাসত্বসুলভ মনোবৃত্তি সমাজের বড় বড় ছিদ্রগুলিকে

৯. ইতিহাস, ৭৩ পৃঃ।

বন্ধ করিতে প্রয়াস পাইত অথবা এরূপ প্রয়াসে সফল হইত, ভারতের অন্যান্য প্রদেশগুলির দিকে তাকাইলে তাহা মনে হয় না। কিন্তু শিবাজী মাটির কলসীর ফুটা বুজাইতে না গিয়া অপ্রতিহত মুঘল শক্তির ধ্বংসের পথ সুগম করিয়া সেই মাটির কলসীকে সোনার কলসীতে পরিণত করিবার সুযোগ দিয়াছিলেন। সমাজের বুক যদি মরুভূমি না হইত তবে তাহা সহজেই জলে ভরিয়া উঠিত। শিবাজী সেই মরুভূমি উর্বরা করিতে পারেন নাই—এই অভিযোগের কথা উঠিলে রবীন্দ্রনাথের আর একটি উক্তি মনে পড়ে—"ভাল হোতো আরও ভাল হোলে।" শিবাজী যে অপূর্ব প্রতিভাবলে ছিন্নবিচ্ছিন্ন কতকগুলি সম্প্রদায়কে এক মহা-শক্তিশালী মারাঠা জাতিতে পরিণত করিয়া দোর্দণ্ডপ্রতাপ মুগলের ধ্বংসের উপর এক হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন—তাহাই ভারতের ভবিষ্যৎ স্বাধীনতার পথ সুগম করিয়া দিয়াছিল। শিবাজীর উদ্ভব না হইলে হয়ত বৃটিশ যুগে গায়কোয়াড়, সিন্ধিয়া, হোলকার, ভোঁসলে, ঝাঁসী প্রভৃতি হিন্দুরাজ্যের পরিবর্তে নিজামের অধীনস্থ হায়দ্রাবাদের ন্যায় বহু মুসলমান রাজ্য দেখিতাম এবং এই সমুদয় স্থানে বলপূর্বক উর্দুভাষার প্রচলনে ইস্‌লামীয় সভ্যতার প্রসার বৃদ্ধি ও হিন্দু সভ্যতার যথেষ্ট সঙ্কোচ হইত। শিবাজী সমাজের ছিদ্র পূর্ণ করেন নাই কিন্তু হিন্দুর রাষ্ট্রীয় অনৈক্যের ছিদ্র কতকটা পূর্ণ করিয়া, সমাজের ছিদ্র পূর্ণ করিবার সরঞ্জাম জোগাইয়াছিলেন। তাহা যে পূর্ণ হয় নাই তাহার কারণ এই যে ছিদ্রের মধ্য দিয়াই ভারতের ইতিহাস গড়িয়া উঠিয়াছে। এই ছিদ্রের বিকাশ ও প্রসারই ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব।

শিখদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন ঃ

"বাবা নানক যে স্বাধীনতা অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাঁহা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা নহে ;......গুরু নানক যে মুক্তির উপলব্ধিকে সকলের চেয়ে বড়ো করিয়া জানিয়াছিলেন, গুরুগোবিন্দ তাহার প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিতে পারেন নাই। শত্রুহস্ত হইতে মুক্তিকামনাকেই

তিনি তাঁহার শিষ্যদের মনে একান্তভাবে মুদ্রিত করিয়া দিলেন। ইহাতে ক্ষণকালের জন্য ইতিহাসে শিখদের পরাক্রম উজ্জ্বল হইয়াছিল সন্দেহ নাই, ইহাতে তাহাদিগকে রণনৈপুণ্য দান করিয়াছে, তাহাও সত্য, কিন্তু বাবা নানক যে পাথেয় দিয়া তাহাদিগকে একটি উদার পথে প্রেরণ করিয়াছিলেন সেই পাথেয় তাহারা এইখানেই খরচ করিয়া ফেলিল এবং তাহাদের যাত্রাও তাহারা এইখানেই অবসান করিয়া দিল। ......রণজিৎসিংহ কিছুদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন শিখদিগকে এক করিয়াছিলেন, কিন্তু সে কেবলমাত্র বলের দ্বারা।......বলের দ্বারা যে লোক এক করে সে অন্যকে দুর্বল করিয়াই এক করে ; শুধু তাই নয়, ঐক্যের যে চিরন্তন মূলতত্ত্ব প্রেম তাহাকেই পরাস্ত করিয়া পঙ্গু করিয়া নিজের প্রয়োজন সাধন করে। রণজিৎসিংহ স্বার্থপুষ্টির জন্যই সমস্ত শিখকে ছলে-বলে-কৌশলে নিবিড় করিয়া বাঁধিয়াছিলেন।"১০

রবীন্দ্রনাথের মত এই যে গুরুগোবিন্দের অভ্যুদয় না হইলে এবং শিখজাতি নানকের আদর্শ ও উপদেশে অনুপ্রাণিত হইয়া চলিলে শিখদের যাত্রা আরও উদার পথে অগ্রসর হইয়া ভারতের তথা মানবজাতির অধিকতর কল্যাণ সাধনে সক্ষম হইত। কিন্তু ভারতের ইতিহাস এই মত সমর্থন করে না। শিখসম্প্রদায় যুদ্ধবিদ্যায় বিশারদ না হইলে প্রবল মুঘল রাজশক্তি খুব সম্ভবতঃ ইহাকে পিষিয়া ফেলিত। যদি তর্কচ্ছলে ধরিয়া লওয়া যায় যে মুঘলশক্তি শিখদের প্রতি উদাসীন থাকিত, তাহাদের যাত্রা-পথে কোন বাধা দিত না—তাহা হইলেই কি কেবল বাবা নানকের পাথেয়ের সাহায্যে তাহারা ভারতের সমাজে ও ধর্মে বিশেষ কোন পরিবর্তন আনিতে পারিত? নানকের ন্যায় রামানন্দ, কবীর, দাদু প্রভৃতি মধ্যযুগের বহু সাধক তাঁহাদের শিষ্যদিগকে অনেক পাথেয় দিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু আজ কেবলমাত্র কবীরপন্থী প্রভৃতি কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগণ্য সম্প্রদায়ই তাঁহাদের স্মৃতি রক্ষা করিয়াছে—বৃহৎ

১০. ঐ, ৬১-৬৪ পৃঃ

ভারতের সমাজে তাঁহাদের বিশেষ কোন প্রভাব নাই। অপরপক্ষে গুরুগোবিন্দ, রণজিৎসিংহ প্রভৃতি শিখনায়কগণ কেবল যে নানকের ধর্মমতকে অনুরূপ সংকীর্ণতার পরিবর্তে একটি বিশাল শক্তিশালী সম্প্রদায়ের মধ্য দিয়া রক্ষা করিয়াছেন তাহা নহে, কঠোর আঘাতে মুঘল ও পাঠানের মেরুদণ্ড ভাঙিগয়া দিয়া ভারতের ভবিষ্যৎ স্বাধীনতার পথ সুগম করিয়াছেন। তাঁহাদের দৃষ্টান্ত বর্তমান যুগে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রেরণা দিয়াছে।

রণজিৎসিংহ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছেন তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে, আমরা যে সমুদয় রাজবংশের কীর্তিতে গৌরব বোধ করি—মৌর্য, গুপ্ত, রাষ্ট্রকূট, চোল প্রভৃতি—সে সমস্তই ভারতকে পঙগু করিয়া দিয়াছে—কারণ তাহাদের সাম্রাজ্য বলের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, প্রেমের দ্বারা নহে।

ভারতের জাতীয়তা এবং ইহার বিকাশে মারাঠা ও শিখজাতির অবদান সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে ধারণা পোষণ করিতেন তাহা বৈশিষ্ট্যে ও স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল। এই অনন্যসাধারণ মতের মূলে আছে ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণা। বিশেষ সঙ্কোচের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে রবীন্দ্রনাথ কল্পনার দিব্য দৃষ্টিতে ভারতবর্ষের ইতিহাসের যে রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন বাস্তব ইতিহাস তাহা সমর্থন করে না। "ভারত-বর্ষের ইতিহাস"[১১] ও "ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা"[১২] এই দুইটি প্রবন্ধে তিনি যে সমুদয় মত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা বিচারসহ বলিয়া মনে হয় না। ইহার বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন নাই—বর্তমান প্রসঙ্গের সহিত সংশ্লিষ্ট দু-একটি বিষয়ের অবতারণা চলিবে।

১১. ঐ, ১-১১ পৃঃ

১২. ঐ, ১২-২৫ পৃঃ

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেনঃ

"ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি, প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপনা করা...তাহার এই স্বভাবই তাহাকে চিরদিন রাষ্ট্রগৌরবের প্রতি উদাসীন করিয়াছে। কারণ রাষ্ট্রগৌরবের মূলে বিরোধের ভাব।... পরের বিরুদ্ধে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার যে চেষ্টা তাহাই পোলিটিকাল উন্নতির ভিত্তি এবং পরের সহিত আপনার সম্বন্ধ বন্ধন ও নিজের ভিতরকার বিচিত্র বিভাগ ও বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা, ইহাই ধর্মনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির ভিত্তি। য়ুরোপীয় সভ্যতা যে ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে তাহা বিরোধমূলক ; ভারতবর্ষীয় সভ্যতা যে ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে তাহা মিলনমূলক।"১৩

দা˙˙নিক তত্ত্বের দিক দিয়া ইহা সত্য হইলেও বাস্তব ব্যবহারিক জীবনে এই ঐক্য স্থাপনের সন্ধান পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষের ইতিহাস যেটুকু আমরা জানি তাহা রবীন্দ্রনাথের উক্তির সম্পূর্ণ বিরোধী। বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া ইংরেজ যুগের শেষ পর্যন্ত দেখিতে পাই যে সমাজে ও ধর্মে ঐক্যের মধ্যে প্রভেদ স্থাপন করাই হিন্দু সভ্যতার মূলনীতি। অবিভক্ত আর্য জাতি প্রথমে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়। ইহার মধ্যেও স্পষ্ট বিরোধের ভাবই দেখিতে পাই—ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই দুইয়ের মধ্যে নিজেকে উচ্চতর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টায়। তারপর এই তিন বর্ণ ও শূদ্র অসংখ্য শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া অখণ্ড হিন্দু সমাজে শত সহস্র জাতির সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার মধ্যে ঐক্য ও মিলনের পরিবর্তে বিরোধেরই আভাস পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ ইহার জন্য বৌদ্ধধর্মকেই পুরাপুরি দায়ী করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, "যে একটি ব্যবস্থার ভিতর দিয়া ভারতবর্ষের জাতিবৈচিত্র্য ঐক্যলাভের চেষ্টা করিতেছিল" বৌদ্ধধর্মের প্রভাবের ফলে তাহার অবসানে দেখা গেল, "সেই ব্যবস্থাটা ভূমিসাৎ

১৩. ঐ, ৬-৭ পৃঃ

হইয়াছে।"[১৪] কিন্তু প্রশ্ন এই যে "জাতিবৈচিত্র্য আদৌ ঘটিল কেন? ঐক্যের মধ্যে অনৈক্যের প্রথম উদ্ভবের জন্য দায়ী কে? "প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করাই" যদি আর্যদের একমাত্র চেষ্টা ছিল তবে বুদ্ধের পূর্বেই তাহাদের মধ্যে বহুসংখ্যক বর্ণ বা জাতির সৃষ্টি হইল কেন? দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে কোন্ ব্যবস্থার ভিতর দিয়া ভারতবর্ষের জাতিবৈচিত্র্য ঐক্যলাভের চেষ্টা করিতেছিল? বৈদিক সংহিতা, ব্রাহ্মণ, ধর্মসূত্র ও স্মৃতির যে সমুদয় গ্রন্থ আমাদের হস্তগত হইয়াছে তাহাতে দেখিতে পাই কালস্রোতের সঙ্গে সঙ্গে জাতিতে জাতিতে প্রভেদের চেষ্টা ক্রমশঃই বলবতী হইতেছে। হিন্দুর সমাজের প্রধান ধর্মশাস্ত্র মনুস্মৃতি—প্রাচীন শাস্ত্রের ভিত্তির উপর রচিত। ইহার প্রধান লক্ষ্য, হিন্দুসমাজ যে শত শত বর্ণে বা জাতিতে বিভক্ত তাহার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা ও পুষ্টি সাধন করা। বৌদ্ধধর্ম অবসানের বহু পূর্বেই এগুলি রচিত হইয়াছিল।

ভারতবর্ষ রাষ্ট্রগৌরবের প্রতি উদাসীন ছিল, এই উক্তির কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে বলিয়া মনে হয় না। ভারতবর্ষের পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক ইতিহাস নাই। কিন্তু শত শত শিলালিপিতে রাজাদের যে কাহিনী বিবৃত হইয়াছে তাহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, যে প্রতিবেশী রাজার রাজ্য জয় করিয়া সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করা আবহমান কাল হইতেই ভারতের রাজাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। এই গৌরব ঘোষণা করার জন্যই অশ্বমেধ ও রাজসূয় যজ্ঞের সৃষ্টি হয়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও অন্যান্য প্রাচীন রাজনৈতিক গ্রন্থে—সর্বত্রই এই রাষ্ট্র বিরোধের পরিচয় ও এই নীতির সমর্থন দেখিতে পাই। শক্তিশালী রাজা মাত্রেই দুর্বল রাজাকে আক্রমণ করিয়া পরাভূত করিবে—অর্থাৎ জোর যার মুলুক তার—ইহাই কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের স্পষ্ট নির্দেশ। বহুসংখ্যক শিলালিপি ও তাম্রশাসন, এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রাজবংশের কাহিনী-

---

১৪. ঐ, ৩৬ পৃঃ

মূলক গ্রন্থ এযাবৎ যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে—সকলের মধ্যেই রাজার বিজয় কাহিনীর উচ্ছ্বসিত বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস এযাবৎ যেটুকু উদ্ধার হইয়াছে তাহা রাজায় রাজায় বিরোধের কাহিনীতে পরিপূর্ণ। এ বিষয়ে য়ুরোপীয় ও ভারতের ইতিহাসে বিশেষ কোন তফাৎ নাই। তফাৎ শুধু এই যে য়ুরোপে বহুধা বিচ্ছিন্ন মনুষ্যগোষ্ঠী ক্রমশঃ ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া 'নেশন' গড়িয়াছে, আর ভারতের আর্যগণ ক্রমশঃ বহুধা বিভক্ত হইয়া বহুসংখ্যক রাজ্য ও ততোধিক সামাজিক বিভাগের সৃষ্টি করিয়াছে।

বহুকে এক করিবার সাধনায় সর্বাপেক্ষা বেশী সিদ্ধিলাভ করিয়াছে ইস্‌লামীয় সভ্যতা। কিন্তু এই সভ্যতা রাষ্ট্রগৌরবের প্রতি মোটেই উদাসীন ছিল না। বরং বলা যাইতে পারে যে রাষ্ট্র-শক্তির প্রভাবেই এই একীকরণ সম্ভব হইয়াছিল। অবশ্য এই একীকরণ প্রকৃত মিলন অথবা আদৌ মঙ্গলকর হইয়াছে কিনা সে বিষয়ে বিচার বিতর্কের অবসর আছে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার উক্তির সমর্থন কল্পে আর্য ও অনার্যের মিলন একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্বরূপ উপস্থিত করিয়াছেন।[১৫] অনার্য শূদ্র, চণ্ডাল, পুক্কস প্রভৃতি হিন্দু সমাজে যে স্থান অধিকার করিত তাহাকে 'মিলন' বলিলে উপহাসের মতই শুনায়। চণ্ডালের ছায়াস্পর্শে এমন কি দূর হইতে কোন চণ্ডাল নয়নগোচর হইলে আর্য নিজেকে অশুচি মনে করিতেন ; অবস্থা বিশেষে এই অপরাধে অপরাধী চণ্ডালের লাঞ্ছনার সীমা থাকিত না ; কোন কোন স্থলে প্রহারে জর্জরিত ঐ চণ্ডালের দেহক্ষত সেই অশুচিতার সাক্ষী-স্বরূপ বিরাজ করিত। চণ্ডাল শূদ্র প্রভৃতি সম্বন্ধে মনুর ব্যবস্থা পাঠ করিলে বর্তমান যুগে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীর অবস্থার কথাই মনে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন যে, "আর্যদের সহিত

১৫. ঐ, ৩২-৩৩ পৃঃ

অনার্যদের রক্তের মিলন ও ধর্মের মিলন ঘটিতেছিল।"[১৬] ইহাতে বিশেষত্ব কিছু নাই। খৃষ্টান য়ুরোপীয়গণের সহিত 'নিগার নেটিভের' 'মিলনের' ফলে ভারতে যে খৃষ্টান সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছিল—ইহা তাহারই অনুরূপ। প্রভেদের মধ্যে এই যে আর্য পুরুষ অনার্য রমণীর সহিত একঘরে ঘর করিলেও তাহাদিগকে হেঁসেলে বা মন্দিরে ঢুকিতে দিতেন না।

আর্যে-অনার্যে মিলন ঘটাইবার প্রতীকস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ রামচন্দ্রের সহিত নিষাদরাজ গুহকের মিত্রতার উল্লেখ করিয়াছেন।[১৭] কিন্তু রামচন্দ্র যে তপস্যা করার অপরাধে শূদ্র শম্বুককে বধ করিয়াছিলেন তাহা পরবর্তীকালের অপবাদ বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। রামচন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতাগণ যে অসংখ্য অনার্য (রাক্ষস প্রভৃতি) বধ করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু মহাকবি কালিদাস গুহকের সহিত মৈত্রীর উল্লেখমাত্র করেন নাই—অথচ শম্বুক ও অন্যান্য অনার্য বধ গর্বের সহিত উচ্ছ্বসিত ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। এই সমুদয় কাহিনী ঐতিহাসিক সত্য কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। কিন্তু হিন্দু মনীষীদের মনে ইহার কি প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল তাহা বিবেচনা করিলেই আমরা তৎকালীন হিন্দুসমাজে আর্য-অনার্য মিলনের প্রকৃত রূপ কি ছিল তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারি। রবীন্দ্রনাথ যদি "জন্ম নিতেন কালিদাসের কালে", তবে ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা সম্বন্ধে তাঁহার মত যে বিংশ শতাব্দীর কল্পনাপ্রসূত চিত্র হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইত এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

রবীন্দ্রনাথ ভারতের জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে যে বিশিষ্ট মত প্রচার করিয়াছেন—তাহা যে অনেকটা এই কল্পিত 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' দ্বারা প্রভাবান্বিত তাহা অনুমান করা অসঙ্গত

১৬. ঐ, ৩৪ পৃঃ
১৭. ঐ, ২৮-২৯ পৃঃ

নহে। সুতরাং তাঁহার এই মত যে দেশ গ্রহণ করে নাই তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে ভারতে যে জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা কয়েকটি কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ এই জাতীয়তাবাদের প্রবল স্রোতে ভাসিয়া যান নাই ; তীর হইতে ইহার গতি লক্ষ্য করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। সেই জন্যই এমন কয়েকটি সহজ সত্য তাঁহার নিকট প্রকট হইয়াছিল যাহা সে যুগের রাজনৈতিকগণ লক্ষ্য করেন নাই অথবা উপেক্ষা করিয়াছিলেন। জাতীয়তার আন্দোলনে হিন্দু-মুসলমানের সম্বন্ধ ইহার একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ভারতীয়েরা যে এক জাতি নহে, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে অনৈক্য ও বিরোধের দৃষ্টান্ত দ্বারা বৃটিশ রাজপুরুষগণ তাহা প্রতিপন্ন করিতে সচেষ্ট ছিলেন। এই যুক্তির অমূলকত্ব প্রমাণ করিবার জন্য ভারতের রাজনৈতিকগণ রাতারাতি ‘হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই’ এই কল্পনায় মাতিয়া উঠিলেন এবং তারস্বরে এই চীৎকার সুরু করিলেন। গরজ বড় বালাই—সুতরাং ইতিহাসের ধারা বদলাইয়া নেতাগণ প্রচার করিতে লাগিলেন যে, মুসলমান যুগে হিন্দু-মুসলমানেরা দুই ভাই-এর ন্যায় পরম সুখে ও শান্তিতে কালযাপন করিত ; বস্তুতঃ তখন হিন্দুরা মোটেই পরাধীন ছিল না ; হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে প্রভেদ অতি সামান্য, ঐক্যের পরিমাণই বেশী ; এবং ভারতে মুসলমানগণের ন্যায় পরধর্মসহিষ্ণু কেহ ছিল না। যখন সারা দেশ এই কল্পিত হিন্দু-মুসলমান-ভ্রাতৃত্বের প্লাবনে ভাসিতেছিল এবং মুসলমানের দিক হইতে ইহার কোন সমর্থন না পাইয়া তাহাদিগকে দেশদ্রোহী মনে করিতেছিল, তখন একমাত্র রবীন্দ্রনাথই হিন্দু-মুসলমানের প্রকৃত সম্বন্ধ কি এবং আমাদের জাতীয়তা গঠনের পথে ইহা যে কত বড় বাধা তাহা নির্ভীকভাবে ও স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে নিম্নে তাঁহার কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি ঃ

"আমাদের দেশে ভারতবর্ষীয়দের মধ্যে রাষ্ট্রীয় ঐক্যলাভের চেষ্টা যখনি প্রবল হইল...তখনি আমরা ইচ্ছা করিলাম বটে মুসলমানদিগকেও আমাদের সঙ্গে এক করিয়া লই, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য হইতে পারিলাম না।...হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে একটি সত্য পার্থক্য আছে তাহা ফাঁকি দিয়া উড়াইয়া দিবার জো নাই।...হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সকল দিক দিয়া একটা সত্যকার ঐক্য জন্মে নাই বলিয়াই রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে তাহাদিগকে এক করিয়া তুলিবার চেষ্টায় সন্দেহ ও অবিশ্বাসের সূত্রপাত হইল। এই সন্দেহকে অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। আমরা মুসলমানকে যখন আহ্বান করিয়াছি তখন তাহাকে কাজ উদ্ধারের সহায় বলিয়া ডাকিয়াছি, আপন বলিয়া ডাকি নাই। যদি কখনো দেখি তাহাকে কাজের জন্য আর দরকার নাই তবে তাহাকে অনাবশ্যক বলিয়া পিছনে ঠেলিতে আমাদের বাধিবে না।...মুসলমান এই সন্দেহটি মনে লইয়া আমাদের ডাকে সাড়া দেয় নাই। আমরা দুই পক্ষ একত্র থাকিলে মোটের উপর লাভের অঙ্ক বেশি হইবে বটে, কিন্তু লাভের অংশ তাহার পক্ষে বেশি হইবে কিনা, মুসলমানের সেইটেই বিবেচ্য। অতএব মুসলমানদের একথা বলা অসঙ্গত নহে যে আমি যদি পৃথক থাকিয়াই বড় হইতে পারি তবেই তাহাতে আমার লাভ।"১৮

এই ভাবটিই রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র আরও স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন ঃ

"যেদিন স্বদেশী নিমকের প্রতি হঠাৎ আমাদের অত্যন্ত একটা টান হইয়াছিল, সেদিন আমরা দেশের মুসলমানদের কিছু অস্বাভাবিক উচ্চৈঃস্বরেই আত্মীয় বলিয়া ভাই বলিয়া ডাকাডাকি শুরু করিয়াছিলাম। সেই স্নেহের ডাকে যখন তাহারা অশ্রুগদগদকণ্ঠে সাড়া দিল না তখন আমরা তাহাদের উপর ভারি রাগ করিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম এটা নিতান্তই ওদের শয়তানী। একদিনের জন্যও ভাবি নাই আমাদের

১৮. পরিচয়, ৭৫-৭৬।

ডাকের মধ্যে গরজ ছিল কিন্তু সত্য ছিল না। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে একটা সাধারণ সামাজিকতা আছে, যে সামাজিকতার টানে আমরা সহজপ্রীতির বশে মানুষকে ঘরে ডাকিয়া আনি, তাহার সঙ্গে বসিয়া খাই, যদি-বা তাহার সঙ্গে আমাদের পার্থক্য থাকে সেটাকে অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়া দেখিতে দিই না—সেই নিতান্ত সাধারণ সামাজিকতার ক্ষেত্রে যাহাকে আমরা ভাই বলিয়া আপন বলিয়া মানিতে না পারি, দায়ে পড়িয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ভাই বলিয়া যথোচিত সতর্কতার সহিত তাহাকে বুকে টানিবার নাট্যভঙ্গী করিলে সেটা কখনোই সফল হইতে পারে না।"১৯

হিন্দুর সহিত রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে মুসলমানদের বিরোধের মূলগত ও অন্তর্নিহিত কারণ কি, এত সহজে ও সুন্দরভাবে কেহই তাহা প্রকাশ করেন নাই। অনেকেরই বিশ্বাস যে যেহেতু কিছুকাল পূর্বে হিন্দু-মুসলমানেরা বেশ শান্তির সহিত একত্র সদ্ভাবে বাস করিত এবং এখন তাহার পরিবর্তন ঘটিয়াছে অতএব বৃটিশের ভেদনীতিই ইহার একমাত্র কারণ। এ সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথ প্রকৃত তথ্যের সন্ধান দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের যে উক্তিটি পূর্ববর্তী প্যারার অব্যবহিত পূর্বে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার পরই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন ঃ

"কিছুকাল পূর্বে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এই স্বাতন্ত্র্য অনুভূতি তীব্র ছিল না। আমরা এমন এক রকম করিয়া মিলিয়াছিলাম যে আমাদের মধ্যেকার ভিন্নতাটা চোখে পড়িত না। কিন্তু স্বাতন্ত্র্য অনুভূতির অভাবটা একটা অ-ভাব মাত্র, ইহা ভাবাত্মক নহে। অর্থাৎ আমাদের মধ্যে সত্যকার অভেদ ছিল বলিয়াই যে ভেদ সম্বন্ধে আমরা অচেতন ছিলাম তাহা নহে—আমাদের মধ্যে প্রাণশক্তির অভাব ঘটিয়াছিল বলিয়াই একটা নিশ্চেতনতায় আমাদিগকে অভিভূত করিয়াছিল। একটা দিন আসিল যখন হিন্দু আপন হিন্দুত্ব লইয়া গৌরব করিতে উদ্যত হইল।

১৯. কালান্তর (রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্বিংশ খণ্ড, ২৬১-৬২ পৃঃ)

তখন মুসলমান যদি হিন্দুর গৌরব মানিয়া লইয়া নিজেরা চুপচাপ পড়িয়া থাকিত, তবে হিন্দু খুব খুসি হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু যে কারণে হিন্দুর হিন্দুত্ব উগ্র হইয়া উঠিল সেই কারণেই মুসলমানের মুসলমানী মাথা তুলিয়া উঠিল। এখন সে মুসলমানরূপেই প্রবল হইতে চায়, হিন্দুর সংগে মিশিয়া গিয়া প্রবল হইতে চায় না।"২০ "মুসলমান নিজের প্রকৃতিতেই মহৎ হইয়া উঠিবে এই ইচ্ছাই মুসলমানের সত্য ইচ্ছা।"২১

এই সমুদয় উক্তি যে অপ্রীতিকর হইলেও নিতান্ত সত্য, নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রেই তাহা স্বীকার করিবেন। এই সত্যকে উপেক্ষা অথবা অস্বীকার করার ফলেই হিন্দু-মুসলমান সমস্যা ক্রমশই এমন তীব্র বিরোধের সৃষ্টি করে যে মহাত্মা গান্ধীও ইহার সমাধান করিতে পারেন নাই। এবং ইহারই ফলে পাকিস্তানের উৎপত্তি। হিন্দুরাজনৈতিকগণের এই ব্যর্থতার কারণ রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অতুলনীয় ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন ঃ

"সংস্কৃত ভাষায় একটা কথা আছে, ঘরে যখন আগুন লাগিয়াছে তখন কূপ খুঁড়িতে যাওয়ার আয়োজন বৃথা। বঙ্গবিচ্ছেদের দিনে হঠাৎ যখন মুসলমানকে আমাদের দলে টানিবার প্রয়োজন হইল তখন আমরা সেই কূপ-খননেরও চেষ্টা করি নাই—আমরা মনে করিয়াছিলাম, মাটির উপরে ঘটি ঠুকিলেই জল আপনি উঠিবে। জল যখন উঠিল না, কেবল ধূলাই উড়িল, তখন আমাদের বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা রহিল না। আজ পর্যন্ত (১৩২১ বঙ্গাব্দ) সেই কূপ-খননের কথা ভুলিয়া আছি। আরও বার বার মাটিতে ঘটি ঠুকিতে হইবে, সেই সঙ্গে সে-ঘটি আপনার কপালে ঠুকিব।"২২

২০. পরিচয়, ৭৬ পৃঃ
২১. ঐ, ৭৮ পৃঃ
২২. কালান্তর, ২৬২-৬৩ পৃঃ

রবীন্দ্রনাথ যে কয়টি কথা বলিয়াছেন, রূঢ় ও নির্মম হইলেও তাহা যে প্রতি বর্ণে সত্য আজ সে কথা অনেকে বুঝিতে পারিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যখন এই সকল মতামত প্রকাশ করেন, তখন কেহই ইহার প্রতি কোন শ্রদ্ধা দেখান নাই। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, লাজপৎ রায়, সুভাষচন্দ্র বসু প্রভৃতি রাজনৈতিক নায়কগণ হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কল্পিত ভ্রাতৃভাব ও ঐক্যের উপর যে জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠা স্থাপনে অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহার ব্যর্থতা ও বিফলতা যে হিন্দু-মুসলমানের অতীত সম্বন্ধের অনিবার্য ফল—কোন আকস্মিক ঘটনা নহে—একথা সে যুগে একা রবীন্দ্রনাথই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তাঁহার দূরদৃষ্টি যে অভ্রান্ত এবং সম্পূর্ণরূপে প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ প্রভেদের যে সমুদয় কারণ উল্লেখ করিয়াছেন তাহা ছাড়াও অন্যান্য কারণ ছিল। কিন্তু সে সমুদয়ের উল্লেখ বর্তমান ক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথ ভারতের জাতীয়তা সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ করিতেন ভারতবাসী তাহা সমর্থন করে নাই। তাঁহার কল্পিত ভারতবর্ষের ইতিহাসের যে ধারার উপরে এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত তাহা অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করা কঠিন। কিন্তু ভারতবর্ষে জাতীয়তা প্রতিষ্ঠার যেটি সর্বপ্রধান সমস্যা—হিন্দু-মুসলমানের মিলন—সে সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানের যোগ্য। তাঁহার সমসাময়িক রাজনৈতিকগণ যদি তাঁহার মতবাদ বিশেষভাবে পর্যালোচনা করিতেন এবং মিথ্যা মরীচিকার পশ্চাতে ধাবমান না হইয়া বাস্তব সত্যকে স্বীকার করিয়া হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হইতেন—তাহা হইলে হয়ত এদেশে প্রকৃত জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইত এবং ভারতের ইতিহাস অন্যরূপ হইত।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, আমি রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদের

আলোচনা কারয়াছ। রবান্দ্রনাথ বিশ্বমানবতা সম্বন্ধে যে মহান আদর্শ প্রচার করিয়াছেন সে সম্বন্ধে কিছু বলা অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া মনে করি। কারণ ইহা এখনও আমাদের জাতীয়তাবাদের সহিত সংশ্লিষ্ট হয় নাই। যে দেশে অধিকাংশ লোকের মনে জাতীয়তা-বোধ এখনও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, সে দেশের লোক বিশ্ব-মৈত্রীর আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হইবে এরূপ আশা করা যায় না। রাষ্ট্রীয় বিবর্তনের তে প্রথমে জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা তাহার পরে বিশ্ব-মানবের মৈত্রী-সংগঠন—ইহাই আশা করা যায়। একতলা বাড়ীর উপর দোতলা বাড়ী করা যায়, কিন্তু একতলা না থাকিলে দোতলা করা যায় না। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বমানবতার যে মহান আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন একদিন হয়ত ভারতবাসী তাহাদ্বারা অনুপ্রাণিত হইবে। কিন্তু বর্তমানে আমাদের সমস্যা প্রকৃত জাতীয়তার সৃষ্টি। শিশুর মুখে বৈরাগ্যের কথার ন্যায় বিশ্বমৈত্রীর আন্দোলন হয়ত শুনিতে ভাল লাগে, কিন্তু যদি কেহ ইহা অসঙ্গত ও অশোভন মনে করে তাহাকে দোষ দিতে পারি না। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াই এই প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব। "যে আপন ঘরকে অস্বীকার করে কখনই বিশ্ব তাহার ঘরে আতিথ্য গ্রহণ করিতে আসে না; নিজের পদরক্ষার স্থানটুকুকে পরিত্যাগ করার দ্বারাই যে চরাচরের বিরাট ক্ষেত্রকে অধিকার করা যায় এ কথা কখনই শ্রদ্ধেয় হইতে পারে না।"২৩

২৩. পরিচয়, ৬৯ পৃঃ

রবীন্দ্রনাথের মানবতাবোধ

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসের নিজস্ব ভাবধারার সহিত উপনিষদের ভাবধারার গভীর মিল থাকিলেও এবং রবীন্দ্রনাথের মানসিক সংগঠনের উপরে আশৈশব উপনিষদের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ প্রভাবের কথা সত্য হইলেও এই অনুরূপতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে কোথাও হারাইয়া ফেলিবার ভয় নাই। গভীর মিল থাকিলেও রবীন্দ্রনাথের মনের এবং উপনিষদগুলির ভিতর দিয়া প্রকাশিত মনের সর্বাংশে এক হইবার কথা নয়। মিলের দিকটা ভাবিবার সঙ্গে সঙ্গে পার্থক্যের দিকটাও আলোচনা করা যাইতে পারে। এই পার্থক্যের আলোচনা সর্বাপেক্ষা কৌতূহলপ্রদ হইয়া উঠিবে যদি যে যে অংশে মিল সেই সেই অংশেই পৃথক্ পরিণতি ও বিবর্তনের ধারা আমরা লক্ষ্য করিবার চেষ্টা করি।

প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের অন্বয়ানুভূতির কথা আলোচনা করিতে পারি। রবীন্দ্রনাথ কোনও সুস্পষ্ট এবং স্থিরবদ্ধ মতবাদ বা বিশ্বাস গড়িয়াও তুলিতে চান নাই, তাহা দ্বারা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিতও হইতে চান নাই ; সর্বক্ষেত্রে নিজের বিচিত্র অনুভূতিকে লইয়াই কথা বলিতে চাহিয়াছেন। এই বিচিত্র অনুভূতি তাঁহাকে জীবনে বিচিত্র পথের পথিক করিয়া তুলিয়াছে। প্রধান পথের আশপাশ হইতে নব নব রহস্য তাঁহার মনকে আকৃষ্ট করিয়াছে, তিনি সেই আকর্ষণের বশে আলোছায়া-ভরা নূতন নূতন পথ ধরিয়া অনেক সময় খানিকটা দূরে দূরে সরিয়া পড়িয়াছেন ; দূরে সরিয়া একেবারে পথ ভুলিয়া যান নাই, ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার আসিয়া প্রধান পথে পৌঁছিয়াছেন। এই জন্য রবীন্দ্রনাথের মনের প্রধান ধারার সঙ্গে আশপাশের বহু তির্যক্ ধারা তাঁহার জীবনানুভূতিতে আশ্চর্য

ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য দান করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের অন্বয়ানুভূতিও তাই চিরদিন একেবারে একটানা গতিতে প্রবাহিত হয় নাই। সকল বৈচিত্র্যের পিছনে ঐক্য অবশ্য একটা নিশ্চয়ই আছে—যে ঐক্য এই বিচিত্র অনুভূতিধারার ভিতর দিয়াই রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনের ভিতর দিয়া একটি বিশেষ ব্যক্তিপুরুষকে গড়িয়া তুলিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের অন্বয়ানুভূতি উপনিষদের অন্বয়ানুভূতির সহিত কোথায় কতখানি অনুরূপ এ কথা লইয়া আমরা অন্যত্র বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি, কোথায় কোথায় এ-ধারা পৃথক হইয়া পড়িয়াছে তাহারও বিস্তৃত আলোচনা করা যাইতে পারে। এই প্রসঙ্গে বিশেষ-ভাবে লক্ষণীয় একটি ধারা হইল রবীন্দ্রনাথের মহামানবতার আদর্শের বিকাশের ধারা।

রবীন্দ্রনাথের অন্বয়বোধের মধ্যে আমরা যে অখণ্ডজীবনের কথা দেখিতে পাই এই অখণ্ডজীবনের তিনটি দিক্ আছে, তিনটি দিক্ মিলিয়াই এক অন্বয়বোধ। একটি দিক্ হইল ব্যক্তি-জীবনের অখণ্ডতা ; এই একটি জীবনের প্রতিটি ক্ষণকে যুক্ত করিয়াই যে শুধু একটি অখণ্ড ব্যক্তি-জীবন গড়িয়া ওঠে তাহা নয়—তাঁহার ব্যক্তি-জীবনের ইতিহাস শুধু মানুষরূপে বা জীবরূপে জন্ম-জন্মান্তরেরই ইতিহাস নয়—রবীন্দ্রনাথের মতে তাহা হইল লক্ষ লক্ষ যুগের ইতিহাস ; ব্যক্তি-জীবনের প্রতিটি সত্যকে ব্যক্তি-জীবনের এই অখণ্ডতার সঙ্গে যুক্ত করিয়া না দেখিতে পারিলে তাহা মিথ্যা হইয়া যাইবে, ব্যক্তি-জীবনের অখণ্ডদৃষ্টিই হইল ব্যক্তি-জীবনের সত্যদৃষ্টি।

অখণ্ডতার দ্বিতীয় দিক্ হইল মহামানবতার অখণ্ড ধারায়। প্রতিটি ব্যক্তি-জীবনের জন্ম-মরণ, উত্থান-পতন, কর্ম-মনন, প্রেম-প্রীতি সমস্ত জড়াইয়া যুগে যুগে দেশে দেশে এক মহামানবতার ধারা চলিয়াছে ; ইহার মধ্যে কোনো মানুষটিই পৃথক্‌ভাবে সত্য নয়, নিখিল মানবের সঙ্গে অখণ্ডযোগে প্রতিটি মানুষ সত্য ; মানুষের অতীত-বর্তমান-অনাগত সব জুড়িয়া যে অবিচ্ছিন্ন ইতি-হাস তাহার ভিতর দিয়াই মানুষের মহামানবতার অখণ্ডতা। ব্যক্তি-

জীবনের অখণ্ডতার ধারা এইভাবে আসিয়া মহামানবতার অখণ্ডতার ধারা সৃষ্টি করিয়া দিল।

আবার এই মহামানবতার ধারা সমগ্র বিশ্বপ্রবাহের ধারার সঙ্গে যুক্ত। অনন্ত মহাকাশে লক্ষ লক্ষ সাবিত্রী-মণ্ডলের যে অনুবর্তন তাহা হইতে এই মহামানবতার বিবর্তন-ইতিহাসকে পৃথক্ করিয়া দেখিবার উপায় নাই। একই উদ্দেশ্য এবং অর্থের মধ্যে এই বিশ্ব-প্রবাহ বিধৃত হইয়া আছে; সুতরাং মানব-জীবনের অখণ্ডতা আবার বিশ্বজীবনের অখণ্ডতার সঙ্গে যুক্ত হইয়া কবির অন্বয়-বোধকে পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে।

উপনিষদের মধ্যে যে অদ্বয়বোধ দেখা যায় তাহা মোটামুটি ভাবে এই তৃতীয় স্তরের অদ্বয়বোধ; অপর দুই স্তরের অখণ্ডতাকেও রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের সঙ্গে নানাভাবে মিলাইয়া লইতে চাহিয়াছেন বটে, কিন্তু এই দুই স্তরের অখণ্ডতাবোধ রবীন্দ্রনাথের নিজের জিনিস। এই দুই স্তরের অখণ্ডতাবোধের ভিতরে ব্যক্তিজীবনের অন্তর্নিহিত অখণ্ডতার বোধ রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ও গানে একটি দীর্ঘ বিস্তার লাভ করিয়াছে, সেই দীর্ঘ বিস্তারের ইতিহাস পৃথক্-ভাবে আলোচ্য, সুতরাং তাহার প্রসঙ্গ এখানে উত্থাপন করিতে চাহি না। দ্বিতীয় স্তরে মহামানবতা লইয়া যে অখণ্ডতাবোধ তাহা লইয়াই এখানে বিশদ আলোচনা করিতে চাই।

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস প্রতিটি ব্যক্তি-জীবনের যে বিকশিত হইয়া উঠিবার ইতিহাস তাহার একটি বিশেষ অর্থ আছে, আবার প্রতিটি ব্যক্তি-জীবনের অর্থ একত্রিত হইয়া সমস্ত অতীত-বর্তমান ও অনাগতকে জুড়িয়া যে এক মানবজীবনের ইতিহাস তাহা তাহার একটি অখণ্ড অর্থ গড়িয়া তুলিতেছে। মানুষের অখণ্ড জীবন-ধারার এই যে অখণ্ড উদ্দেশ্য বা অর্থ তাহা প্রতিটি ব্যক্তি-মানুষের পৃথক্ পৃথক্ অর্থের একটি যোগফল মাত্র নহে; ইহা একটি অনাদি অখণ্ড আদর্শ বা অর্থ। প্রতিটি ব্যক্তি-মানুষের জীবন-ধারার অর্থ যেমন নিহিত আছে এক 'মহাদেবে'র (মহান্ দেব)

অনাদি স্বপ্নের মধ্যে বা আত্মপ্রকাশ এবং আত্মোপলব্ধির পরিকল্পনায়—তাঁহার ভাবের (idea) মধ্যে; যাহা নিহিত ছিল ভাবের মধ্যে তাহাই ক্রমাভিব্যক্ত হইতেছে 'ভবে'র মধ্যে—প্রকাশের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসে আবার এই ব্যক্তি-মানুষের সকল পরিকল্পনা বিধৃত হইয়া রহিয়াছে মহামানবের মহাবিকাশের অর্থ ও পরিকল্পনার মধ্যে। এই মহামানবের মহাবিকাশের পরিকল্পনা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাই ব্যক্তি-মানুষের কখনও সত্য হইয়া উঠিবার উপায় নাই। যেখানে সে বিচ্ছিন্ন বা খণ্ড সেইখানেই সে ক্ষুদ্র, সেইখানেই অর্থহীনতার নৈরাশ্য, সেইখানেই মৃত্যুর ভয়, সৃষ্টি-মহাসমুদ্রে মুহূর্তেজাত একটি বুদ্বুদের মত একেবারে হারাইয়া যাইবার ভয়। কিন্তু মহাকাশের এককোণে একটি ক্ষুদ্র তারকা মিট্‌মিট্ করিয়া যতক্ষণ পারে জ্বলিয়া যে নিভিয়া গেল, সে মহাকাশের শূন্যতায় হারাইয়া গেল না—সেও নিত্যকালের জন্য অর্থবান হইয়া উঠিল—কারণ ঐটুকু আলোবিকীরণের আত্মবিসর্জনের দ্বারা সে বিশ্বজীবনের প্রকাশের ইতিহাসকে অভিব্যক্তির ইতিহাসকে যতটুকু পারে লিখিয়া দিয়াছে। মহামানবের ক্রমাভিব্যক্তির পশ্চাতে সেই 'মহান্ দেবে'র নিশ্চয়ই একটি বিশেষ পরিকল্পনা আছে। সে পরিকল্পনার পরম অর্থ একটা নিশ্চল স্থাবর জিনিস নয়—নিখিল মানব-জীবনপ্রবাহে তাহা একটা নিরন্তর 'হইয়া উঠিবার' অর্থ; 'মহাদেবে'র পরিকল্পনার পথে নিখিল মানব তাই সকল অভিব্যক্তি লইয়া কেবলই মহামানব হইয়া উঠিতেছে।

নিখিল মানবের প্রতি রবীন্দ্রনাথের পরম শ্রদ্ধা—পরম বিশ্বাস: কোনও প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেই তাই মানুষ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই শ্রদ্ধা এই বিশ্বাসকে হারাইয়া ফেলেন নাই। মানবেতিহাসের কোনও বিপর্যয়ই এই কারণে রবীন্দ্রনাথকে মহামানবের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নৈরাশ্যবাদী করিয়া তুলিতে পারে নাই। রবীন্দ্রনাথ দেখিয়াছেন মানুষের চৈতন্যের ঐশ্বর্যে ও মহিমায় মানুষ মর্ত্যের সকল সীমা লঙ্ঘন করিয়া দেবমহিমার অধিকারী হইয়া উঠিয়াছে,

সীমা-অসীমের—সান্ত-অনন্তের অপূর্ব মিলন ঘটিয়াছে এই মানুষের মধ্যে। মানুষের মধ্যে এই রূপ-অরূপের সীমা-অসীমের মিলন ঘটিবার ফলে আদিদেব মহাদেবের মহাস্বপ্ন বা মহাসংগীত সর্বাপেক্ষা অর্থবান্ হইয়া উঠিয়াছে মানুষের মধ্যে—কারণ মানুষের মধ্যে তাঁহার প্রকাশ হইয়া উঠিয়াছে সুন্দরতম—মধুরতম—গভীরতম। আত্মপ্রকাশের এই প্রথম স্পন্দন দেখা দিয়াছিল আলোকের প্রথম স্পন্দনে—তাহার পরে চলিতে লাগিল অনন্ত-কালস্রোতে অজস্র জীবনের জাল-বুনানি। কিন্তু সব সত্ত্বেও—

The mystery remains dumb,
the meaning of this pilgrimage,
the endless adventure of existence—
whose rush along the sky
flames up into innumerable rings of paths,
till at last knowledge gleams out from the dusk
in the infinity of human spirit,
and in that dim-lighted dawn
she speechlessly gazes through the
break in the mist
at the vision of Life and of Love
emerging from the tumult of profound
pain and joy.

সমগ্র সৃষ্টির ভিতর দিয়া এই যে অজস্র জীবনের তীর্থযাত্রা—এই যে অনন্ত অস্তিত্বের অভিযান—ইহা আপন রহস্য খুঁজিতেছিল—অর্থ খুঁজিতেছিল—সত্য খুঁজিতেছিল; কিন্তু সৃষ্টির রঙ্গমঞ্চে মানুষের আবির্ভাবের পূর্বপর্যন্ত এই অর্থের অভিব্যক্তি ঘটে নাই—সৃষ্টির সমস্ত রহস্য মৌন হইয়াছিল। তাহার পরে অস্পষ্টতার সকল কুজ্ঝটিকা বিদীর্ণ করিয়া ঘটিল মানুষের আবির্ভাব—দেখা দিল তাহার মধ্যে প্রাণের বিচিত্র ধারা—মনের আনন্দলীলা—প্রেমের অতলস্পর্শ রহস্য; মানুষের চেতনার মধ্যে দেখা দিল গভীর বেদনা

ও আনন্দের যে আলোড়ন তাহার ভিতর দিয়াই উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল সৃষ্টির রহস্য! এই কথারই স্মরণ করিয়াছেন কবি তাঁহার জন্মাদনে—

লক্ষ কোটি নক্ষত্রের
অগ্নিনির্ঝরের যেথা নিঃশব্দ জ্যোতির বন্যাধারা
ছুটেছে অচিন্ত্য বেগে নিরুদ্দেশ শূন্যতা প্লাবিয়া
দিকে দিকে,
তমোঘন অন্তহীন সেই আকাশের বক্ষস্তলে
অকস্মাৎ করেছি উত্থান
অসীম সৃষ্টির যজ্ঞে মুহূর্তের স্ফুলিঙ্গের মতো
ধারাবাহী শতাব্দীর ইতিহাসে।
এসেছি সে পৃথিবীতে যেথা কল্প কল্প ধরি
প্রাণপঙ্ক সমুদ্রের গর্ভ হতে উঠি
জড়ের বিরাট অঙ্কতলে
উদ্‌ঘাটিল আপনার নিগূঢ় আশ্চর্য পরিচয়
শাখায়িত রূপে রূপান্তরে।
অসম্পূর্ণ অস্তিত্বের মোহাবিষ্ট প্রদোষের ছায়া
আচ্ছন্ন করিয়াছিল পশুলোক দীর্ঘ যুগ ধরি;
কাহার একাগ্র প্রতীক্ষায়
অসংখ্য দিবসরাত্রি-অবসানে
মন্থরগমনে এল
মানুষ প্রাণের রঙ্গভূমে;
নূতন নূতন দীপ একে একে উঠিতেছে জ্বলে,
নূতন নূতন অর্থ লভিতেছে বাণী;
অপূর্ব আলোকে
মানুষ দেখিছে তার অপরূপ ভবিষ্যের রূপ,
পৃথিবীর নাট্যমঞ্চে
অঙ্কে অঙ্কে চৈতন্যের ধীরে ধীরে প্রকাশের পালা—

আমি সে নাট্যের পাত্রদলে
পরিয়াছি সাজ।
আমারো আহ্বান ছিল যবনিকা সরাবার কাজে,
এ আমার পরম বিস্ময়। (৫ সং)

সৃষ্টিপ্রবাহে স্তরে স্তরে জড়ের আবরণ ভেদ করিয়া ক্রমে ক্রমে যে প্রাণের প্রকাশ—সেই প্রাণের ভূমিতে যে আবার চৈতন্যের মহা-অবতরণ—প্রকাশের পথে এইখানেই সৃষ্টির অগ্রগতি। এই চৈতন্যই জীবন-মহাদেবের মন্দিরের প্রজ্বলিত প্রদীপমালা—জীবন-মহাদেবের রহস্যকেও প্রকাশিত করিতেছে—মহিমাকেও ঘনীভূত করিয়া তুলিতেছে। এই চৈতন্যের অধিকারেই সৌন্দর্যের ক্ষেত্রেও বনের সুন্দরতম ফুলকেও মানুষ পরাজিত করিয়া দিয়াছে, কারণ ফুলের সৌন্দর্য সৌন্দর্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিয়া গিয়াছে; কিন্তু মানুষের ভিতর চৈতন্যের স্পর্শে সৌন্দর্য আরও রহস্যান্বিত এবং মহিমান্বিত হইয়া রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে প্রেমে। বনের ফুল তাই নারীমুখ দেখিয়া তাহার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দিয়াছে—একদিন আদিম প্রভাতে প্রথম আলোকে জাগিয়া উঠিয়া একই প্রাণচ্ছন্দে সে এক সাথে নারীর সঙ্গে যাত্রা করিয়াছিল—

অবশেষে দেখিলাম কত জন্ম পরে নাহি জানি
ওই মুখখানি।
বুঝিলাম আমি আজো আছি
প্রথমের সেই কাছাকাছি,
তুমি পেলে চরমের বাণী।
তোমার আমার দেহে আদিছন্দ আছে অনাবিল
আমাদের মিল।
তোমার আমার মর্মতলে
একটি সে মূল সুর চলে,
প্রবাহ তাহার অন্তঃশীল।

কী যে বলে সেই সুর, কোন্ দিকে তাহার প্রত্যাশা,
জানি নাই ভাষা।
আজ সখি, বুঝিলাম আমি
সুন্দর আমাতে আছে থামি,
তোমাতে সে হল ভালোবাসা।

(বিচিত্রিতা, পুষ্প)

এই যে মহিমান্বিত মানুষ, চেতনার অসীম বিকাশে অফুরন্ত যাহার অধিকার শক্তিতে সৌন্দর্যে প্রেমে কল্যাণবোধে—সেই মানুষের ইতিহাসকে রবীন্দ্রনাথ কখনও একটা উদ্দেশ্যবিহীন প্রবাহমাত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই—নিখিল মানুষের জীবনযাত্রা সেই পরম উদ্দেশ্যের পথে কেবলই হইয়া উঠিবার ইতিহাস—ইহাই তাহার অগ্রগতি। ব্যক্তি-জীবনের সকল প্রসার এবং অগ্রগতি এই মহামানবের—শাশ্বত সর্বব্যাপী মানবের প্রসার ও অগ্রগতির সঙ্গে যুক্ত; এই ব্যক্তি-মানব ও শাশ্বত সর্বব্যাপী মহামানব—ইহার সকল জুড়িয়া রহিয়াছে সেই এক সত্য যিনি 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ'—আজকারের মানুষ নহে—এই দেশের মানুষ নহে—যে মানুষ নিত্য সত্য—সর্বত্র সত্য—সেই মানষের প্রত্যেকের হৃদয়ে পরম সত্য পরম অর্থরূপে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছেন।

'প্রভাতসংগীত' হইতেই আমরা রবীন্দ্রনাথের কবি-মনে এই অখণ্ড মানবতাবোধের আভাস দেখিতে পাই এবং এই মহামানবের সঙ্গে নিবিড় যোগেই যে ব্যক্তি-মানবের মুক্তি এ কথারও আভাস পাই। আমরা এই সময়কার কবির বিশ্বৈক্যবোধের কথা পূর্বেই আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। সেই বিশ্বৈক্যবোধ ব্যবহারিক জীবনে সক্রিয় হইয়া উঠিতে চাহিয়াছে সৌন্দর্যের ভিতর দিয়া বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে যোগে আর প্রেমের ভিতর দিয়া নিখিল মানবের সঙ্গে যোগে। 'প্রভাতসংগীতে' কবি যেখানে বলিয়াছেন—

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি।
জগত আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।

ধরায় আছে যত মানুষ শত শত
আসিছে প্রাণে মোর, হাসিছে গলাগলি।

তখন প্রকাশভঙ্গির মধ্যে যতই একটা হঠাৎ উত্তেজনার আভাস থাক, সব জিনিসটাকেই একটা সস্তা হৃদয়োচ্ছ্বাস বলিয়া গ্রহণ করিলে ভুল করা হইবে ; ইহার মধ্যে রহিয়াছে স্বধর্মের প্রথম আবিষ্কারের আনন্দ-স্পন্দন। এই স্পন্দনই প্রকাশলাভ করিতেছে উচ্ছ্বাস-আবেগের সুরেই 'কড়ি ও কোমলে'র অনেক কবিতার মধ্যে।

যাত্রী সবে ছুটিয়াছে শূন্যপথ দিয়া
উঠিছে সংগীত কোলাহল—
ওই নিখিলের সাথে কণ্ঠ মিলাইয়া
মা, আমরা যাত্রা করি চল্।

নিখিল মানুষের সঙ্গে যোগের আকাঙ্ক্ষা এখন পর্যন্ত অন্ধ আবেগেই প্রকাশ পাইতেছে ; কিন্তু ছোট আমির মধ্যে যেখানেই বন্ধন সেখানে হৃদয়ের ক্রন্দন জাগিয়া উঠিতেছে, সে ক্রন্দন কৃত্রিম বিলাপ নহে—সে ক্রন্দন বিকাশপ্রার্থী আত্মার ক্রন্দন।—

মগ্ন থাকি আপনার মধুর তিমিরে,
দেখি না এ জগতের প্রকাণ্ড জীবন।
কেন আমি আপনার অন্তরালে থাকি!
মুদ্রিত পাতার মাঝে কাঁদে অন্ধ আঁখি।

ইহার পরে 'মানসী'র মধ্যে দেখিতে পাই, চঞ্চল হৃদয় লইয়া প্রথম প্রেমে উদ্বেল কবি ভোগের দৃষ্টিতে মানবের দিকে তাকাইয়াই আত্ম-সচকিত হইয়া উঠিয়াছেন, হৃদয়ে অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছেন সেই মহামানবের মহিমান্বিত রূপ যাহা—

অতি সযতনে,
অতি সংগোপনে,
সুখে দুঃখে, নিশীথে দিবসে,
বিপদে সম্পদে,

জীবনে মরণে
শত ঋতু আবর্তনে
বিশ্বজগতের তরে ঈশ্বরের তরে
শতদল উঠিতেছে ফুটি। (নিষ্ফল কামনা)

পরবর্তী কালে কবি মহামানব সম্বন্ধে যেসকল কথা বলিয়াছেন তাহার অনেক কথারই গূঢ় ব্যঞ্জনা ফুটিয়া উঠিয়াছে এই স্তবকটির মধ্যে; প্রথমতঃ 'সুখে দুঃখে, নিশীথে দিবসে, বিপদে সম্পদে, জীবনে মরণে' মহামানবের নিরন্তর যাত্রা; দ্বিতীয়তঃ সে যাত্রার ভিতর দিয়া মহামানবতার কালপ্রবাহে শতদলের মত বিকশিত হইয়া উঠিবার কথা, মহামানবতা যে একটা নিশ্চল আদর্শ নয়—তাহা যে সকল লোকের জানার অগোচরে 'অতি সংগোপনে'—কিন্তু 'অতি সযতনে' যুগ যুগ ধরিয়া গড়িয়া উঠিতেছে তাহার কথা; তৃতীয়তঃ দেখিতে পাই, এই ফুটিয়া ওঠা শুধু অন্ধশক্তির বিপুল আবেগে নয়, ইহার পশ্চাতে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে, সেই জন্যই ইহা বিকশিত হইয়া উঠিতেছে 'বিশ্বজগতের তরে' এবং 'ঈশ্বরের তরে'।

'সোনার তরী'র কবিতার মধ্যেও কবির 'মহামানবে'র ধারণার প্রকাশ দেখিতে পাই, এবং সেখানেই স্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাই যে এই মহামানবের মানস সেই বিশ্বপ্রশাসনিকের প্রশাসনেই নিয়ন্ত্রিত হইতেছে যাহার প্রশাসন কাল-যন্ত্রের বিচিত্ররাগিণী রূপে নিরন্তর ছড়াইয়া পড়িতেছে।—

ওই কে বাজায় দিবস-নিশায়
বসি অন্তর আসনে।
কালের যন্ত্রে বিচিত্র সুর—
কেহ শোনে কেহ না শোনে।
অর্থ কী তার ভাবিয়া না পাই,
কত গুণী জ্ঞানী চিন্তিছে তাই,
মহান মানব মানস সদাই
উঠে পড়ে তারি শাসনে। (বিশ্বনৃত্য)

এই 'সোনার তরী'তেই স্পষ্ট উক্তি দেখিতে পাই—

হোক খেলা, এ খেলায় যোগ দিতে হবে
আনন্দকল্লোলাকুল নিখিলের সনে। (খেলা)

এই কথাই আরও গভীর জীবন-প্রত্যয়ের সহিত যুক্ত হইয়া এবং আত্ম-প্রতিক্রিয়ায় অধিক বেগ সঞ্চয় করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে 'চিত্রা'র সুপ্রসিদ্ধ বাণীতে—

স্বার্থমগ্ন যে-জন বিমুখ
বৃহৎ জগৎ হতে, সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে।
মহা বিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা।

'নৈবেদ্যে'র কবিতা হইতে আরম্ভ করিয়া কিছু দিন পর্যন্ত যখন কবিতায় ও গানে কবির অধ্যাত্মচেতনা অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল, বিশ্বের কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত 'এক' যখন কবির চেতনা-কেন্দ্রকেও অধিকার করিয়া বসিল, তখনও কবি মানুষের জগৎ এবং মানুষের জীবন হইতে দূরে সরিয়া যাইবার চেষ্টা করেন নাই, বিশ্বের ভিতর দিয়াই বিশ্বরাজকে গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন—

বিশ্বের সবার সাথে হে বিশ্বরাজন্,
অজ্ঞাতে আসিতে হাসি আমার অন্তরে
কত শুভদিনে; (৩৩ সং)

আবার অন্যটাও সত্য; বিশ্বরাজা যখন আসেন তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের সকলেই অন্তরে প্রবেশ করে—

মহারাজ, তুমি যবে এস সেই সাথে
নিখিল জগৎ আসে তোমারি পশ্চাতে। (৩৪ সং)

যত দিন যাইতে লাগিল ততই লক্ষ্য করিতে পারি, নিখিল মানবকে অবলম্বন করিয়া কবির যে একটা অধ্যাত্ম অন্বয়বোধ তাহা ধীরে ধীরে তাঁহার ইতিহাসবোধের সঙ্গে যুক্ত হইয়া মানব-ইতিহাসকেই একটা অধ্যাত্ম-বিবর্তনের বহিঃপ্রকাশ রূপ দান করিতে লাগিল। ইহার পূর্ব পর্যন্ত কবি নিখিল মানবের কথা বলিয়াছেন

বটে, কিন্তু সে নিখিল মানব কবির মনে অনেকখানি যেন একটা অনির্দেশ্য সত্য ছিল, তাহার সঙ্গে ইতিহাসের যোগ ছিল একটা অস্পষ্ট স্মরণে। কবি বিশ্বমানব প্রেমের কথা বলিয়াছেন, কিন্তু বাস্তব জীবনে—ইতিহাসের রূঢ় সত্যের মধ্যে তাহা কি রূপ গ্রহণ করিবে—ইহা স্পষ্ট হইয়া ওঠে নাই। প্রথম প্রথম কবি ইতিহাসকে তাঁহার অধ্যাত্ম অন্বয়বোধের সঙ্গে যেখানে যুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন সেটা একটা গভীর রহস্যবাদের পন্থায়। 'উৎসর্গে'র মধ্যে একটি কবিতায় যখন এই ইতিহাসের কথা আসিয়াছে তখন দেখি মানুষের বাস্তব ইতিহাসকে বিশ্বপ্রবাহের সহিত অচ্ছেদ্য-ভাবে যুক্ত একটি প্রবাহ বলিয়াই গ্রহণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। এই বিশ্বপ্রবাহের ভিতর দিয়া নিশিদিন লীলা করিতেছে যেন একটি নিত্যকালের 'তুমি'—যিনি রবীন্দ্রনাথের 'অনাদি এক'—আর একটি বিশ্বছন্দের সঙ্গে যুক্ত—বিশ্বছন্দের ভিতর দিয়া নিত্য প্রকাশমান ক্রমবর্ধনশীল 'আমি'। এই এক 'আমি'ই যেন মানব-ইতিহাসের সকল 'আমি'র ভিতর দিয়া বিকাশচ্ছন্দে এবং লীলাচ্ছন্দে বহিয়া আসিয়াছে—

> প্রাচীন কালের পড়ি ইতিহাস
> সুখের দুখের কাহিনী—
> পরিচিত সম বেজে ওঠে সেই
> অতীতের যত রাগিণী।
> পুরাতন সেই গীতি
> সে যেন আমার স্মৃতি,
> কোন্ ভাণ্ডারে সঞ্চয় তার
> গোপনে রয়েছে নীতি।
> প্রাণে তাহা কত মুদিয়া রয়েছে
> কত বা উঠিছে মেলিয়া—
> পিতামহদের জীবনে আমরা
> দুজনে এসেছি খেলিয়া। (১৩ সং)

এই যে পিতামহদের জীবনের ভিতর দিয়া সেই নিত্যকালের 'তুমি' এবং নিত্যকালের 'আমি'র খেলিয়া আসা ইহার স্বরূপ যে কবির কি-জাতীয় রহস্যবোধের দ্বারা আবৃত তাহা এই স্তবকটির অব্যাহত বতা স্তবকাটকে অনুধাবন বোঝা যাইবে—

তৃণরোমাঞ্চ ধরণীর পানে
আশ্বিনে নব আলোকে
চেয়ে দেখি যবে আপনার মনে
প্রাণ ভরি উঠে পুলকে।
মনে হয় যেন জানি
এই অকথিত বাণী,
মূক মেদিনীর মর্মের মাঝে
জাগিছে যে ভাবখানি।
এই প্রাণে ভরা মাটির ভিতরে
কত যুগ মোরা যেপেছি,
কত শরতের সোনার আলোকে
কত তৃণে দোঁহে কেঁপেছি।

ইহা কবির একটি বিশুদ্ধ মিস্টিক দৃষ্টি; ইহা ততখানি ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা-নির্ভর নয় যতখানি একটা সহজাত-প্রবণতা-নির্ভর। এ মিস্টিক দৃষ্টি হইল সেই মিস্টিক দৃষ্টি—যে দৃষ্টি লইয়া কবি গান করিয়াছেন—

তখন কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি।
সকল খেলায় করবে খেলা এই আমি—
নতুন নামে ডাকবে মোরে,
বাঁধবে নতুন বাহু ডোরে,
আসব যাব চিরদিনের সেই আমি।

কিন্তু যাহা কবিমনের মধ্যে নিহিত ছিল একটা গভীর রহস্য-বাদে—যাহা ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার মনে জাগ্রত হইয়া উঠিত স্মৃতিরূপে তাঁহার সহজাত-প্রবণতারই অনিবার্যতায় তাহাই ক্রমে ক্রমে একটা

বলিষ্ঠরূপ ধারণ করিতে লাগিল তাঁহার কর্মজীবনের ভিতর দিয়া। স্বদেশী আন্দোলন, কংগ্রেস আন্দোলন, অস্পৃশ্যতাবর্জনের আন্দোলন, শান্তিনিকেতন এবং শ্রীনিকেতনকে কেন্দ্র করিয়া বহুমুখে মানব সেবার প্রয়াস কবিকে শুধু স্বপ্নে বা স্মৃতিতে বা একটা অস্পষ্ট আদর্শে মহামানবের সহিত যুক্ত করিল না, যুক্ত করিল বাস্তবজীবনের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতায়। অনুভূতি ও মনন বাস্তব কর্মে বা কর্মপ্রেরণায় রূপান্তরিত হইয়া নূতন সত্যমূল্য লাভ করিতে লাগিল। মানুষের সমগ্র ইতিহাস—সেই সমগ্র ইতিহাস-জোড়া যে অখণ্ড মানুষ তাহা আর কবিচিত্তে একটা অমূর্ত ভাব-মাত্রে পর্যবসিত রহিল না. নিত্যকালের বিশ্বমানবও সত্যকারের ইতিহাসবোধের ভিতর দিয়া মূর্তিলাভ করিল। কবি নিজে বিশ্ব-জোড়া কর্মচেষ্টায় জড়াইয়া পড়িলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার দীর্ঘ জীবনে মানুষের ইতিহাসে যেখানে যে কর্মপ্রচেষ্টা মানবজীবনকে ধিক্‌কৃত করিয়া দিয়াছে বা মহিমান্বিত করিয়া দিয়াছে ধ্যান-মননে তাহার সহিত নিজেকে তিনি যুক্ত করিবার চেষ্টা কারয়াছেন। যেখানে অশুভকর্মের দ্বারা মানুষের ইতিহ ধিক্‌কৃত সেখানকার সে ধিক্‌কার রবীন্দ্রনাথের নিকটে তাঁহার নিজের জীবন-ধিক্‌কারের তীব্র অনুভূতি লইয়াই উপস্থিত হইয়াছে; মহৎ কর্মে মানুষের ইতিহাস যেখানে উজ্জ্বল সেই ঔজ্জ্বল্যে নিজের জীবনকেই মহিমান্বিত করিয়া দেখিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এই চেষ্টার পশ্চাতে যে কতখানি নিষ্ঠা, সততা এবং বিচক্ষণতা ছিল রবীন্দ্র-নাথের 'কালান্তরে' প্রকাশিত কতকগুলি প্রবন্ধের মধ্যে তাহার স্পষ্ট পরিচয় রহিয়াছে। ইতিহাস-চিন্তা যে কবির পক্ষে বিলাসমাত্র ছিল না, মানুষের ইতিহাস যে কবির জীবনে অনুকূল প্রতিকূল উভয়বিধ আলোড়নের উদ্বোধে কতখানি সত্য হইয়া উঠিয়াছে এই লেখাগুলি তাহারই প্রমাণ বহন করে।

কর্মে চিন্তায় এবং সেবাবোধের বিপুল আগ্রহে জীবনের সঙ্গে কবির যে যোগ, সে যোগ মহামানবতার সহিত অন্বয়যোগের দর্শনকে

কবিচিত্তে একটি বলিষ্ঠরূপ দান করিল, সেই বলিষ্ঠরূপের পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে কবির অক্স্‌ফোর্ড প্রদত্ত 'হিবার্ট লেক্‌চারস'-এ —যাহার বিষয়বস্তু ছিল 'The Religion of Man'; এখানকার বক্তব্যেরই প্রসার দেখিতে পাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত 'কমলা বক্তৃতামালা'য়—যাহার বিষয় ছিল 'মানুষের ধর্ম'।

হিবার্ট বক্তৃতা দিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ প্রারম্ভেই বলিয়াছেন যে, তাঁহার বক্তৃতার বিষয় হইল 'The idea of the humanity of our God, or the divinity of Man the Eternal', ভগবানের মানবীয়তা, অথবা শাশ্বত মানুষের ভগবত্তা। একটি অথবা দ্বারা দুইটি জিনিসকে যখন জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে তখন বুঝিতে হইবে, কবির নিকটে এই উভয়ই সমার্থক। বেশ বোঝা যাইতেছে, এখানে কবির যে ভগবত্তার ধারণা তাহা কোনও নির্গুণ নিষ্ক্রিয়, সন্মাত্রে পর্যবসিত ভগবত্তার ধারণা নয়; ভগবত্তা একটা নিত্যকালের সৃজনশীল শক্তি প্রতিমুহূর্তে যাহা সৃষ্টির ভিতর দিয়া নিজের অনন্ত সম্ভাবনাকে কেবলই প্রকাশ করিয়া দিতেছে। পূর্বেই দেখিয়াছি, ভগবত্তার অন্তর্নিহিত যে সৎ-চিৎ-আনন্দের সম্ভাবনা তাহার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ মানুষে—কোনও অবতারে নয়—কোনও নির্দিষ্ট ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষের ভিতরে নয়—যত মহান্‌ই হোন না কেন, অন্য কোনও ব্যক্তিবিশেষের ভিতর দিয়াও নহে—সে প্রকাশ মানুষের অখণ্ড ইতিহাসে—সেই অখণ্ড ইতিহাসে ব্যাপ্ত যে নিত্যকালের মানুষ তাহার ভিতর দিয়াই প্রকাশ ভগবত্তার ভিতরে নিহিত সকল মনুষ্য-সম্ভাবনা। নিখিল মানুষের নিরন্তর বিকাশের ভিতর দিয়াই ঘটিতেছে ভগবত্তার নিরন্তর অবতরণ, নিখিল মানুষই তাই হইল ভগবত্তার যথার্থ অবতার।

সৃষ্টিবিকাশের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথও বিবর্তনবাদী; এই বিবর্তনের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিবর্তনেই বিশ্বাসী, শুধু মৌলিক পার্থক্য হইল এইখানে, এই বিবর্তনের পিছনকার কারণকে তিনি শুধুমাত্র বস্তু-প্রকৃতির ভিতরকার 'আকস্মিক পার্থক্য', বা

'প্রাকৃতিক নির্বাচন' বা 'পরিবেশ পরিবর্তন' বলিয়া স্বীকার করিবেন না ; রবীন্দ্রনাথের চিত্তধৃত ভগবত্তা একটি চৈতন্যময় সৃজনীশক্তি— এই চৈতন্যের ভিতরেই নিহিত আছে মানুষের জন্য একটি মঙ্গলের আদর্শ—একটি পূর্ণতার আদর্শ। এই পূর্ণতার আদর্শটি কি? রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসে পরিপূর্ণ মানবতা হইল বিধাতার বা বিশ্বের অন্তর্নিহিত এবং বিশ্ববিধির পরিচালক চৈতন্যময় সৃজনীশক্তির চৈতন্যে ধৃত একটি চিরন্তন সত্য ; বিধাতার মানস-সরোবরে তাহার স্থিতি সম্ভাবনা রূপে ; সেই সম্ভাবনাই বিষয়ীকৃত নিখিল মানবের ইতিহাসে। মানুষের পক্ষে পূর্ণতার আদর্শ হইল বিধাতার মানস-থৃত পরিকল্পনার সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণরূপে ফুটাইয়া তোলার আদর্শ। যুগ যুগ ধরিয়া সৃষ্টির ভিতরকার বিবর্তনধারা একদিন মানুষের ইতিহাসে আসিয়া নিজেকে বিকশিত করিয়াছে ; রবীন্দ্র-নাথ বলিলেন, সৃষ্টি-বিবর্তনের প্রত্যেকটি স্তরের তথ্যকে বিশ্লেষণ করিলেই বোঝা যাইবে, চৈতন্যসমৃদ্ধ মানুষকে গড়িয়া তুলিবার জন্যই মনুষ্য পূর্ববর্তী সৃষ্টি-বিবর্তনের সকল চেষ্টা ; মানুষ সৃষ্টি হইবার পরে সেই মানুষকে সর্বভাবে বিকশিত করিয়া তোলাই হইল বিশ্বপ্রকৃতির সকল চেষ্টার লক্ষ্য। বিশ্বপ্রবাহকে এইভাবেই মানুষের ইতিহাসধারার সঙ্গে যুক্ত করিয়া লইতে হইবে। মানুষের মধ্যে আসিয়া সৃষ্টি-বিবর্তন একটা নূতন মূল্য লাভ করিয়া পৃথক পথে যাত্রা আরম্ভ করিলেও বিশ্বপ্রবাহের ইতিহাস হইতে মানুষের ইতিহাস বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে নাই, কারণ বিশ্বপ্রবাহের সব কিছুই অর্থলাভ করিয়াছে মহামানবের মধ্যে। সুতরাং কবির মতে বৈজ্ঞানিকগণ যাহাকে বহির্বিশ্ব বলিয়া বর্ণনা করেন তাহাও আসলে হইল মানুষেরই বিশ্ব।

সৃষ্টির ভিতরে আমরা যে বস্তুপ্রবাহ দেখিতে পাই তাহার ভিতর দিয়া ভগবৎ-ইচ্ছার পরিচয় পাই সব বস্তুর অন্তর্নিহিত একটা পারস্পরিক সম্বন্ধের ভিতরে ; জড়বস্তুর ভিতরেও আমরা এই সত্য লক্ষ্য করি—এই সত্য নিহিত প্রথম যুগ হইতে জৈব-

প্রবাহের ভিতরেও। মানুষের দেহের মধ্যে এই অন্তর্নিহিত পারস্পরিক সম্বন্ধের নীতি সর্বাপেক্ষা পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে মানুষ এই দেহস্থ পারস্পরিক সম্বন্ধে অনুভূতি অপেক্ষাও একটা প্রকাণ্ড বড় অনুভূতিলাভ করিল তাহার গভীর সত্তায়—যেখানে সে দেখিল, নিজেকে যেখানে সে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতেছে সেইখানেই সে নিজেকে সম্পূর্ণ ফেলিতেছে, —অন্যদিকে প্রেমে কর্মে সেবায় সে মানুষের সঙ্গে যতই নিজেকে যুক্ত করিয়া ততই তাহার ভিতরকার বৃহৎকে—মহৎকে—এক কথায় তাহার ভিতরকার 'ব্রহ্ম'কে উপলব্ধি করিতে পারিতেছে। বহুকোষের পারস্পরিক যোগে গঠিত তাহার দেহ জন্মে এবং মরে, কিন্তু বহুজনের মধ্যে ব্যাপ্ত তাহার মনুষ্যত্বের কখনও বিনাশ নাই। মানুষের সহিত এই মিলনের দ্বারাই মানুষ তাহার ভিতরকার নিত্যস্বরূপকে অনুভব করে—প্রেমে অনুভব করে তাহার স্বরূপের অসীমতা।

এই যুগে রবীন্দ্রনাথ এই যে মহামানবের ভিতরকার ঐক্যকে উপলব্ধি করিলেন, এই ঐক্য একটা ব্যক্তি-মানসে ধৃত চিন্তা বা ধারণা মাত্র নয়, এ ঐক্য তাঁহার কাছে জীবন্ত সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল, কারণ এই ঐক্যের বোধ তাঁহার ভিতরে জাগাইয়া দিয়াছিল বিপুল জীবন-প্রেরণা। জীবনে যাহা অফুরন্ত প্রেরণা দেয় তাহাই জীবনের পরম সত্য।

এস্থলে হয়ত বলা যাইতে পারে, মানুষের মধ্যে এই যে ঐক্যবোধ ইহাকে একটা অধ্যাত্মসত্যের রূপ দিবার প্রয়োজন কি? মানুষ স্বরূপতঃ একটি সামাজিক জীব; সেই সামাজিক জীব হিসাবে তাহার যে সমাজবোধ—সমাজের প্রতি তাহার যে আনুগত্য তাহা হইতেই তাহার এই ঐক্যবোধ প্রসূত হইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ এই জাতীয় উক্তির মুখোমুখী দাঁড়াইয়া কখনও প্রত্যুক্তি করেন নাই; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পূর্বাপর মত বিচার করিয়া এ কথার জবাব দিতে হইলে বলিতে হয়, এখানে গোড়াতেই একটা মস্ত ভুল করা

হইল। ঐ যে বলা হইল মানুষ প্রকৃতিতেই একটি সামাজিক জীব সেইখানেই তো স্বীকার করিয়া লওয়া হইল যে মানুষ প্রকৃতিতেই একটি অধ্যাত্ম জীব। প্রকৃতিতে সামাজিক জীব হওয়া শব্দের অর্থই হইল প্রকৃতির মধ্যে আত্ম-অতিক্রম করিয়া অপর সকলের সহিত মিলিত হইবার একটা অনিবার্য ঝোঁক ; মানুষের পক্ষে এই প্রকৃতিগত ঝোঁকটাই হইল একটা প্রকৃতিগত অধ্যাত্মপ্রেরণা—সেই অধ্যাত্মপ্রেরণা হইতেই আসে সকল ঐক্যবোধ। নিখিল মানবের সঙ্গে মিলনের এই চেতনাই হইল একটা পরম আধ্যাত্মিক সত্য ; এই চেতনাকে সেবাবুদ্ধিপ্রণোদিত কর্মের দ্বারা জীবনে সার্থক করিয়া তোলাই হইল মানুষের ধর্ম। এই ধর্মই মানুষের সকল ইতিহাসকে ধারণ করিয়া আছে।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, বাহিরের জগতের সঙ্গে একটা দৃষ্টির সম্পর্ক স্থাপন করিবার জন্য যেমন আমাদের চক্ষুরিন্দ্রিয় রহিয়াছে, এইরূপ আমাদের ভিতরে এমন একটি অন্তরিন্দ্রিয় রহিয়াছে যাহা মানুষের পরমাত্মার সহিত—বিশ্বমানবতার সহিত আমাদিগকে যুক্ত করিয়া দিবার শক্তি রাখে। মানুষের এই যে উজ্জ্বল মনন—ইহার সর্বোত্তম স্তরটি শুধু মানুষের মধ্যেই সম্ভব। এই মনন আমাদের মধ্যে বিশ্বমানতার সহিত যোগে একটু পূর্ণতার বোধ জাগাইয়া তোলে—এই পূর্ণতাবোধেই মানুষের অমরতা। ব্যক্তি-মানবের নিকটে এই যে একটা পূর্ণতাবোধ ইহা হয়ত একটা আদর্শমাত্র ; কিন্তু 'আদর্শ' বলিয়া মানুষের জীবনে ইহা অলীক নয়। 'মানুষের ধর্মে'র ভিতরে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—"এ আদর্শ একটা আন্তরিক আহ্বান, এ আদর্শ একটা নিগূঢ় নির্দেশ। কোন্ দিকে নির্দেশ। যেদিকে সে বিচ্ছিন্ন নয়, যেদিকে তার পূর্ণতা, যেদিকে ব্যক্তিগত সীমাকে সে ছাড়িয়ে চলেছে, যেদিকে বিশ্বমানব।"

পূর্ণতার আদর্শ শুধু নিখিল দেশ-কালে ব্যাপ্ত যে শাশ্বত মানুষ তাহাকে অবলম্বন হইয়াই সম্ভব হইয়া উঠিতে পারে ; এ আদর্শ প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে জাগায় শ্রদ্ধা প্রীতি ভালোবাসা—জাগায়

এই পূর্ণতাকে লাভ করিবার তীব্র বাসনা। কিছু বুদ্ধি এবং অনেকখানি শারীরিক বল অনেক প্রাণীর মধ্যেই রহিয়াছে, কিন্তু মানুষের মধ্যে যে বল ও বুদ্ধি রহিয়াছে তাহার সবটাকেই সে বিকশিত করিয়া তুলিতে চায় তাহার মধ্যে যে একটি অমর পূর্ণ নিত্য সত্তা রহিয়াছে তাহার উপলব্ধিকে গভীর এবং অনন্তপ্রসারী করিয়া তুলিবার জন্য। এই যে পূর্ণতার পথে অভিসারের অন্তর্গূঢ় বাসনা ইহাই মানুষকে প্রচোদিত করে সৃষ্টিকর্মের দিকে—যে সৃষ্টিকর্মের ভিতর দিয়া মানুষের ভিতরকার ভগবত্তাই প্রকাশিত হইতে থাকে। নিরন্তর কর্মের মধ্য দিয়া যে এই মানুষের ভিতর-কার ভগবত্তার প্রকাশ—এই প্রকাশই মানুষের ভিতরকার মানবতার প্রকাশ। মানবতার এই প্রকাশ হইল সত্য শিব এবং সুন্দরের ভিতর দিয়া প্রকাশ; এ প্রকাশ শুধু স্বার্থসিদ্ধির জন্য নহে—এ প্রকাশ নিজেকে প্রকাশ করিবার জন্যই। 'মানুষের ধর্মে'র মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—"মানুষও আপন অন্তরের গভীরতর চেষ্টার প্রতি লক্ষ্য করে অনুভব করেছে যে, সে শুধু ব্যক্তিগত মানুষ নয়, সে বিশ্বগত মানুষের একাত্ম। সেই বিরাট মানব 'অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্'। সেই বিশ্বমানবের প্রেরণায় ব্যক্তিগত মানুষ এমন সকল কাজে প্রবৃত্ত হয় যা তার ভৌতিক সীমা অতি-ক্রমণের মুখে। যাকে সে বলে ভালো, বলে সুন্দর, বলে শ্রেষ্ঠ; কেবল সমাজরক্ষার দিক থেকে নয়, আপন আত্মার পরিপূর্ণ পরি-তৃপ্তির দিক থেকে।"

এই ভাবে ব্যক্তিকর্মের মধ্য দিয়া যে ব্যক্তি-প্রকাশ তাহাই মহা-মানবের ভিতর দিয়া মহামানবতার প্রকাশকে সম্ভব করিয়া তুলি-তেছে। ব্যক্তি-মানুষকে বাঁচিতে হইবে মহামানবের জন্য, এবং তাহার ভিতর দিয়াই মহামানবের ক্ষুদ্রতম একটি অংশকে প্রকাশের দ্বারা সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য তাহার নিজেকে প্রকাশ করিতে হইবে নিষ্কাম কর্মে, বিজ্ঞানে দর্শনে সাহিত্যে শিল্পে—সেবায় ও পূজায়। মানুষের মনে যত ধর্মমত জাগিয়া উঠিয়াছে তাহারা যে নাম এবং

রূপই গ্রহণ করুক না কেন, সকল ধর্মের ভিতর দিয়া মানুষ একমাত্র এই মহামানবতার প্রকাশচেষ্টা রূপ মূল সত্যকেই আশ্রয় করিয়াছে।

বাঙলাদেশের বাউলগণ যখন 'মনের মানুষে'র কথা বলিয়াছেন তখন রবীন্দ্রনাথ মানুষের মধ্যে যুগযুগান্ত ধরিয়া গড়িয়া উঠিয়া সুন্দরতম মধুরতম পূর্ণতম প্রকাশ খুঁজিতেছে যে মানুষ তাহার কথাই মনে করিয়াছেন। বাউল কবিগণের গানের পূর্বাপরের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া বিচার করিলে বাঙলার বাউলকবিগণ তাঁহাদের গানে 'মনের মানুষ' কথার ভিতর দিয়া মানুষের ভিতরকার এই প্রকাশমান মানুষ বা প্রকাশমান ভগবত্তার কথাই যে বলিয়াছেন একথা স্বীকার করা যায় না। কিন্তু বাউলগণের একতারার সুর রবীন্দ্রনাথের মনে গিয়া এই সুরেরই ঝঙ্কার তুলিয়াছিল—এবং এই অর্থ বা ব্যঞ্জনা লইয়াই বাউল গান রবীন্দ্রনাথের নিকটে এত প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। গগন হরকরার যে গানটি রবীন্দ্রনাথের মন অধিকার করিয়াছিল এবং যে গানকে তিনি তাঁহার বহু লেখায় বা ভাষণে ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহার ভিতরকার—

আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে!
হারায়ে সেই মানুষে
তার উদ্দেশে
দেশ বিদেশে
বেড়াই ঘুরে।

এই পঙক্তি কয়টিই রবীন্দ্রনাথের মনকে গভীরভাবে নাড়া দিয়াছিল ; ইহা যেন মানুষের ভিতরে প্রকাশ খুঁজিতেছে যে আসল মানুষ—যে দেব-মানুষ—নিজের ভিতর দিয়া এবং তাহার সঙ্গে নিখিল মানুষের ভিতর দিয়া সেই 'মনের মানুষের' সন্ধানের ব্যাকুলতা। বাউলের 'ব্রহ্ম-কমলে'র কল্পনাটি রবীন্দ্রনাথের ভিতরে আনন্দোদ্বোধে একটি চিত্ত-প্রসার আনিয়া দিয়াছিল। প্রত্যেক ব্যক্তি-মানুষের ভিতর দিয়া যেমন তাহার হৃদয়-কমল যুগ যুগ ধরিয়া

প্রকাশ পাইতেছে, তেমনই আবার সব দেশে সব কালে ব্যাপ্ত যে মহামানব এবং সেই মহামানবের চারিপাশে যে বিশ্বপ্রকৃতি—ইহার সব কিছুকে লইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে বিশ্বের ব্রহ্ম-কমল। ব্রহ্ম-কমলের ফুটিয়া উঠিবার এই আদর্শের ভিতর দিয়াই—

দেখনা আমার পরমগুরু সাঁই,
যে যুগযুগান্তে ফুটায় মুকুল, তাড়াহুড়া নাই।

এই পদটি রবীন্দ্রনাথের নিকটে এত প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। এই দৃষ্টিতেই তাহার নিকটে সার্থক হইয়া উঠিয়াছিল বাউলের এই গান—

হৃদয় কমল চলতেছে ফুটে
কত যুগ ধরি',
তাতে তুমিও বাঁধা, আমিও বাঁধা,
উপায় কি করি।

'কমলা-বক্তৃতামালা'য় 'মানুষের ধর্ম' বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ যে ভাষণ দিয়াছেন তাহার মুখ্য প্রতিপাদ্যও হইল বৃহৎমানব বা মহামানবের ভিতর দিয়া এই ব্রহ্ম-কমলের পরিপূর্ণ বিকাশ, এবং সেই পূর্ণতার আদর্শে ব্যক্তির সহিত মহামানবের অন্বয়যোগের কথা। ভূমিকাতেই কবি বলিয়াছেন, "আমাদের অন্তরে এমন কে আছেন যিনি মানব অথচ যিনি ব্যক্তিগত মানবকে অতিক্রম ক'রে 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ'। তিনি সর্বজনীন সর্বকালীন মানব। তাঁরই আকর্ষণে মানুষের চিন্তায় ভাবে কর্মে সর্বজনীনতার আবির্ভাব। মহাত্মারা সহজে তাঁকে অনুভব করেন সকল মানুষের মধ্যে, তাঁর প্রেমে সহজে জীবন উৎসর্গ করেন। সেই মানুষের উপলব্ধিতেই মানুষ আপন জীবসীমা অতিক্রম ক'রে মানবসীমায় উত্তীর্ণ হয়।...সেই মানবকেই মানুষ নানা নামে পূজা করেছে, তাঁকেই বলেছে 'এষ দেবো বিশ্ব-কর্মা মহাত্মা'। সকল মানবের ঐক্যের মধ্যে নিজের বিচ্ছিন্নতাকে পেরিয়ে তাঁকে পাবে আশা ক'রে তাঁর উদ্দেশে প্রার্থনা জানিয়েছে—

স দেবঃ
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।

সেই মানব, সেই দেবতা, য একঃ, যিনি এক, তাঁর কথাই আমার এই বক্তৃতাগুলিতে আলোচনা করেছি।”

মানুষের এই শাশ্বত অখণ্ড আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া কবি মানুষের শ্রেষ্ঠ জীবন-সাধনার সম্বন্ধেও স্পষ্ট নির্দেশ দিয়াছেন,—

> “এই সর্বজনীন মনকে উত্তরোত্তর বিশুদ্ধ ক'রে উপলব্ধি করাতেই মানুষের অভিব্যক্তির উৎকর্ষ। মানুষ আপন উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিসীমাকে পেরিয়ে বৃহৎমানুষ হয়ে উঠছে, তার সমস্ত শ্রেষ্ঠ সাধনা এই বৃহৎমানুষের সাধনা। এই বৃহৎমানুষ অন্তরের মানুষ। বাইরে আছে নানা দেশের নানা সমাজের নানা জাত, অন্তরে আছে এক মানব।”

শুভকর্ম-সাধনার পথই হইল মানুষের জীবন-সাধনার পথ। কর্মসাধনাকে এই শুভত্ব দান করে কিসে? শুভত্ব দান করে যোগ: কর্ম যখন কর্মযোগ হইয়া ওঠে তখনই কর্ম শুভ। কর্ম কর্মযোগে হইয়া ওঠে কখন? কর্ম যখন বৃহতের সঙ্গে—মহামানবের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেয় তখনই কর্ম হইয়া ওঠে কর্মযোগ। “ঈশোপনিষদ্ তাই বলেন, 'শত বৎসর তোমাকে বাঁচতে হবে, কর্ম তোমার না করলে নয়।' শত বৎসর বাঁচাকে সার্থক করো কর্মে, এমনতরো কর্মে যাতে প্রত্যয়ের সঙ্গে প্রমাণের সঙ্গে বলতে পারা যায় সোঽহম্। এ নয় যে, চোখ উলটিয়ে, নিশ্বাস বন্ধ ক'রে বসে থাকতে হবে মানুষের থেকে দূরে। অসীম উদ্‌বৃত্ত থেকে মানুষের মধ্যে যে-শ্রেষ্ঠতা সঞ্চারিত হচ্ছে সে কেবল সত্যং ঋতং নয়, তার সঙ্গে আছে রাষ্ট্রং শ্রমো ধর্মশ্চ কর্ম চ ভূতং ভবিষ্যৎ। এই যে-কর্ম, এই যে-শ্রম, যা জীবিকার জন্যে নয়, এর নিরন্তর উদ্যম কোন্ সত্যে। কিসের জোরে মানুষ প্রাণকে করেছে তুচ্ছ, দুঃখকে করছে বরণ, অন্যায়ের দুর্দান্ত প্রতাপকে উপেক্ষা করছে বিনা উপকরণে, বুক পেতে নিচ্ছে অবিচারের দুঃসহ মৃত্যুশেল। তার কারণ, মানুষের মধ্যে শুধু কেবল তার প্রাণ নেই, আছে তার মহিমা। সকল প্রাণীর মধ্যে মানুষেরই মাথা তুলে বলবার অধিকার আছে, সোঽহম্।”

রবীন্দ্রনাথের ভিতরে এই মানবতাবোধ কোনও এক সময়ে বুদ্ধির পথে আবির্ভূত হইয়া স্পষ্ট একটি 'থিওরি'র রূপ গ্রহণ করে নাই; সারাজীবনের বিভিন্ন জাতীয় অনুভূতি দিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। এই জন্য ইহা ভাষণ প্রবন্ধের ভিতর দিয়া যেমন প্রকাশ-লাভ করিয়াছে, তাঁহার কবিতার ভিতর দিয়াও নানাভাবে তাহা প্রকাশলাভ করিয়াছে। কোথাও এককে অবলম্বন করিয়া নিখিল-মানবে গিয়া পেঁছাইয়াছেন, কোথাও নিখিল মানবের ভিতর দিয়া এককে লাভ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। 'পরিশেষে'র 'প্রণাম' কবিতায় দেখিতে পাই, এই মানবের ভিতর দিয়া একের চরণে প্রণাম—

নিখিলের অনুভূতি
সংগীতসাধনা মাঝে রচিয়াছে অসংখ্য আকৃতি।
এই গীতিপথপ্রান্তে হে মানব, তোমার মন্দিরে
দিনান্তে এসেছি আমি নিশীথের নৈঃশব্দ্যের তীরে
আরতির সান্ধ্যক্ষণে; একের চরণে রাখিলাম
বিচিত্রের নর্মবাঁশি,—এই মোর রহিল প্রণাম।

এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে লক্ষণীয় 'পরিশেষে'র 'বর্ষশেষ' কবিতাটি; যেখানে 'আয়ুর পশ্চিমপথশেষে ঘনায় মৃত্যুর ছায়া এসে' সেইখানে দাঁড়াইয়া কবি নিজের জীবনের মূল্য নিরূপণ করিতে গিয়া এবং মৃত্যুর হাত হইতে নিজেকে অমরত্বের গভীরতায় উপলব্ধি করিতে গিয়া মানবজীবনের সহিত নিজেকে সর্বভাবে যুক্ত করিয়া নিজের অমর মূল্যকে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছেন—

যাঁহারা মানুষরূপে দৈববাণী অনির্বচনীয়
তাঁহাদের জেনেছি আত্মীয়।
কতবার পরাভব, কতবার কত লজ্জা ভয়,
তবু কণ্ঠে ধ্বনিয়াছে অসীমের জয়।
অসম্পূর্ণ সাধনায় ক্ষণে ক্ষণে ক্রন্দিত আত্মার
খুলে গেছে অবরুদ্ধ দ্বার।

লভিয়াছি জীবলোকে মানব জন্মের অধিকার,
ধন্য এই সৌভাগ্য আমার।
যেথা যে-অমৃতধারা উৎসারিল যুগে যুগান্তরে
জ্ঞানে কর্মে ভাবে, জানি সে আমারি তরে।
পূর্ণের যে-কোনো ছবি মোর প্রাণে উঠেছে উজ্জ্বলি
জানি তাহা সকলের বলি।

যেখানেই যে-তপস্বী করেছে দুষ্কর যজ্ঞভাগ,
আমি তার লভিয়াছি ভাগ।
মোহবন্ধমুক্ত যিনি আপনারে করেছেন জয়,
তাঁর মাঝে পেয়েছি আমার পরিচয়।
যেখানে নিঃশঙ্ক বীর মৃত্যুরে লঙ্ঘিল অনায়াসে,
স্থান মোর সেই ইতিহাসে।

শ্রেষ্ঠ হতে শ্রেষ্ঠ যিনি, যতবার ভুলি কেন নাম,
তবু তাঁকে করেছি প্রণাম।
অন্তরে লেগেছে মোর স্তব্ধ আকাশের আশীর্বাদ ;
ঊষালোকে আনন্দের পেয়েছি প্রসাদ।
এ আশ্চর্য বিশ্বলোকে জীবনের বিচিত্র গৌরবে
মৃত্যু মোর পরিপূর্ণ হবে।

ঈশ্বরকে মানুষের মধ্য দিয়া দেখিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়া কবি তাঁহার 'পুনশ্চ'র কবিতায় ঈশ্বরপুত্র খৃস্টের নাম দিলেন 'মানবপুত্র'। মানুষের ব্যবহারে মর্মাহত হইয়া একদিন যিশুখৃস্ট ঊর্ধ্বে তাকাইয়া ঈশ্বরের নিকটে হৃদয়ের আর্তি জানাইয়াছিলেন, 'পিতা, হে আমার স্বর্গস্থ পিতা, কেন তুমি আমাকে ত্যাগ করিলে?' রবীন্দ্রনাথ আবার যেদিন দেখিতে পাইলেন, মানবের মধ্যে একদিন রক্তমাংসের দেহে বিষয়ীকৃত হইয়া উঠিয়াছিল যে মহৎ মানব আদর্শ

যিশুখৃস্ট রূপে চারিদিকে মানুষের মধ্যে জাগিয়া উঠিতেছে ধর্মের নামে ষড়্‌যন্ত্র সেই মানবপুত্রকে চরম লাঞ্ছনায় হত্যা করিতে— মানুষের মধ্যে একদিন একান্ত সত্য হইয়া উঠিয়াছিল যে আদর্শ সেই আদর্শকে অবমানিত করিয়া ধ্বংস করিতে, সেদিন যেন আবার—

মানবপুত্র যন্ত্রণায় বলে উঠলেন ঊর্ধ্বে চেয়ে,
'হে ঈশ্বর, হে মানুষের ঈশ্বর,
কেন আমাকে ত্যাগ করলে।'

বাহিরের কর্মের যোগে মানুষের সঙ্গে যুক্ত হইবার নানাভাবে কবি যে চেষ্টা করিয়াছেন তাহার সঙ্গে তাঁহার কবি-অন্তরের যোগ তিনি কিভাবে মিলাইয়া দিতে চাহিয়াছেন তাহার পরিচয় আছে কবির 'পত্রপুট'এর পনেরো সংখ্যক কবিতায়। অনুভূতিতে ধ্যানে-মননে যে যোগ তাহাই তো প্রেরণা দিয়াছে সকল কর্মযোগের। এ-যোগকে একটা বস্তুবিয়োজিত চিন্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া তাঁহার ব্যবহারিক কবিজীবনে এই যোগকে তিনি মানুষের প্রত্যেক স্তরে কিভাবে ছড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহারই প্রকাশ এই কবিতায়—

লোকালয়ের বাইরে পেয়েছি আমার নির্জনের সঙ্গী
যারা এসেছে ইতিহাসের মহাযুগে
আলো নিয়ে, অস্ত্র নিয়ে, মহাবাণী নিয়ে।
তারা বীর, তারা তপস্বী, তারা মৃত্যুঞ্জয়,
তারা আমার অন্তরঙ্গ, আমার স্ববর্ণ, আমার স্বগোত্র,
তাদের নিত্যশুচিতায় আমি শুচি।
তারা সত্যের পথিক, জ্যোতির সাধক,
অমৃতের অধিকারী।

মানুষকে গণ্ডির মধ্যে হারিয়েছি
মিলেছে তার দেখা
দেশবিদেশের সকল সীমানা পেরিয়ে।

তাকে বলেছি হাতজোড় ক'রে,—
হে চিরকালের মানুষ, হে সকল মানুষের মানুষ,
পরিত্রাণ করো—
ভেদচিহ্নের তিলক-পরা
সংকীর্ণতার ঔদ্ধত্য থেকে।
হে মহান পুরুষ, ধন্য আমি, দেখেছি তোমাকে
তামসের পরপার হতে
আমি ব্রাত্য, আমি জাতিহারা।

ইতিহাসবোধের এই গভীরতার প্রতিষ্ঠাতে 'আকাশপ্রদীপ'এর একটি কবিতায় কবিকণ্ঠে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে এই বাণী—

মহেন্দজারোর কবি, তোমার সন্ধ্যাতারা
অস্তাচল পেরিয়ে
আজ উঠেছে আমার জীবনের
উদয়াচলশিখরে।

রবীন্দ্রনাথ এইভাবে যে মহামানবতার কথা এবং তাহাকে অবলম্বন করিয়া একটা অন্বয়যোগের কথা বলিলেন এ-সম্বন্ধে একটা মস্ত বড় প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হয়। আমরা কি তাহা হইলে এই কথাই বলিব যে রবীন্দ্রনাথের পরিণত মনে 'মহামানব'ই 'ব্রহ্মে' রূপান্তরিত হইয়াছিল বা তাঁহার 'ব্রহ্ম'ই মহামানবতার রূপ ধারণ করিয়াছিল? সত্য বৃহৎ-বাচী বলিয়াই সত্য 'ব্রহ্ম'; এই বৃহত্ত্ব এবং মহত্ত্ব সবখানিই যখন রবীন্দ্রনাথ অতীত-বর্তমান-অনাগত জুড়িয়া প্রকাশমান অখণ্ড মানবতার মধ্যেই আবিষ্কার করিলেন তখন এই মহামানবের অন্তর্নিহিত সত্যই তো ব্রহ্ম। নিঃস্বার্থ কর্মের ভিতর দিয়া মানুষের সঙ্গে যে যোগ তাহাই যদি শ্রেষ্ঠ উপাসনা হয় তবে উপাসনাকে শুধু এই নিঃস্বার্থ শুভকর্মের মধ্যে পর্যবসিত করিতে কোনও আপত্তি আছে কিনা। আত্মসিসৃক্ষু

চৈতন্যময় সৃজনীশক্তির মানুষই হইল যখন শ্রেষ্ঠ প্রকাশ বা মূর্তি তখন মানবপূজাই তো হইল শ্রেষ্ঠ পূজা। প্রশ্নটিকে আরও পরিষ্কার করিয়া বুঝিবার জন্য দুই ভাগ করিয়া লওয়া যাইতে পারে; প্রথম প্রশ্ন হইল দার্শনিক প্রশ্ন; মানবতার ভিতর দিয়া পরম সত্যের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ এই কথা স্বীকার করার ভিতর দিয়া পরম সত্য অখণ্ড মানবতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ এই কথা স্বীকার করিতে হয় কিনা। দ্বিতীয় প্রশ্ন হইল একটা ধর্মের প্রশ্ন; পরিণত জীবনে রবীন্দ্রনাথ উপাসনাকে কেবল বৃহৎমানবের সহিত যোগযুক্ত শুভকর্মের মধ্যেই পর্যবসিত রাখিতে চাহিয়াছেন কিনা; অথবা, এ কথাও বলা যাইতে পারে, তিনি তাহা করিতে না চাহিলেও তিনি যেসব কথা বলিয়াছেন তাহাতে তাহাই তাঁহার করা উচিত ছিল।

এখানকার দার্শনিক প্রশ্নটি যাহা তাহার উত্তর রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'The Religion of Man' গ্রন্থেই দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, তিনি যে পুরুষকে সমস্ত পুরুষের মধ্য দিয়া প্রকাশিত সনাতন পুরুষ বলিয়াছেন (the Eternal Person manifested in all persons) সেই মহামানবরূপ সনাতন পুরুষই যে পরম সত্যের একমাত্র মূর্ত রূপ এ কথা সত্য নাও হইতে পারে; এই মূর্তি বা বিকাশ হয়ত ভগবানের অসংখ্য বিকাশের মধ্যে এক রকমের একটি বিকাশ মাত্র—অসংখ্য মূর্তির এক মূর্তি মাত্র; কিন্তু এই মূর্তিই মানুষকে এবং মানুষের বিশ্বকে বিধৃত করিয়া আছে। আমরা যে পর্যন্ত মনুষ্যজাতীয় জীবই থাকিয়া যাইতেছি, সে পর্যন্ত আমরা এই পরম সত্যকে অন্য কোনও রূপ বিশ্বের মধ্যে প্রকাশিত বলিয়া জানিতে বা কল্পনা করিতে পারি না। এই জন্যই আমাদের রচিত বিভিন্ন ধর্মতত্ত্ব ভগবানের যত প্রকারের স্বরূপের কথাই কল্পনা করুক না কেন, বাস্তবপক্ষে তিনি আমাদের নিকটে হইলেন মানবতার একটা সীমাহীন আদর্শ; মানুষ কাহার ঐক্যবদ্ধ ক্রমোন্নতির ভিতর দিয়া এই আদর্শের দিকেই অগ্রসর হইতেছে; প্রতিটি প্রেম-মিলনের ভিতর দিয়া, পিতা

সুহৃদ্ প্রেমাস্পদ প্রভৃতির আদর্শের ভিতর দিয়া তাহারই দিকে মানুষ ছুটিয়া চলিতেছে।

> "It may be one of the numerous manifestations of God, the one in which is comprehended Man and his universe. But we can never know or imagine him as revealed in any other inconceivable universe so long as we remain human beings. And therefore, whatever character our theology may ascribe to him, in reality he is the infinite ideal of Man towards whom men move in their collective growth, with whom they seek union of love as individuals, in whom they find their ideal of father, friend and beloved." (Ch. xii)

ধর্মানুষ্ঠানের দিক হইতে দেখিতে পাই, এই মানবতাবোধের বিকাশের ফলে রবীন্দ্রনাথ কর্মযোগের উপরে জোর দিয়াছেন বটে, কিন্তু তদতিরিক্ত একান্তে ধ্যান, মন্ত্রোচ্চারণ বা প্রার্থনাকে বাদ দিবার কখনই পক্ষপাতী হইয়া ওঠেন নাই; কিন্তু এই সকল অনুষ্ঠানের দ্বারা চিত্তে যে সত্যবোধ বা সত্যানুভূতি জাগ্রত হইবে সেই বোধ এবং অনুভূতিকে সকল কর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত করিয়া লইবার পক্ষপাতী ছিলেন। ধর্মবোধ কখনও যেন মানবতাবোধ হইতে বিচ্ছিন্ন না হইয়া পড়ে—কোনও ধর্মানুষ্ঠানই যেন বৃহৎমানবের সহিত যোগযুক্ত যে কর্ম তাহা হইতে একান্তভাবে অতিরিক্ত না হইয়া ওঠে। ধর্মানুষ্ঠানও চিত্তকে শুভকর্মানুষ্ঠানের দিকে প্রচোদিত করিয়া তুলুক, সকল কর্মানুষ্ঠান 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ' যে পরম সত্য তাহার দিকে চিত্তকে কেন্দ্রীভূত করুক—ইহাই ছিল তাঁহার আদর্শ।

আসলে রবীন্দ্রনাথের শেষের দিকের কিছু লেখা—শুধু গদ্য নয়, কবিতাও—পড়িলে মধ্যে মধ্যে আমাদের মনে সংশয় জাগে, রবীন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে নিজের অজ্ঞাতে পাশ্চাত্য 'হিউম্যানিস্ট্'গণের সহোদর হইয়া ওঠেন নাই তো? ঊনবিংশ শতাব্দীতে সাধারণভাবে সর্বত্রই ধর্মের উপরে মানবতাবাদের একটা প্রাধান্য দেখিতে পাই।

পূর্ববর্তী কালে ধর্মের ক্ষেত্রে আমরা মানবাতীত অধ্যাত্ম-সত্য বড় করিয়া দেখিতে চাহিয়াছি; ধর্মের পথে যাইতে হইলে এই মাটির পৃথিবীকে এবং সেই পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে এই জীবনের অভিনয়কে পায়ে ঠেলিয়া ফেলিয়া অগ্রসর হইয়া যাইতে হইবে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে মনীষিগণের ধর্মচিন্তায় প্রায় সর্বত্রই ইহার বিরুদ্ধতা দেখিতে পাই; জীবনের জন্যই ধর্ম—ধর্মের জন্য জীবন নহে—এই কথাটাই দিকে দিকে বহুস্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে 'মানবতাবাদ'এর এই বিকাশ এই ভাবে ধর্মাশ্রিত হইয়াই হয় নাই; অধ্যাত্ম-সত্যের সম্পূর্ণ বিরোধিতায় ঘটিয়াছে অনেক ক্ষেত্রে। আমরা যাঁহাদিগকে পাশ্চাত্য দেশের 'হিউম্যানিস্ট্' বলি তাঁহাদের অধিকাংশেরই ঝোঁক অনাধ্যাত্মবাদের দিকে; মানবতাকে তাঁহারা অধ্যাত্মব্যদের সর্বপ্রকার আবরণ হইতে মুক্ত করিয়া সম্পূর্ণরূপে 'স্বে মহিম্নি' প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাহিয়াছেন। দু'এক স্থানে রবীন্দ্রনাথের উক্তি দেখিয়া মনে সংশয় জাগে, তিনিও কি ক্রমে ক্রমে শেষে নিজের অজ্ঞাতে এই মানবতাবাদিগণের দলেই ভিড়িয়া পড়িয়াছেন? একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইব, এই সব দল মনুষের সম্বন্ধে যত কথা বলিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ নিজেও সেই সব কথা বলিলেও বা প্রকারান্তরে স্বীকার করিলেও সম্পূর্ণভাবে ঐ দলে কখনই ভিড়িয়া পড়েন নাই। ভিড়িয়া না পড়িবার কারণ তাঁহার বিশেষ মানসিক সংগঠন—যে সংগঠনের ভিতরে সকল ইতিহাস-প্রবাহের পিছনে একটি চৈতন্যময় মঙ্গলময় 'পরম এক'এ বিশ্বাস ছিল একটি ধাতুগত সত্য। মন-ঘুড়ি তাই মানবতার আকাশে যতই ঘুরিয়া বেড়াক, একের বন্ধনসূত্র কখনই ছিন্ন হইয়া যায় নাই।

মানবতাকে অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথের এই যে আদর্শ গড়িয়া উঠিয়াছিল ইহার সহিত ঐতিহাসিক রবীন্দ্রনাথের জীবন-পরিণতির একটা গভীর যোগ রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আশৈশব এই একটি প্রবল ঝোঁক ছিল যে, দুনিয়ার অপর সকল

লোকের উপরে নানা রকম কাজের ভার পড়িয়াছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জীবন-দেবতা তাঁহাকে নিভৃত নিরালায় একান্ত সুদূরে আপন মনে বসিয়া বাঁশী বাজাইবার একটি বিশেষ কাজ এবং অধিকার দিয়াছেন। কর্মময় সংসারের জটিল ঘূর্ণাবর্ত হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়া খেয়াল-খুশিতে বাঁশী বাজাইবার একটি বিশেষ অধিকার যে তাঁহার আছে এ বিষয়ে কবি দীর্ঘদিন সচেতন ছিলেন, এবং তাঁহার গানে কবিতায় নাটকে কোনো কোনো সময়ে এই সচেতনতা অত্যন্ত হইয়া দেখা দিয়াছে। আশৈশব তাঁহার যে একটা বিশ্বাত্মবোধ ছিল এবং অখণ্ড মানবতার সহিত যোগের আকাঙ্ক্ষা ছিল তাহার প্রমাণ আমরা পূর্বে বহুভাবে দিয়া আসিয়াছি ; কিন্তু এ আকাঙ্ক্ষা কোথাও একটা ঝাপসা স্বপ্নবিলাসে, কোথাও গভীর মিস্টিক্ অনুভূতিতে এবং ক্ষণে ক্ষণে অনুস্মৃত কবিধর্মের বিরুদ্ধে একটা আত্মপ্রতিক্রিয়ায় দেখা দিয়াছে। দীর্ঘদিন পর্যন্ত ইহা জীবনবোধের বলিষ্ঠতা লাভ করে নাই বলিয়া বিপরীতমুখীন ভাবটিই—অর্থাৎ এককভাবে বিশ্বরূপের বিশ্বলীলা 'আপনার নিকুঞ্জচ্ছায়' বর্ণে গন্ধে গানে রসে আস্বাদন করিবার বিশেষ অধিকারের দাবীটিই প্রবলতর রূপে ঘোষণা লাভ করিয়াছে। যে সকল কবিতায় গানে রবীন্দ্রনাথের এই মনোভাবটি প্রকাশিত হইয়াছে তাহার অনেকগুলিই সে যুগে প্রকাশিত তাঁহার কতকগুলি শ্রেষ্ঠ গান ও কবিতা। সৃষ্টির ক্ষেত্রে যে তিনি 'একক' এবং এই একাকিত্বের তাঁহার যে অধিকার আছে—সেই অধিকারের পিছনে যে যুক্তি রহিয়াছে এ কথা বার বার ঘুরিয়া ফিরিয়া তাঁহার গানে কবিতায় নাটকে প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে আবার দেখিতে পাই শুধু স্বপ্নবিলাস নয়—শুধু মিস্টিক্ অনুভূতি নয় —ঐতিহাসিক জীবনে একটা প্রবল প্রতিক্রিয়া—যে প্রতিক্রিয়ার সুরটি একটি অতিশয় তীব্র ভাবে শোনা গিয়াছে, 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতার মধ্যে। এই ফিরিবার চেষ্টা এইখানেই এই প্রথম নয়, 'প্রভাত সংগীত', 'কড়ি ও কোমল' প্রভৃতির সময় হইতেই এই

ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বপ্নাচ্ছন্নতা হইতে জাগরণের অভীপ্সা উচ্চারিত হইয়াছে। সেই অভীপ্সাই রূপলাভ করিয়াছে এই মানবতাবাদে এবং মানবতার সহিত অন্বয়যোগের বলিষ্ঠ উচ্চারণে।

অখণ্ড মানবতার সহিত একটা অন্বয়যোগের বোধ প্রথম জীবন হইতে থাকিলেও, তাঁহার বাস্তব কবিজীবনে বৃহৎ সমাজজীবন হইতে যে তিনি জ্ঞাতে অজ্ঞাতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছেন এ বোধ রবীন্দ্রনাথকে থাকিয়া থাকিয়া পীড়া দান করিয়াছে। জীবনের বিভিন্ন বাঁকে তাই তিনি সমাজজীবনের যোগে নূতন করিয়া জাগ্রত হইয়া উঠিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শুধু যে কাব্যজগতেই জাগ্রত হইতে চাহিয়াছেন তাহা নয়, নূতন নূতন কর্মপন্থার পরিকল্পনায় ও গ্রহণে এই জাগরণকে সত্যরূপ দান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের 'শান্তিনিকেতন', 'শ্রীনিকেতন' এবং তাহাদিগকে অবলম্বন করিয়া যে অন্যান্য গঠনমূলক কাজের পরিকল্পনা এ-গুলিকে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কবিজীবনের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেখিতে হইবে, নতুবা এই অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানগুলির তাৎপর্যও ভাল করিয়া বোঝা যাইবে না, রবীন্দ্রনাথের জীবনের সমগ্রতাকেও বোঝা যাইবে না। কবিতা ও গানে বিশ্বজীবনের সঙ্গে যুক্ত হইবার যে পরম আকুতি 'বিশ্বভারতী' হইল তাহারই বাস্তব সাধন-পন্থা। এই জন্য যে সুর কবির কবিতায়, যে সুর কবির গানে, সেই সুরই হইল কবির 'বিশ্বভারতী'র পরিকল্পনায় এবং সমস্ত কর্মসূচীতে। স্বদেশী-আন্দোলন, কংগ্রেস-আন্দোলনের সঙ্গে কবি এক সময়ে নিজেকে প্রত্যক্ষভাবেই যুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন ; কিন্তু সেই কর্ম-সূচীর ভিতরে কবির নিজের সুরকে সঞ্চারিত দেখিতেও পান নাই, নিজে সে সুরকে সেখানে সঞ্চারিত করিতেও পারেন নাই ; ফলে আস্তে আস্তে কবি পিছনে পড়িয়া গেলেন—নিজেই তিনি আস্তে আস্তে দূরে সরিয়া গেলেন। অথচ বৃহৎ সমাজজীবন হইতে এই বিচ্ছিন্নতা তাঁহাকে পীড়া দিতেছিল ; তিনি খুঁজিতেছিলেন বিশ্ব-জীবনের সঙ্গে মিলনের এমন আর একটি কর্মসূচী যে কর্মসূচীতে

তাঁহাকে কোনও ভগ্নাংশে যোগ দিতে হয় না—সমগ্র সত্তা লইয়া সমগ্রভাবেই তিনি যোগ দিতে পারেন। এই আকৃতির এবং ভাব-বীজের প্রথম অঙ্কুর 'বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রম'; তাহার ক্রমপরিণতি 'শান্তিনিকেতন'এর 'শ্রীনিকেতন'এর বহুমুখী প্রসারে, তাহারই ব্যপ্তি 'বিশ্বভারতী'তে। এই 'বিশ্বভারতী'তে তাই কাহাকেও বাদ পড়িলে চলিবে না; মানুষকে চাই সব দেশের, সব ধর্মের, সব জাতের; সব বৈচিত্র্য লইয়াই তাহারা এখানে আসিয়া বৈচিত্র্যের মধ্যেই মানবতার পরম 'এক'এর মধ্যে এক হইয়া উঠিবে। এখানে যে ধর্ম, যে শিক্ষা তাহাকেও কোনও একটি দিকে ঝোঁক দিলে হইবে না—সঙ্গীত, শিল্প, আনন্দানুষ্ঠান সকলের সঙ্গে এগুলিকে যুক্ত করিয়া লইতে হইবে। শ্রমশিল্পের কাজও এখানে বাদ যাইবে না, কৃষিকার্যও বাদ যাইবে না, কিন্তু এগুলিকে মন্ত্র, সংগীত, শিল্প, নৃত্য—ইহার কোনটা হইতেই পৃথক্ করিয়া দেখা চলিবে না, সবটার সঙ্গেই যুক্ত করিয়া লইতে হইবে। এখানকার ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি —সকল জিনিসেরই এক লক্ষ্য হইল অনন্ত সম্ভাবনাপূর্ণ মানবতাকে অনন্তভাবে বিকশিত করিয়া তোলা। আবার এই যে বিশ্বমানবতার বিকাশের আয়োজন এ আয়োজনকে বিশ্বপ্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন একটা মানবীয় আয়োজন মাত্র বলিয়া গ্রহণ করিলে চলিবে না; মানবজীবনকে এখানে যথাসম্ভব বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে যোগে এক করিয়া লইতে হইবে, উভয়ক্ষেত্রেই বিকাশের ধারা যেন এক ছন্দে প্রবাহিত হয়। রবীন্দ্রনাথের ভিতরকার যে সমগ্র কবিপুরুষটি তাহার প্রকাশকে এই দুই দিকে লক্ষ্য করিতে হইবে। একদিক হইল তাঁহার সকল সাহিত্যকৃতি ও সংগীত, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি শিল্পকলা, অন্যদিক হইল রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী; ইহারা এ-পিঠ আর ও-পিঠ; কিন্তু পরস্পরবিরোধী এ-পিঠ ও-পিঠ নয়, দুই পিঠকে একসঙ্গে করিয়া তবে সমগ্র রবীন্দ্রনাথের প্রকাশ।

তাঁহার মানবতাবোধের দ্বারা প্রেরিত হইয়া এক সময়ে যে তিনি বিশেষভাবে বিচ্ছিন্নতার আত্মগণ্ডি অতিক্রমের জন্য উদ্বুদ্ধ হইয়া-

ছিলেন এ কথার স্বীকৃতি কবি নিজেই দিয়া গিয়াছেন—'The Religion of Man' গ্রন্থে। এ বিষয়ে তিনি এ পর্যন্ত বলিয়াছেন যে, সাহিত্য-কর্ম লইয়া সমাজ-বিচ্ছিন্নতাই যে তাঁহাকে পীড়া দিতেছিল তাহা নয়, বিরলে একাকী বসিয়া অসীমের ধ্যানে যে আনন্দ তাহাও তাঁহার চিত্তকে আর তৃপ্তি দিতে পারিতেছিল না; এমন কি এক সময়ে তিনি এমনও অনুভব করিলেন যে তাঁহার নীরব উপাসনায় তিনি যেসকল মন্ত্র মনে মনে আবৃত্তি করিতেন তাঁহার অজ্ঞাতেই তাঁহার চিত্তে সেসকল মন্ত্র প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছিল। তখন কবি অস্পষ্টভাবে ভিতরে ভিতরে অনুভব করিতে পারিলেন, তাঁহাকে তাঁহার অধ্যাত্ম স্বরূপকে উপলব্ধি করিতে হইবে মানুষের জীবনের মধ্যে—এবং তাহার সাধনা হইবে নিঃস্বার্থ জনসেবা। তখনই তিনি স্থাপন করিলেন তাঁহার বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রম, যাহারই ক্রমপরিণতি 'বিশ্বভারতী'তে।

> "I am sure that it was this idea of the divine Humanity unconsciously working in my mind, which compelled me to come out of the seclusion of my literary career and take my part in the world of practical activities. The solitary enjoyment of the infinite in meditation no longer satisfied me, and the texts which I used for my silent worship lost their inspiration without my knowing it. I am sure I vaguely felt that my need was spiritual self-realization in the life of Man through some disinterested service. This was the time when I founded an educational institution for our children in Bengal." (Ch. xii)

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এই মানবতাবোধকে কবিতায় ভাষণে প্রবন্ধে বিবিধভাবে উপনিষদের উপরেই প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু সহজেই বোঝা যায় এ মানবতাবাদের সঙ্গে উপনিষদের যোগ থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা সর্বাংশে উপনিষদের বস্তু নয়, ইহা অনেকখানিই রবীন্দ্রনাথের নিজের বস্তু—এবং এ কথাও আমাদের বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, এই রবীন্দ্রনাথও হইলেন সেই ঊনবিংশ

শতকে গড়িয়া-ওঠা একজন কবিপুরুষ—যে ঊনবিংশ শতাব্দীতে মানবতার বাণী উচ্চারিত পৃথিবীর দিকে দিকে বহুমনীষীর কণ্ঠে —বিশেষ করিয়া ইউরোপে। মননের ক্ষেত্রে এই মনীষিগণের মননের সহিত যে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ যোগ ছিল এ কথা অনস্বীকার্য।

উপনিষদের মধ্যে প্রথমে নিজের আত্মাকে উপলব্ধি করিবার এবং সেই আত্মোপলব্ধির ভিতর দিয়া সর্বব্যাপী 'এক'কে অনুভব করিবার কথা—এবং সেই সর্বব্যাপী 'এক'এর ভিতর দিয়াই আবার সব কিছুর ভিতরে প্রবেশ করিয়া একেবারে সব কিছু হইয়া যাইবার কথা বহুভাবে পাই এবং ইহার বিস্তৃত আলোচনা আমরা পূর্বেই করিয়া আসিয়াছি। উপনিষদের এই জাতীয় বাণীর মধ্যে তিনটি বাণী বিশেষ করিয়া রবীন্দ্রনাথের মনকে নাড়া দিয়াছিল, তাহার ভিতরে একটি হইল—

> এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা
> সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। (শ্বেতা, ৪।১৭)

'এই দেব বিশ্বকর্মা মহাত্মা—ইনি সদা জনসমূহের হৃদয়ে সান্নাবষ্ট।'

দ্বিতীয়টি হইল—

> তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা
> যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি॥ (মুণ্ডক ৩।২।৫)

'সেই যুক্তাত্মা ধীরগণ সর্বগকে সর্বভাবে প্রাপ্ত হইয়া সবের মধ্যেই প্রবেশ করেন।'

তৃতীয় হইল একসঙ্গে ঈশোপনিষদের দুইটি শ্লোক—

> যস্তু সর্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
> সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥
>
> যস্মিন্ সর্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
> তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥ (৬, ৭)

'যিনি সর্বভূতকে আত্মার মধ্যেই অবস্থিত দেখেন, সর্বভূতে আত্মাকে দেখেন, তিনি এই হেতু (এই জাতীয় উপলব্ধির ফলে) আর কাহাকেও ঘৃণা করেন না।' যে সময়ে সর্বভূত সেই জ্ঞানী-ব্যক্তির আত্মাই হইয়া যায়, তখন একত্বদর্শনকারী সেই ব্যক্তির মোহই বা কি শোকই বা কি?''

উপনিষদের এই বিশেষ বাণীগুলিই রবীন্দ্রনাথের মনের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অনেকখানি ব্যঞ্জনা এবং বিস্তারলাভ করিয়া তাঁহার মানবতাবাদকে গড়িয়াছিল এ কথা বলা ঠিক হইবে না। শৈশব হইতেই তাঁহার নিজের ভিতরে কিভাবে মানবতাবাদ গড়িয়া উঠিতে-ছিল সে কথা আমরা বিস্তৃতভাবে লক্ষ্য করিয়াছি। এই গড়িয়া উঠিবার প্রত্যেক স্তরেই উপনিষদের অদ্বয়বাদ নানাভাবে জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে রবীন্দ্রনাথকে অল্পবিস্তর প্রভাবিত করিয়াছে এ কথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে উপনিষদের প্রভাবই এক-মাত্র লক্ষণীয় বা প্রধান লক্ষণীয় বস্তু নয়; এ মানবতাবাদের অনেক-খানিই রবীন্দ্রনাথের নিজের; উপনিষদের বাণীগুলির ব্যঞ্জনাকে বিস্তৃত করিয়া নিজের বাণীর সঙ্গেই তাহাদের মিলাইয়া লইয়া তিনি নিজের ভিতরকার মানবতাবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

পূর্বে বলিয়াছি, ঊনবিংশ শতাব্দী জগৎ জুড়িয়াই 'humanism' বা মানবতার যুগ। ইউরোপে অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় পাদ হইতেই দেবত্বের বা ভগবত্তার সকল মহিমা ঊর্ধ্বের স্বর্গ হইতে নামাইয়া আনিয়া সবটাই নিম্নের মর্ত্যভূমির মানুষের মধ্যে বণ্টন করিয়া লইবার অজস্র চেষ্টা হইয়াছে। এ কথা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই যে, তখনকার দিনের মননশীলতার ক্ষেত্রে এই মানবতাবাদ অনেক-খানি জল-মাটি আলো-হাওয়ার সঙ্গেই মিশিয়াছিল এবং সেখান হইতে সেই উপাদান নানাভাবেই আসিয়া রবীন্দ্রনাথের মানস-পরিমণ্ডলে প্রবেশলাভ করিয়াছে। এই সম্ভাবনাকে অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথের এই হিবার্ট-বক্তৃতামালা এবং কমলা-বক্তৃতামালা

দিবার পরে তাঁহার এই জাতীয় সকল মতবাদই যে কি করিয়া পাশ্চাত্যের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ 'হিউম্যানিস্ট্'গণের মতামতেরই একটি কবিসুলভ কৌশলী সার-সংকলনমাত্র তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবার চেষ্টাও সাময়িক পত্রের পাতায় যে না হইয়াছে তাহা নহে। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের এ জাতীয় বহু বাণীর পাশেপাশেই যে পাশ্চাত্য মনীষিগণের বাণী হইতে অনুরূপ বাণী উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যায় না তাহা নহে; কিন্তু উপনিষদ হইতে উদ্ধৃতি তুলিয়া তুলিয়া বা পাশ্চাত্য 'হিউম্যানিস্ট্'গণের লেখা হইতে বচন তুলিয়া তুলিয়াই গোটা রবীন্দ্রনাথকে ব্যাখ্যা করা চলে না।

গ্রহণে রবীন্দ্রনাথের কোনোদিন সঙ্কোচ বা দ্বিধা ছিল না—তাহা তাঁহার কবিমনের আশ্চর্য গ্রহণ ক্ষমতারই পরিচায়ক, তাঁহার চারিত্রিক বলিষ্ঠতারই চিহ্ন। ঋণস্বীকারে তাঁহার কোথাও কার্পণ্য ছিল না। আবার এ কথা সত্য যে, নিজের অন্তরের ঐশ্বর্য অনেক সময় তিনি ঢালিয়া দিয়াছেন উপনিষদের অনুকূল বাণীতে, মধ্যযুগের উত্তর ও মধ্যভারতীয় সাধকগণের বাণীতে, বাঙলার নিরক্ষর বাউলের গানে গানে। তাঁহার ব্যাখ্যায়, তাহার গ্রহণে এই সকল বাণীর মধ্যে যে মানস ঐশ্বর্য এবং মহিমা দেখা দিয়াছে তাহার অনেকখানি প্রাপ্য রবীন্দ্রনাথের নিজের। তাঁহার চিত্তধৃত মানবতাবাদের ক্ষেত্রেও এই কথাটিই সত্য বলিয়া মনে হয়।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে গণ-আন্দোলন

ডক্টর শচীন সেন

রবীন্দ্র-সাহিত্যে গণ-আন্দোলনের যে-রূপ আখ্যাত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে তা সম্যকরূপে বুঝতে হলে রাবীন্দ্রিক চিন্তন-ধারার বৈশিষ্ট্য আমাদের জেনে রাখা দরকার। মানুষের দুটো দিক আছে —একটা দিক ব্যক্তিগত, আর একটা দিক বিশ্বগত। ব্যক্তি যখন প্রয়োজনীয়তার সীমা ও বৈষয়িকতার বেড়া-জালে আবদ্ধ থাকে, তখন সে স্বার্থের প্রবর্তনাকে স্বীকার করে। কিন্তু ব্যক্তি যখন স্বার্থকে অস্বীকার করে ত্যাগের দিকে এগিয়ে যায়, তখন সে সর্বজনীন ও সর্বকালীন মানবতাকে শ্রদ্ধা জানায়। যে স্বার্থগত, সে পৃথকভাবে নানা কর্মে প্রবৃত্ত। যে সকলের সঙ্গে যুক্ত হতে চায় এবং সকল কালের সকল মানুষকে স্বীকার করে, তার মধ্যে বৃহৎমানুষ জাগ্রত হয়ে ওঠে। ব্যক্তিগত সীমাকে ছাড়িয়ে বিশ্ব-মানব মনের সঙ্গে যে মিল পায় এবং মিল চায়, সে কৃতার্থ। মানুষ যখন বিশ্বাভিমুখী, তখন সে অন্তরের মানুষের সন্ধান পায়। এই অন্তরের মানুষের সন্ধানে যাদের জয়যাত্রা, গণ-আন্দোলনের প্রকৃত অধিনায়ক তারাই।

ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতা ও বিশ্বগত সর্বজনীনতা, এই দুয়ের কোনোটাকেই উপেক্ষা করা চলে না। কিন্তু মানুষ অনুভব করেছে যে, সে আপনাকে সত্য করে জানতে পারে নিখিলের সঙ্গে যোগসাধন করে। সকলের সঙ্গে সচেতন সচেষ্ট মিলনসাধনের দ্বারা মানুষ তার সভ্যতা গড়ে তুলেছে। বাহিরের সঙ্গে মিলন-সাধনে ব্যক্তির সমৃদ্ধি ও সার্থকতা। তাই রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের প্রার্থনা-মন্ত্রকে স্বীকার করে বলেছেন—"যিনি এক, শুভবুদ্ধির দ্বারা তিনি আমাদের সকলকে এক করে দিন। যে বুদ্ধিতে আমরা

সকলে মিলি সেই বুদ্ধিই শুভবুদ্ধি।" রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন যে, সমগ্রের মধ্যেই শিব; শিবকে পাওয়া যায় ঐক্যবন্ধনে। ভগবান সর্বগত, সকলকে নিয়ে আছেন বলেই তিনি শিব। মিলনের ভিতর শিব এবং খণ্ডতার ভিতর অশিব। যে বিধি ও বিধান সকলকে এক করে, তার মধ্যে শুভবুদ্ধি, তার মধ্যে কল্যাণ। এই শুভবুদ্ধি যেখানে জাগ্রত, মানুষের সভ্যতা সেখানে সমৃদ্ধ।

তাই রবীন্দ্রনাথ বলতেন, মানুষের দায় মহামানবের দায়। এই মহামানবের সাধনা সফল করতে হলে ভারতের মধ্যযুগের কবি রজ্জবের বাণী মানতে হবে—

"সব সাঁচ মিলৈ সো সাঁচ হৈ না মিলৈ সো ঝূঁঠ।
জন রজ্জব কহী ভাবই রিঝি ভাবই রূঠ॥"

(সব সত্যের সঙ্গে যা মেলে তাই সত্য, যা মিলল না তা মিথ্যে; রজ্জব বলছে, এই কথাই খাঁটি, এতে তুমি খুশিই হও আর রাগই কর।)

'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, "জন্তুরা পেয়েছে বাসা, মানুষ পেয়েছে পথ।" মানুষের প্রকৃত ধর্ম হল পথের ধর্ম। যারা ঘর বাঁধে, তারা আপন সমাধি রচনা করে। যারা পথনির্মাণ করে, নূতন পথে এগিয়ে চলে, তারা মানুষকে শ্রী দেয়, সভ্যতাকে ঐশ্বর্য দেয় এবং সমগ্র দেশে মহত্ত্ব গড়ে তোলে। মানুষ চলতে চায়, ঘরের দেয়াল ভেঙে বেরিয়ে পড়তে চায়। এই ভাঙার ভিতর উদ্দামতা আছে, সতৃষ্ণ চিত্তের পিপাসা আছে, সতেজ গতি-ভঙ্গি আছে। এই ভাঙন-বোধ হতে গণ-আন্দোলন সম্ভূত। রবীন্দ্রনাথের গণ-আন্দোলনের উৎস আবিষ্কার করতে হলে রবীন্দ্র-দর্শনের কতকগুলি মূলকথা জানতে হবে। প্রথম, মানুষ ব্যক্তিগত সীমাকে ছাড়িয়ে বিশ্বগত মানবের দিকে এগিয়ে চলেছে। দ্বিতীয়, যাকে মানুষ ভাল বলে, শ্রেষ্ঠ বলে, সুন্দর বলে, তার মধ্যে দেশের ও দশের কল্যাণ-বোধ নিহিত আছে। তৃতীয়, মানুষের দৃষ্টি দিগন্তের দিকে, বাইরের দিকে তার আকর্ষণ, এবং এই আকর্ষণে

মানুষ চঞ্চল। চতুর্থ, মানুষের চরম লক্ষ্য অভাব দূর করা নয়, মহিমা উপলব্ধি করানো। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "তাকে পেতে হবে অমিত, তাকে দিতে হবে অমিত, কেন না তার মধ্যে আছে অতি-মানব। সেই অতিমানব আরামের দ্বার ভেঙে কেবলই মানুষকে বের করে নিয়ে চলেছে কঠোর অধ্যবসায়ে।"

জন্তুধর্মের স্থাবর বেড়া ডিঙিয়ে মানবধর্মের দিকে অগ্রসরণ করতে হবে। তার জন্য আমাদের শ্রান্তিহীন জয়যাত্রা, তার জন্য প্রয়োজন গণ-আন্দোলন। যে আন্দোলন পশুধর্মের দিকে টানে, তার মধ্যে আছে মানুষের অবমাননা। সেখানে মানুষের প্রকাশ নেই। তাই যে আন্দোলনে বৃহতের দিকে, মহতের দিকে, অমৃতের দিকে দৃষ্টি নেই, রবীন্দ্রনাথ তাকে প্রশংসার চোখে দেখেন নি। মানুষের লক্ষ্য হল—মুক্তি পেতে হবে এবং মুক্তি দিতে হবে। তার জন্যই মানুষের যাত্রা। এই মুক্তির সুরে সমস্ত আন্দোলনকে মন্দ্রিত করতে হবে। ইতিহাসের এক যুগের পর আর এক যুগ আসছে—মানুষ বিশ্বমানবের মঙ্গলের আহ্বানে যাত্রা করেছে। মানবলোকে মহামানবের প্রতিষ্ঠার জন্যই তার যাত্রা। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"মহাবিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা
মৃত্যুরে না করি শঙ্কা। দুর্দিনের অশ্রুজলধারা
মস্তকে পড়িবে ঝরি, তারি মাঝে যাব অভিসারে
তারি কাছে জীবনসর্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি।

কে সে! জানি না কে! চিনি নাই তারে,
শুধু এইটুকু জানি, তারি লাগি রাত্রি অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর পানে,
ঝড়ঝঞ্ঝা-বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর-প্রদীপখানি।"

মানুষের জড়তা ও অন্ধতাকে দূর করতে হবে। এই দূরীকরণের জন্য আন্দোলনের প্রয়োজন, শুধু তাই নয়, চলার পথে যতিভঙ্গ যখন হয়, তখন নূতন আন্দোলনের আবশ্যকতা প্রকটিত হয়। সমাজে যে শ্রেণীবিন্যাস আছে, তার মধ্যে যখন তাল কেটে যায়, তখন সমস্তই ছন্দহীন হয়ে পড়ে। মানুষের যাত্রা সুরের দিকে। বেসুর মানুষকে পীড়া দেয়, সম্পূর্ণ সংগীতের আকর্ষণে মানুষ এগিয়ে চলে। সমাজের একদল লোক থাকে অখ্যাত, তাদের সংখ্যা বেশি। সেই অখ্যাতদল মানুষ হবার সুযোগ পায়নি, অথচ তারাই সভ্যতার বাহন। তারা এগিয়ে যেতে শেখেনি, তাদের চলায় ছন্দ নেই। অথচ তাদের এগিয়ে নিতে হবে. তাদের চলার ভিতর তাল ও ছন্দ আনতে হবে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "তারা সভ্যতার পিলসুজ, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে—উপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে।"

প্রশ্ন উঠতে পারে, একদল তলায় না থাকলে আর একদল উপরে থাকতে পারে না। শুধু প্রয়োজনকে মানলে সভ্যতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করা যায় না। মানুষের সভ্যতার এক অংশ আছে, যা প্রয়োজনের অতীত, যা মানবমনের ঐশ্বর্যকে প্রকাশ করে। কিন্তু সেই ঐশ্বর্য, শ্রী ও মহিমা মলিন হয়ে ওঠে, যখন সমাজে চলে পীড়ন ও পেষণের ব্যবস্থা। তাল তখনই কেটে যায়, এবং এই বেতাল থেকে সামাজিক আবর্তন ও প্রলয় ঘটে। মার্কসীয় দৃষ্টিতে সংঘাতের মূলে আছে শ্রেণীবিরোধ বা সমাজের বিরোধী শক্তি; রবীন্দ্রনাথের মতে সংঘর্ষের মূলে আছে সমাজের ছন্দোহীনতা, মার্কস বিভিন্ন শ্রেণীকে চূর্ণিত করে অখ্যাত শ্রেণীর অধিনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ সর্বশ্রেণীর ভিতর সামঞ্জস্য-বোধকে সজাগ রাখতে বলেছেন। তাই রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীকে বলেছেন—"আমি তাল রেখে গান গাব।"

মানবসমাজের সকলের চেয়ে বড়ো দুর্গতি গতিহীনতা। মানুষের চলা যখন বন্ধ হয় বা আটকে যায়, ছন্দের তখন যতিভঙ্গ

ঘটে। যখন চলা বন্ধ হয়, তখন মানবসম্বন্ধ অসত্য ও অসমান হয়ে যায়। মানবসম্বন্ধের অসাম্য দূর করতে হলে সম্মুখের দিকে এগিয়ে যেতে হবে, মানুষকে শ্রদ্ধা করতে হবে, সর্বপ্রকার জড়তাকে জয় করতে হবে। অশক্তের শক্তিকে জাগাতে না পারলে শক্তিমানের শক্তি অতিমাত্র প্রবল হয়ে ওঠে। তখন মানবসম্বন্ধের যতিপাত সমগ্র দেশকে অসাড় করে তোলে। ছন্দোহীনতার দিকে রবীন্দ্রনাথ আমাদের বারবার সচেতন করিয়ে বলেছেন—"নিরুপায় আজ অতি-মাত্র নিরুপায়—সমস্ত সুযোগ-সুবিধা আজ কেবল মানবসমাজের এক পাশে পুঞ্জীভূত, অন্যপাশে নিঃসহায়তা অন্তহীন।"

বাংলা ১৩৩০ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে "রথযাত্রা" নামে রবীন্দ্রনাথের একটি নাটিকা প্রকাশিত হয়। "রথের রশি" তারই পরিবর্তিত ও আগাগোড়া পুনর্লিখিত রূপ। এই নাটিকায় রবীন্দ্রনাথ তালমানযুক্ত সমাজের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। প্রলয়ের আগুন তখনই জ্বলে যখন সমাজের ওজনবোধ আহত হয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ যখন অসাম্যের দিকে ঝুঁকে পড়ে, যখন অসুন্দর ও কঠোরকে মানুষ বড়ো স্থান দেয়, যখন একদল লোক মাথা উঁচু করে নীচের দিকে তাকায় না, তখন সভ্যতার তাল কেটে যায়, সমাজে আগুন লাগে। "রথের রশি" নাটিকায় কবি তাই বুঝিয়ে বললেন—"রথ চলবে গায়ের জোরে নয়, ছন্দের জোরে। আমরা মানি ছন্দ, জানি এক ঝোঁকা হলেই তাল কাটে। এক-দিকটা বেশি উঁচু হলে, ঠাকুর এসে দাঁড়ান ছোটোর দিকে। কারণ, আসন-টাকে সমান করতে হবে। কিন্তু আবার যদি ছোটোর দল মাতলামি করতে থাকে, তখন নবযুগের উঁচুতে-নিচুতে নতুন বোঝাপড়া হবে। প্রত্যেক যুগে যা ছাই হবার তাই ছাই হয়, যা টিকে যায় তাই নিয়ে সৃষ্টি হয় নবযুগের।"

রবীন্দ্রনাথ প্রলয়ের আবর্তনকে ভয় করেন নি, কারণ, তিনি জানেন যে, মানবসম্বন্ধের ভিতর মিথ্যা জমে উঠলে, পথের চলা বন্ধ হলে, পীড়ন, পেষণ ও কঠোরকে বিশ্বাস করলে আগুন জ্বলে

উঠবে, এবং যা ছাই হবার তা ছাই হয়ে যাবে। তাই "রথের রশি"র কবি উঁচু গলায় বলেছেন—

"আজকের মতো বলো সবাই মিলে—
যারা এতদিন মরেছিল তারা উঠুক বেঁচে,
যারা যুগে যুগে ছিল খাটো হয়ে, তারা
দাঁড়াক মাথা তুলে।"

"রথের রশি" নাটিকায় যখন রব উঠল যে, রথ চলছে না, চাকার শব্দ নেই, তখন সন্ন্যাসী এসে বলল—"তোমরা কেবলি করেছ ঋণ, কিছুই করনি শোধ, দেউলে করে দিয়েছ যুগের বিত্ত। তাই নড়ে না আজ আর রথ। ঐ যে, পথের বুক জুড়ে পড়ে আছে তার অসার দড়িটা।" রথ যখন চলে, দড়ি দেয় তার মুক্তি। কিন্তু রথ-চলা যখন বন্ধ, তখন রথের দড়ি জড়াতে থাকে। মন্তরের সাহায্যে রথ-চলাকে সুগম করা যাবে না। সন্ন্যাসী তাই বললে—"কোথাও উঁচু, কোথাও নিচু, কোথাও গভীর গর্ত, করতে হবে সমান, তবে ঘুচবে বিপদ।"

দিনে দিনে গর্তগুলো যখন বাড়তে থাকে, তখন ভেঙে পড়বার সময় আসে। সেই গর্তকে ভরতে হলে, যারা অখ্যাত, যারা অসম্মানিত, তাদের ডেকে আনতে হবে রথ চালাবার জন্য। প্রলয়ের ব্যাখ্যা করে "রথের রশি" নাটিকায় মন্ত্রী বললে—"নিচের তলাটা হঠাৎ উপরের তলা হয়ে ওঠাকেই বলে প্রলয়। বরাবর যা প্রচ্ছন্ন তাই প্রকাশ হবার সময়টাই যুগান্তর। দল বেঁধে যারা আসছে তাদের বাধা দিয়ো না। বাধা পেলে শক্তি নিজেকে নিজে চিনতে পারে, চিনতে পারলেই আর ঠেকানো যায় না।"

শূদ্র-পাড়া থেকে দল বেঁধে এসে ওরা রথ টানতে এগিয়ে এল। রথ চলতে শুরু করল। মন্ত্রী বলে উঠল, "ওদের সঙ্গে মিলে ধরো সে রশি। বাঁচবার দিকে ফিরিয়ে আনো রথটাকে—দো-মনা করবার সময় নেই।" কবি বললে—"যারা টানছে রথ, তারা পা ফেলবে তালে তালে। পা যখন বেতাল হয়, রাজপথ হয়ে ওঠে

বন্ধুর। কিন্তু এই শূদ্রের দল যখন আবার মাতলামি শুরু করবে, আসবে উলটোরথের পালা। আবার নতুন বোঝাপড়া।" চলবার তাল যখন কেটে যায়, প্রলয়ের বেতাল-চলা শুরু হয়। তাই সবার সঙ্গে তাল রেখে চলতে হবে।

"রথের রশি" নাটিকায় রবীন্দ্রনাথ যে মোট কথা বলেছেন, তা হল এই—(ক) মানবসমাজের চলার পথে গর্ত যখন গভীর হয়, তখন সেতু বাঁধবার প্রয়োজন হয়; (খ) যারা অখ্যাত তারা যখন দল বেঁধে এগিয়ে আসে, তখন তাদের সঙ্গে বিখ্যাত দলের তাল রেখে চলতে হবে; (গ) তাল যখনই কেটে যাবে, প্রলয়ের আগুনে সব ছারখার হয়ে যাবে, এবং তারপরে নতুন যুগের সৃষ্টি চলবে।

প্রলয়ের দুটো দিক আছে—একটা আলোর দিক, আর একটা অন্ধকারের দিক। "রাশিয়ার চিঠি"তে রবীন্দ্রনাথ বলশেভিক বিদ্রোহের দীপ্তির দিক দেখে আশ্চর্য হয়েছিলেন। যারা অচল ছিল, তারা সচল হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ প্রাণশক্তিকে বড়ো স্থান দেন। যারা মনেপ্রাণে বন্ধন-জর্জর, চলার পথে অসাড়, তাদের প্রাণ-শক্তি নিঃশোষিত হয়েছে। মানুষ যখন বাইরের স্বাধীনতা হারায়, তাকে সে ফিরে পেতে পারে সহজে। কিন্তু চিত্তের স্বাধীনতা যখন নষ্ট হয়, তখন সে প্রকৃত দাস। তাই, যাদের দাস করে রাখতে হয়, তাদের অন্ধ ও অসাড় করে রাখবার ষড়যন্ত্র চলে। সোভিয়েট বিপ্লবীরা মানুষকে সচল করেছে, কারণ ধর্ম ও অত্যাচারী রাজার পাথর চাপা ছিল রাশিয়ার বুকের উপর, তা থেকে তারা নিষ্কৃতি পেয়েছে। যে-ধর্ম মানুষকে অন্ধ করে রাখে, "সে-ধর্ম বিষকন্যার মতো; আলিঙ্গন ক'রে সে মুগ্ধ করে, মুগ্ধ ক'রে সে মারে।" তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, "ধর্মমোহের চেয়ে নাস্তিকতা অনেক ভালো।"

সোভিয়েট বিপ্লবের দীপ্তির দিক হল যে, যারা পঙ্গু ছিল, তারা চলতে আরম্ভ করেছে; যারা পদাতিক ছিল, তারা রথী হয়ে উঠেছে; যাদের মাথা নিচু ছিল, তারা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। যারা

অশক্ত তাদের জন্য শিক্ষার আয়োজন হয়েছে। অশক্তের শক্তিকে না জাগাতে পারলে পরিত্রাণ নেই, এবং এই অশক্তকে জাগাতে হবে শিক্ষার দীপালোকে। রবীন্দ্রনাথ বারবার বলেছেন—"মানুষের সকল সমস্যা-সমাধানের মূল হচ্ছে তার সুশিক্ষা।" বুদ্ধির সাহস ও জনসাধারণের প্রতি দরদবোধ না থাকলে দুঃখীর দুঃখ ঘোচানো যায় না। এই বুদ্ধির সাহস তখনই আসে যখন ধর্মমূঢ়তা ও সমাজ-প্রথার অন্ধতা থেকে সাধারণের মনকে মুক্ত রাখার প্রবল চেষ্টা চলে সুশিক্ষার মারফতে। মনের জীবনীশক্তি যখন জাগ্রত থাকে, পরিত্রাণের রাস্তা তখন প্রশস্ত হয়। যারা যথার্থ দৌরাত্ম্য করতে চায়, তারা মানুষের মনকে মারে আগে, এই অভিযোগ রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রকার প্রাণহীন আচার ও বিধানের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত করেছেন।

রবীন্দ্র-চিন্তাধারার এক বিশেষ মূর্ছনা আছে। রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনীতি ও সমাজনীতি বুঝতে হলে রবীন্দ্র-দর্শনের মূলতত্ত্ব জানতে হবে। প্রথম, ব্যষ্টিকে দুর্বল করে সমষ্টিকে সবল করা যায় না ; ব্যষ্টি যদি শৃঙ্খলিত হয় তবে সমষ্টি স্বাধীন হতে পারে না। দ্বিতীয়, কঠোরতার সাহায্যে মনকে মুক্ত করা যায় না। অস্ত্রের বা শাস্ত্রের বা নায়কের জবরদস্তিদ্বারা দশের চালনা মঙ্গলপ্রসূ নয়। মনের জীবনীশক্তি, ব্যক্তির আত্মনিহিত শক্তি, সমাজের প্রতি দরদবোধ, সমস্ত কিছু চিরকাল জাগ্রত রাখতে হবে। তৃতীয়, পশুধর্মকে সক্রিয় ও সজাগ রেখে মানবধর্মকে সার্থক করা যায় না। মানুষকে যারা ফাঁকি দেয়, তারা দেবতাকে অসম্মান করে। পুঁথির মন্ত্রে বা মন্দিরের প্রাঙ্গণে দেবতার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে না। মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনদ্বারা দেবতাকে তুষ্ট রাখিতে হবে। চতুর্থ, যে চালক এবং যারা চালিত, তাদের মধ্যে ইচ্ছার যোগসাধন না হলেই বিপ্লবের কারণ ঘটে। জনগণ যখন সবলে চালিত হয় ইচ্ছার বিরুদ্ধে, তখন চিত্তের ও চরিত্রের বলহানি হয়। খাঁচাতে দানাপানি ভাল মিললেও পাখা আড়ষ্ট হয়ে যায়। এই আড়ষ্টতা ও জড়তা মনুষ্যত্বের চরম শত্রু। পঞ্চম, যে-মানুষকে মানুষ সম্মান করতে পারে না,

সে-মানুষকে মানুষ উপকার করতে অক্ষম। তাই প্রয়োজন আত্মার সাধনা—মনের ঈর্ষা, ক্ষুদ্রতা, সর্ববিধ কলুষ বর্জন করতে হবে। ষষ্ঠ, সমস্ত দেশের অন্তঃকরণ থেকে সমস্ত দেশের উদ্ধার জেগে ওঠে, তার কোন একটা অংশ থেকে নয়। যা-কিছুতে সমস্ত দেশের চিত্ত উদ্বোধিত হয় না, বরঞ্চ অভিভূত হয়, দেশমুক্তির কাজে তা অন্তরায়।

রবীন্দ্রনাথ সচেতন ছিলেন যে, রাশিয়ার ডিক্‌টেটরশিপ-এর মস্ত বিপদ আছে। তাই তিনি বলেছিলেন—"এর নঙর্থক দিকটা জবরদস্তির দিক, সেটা পাপ। কিন্তু সদর্থক দিকটা দেখেছি, সেটা হল শিক্ষা।" রাশিয়ার শিক্ষাবিধির গলদ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ সজাগ ছিলেন। তাঁর মতে, "সংক্ষেপে সে গলদ হচ্ছে, শিক্ষাবিধি দিয়ে এরা ছাঁচ বানিয়েছে. কিন্তু ছাঁচে-ঢালা মনুষ্যত্ব কখনো টেকে না—সজীব মনের তত্ত্বের সঙ্গে বিদ্যার তত্ত্ব যদি না মেলে তাহলে হয় একদিন ছাঁচ হবে ফেটে চুরমার, নয় মানুষের মন যাবে মরে আড়ষ্ট হয়ে, কিম্বা কলের পুতুল হয়ে দাঁড়াবে।"

এই ছাঁচে-ঢালা মনুষ্যত্বের প্রতি রবীন্দ্রনাথের কোনদিন শ্রদ্ধা ছিল না। তিনি আমাদের জানিয়েছেন যে, "যেখানে মানুষ তৈরী নেই, মত তৈরী হয়েছে, সেখানকার উচ্চন্ড দন্ডনায়কদের আমি বিশ্বাস করিনে।" তাই তিনি বলেছেন যে, চিত্তকে ঐক্যপ্রবণ করে তুলে পল্লীকে বাঁচাতে হবে, আত্মসম্মানকে জাগ্রত রেখে দুর্গতি দূর করতে হবে, এবং যে-নায়কতা মানুষের দেবতাকে শ্রদ্ধা করতে শেখায় না, তার বিপদ অনেক। অন্ধ ও জবরদস্ত নায়কতা "শাস্ত্রের মধ্যেই থাক, গুরুর মধ্যেই থাক, আর রাষ্ট্রতন্ত্রের মধ্যেই থাক, মনুষ্যত্বহানির পক্ষে এমন উপদ্রব কিছুই নেই।" রবীন্দ্রনাথ উদাত্তকণ্ঠে বলেছেন—"মানুষের দেবতাকে স্বীকার করে এবং প্রণাম করে যাব আমার জীবনদেবতা আমাকে সেই মন্ত্র দিয়েছেন। আমাকে সত্য হবার চেষ্টা করতে হবে, প্রিয় হবার নয়।"

মানুষের কাছে যখন আহ্বান এসেছে যে, চিন্তা করো না, কর্ম

করো, বিচারের অধিকার বিকিয়ে অনুশাসনের কাছে, প্রথার কাছে অধীনতা স্বীকার করো, সেই আহ্বান সত্যের আহ্বান নয়। "অচলায়তন" নাটকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, আচার-চালিত মানুষ কলের মানুষ। চিত্তের জড়ত্ব হল সর্বপ্রকার দাসত্বের কারণ—তার থেকে মুক্তি দেবার উপায় চোখে-ঠুলি দেওয়া বাধ্যতা নয়, কলের পুতুলের মত বাহ্যানুষ্ঠানও নয়। "অচলায়তন" নাটকে যে-সত্য ঘোষিত হয়েছে তা হল এই যে, "আচারই ধর্ম নহে, বাহ্যিকতায় অন্তরের ক্ষুধা মেটে না এবং নিরর্থক অনুষ্ঠান মুক্তির পথ নহে, তাহা বন্ধন।" ধর্মকে অভিভূত করে আচার যখন বড়ো হয়ে ওঠে, মানুষের চিত্তকে সে রুদ্ধ করে দেয়। এই রুদ্ধ চিত্তের বেদনাই "অচলায়তন" নাটকের বিষয়। মন্ত্রের যথার্থ উদ্দেশ্য মননে সাহায্য করা। কিন্তু মন্ত্র যখন চিত্তকে অসাড় করে, তখন মন্ত্র মানুষের দুর্গতি সৃষ্টি করে। বাহ্যানুষ্ঠান যখন প্রধান হয়ে ওঠে, তখন অন্তরের সজীবতা ও সরসতা নষ্ট হয়। তাই সংস্কারের জড়তা ও অন্ধতাকে রবীন্দ্রনাথ কঠিনভাবে আঘাত করেছেন "অচলায়তন" নাটকে।

"অচলায়তন" হল আচারের খাঁচা, চারিদিকের দরজা-জানালা বন্ধ। এই পাথরের প্রাচীর, এই বন্ধ দরজা, এই অহোরাত্র মন্ত্রপাঠের গুঞ্জনধ্বনি, এই স্তূপাকার পুঁথি, এই নানা রেখার গণ্ডি—এই সব-কিছু মানুষের চলাকে, চিত্তের প্রসারণকে আড়ষ্ট করে রেখেছে। পঞ্চক অচলায়তনে দুর্লক্ষণরূপে দেখা দিল—সে মন্ত্র-তন্ত্র, আচার-আচমন সূত্র-বৃত্তি কিছুই মানতে চায় না। সে নিয়ম ভাঙতে চায়,—কারণ, নিয়ম না ভাঙলে নতুন পরীক্ষা চলে না। মানুষের মন মন্ত্রের চেয়ে সত্য, অতিপ্রাচীন আচারের চেয়ে সত্য, একথা অচলায়তন গৃহে অচল। পঞ্চক গানকে পছন্দ করে, মন্ত্রকে নয়। পঞ্চক বলে —"খাঁচায় যে পাখিটার জন্ম, সে আকাশকেই সবচেয়ে ডরায়। সে লোহার শলাগুলোর মধ্যে দুঃখ পায়, তবু দরজাটা খুলে দিলে তার বুক দুরুদুরু করে, ভাবে, বন্ধ না থাকলে বাঁচব কী করে।

আপনাকে সে নির্ভয়ে ছেড়ে দিতে শেখেনি। এইটেই আমাদের চির-কালের অভ্যাস।''

যোদ্ধৃবেশে দাদাঠাকুর এলেন। তাঁর ইঙ্গিতে মেতে উঠল শোণপাংশুদল। তারা ম্লেচ্ছ—অচলায়তনের বাসিন্দা শোণপাংশুদের এড়িয়ে চলে। দাদাঠাকুর শোণপাংশুদের গুরু। মহাপঞ্চক অচলায়তনের আচার্য—তিনি দাদাঠাকুরকে যোদ্ধার বেশে দেখে চমকিত হলেন। অচলায়তনে যে বিদ্রোহ দেখা দিল, তাকে রবীন্দ্রনাথ যে-ভাবে পরিবেশন করেছেন, তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। বিদ্রোহের বর্ণ ও রূপ, গুরুর বর্ম ও ধর্ম, সবকিছু ''অচলায়তন'' নাটকে ব্যাখ্যাত হয়েছে। ''অচলায়তন'' নাটকে দেখি রবীন্দ্রনাথ তন্ত্রহীন মন্ত্রের উপাসক। তাই—

''মহাপঞ্চক—উপাধ্যায়, এই কি গুরু।

উপাধ্যায়—তাই তো শুনছি।

মহাপঞ্চক—তুমি কি আমাদের গুরু।

দাদাঠাকুর—হাঁ, তুমি আমাকে চিনবে না, কিন্তু আমিই তোমাদের গুরু।

মহাপঞ্চক—তুমি গুরু? তুমি আমাদের সমস্ত নিয়ম লঙ্ঘন করে এ কোন্ পথ দিয়ে এলে। তোমাকে কে মানবে।

দাদাঠাকুর—আমাকে মানবে না জানি, কিন্তু আমিই তোমাদের গুরু।

মহাপঞ্চক—তুমি গুরু? তবে এই শত্রুবেশে কেন।

দাদাঠাকুর—এই তো আমার গুরুর বেশ। তুমি যে আমার সঙ্গে লড়াই করবে—সেই লড়াই আমার গুরুর অভ্যর্থনা।

মহাপঞ্চক—কেন তুমি আমাদের প্রাচীর ভেঙে দিয়ে এলে।

দাদাঠাকুর—তুমি কোথাও তোমার গুরুর প্রবেশের পথ রাখনি।

মহাপঞ্চক—তুমি কি মনে করেছ তুমি অস্ত্র হাতে করে এসেছ বলে আমি তোমার কাছে হার মানব।

দাদাঠাকুর—না, কখনই না। কিন্তু দিনে দিনে হার মানতে হবে, পদে পদে।

মহাপঞ্চক—আমাকে নিরস্ত্র দেখে ভাবছ আমি তোমাকে আঘাত করতে পারিনে?

দাদাঠাকুর—আঘাত করতে পার, কিন্তু আহত করতে পার না। আমি যে তোমার গুরু।

মহাপঞ্চক—উপাধ্যায়, তোমরা এঁকে প্রণাম করবে নাকি।

উপাধ্যায়—দয়া করে উনি যদি আমাদের প্রণাম গ্রহণ করেন তাহলে প্রণাম করব বই কি—তা নইলে যে—

মহাপঞ্চক—না, আমি তোমাকে প্রণাম করব না।

দাদাঠাকুর—আমি তোমার প্রণাম গ্রহণ করব না—আমি তোমাকে প্রণত করব।

মহাপঞ্চক—তুমি আমাদের পূজা নিতে আসনি?

দাদাঠাকুর—আমি তোমাদের পূজা নিতে আসিনি, অপমান নিতে এসেছি।

মহাপঞ্চক—তোমার পশ্চাতে অস্ত্রধারী এ কারা।

দাদাঠাকুর—এরা আমার অনুবর্তী—এরা শোণপাংশু।

মহাপঞ্চক—এরাই তোমার অনুবর্তী?

দাদাঠাকুর—হাঁ।

মহাপঞ্চক—এই মন্ত্রহীন কর্মকাণ্ডহীন ম্লেচ্ছদল।"

সংঘাত ঘটল—অচলায়তনের বন্ধতা দূরীভূত হল। কিন্তু কারাগার ভাঙার পর আবার কাজ শুরু হবে—সবাইকে ডাক দিয়ে আনতে হবে। দাদাঠাকুর বললেন—"এবার আর লাল নয়, এবার শুভ্র। নূতন সৌধের সাদা ভিতকে আকাশের আলোর মধ্যে অভ্র-ভেদী করে দাঁড় করাও। মেলো তোমরা দুই দলে, লাগো তোমাদের কাজে।"

"অচলায়তন" নাটকে রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করেছেন যে, গুরু আসছেন। দ্বার রুদ্ধ, পথ দুর্গম, বেড়া বিস্তর, তবু তিনি আসছেন। জড়তার প্রাচীর ভেঙে সজীব-প্রাণের নবসৌধ সৃষ্টি করবেন। তাই সংঘাত—তাই নূতন পথে আবার মিলন। তাই

প্রলয়ের সমারোহ এবং নূতন গড়ে তোলবার আয়োজন। ভাঙনের পর গড়ন, এবং গড়নের মধ্যে আবার যতিভঙ্গ। তাই, নূতন বিবর্তন এবং নবযুগের সৃষ্টি। কিন্তু যুগসৃষ্টি সার্থক হয় না যদি সকলে মিলে নির্মাণকার্যে এগিয়ে না যায়। রবীন্দ্র-সাধনায় সমগ্রতাবোধ যেখানে আহত হয়েছে, মুক্তির সন্ধান সেখানে ব্যাহত।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন যে, ধর্মসাধনার একটা রসের দিক আছে। রস জিনিসটা সবল—তার মধ্যে চলনশীল প্রাণের লীলা। এই রস যখন শুকিয়ে যায়, অনম্রতায়, কাঠিন্যে প্রাণ আড়ষ্ট হয়ে ওঠে এবং মাধুর্যের বিকাশ বাধা পায়। কঠোরতা মানুষকে স্বতন্ত্র রাখে, রসের ঐশ্বর্য মিলনের সন্ধান দেয়। তাই রবীন্দ্রনাথ "রসের ধর্ম" প্রবন্ধে বলেছেন—

"মানুষের মধ্যে যখন রসের আবির্ভাব না থাকে, তখনি সে জড়পিণ্ড। তখন ক্ষুধা-তৃষ্ণা, ভয়-ভাবনাই তাকে ঠেলে ঠেলে কাজ করায়, সে-কাজে পদে পদেই তার ক্লান্তি। সেই নীরস অবস্থাতেই মানুষ অন্তরের নিশ্চলতা থেকে বাহিরেও কেবলি নিশ্চলতা বিস্তার করতে থাকে। তখন তার যত খুঁটিনাটি, যত আচার-বিচার, যত শাস্ত্রশাসন। তখনি তার ওঠাবসা, খাওয়াপরা সকল দিকেই বাঁধাবাধি। তখন সে সেই সকল নিরর্থক কর্মকে স্বীকার করে যা তাকে সম্মুখের দিকে অগ্রসর করে না, যা তাকে অন্তহীন পুনরাবৃত্তির মধ্যে কেবলি একই জায়গায় ঘুরিয়ে মারে। রসের আবির্ভাবে মানুষের জড়ত্ব ঘুচে যায়। সুতরাং তখন সচলতা তার পক্ষে অস্বাভাবিক নয়; তখন অগ্রগামী গতিশক্তির আনন্দেই সে কর্ম করে; সর্বজয়ী প্রাণশক্তির আনন্দেই সে দুঃখকে অস্বীকার করে।"

রবীন্দ্র-সাহিত্যে গণ-আন্দোলনের নেতা ধনঞ্জয় বৈরাগী রাবীন্দ্রিক আদর্শে গঠিত। ধনঞ্জয় বৈরাগীর প্রথম সাক্ষাৎ পাই "প্রায়শ্চিত্ত" নাটকে। ১৩১৬ সালে "প্রায়শ্চিত্ত" নাটক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। "প্রায়শ্চিত্ত" পরে পুনর্লিখিত হয়ে "পরিত্রাণ" নামে ১৩৩৬ সালে প্রকাশিত হয়। আবার দেখা হয় ধনঞ্জয় বৈরাগীর

সঙ্গে "মুক্তধারা" নাটকে। ১৩২৯ সালে "মুক্তধারা" নাটক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

"প্রায়শ্চিত্ত" নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগী মাধবপুরের প্রজাদের জানান দিল রাজাকে খাজনা না দেবার জন্য। খাজনা বন্ধ করার কৈফিয়ৎ হিসাবে ধনঞ্জয় বৈরাগী প্রজাদের অভয় দিয়ে বললে—

"ঘরের ছেলেমেয়েকে কাঁদিয়ে যদি রাজাকে টাকা দিই তাহলে আমাদের ঠাকুর কষ্ট পাবে। যে-অন্নে প্রাণ বাঁচে সেই অন্নে ঠাকুরের ভোগ হয় ; তিনি যে প্রাণের ঠাকুর। তার বেশি যখন ঘরে থাকে তখন রাজাকে দিই—কিন্তু ঠাকুরকে ফাঁকি দিয়ে রাজাকে খাজনা দিতে পারব না।"

প্রজারা যখন প্রশ্ন করল যে, রাজা এবংবিধ ওজর-আপত্তি শুনবেন না, ধনঞ্জয় অবিচলিতচিত্তে বলল—

"তবু শোনাতে হবে। রাজা হয়েছে বলেই কি সে এমন হত-ভাগা যে ভগবান তাকে সত্য কথা শুনতে দেবেন না। ওরে, জোর করে শুনিয়ে আসব।"

প্রজারা উত্তর দিল যে, রাজার জোর বেশি, তাঁরই জিত হবে। ধনঞ্জয় আশ্বাস দিয়ে বললে—

"দূর বাঁদর, এই বুঝি তোদের বুদ্ধি। যে হারে, তার বুঝি জোর নেই। তার জোর যে একেবারে বৈকুণ্ঠ পর্যন্ত পেঁছায়, তা জানিস।"

তারপরে বিশ্বাসের সঙ্গে ধনঞ্জয় বলল—"যতদূর পর্যন্ত হবার তা হ'তে দে, নইলে কিছুই শেষ হতে চায় না। যখন চুড়ান্ত হয় তখনই শান্তি হয়।"

ধনঞ্জয় বৈরাগী প্রজাদের তিরস্কার করে বললে—

"বেটারা কেবল তোরা বাঁচতে চাস—পণ করে বসেছিস যে মরবি নে। কেন, মরতে দোষ কী হয়েছে। যিনি মারেন তাঁর গুণগান করবিনে বুঝি।" ধনঞ্জয় বৈরাগী বিশ্বাস করে, যে, "আমাকে যে কাঁদাবে তার ভাগ্যে আছে কাঁদন।" সে কাউকে ভয় করে না,

মরণকেও ভয় করে না। তাই সে প্রজাদের নির্ভয়ে এগিয়ে যেতে বলল। অত্যাচার যখন প্রচণ্ড হয়, সংঘাত তখনই ঘটে, এবং শান্তির পথ সংঘাতের পর মেলে। নিজের অন্ন যখন জোটে না, তখন খাজনা দেওয়া অন্যায়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা থাকে তা দিয়ে রাজার খাজনা দিতে হবে। তার মানে হল, রাজার কর্তব্য প্রজাদের প্রয়োজনের দাবি মেটাবার সুযোগ বিস্তৃত করে দেওয়া। যেখানে সাচ্ছল্য, সেখানে স্বাচ্ছন্দ্য, এবং সেখানে রাজা-প্রজার সম্বন্ধ সুসঙ্গত। রাজা যদি প্রজাকে ফাঁকি দেয়, রাজা তাঁর প্রাপ্য দাবি করতে পারবে না। খাজনা বন্ধ করার এই যুক্তি ও আদর্শ, তা নিতান্তই রাবীন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। ''প্রায়শ্চিত্ত'' নাটকে খাজনা-বন্ধ আন্দোলনের তত্ত্ব নিয়ে ধনঞ্জয় বৈরাগী যে-সব বিতর্ক উপস্থাপিত করেছে, তা শুধু রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখলে সম্যকভাবে বুঝা যাবে না। ধনঞ্জয় বৈরাগী প্রজাদের অকুণ্ঠভাবে জানাল—

''তোরা যে মার সইতে পারিস নে, সেই জন্য তোদের মারগুলো সব নিজের পিঠে নেবার জন্য স্বয়ং রাজার কাছে চলেছি। পেয়াদা নয় রে পেয়াদা নয়—যেখানে স্বয়ং মারের বাবা বসে আছে সেইখানে ছুটেছি।''

প্রজারা শঙ্কিত হল, তারা বলল—হাতিয়ার সঙ্গে নিতে হবে। তারা জানত যে, ধনঞ্জয় বৈরাগীর উপর রাজা অসন্তুষ্ট। রাজা জানেন যে, ধনঞ্জয় প্রজাদের পরামর্শ দিয়ে খাজনা বন্ধ করিয়েছে। ধনঞ্জয় জিজ্ঞাসা করল—''হাতিয়ার নিয়ে কি করবি?''

প্রজারা উত্তর দিল—''যদি তোমার গায়ে হাত দেয় তাহলে—''

ধনঞ্জয় বৈরাগী তিরস্কার করে বললে—''তাহলে তোরা দেখিয়ে দিবি হাত দিয়ে না মেরে কী করে হাতিয়ার দিয়ে মারতে হয়। কী আমার উপকারটা করতে যাচ্ছ। তোদের যদি এই রকম বুদ্ধি হয়, তবে এইখানেই থাক।'' ধনঞ্জয় প্রজাদের সাহস দিয়ে বললে—''সব রাজত্বটাই কি রাজার?

অর্ধেক রাজত্ব প্রজার নয়তো কী? চাইতে দোষ নেই রে। চেয়ে দেখিস।"

প্রজা বললে—"যখন তাড়া দেবে?"

ধনঞ্জয়—"তখন আবার চাইব। তুই কি ভাবিস রাজা একলা শোনে? আরও একজন শোনবার লোক রাজদরবারে বসে থাকেন, শুনতে শুনতে তিনি একদিন মঞ্জুর করেন, তখন রাজার তাড়াতে কিছুই ক্ষতি হয় না।"

রবীন্দ্রনাথ খাজনা বন্ধ করবার এই অহিংস আন্দোলনের কথা লিখেছিলেন ইংরেজী ১৯০৯ সালে। ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে গান্ধীজির অধিনায়কত্বে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়েছিল ১৯২১ সালে। ঐতিহাসিকভাবে দেখতে গেলে, গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের আভাস "প্রায়শ্চিত্ত" নাটকে পাওয়া যায়। ধনঞ্জয় বৈরাগীর যুক্তি ও দৃষ্টি যে রাজ-ধর্ম প্রচার করেছে, তার সমর্থন মেলে গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনে। "প্রায়শ্চিত্ত" নাটকে রাজা প্রতাপাদিত্য ধনঞ্জয় বৈরাগীকে "ধর্মের ভেক" বলে বিদ্রূপ করেছেন, তাকে শাস্তি দিতে উদ্যত হয়েছেন, কিন্তু পারেন নি। রাজা প্রতাপাদিত্য ধনঞ্জয় বৈরাগীকে জিজ্ঞাসা করলেন—"মাধবপুরের প্রজাদের দু-বছরের খাজনা বাকি—দেবে কিনা বলো।"

ধনঞ্জয়—"না মহারাজ, দেব না।"

প্রতাপাদিত্য—"দেবে না। এতবড়ো আস্পর্ধা।"

ধনঞ্জয়—"যা তোমার নয় তা তোমাকে দিতে পারব না।"

প্রতাপাদিত্য—"আমার নয়!"

ধনঞ্জয়—"আমাদের ক্ষুধার অন্ন তোমার নয়। যিনি আমাদের প্রাণ দিয়েছেন এ-অন্ন যে তাঁর, এ আমি তোমাকে দিই কী বলে।"

প্রতাপাদিত্য—"তুমিই প্রজাদের বারণ করেছ খাজনা দিতে!"

ধনঞ্জয়—"হাঁ মহারাজ, আমিই তো বারণ করেছি। ওরা মূর্খ,

ওরা তো বোঝে না—পেয়াদার ভয়ে সমস্তই দিয়ে ফেলতে চায়। আমি বলি, আরে আরে এমন কাজ করতে নেই—প্রাণ দিবি তাঁকে প্রাণ দিয়েছেন্ যিনি—তোদের রাজাকে প্রাণহত্যার অপরাধী করিস নে।''

প্রতাপাদিত্য—''দেখো ধনঞ্জয়, তোমার কপালে দুঃখ আছে।''

ধনঞ্জয়—''যে-দুঃখ কপালে ছিল তাকে আমার বুকের উপর বসিয়েছি মহারাজ—সেই দুঃখই তো আমাকে ভুলে থাকতে দেয় না। যেখানে ব্যথা সেইখানেই হাত পড়ে—ব্যথা আমার বেঁচে থাক।''

ধনঞ্জয় বৈরাগী পথিক, সে রাস্তার ছেলে। রাস্তার ধুলোয় ধুলোময় হয়ে বেড়ায়। তাই সে বলে—''ওই রাস্তাই আমাদের মজিয়েছে।'' রবীন্দ্রনাথের মতে, প্রকৃত নেতা পথনির্মাতা, তিনি পথ-চলার আনন্দে বিভোর, পথের ধুলোয় লাল হয়ে ওঠেন। তিনি পথিক, গৃহী নন। তাই ঘরের প্রাচীর না ভাঙলে প্রকৃত গুরুর সংগে দেখা হয় না। ''অচলায়তন'' নাটকে সেই কথাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন।

''মুক্তধারা'' নাটকে আমরা ধনঞ্জয় বৈরাগীকে দেখি—সে হচ্ছে ''যন্ত্রের হাতে মারখানেওয়ালার ভিতরকার মানুষ।'' রবীন্দ্রনাথ ''মুক্তধারা'' নাটকের মর্মকথা ব্যাখ্যা করে নিজেই বলেছেন—

"পৃথিবীতে যন্ত্রী বলছে, মার লাগিয়ে জয়ী হব। পৃথিবীতে মন্ত্রী বলছে, হে মন, মারকে ছাড়িয়ে উঠে জয়ী হও। আর নিজের যন্ত্রে নিজে বন্দী মানুষটি বলছে, প্রাণের দ্বারা যন্ত্রের হাত থেকে মুক্তি পেতে হবে মুক্তি দিতে হবে। যন্ত্রী হচ্ছে বিভূতি, মন্ত্রী হচ্ছে ধনঞ্জয়, আর মানুষ হচ্ছে অভিজিৎ।"

ধনঞ্জয় বৈরাগীর অহিংসনীতি দুর্বলের আশ্রয় নয়। শিবতরাইয়ের প্রজারা অভিযোগ জানালো যে, রাজশ্যালক চণ্ডপালের মার অসহ্য। তারা চায় গায়ের জোরে চণ্ডপালকে অপমান করতে। ধনঞ্জয় তাদের বলল যে, মারকে জয় করতে হবে। ''ঢেউকে বাড়ি

মারলে ঢেউ থামে না, হালটাকে স্থির করে রাখলে ঢেউ জয় করা যায়।" তাই ধনঞ্জয় প্রজাদের অভয় দিয়ে বললে—"মাথা তুলে যেমনি বলতে পারবি লাগছে না, অমনি মারের শিকড় যাবে কাটা।"

মানুষের ভিতর যে-জন্তু আছে, "সে মার খেয়ে কেঁই কেঁই করে মরে।" ধনঞ্জয় যে-সত্যে বিশ্বাসী, তা হল এই—"তোরা যে মনে মনে মারতে চাস তাই ভয় করিস, আমি মারতে চাইনে তাই ভয় করিনে, যার হিংসা আছে ভয় তাকে কামড়ে লেগে থাকে।"

ধনঞ্জয় রাজা রণজিৎকে বলতে দ্বিধা করল না—"লোভ করে যা রাখতে চাইবে সে হল চোরাই মাল, সে টিকবে না। রাজা, ভুল করছ এই যে, ভাবছ জগৎটাকে কেড়ে নিলেই জগৎ তোমার হল। ছেড়ে রাখলেই যাকে পাও, মুঠোর মধ্যে চাপতে গেলেই দেখবে সে ফসকে গেছে।"

"মুক্তধারা" ১৩২৯ সালে প্রকাশিত হয়। রাজনীতিক্ষেত্রে তখন গান্ধীজির নেতৃত্ব অবিসংবাদিতভাবে গৃহীত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজির নেতৃত্ব নানাভাবে বরণ করেছিলেন। গান্ধীজির নীতি ও রীতি রবীন্দ্র-ভাবনার সঙ্গে সংযুক্ত। অথচ রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীকে বলতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি যে, অন্ধভাবে নেতাকে অনুসরণ করলে দেশবাসীর বুদ্ধি, দীপ্তি ও শ্রী বিনষ্ট হবে। ধনঞ্জয় বৈরাগী "মুক্তধারা" নাটকে প্রজাদের বললে—

"আমার জোরেই কি তোদের জোর? একথা যদি বলিস তাহলে যে আমাকে সুদ্ধ দুর্বল করবি।"

"আমাকে পেয়ে আপনাকে হারাবি? এত বড়ো লোকসান মেটাতে পারি এমন সাধ্য কি আমার আছে?"

"ভালোবেসে তোদের চেপে মারার চেয়ে ভালোবেসে তোদের ছেড়ে থাকাই ভালো।"

ধনঞ্জয় বৈরাগী রাজা রণজিৎকে বললে—"তোমার চণ্ডপালের দণ্ড লাগিয়েও যা করতে পারনি আমি দেখছি তাই করে বসে আছি।

এতদিন ঠাউরে ছিলুম আমি ওদের বলবুদ্ধি বাড়াচ্ছি; আজ মুখের উপর বলে গেল আমিই ওদের বলবুদ্ধি হরণ করেছি।''

''রণজিৎ—এমনটা হয় কী করে?

ধনঞ্জয়—ওদের যতই মাতিয়ে তুলেছি ততই পাকিয়ে তোলা হয়নি আর কি। দেনা যাদের অনেক বাকি, শুধু কেবল দৌড় লাগিয়ে দিয়ে তাদের দেনা শোধ হয় না তো। ওরা ভাবে আমি বিধাতার চেয়ে বড়ো, তার কাছে ওরা যা ধারে আমি যেন তা নামঞ্জুর করে দিতে পারি। তাই চক্ষু বুজে আমাকেই আঁকড়ে থাকে।

রণজিৎ—ওরা যে তোমাকেই দেবতা বলে জেনেছে।

ধনঞ্জয়—তাই আমাতেই এসে ঠেকে গেল, আসল দেবতা পর্যন্ত পৌঁছোল না। ভিতরে থেকে যিনি ওদের চালাতে পারতেন বাইরে থেকে তাঁকে রেখেছি ঠেকিয়ে।

রণজিৎ—রাজার খাজনা যখন ওরা দিতে আসে তখন বাধা দাও, আর দেবতার পুজো যখন তোমার পায়ের কাছে এসে পড়ে তখন তোমার বাজে না?

ধনঞ্জয়—ওরে বাপ রে। বাজে না তো কী। দৌড় মেরে পালাতে পারলে বাঁচি। আমাকে পুজো দিয়ে ওরা অন্তরে অন্তরে দেউলে হতে চলল, সে দেনার দায় যে আমারও ঘাড়ে পড়বে, দেবতা ছাড়বেন না।

রণজিৎ—এখন তোমার কর্তব্য?

ধনঞ্জয়—তফাতে থাকা, আমি যদি পাকা করে ওদের মনের বাঁধ বেঁধে থাকি, তা হ'লে তোমার বিভূতিকে আর আমাকে ভৈরব যেন একসঙ্গেই তাড়া লাগান।

রণজিৎ—তবে আর দেরি কেন? সরো না।

ধনঞ্জয়—আমি সরে দাঁড়ালেই ওরা একেবারে তোমার চণ্ডপালের ঘাড়ের উপর গিয়ে চড়াও হবে। তখন যে-দণ্ড আমার

পাওনা সেটা পড়বে ওদেরই মাথার খুলির উপরে। এই ভাবনায় সরতে পারিনে।''

রবীন্দ্রনাথের আদর্শ নেতা হল ধনঞ্জয় বৈরাগী। মুক্তধারার বাঁধ-ভাঙার উৎসবে ধনঞ্জয় সবাইকে ডাক দিলে। যুবরাজ প্রাণ দিয়ে মুক্তধারার বাঁধ ভাঙলেন—সেই মুক্তিতে তিনি মুক্তি পেলেন। ধনঞ্জয়ের মতে, যুবরাজ চিরকাল জয়ী হয়ে রইল। অর্থাৎ প্রাণ-দিয়ে মুক্তির সাধনা করতে হবে—এই বাণী হল ধনঞ্জয় বৈরাগীর বাণী।

রবীন্দ্রনাথ একান্তভাবে বিশ্বাস করতেন যে, মুক্তির সাধনাকে সফল করতে হলে চিত্তবিকাশের সমস্ত বাধাকে দূর করতে হবে। বুদ্ধি দিয়ে, জ্ঞান দিয়ে, প্রাণ দিয়ে সেই মুক্তির পথে এগিয়ে যেতে হবে—সর্বপ্রকার মোহ, অন্ধতা ত্যাগ করতে হবে। তাই রবীন্দ্রনাথ বাংলা ১৩২৮ সালে দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলেছিলেন—

"আজ এই বিশ্বচিত্ত-উদ্বোধনের প্রভাতে আমাদের দেশে জাতীয় কোনো প্রচেষ্টার মধ্যে যদি বিশ্বের সর্বজনীন কোনো বাণী না থাকে তা হোলে তাতে আমাদের দীনতা প্রকাশ করবে। আমি বলছিনে, আমাদের আশু প্রয়োজনের যা-কিছু কাজ আছে তা আমরা ছেড়ে দেব। সকাল বেলায় পাখী যখন জাগে তখন কেবলমাত্র আহার অন্বেষণে তাহার সমস্ত জাগরণ নিযুক্ত থাকে না, আকাশের আহ্বানে তার দুই অক্লান্ত পাখা সায় দেয় এবং আলোকের আনন্দে তার কণ্ঠে গান জেগে ওঠে। আজ সর্বমানবের চিত্ত আমাদের চিত্তে তার ডাক পাঠিয়েছে ; আমাদের চিত্ত ভাষায় তার সাড়া দিক—কেননা ডাকের যোগ্য সাড়া দেওয়ার ক্ষমতাই হচ্ছে প্রাণশক্তির লক্ষণ। একদা পর-মুখাপেক্ষী পলিটিক্সে সংযুক্ত ছিলুম তখন আমরা কেবলি পরের অপরাধের তালিকা আউড়ে পরকে তার কর্তব্যত্রুটি স্মরণ করিয়েছি—আজ যখন আমরা পর-পরায়ণতা থেকে আমাদের পলিটিক্সকে ছিন্ন করতে চাই, আজও সেই পরের অপরাধ জপের দ্বারাই আমাদের বর্জন-নীতির পোষণ-পালন করতে যাচ্ছি।"

বঙ্গবিভাগের উত্তেজনার দিনে একদল যুবক রাষ্ট্রবিপ্লবের দ্বারা দেশে যুগান্তর আনবার উদ্যোগ করেছিলেন। তাঁদের ত্যাগ প্রশংসনীয় ও বরণীয়, কিন্তু সেই ত্যাগ সফল হতে পারেনি, কারণ তার সঙ্গে দেশের জনসাধারণের জাগ্রত চিত্ত জড়িত ছিল না। "চার অধ্যায়" উপন্যাসে সেই উত্তেজনাপূর্ণ রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রচেষ্টাকে রবীন্দ্রনাথ সার্থক বলে গ্রহণ করতে পারেন নি। "চার অধ্যায়" উপন্যাসের অতীন এলার কাছে বলল—

> "আমি আজ স্বীকার করব তোমার কাছে, তোমরা যাকে পেট্রিয়ট বলো আমি সেই পেট্রিয়ট নই। পেট্রিয়টিজ্‌মের চেয়ে যা বড়ো তাকে যারা সর্বোচ্চ না মানে তাদের পেট্রিয়টিজ্‌ম কুমিরের পিঠে চড়ে পার হবার খেয়া নৌকা। মিথ্যাচরণ, নীচতা, পরস্পরকে অবিশ্বাস, ক্ষমতালাভের চক্রান্ত, গুপ্তচরবৃত্তি একদিন তাদের টেনে নিয়ে যাবে পাঁকের তলায়। এ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। এই গর্তের ভিতরকার কুশ্রী জগৎটার মধ্যে দিনরাত মিথ্যের বিষাক্ত হাওয়ায় কখনোই নিজের স্বভাবে সেই পৌরুষকে রক্ষা করতে পারব না যাতে পৃথিবীতে কোনো বড়ো কাজ করতে পারা যায়।"

এলা—"আচ্ছা অন্তু, তুমি যাকে আত্মঘাত বল সে কি কেবল আমাদেরই দেশে?"

অতীন—"তা বলিনে, দেশের আত্মাকে মেরে দেশের প্রাণ-বাঁচিয়ে তোলা যায় এই ভয়ংকর মিথ্যে কথা পৃথিবীসুদ্ধ ন্যাশনালিষ্ট আজকাল পাশবগর্জনে ঘোষণা করতে বসেছে, তার প্রতিবাদ আমার বুকের মধ্যে অসহ্য আবেগে গুমরে গুমরে উঠছে—এই কথা সত্যভাষায় হয়তো বলতে পারতুম, সুড়ঙ্গের মধ্যে লুকোচুরি করে দেশ-উদ্ধার চেষ্টার চেয়ে সেটা হ'ত চিরকালের বড়ো কথা। কিন্তু এ-জন্মের মত

বলবার সময় হল না। আমার বেদনা তাই আজ এত নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে।"

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন যে, সমস্ত দেশের হয়ে কয়েকজন যুবক আত্মোৎসর্গদ্বারা যুগান্তর আনতে পারবে না। সমস্ত দেশকে না জাগাতে পারলে প্রকৃত বিপ্লব ঘটানো যায় না। যাঁরা প্রলয়-হুতাশনে নিজেদের আহুতি দিলেন, তাঁরা নমস্য। কিন্তু তাঁদের আহুতি যদি দেশের অন্তরকে না জাগাতে পারে, তাহলে নবযুগ রচিত হবে না। বঙ্গবিভাগজনিত উত্তেজনাপূর্ণ রাষ্ট্রবিপ্লব যতখানি দেশবাসীর চিত্তকে জাগ্রত করেছে, ততখানি সার্থকতাই ইতিহাসের পাতায় স্বীকৃত থাকবে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মানতে পারেন নি যে, অন্যায়ে অন্যায়কারীর সমান হলে তাতে জয় লাভ করা যায়। এ কথা ঠিক যে, আমরা ভয়ে হার মানব না, পীড়নে হার মানব না, কিন্তু আমাদের হতে হবে মানবধর্মে বড়ো। তাই রবীন্দ্রনাথের অতীন "চার অধ্যায়" উপন্যাসে বলল—"মনুষ্যত্বের অপমান করেও কিছুদিনের মতো জয়ডঙ্কা বাজিয়ে চলতে পারে তারা যাদের আছে বাহুবল, কিন্তু আমরা পারব না। আগাগোড়া কলঙ্কে কালো হয়ে পরাভবের শেষসীমায় অখ্যাতির অন্ধকারে মিশিয়ে যাব আমরা।"

জনতাকে বাদ দিয়ে দেশের মুক্তির পথ মিলবে না। রবীন্দ্র-ভাবনার মর্মকথা হল যে, দেশের সমগ্রমূর্তি ধ্যান করতে হবে, মানুষকে শ্রদ্ধা করতে হবে, সবার সঙ্গে হাত মিলিয়ে দেশের কাজ করতে হবে। মানুষের সঙ্গে সহযোগিতায় প্রকৃত মঙ্গলসাধন করা যায়। রবীন্দ্র-সাহিত্য সাধারণ মানুষের প্রতি শ্রদ্ধায় সমুজ্জ্বল। মানুষ বাস্তবিকপক্ষে পথিক। "পথের সৌন্দর্য ঘাসেও নহে ফুলেও নহে, তাহা বাধাহীন বিচ্ছেদহীন বিস্তারে ; তাহার ভ্রমরগুঞ্জনে নহে, কিন্তু পথিকদলের অক্লান্ত পদধ্বনিতেই রমণীয়।" রবীন্দ্র-সাহিত্য মানুষকে পথে চলতে বলেছে। সেই পথচলাতেই দেশের নবযৌবন ও তারুণ্যের জয় ঘোষিত হবে।

গণ-আন্দোলন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে-কথাটা প্রধান বলে মেনে

নিয়েছিলেন সে-কথাটা হল এই যে, লোক-সাধারণকে লোক বলে গণ্য করতে হবে। লোক-সাধারণের দুঃখ সমাজের দুঃখ, এ কথাটা আমাদের জানতে হবে এবং মানতে হবে। অনুগ্রহ করে নয়, নিজের দেশকল্যাণের গরজে লোক-সাধারণের সমস্যার মীমাংসা করতে হবে। অখ্যাতশ্রেণীর সঙ্গে বিখ্যাতশ্রেণীর যোগসূত্র স্থাপন করতে বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ শ্রেণীহীন সমাজের পরিকল্পনা বা কোন বিশেষ শ্রেণীর জবরদস্ত শাসনের প্রস্তাবনা করেন নি—শ্রেণীগত বৈষম্যকে দূর করতে বলেছেন। শ্রেণীবিরোধের সংকট থেকে সমাজকে বাঁচাতে হলে নিম্নশ্রেণীদের শক্তিশালী করতে হবে এবং উচ্চশ্রেণীদের প্রণত করতে হবে। পরস্পরের পার্থক্য যখন বিকট-ভাবে প্রকট হয়, তখন শ্রেণীসংঘাতের রণারণি শুরু হয়। প্রলয়ের আগুন নিবাতে হলে সামঞ্জস্যের আস্তরণ বিছিয়ে দিতে হবে। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> "দূরের সঙ্গে নিকটের, অনুপস্থিতের সঙ্গে উপস্থিতের সম্বন্ধ পথটা সমস্ত দেশের মধ্যে অবাধে বিস্তীর্ণ হইলে তবেই তো দেশের অনুভব শক্তিটা ব্যাপ্ত হইয়া উঠিবে। মনের চলাচল যতখানি, মানুষ ততখানি বড়ো। মানুষকে শক্তি দিতে হইলে মানুষকে বিস্তৃত করা চাই।... আমাদের সমাজ লোক-সাধারণকে যে শক্তিহীন করিয়া রাখিয়াছে এই-খানেই সে নিজের শক্তিকে অপহরণ করিতেছে। পরের অস্ত্র কাড়িয়া লইলে নিজের অস্ত্র নির্ভয়ে উচ্ছৃংখল হইয়া উঠে—এইখানেই মানুষের পতন।"

রবীন্দ্রনাথ যখন বলেছেন যে, মানুষের মধ্যে ভূমাকে আমাদের প্রত্যক্ষ করতে হবে, তার মানে হল যে, আমাদের "নিত্যসম্মুখগামী মহৎ মনুষ্যত্বের" সঙ্গে যোগসাধন করতে হবে। সামঞ্জস্যের পথ অবলম্বন করে এই যোগসাধনকে সার্থক করা যায়। যে দুর্বল ও অবমানিত, সে সামঞ্জস্যকে নষ্ট করে। সেই দুর্বল মানুষকে শ্রদ্ধার সঙ্গে সবল করতে হবে। দেশ তখনই বড়ো হয় যখন আমরা প্রত্যেক মানুষের মূল্য দিতে শিখি। যেখানে দেখি

প্রত্যেক বিভাগের এবং প্রত্যেক ব্যক্তির অকিঞ্চনতা দূরীভূত হচ্ছে, সেখানে মানুষ বড়ো হবার পথ খুঁজে পায়। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, স্বরাজ-সৃষ্টি কোন দেশেই শেষ হয় না। ক্লান্তিহীন শ্রান্তিহীন, বিরামহীনভাবে আমাদের সামঞ্জস্যের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। মোহের প্ররোচনায় নতুন বন্ধন দেখা দেয়, শুভবুদ্ধি জাগ্রত করে নতুন ঐক্য সৃষ্টি করতে হয়। তাই, গণ-আন্দোলনের পর নবযুগের সৃষ্টি চলবে, আবার নূতন সমস্যা সমাধানের পথ সন্ধান করবে। এই অন্তহীন অগ্রসরণকে জাগ্রত মানুষ চিরকাল প্রণামের সঙ্গে গ্রহণ করেছে। দেশের তপস্যাকে জয়যুক্ত ও সার্থক করতে হলে জনসাধারণের সঙ্গে মিলিত হবার পথ বিস্তৃত করতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ ও ভারতধর্ম

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রভাবে বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে নব-অভ্যুদয়ের সূচনা হয়েছিল। শতাব্দীকাল ধরে আমাদের ইতিহাসে মনীষীর মিছিল চলেছিল; তাঁদের নাম শুধু বাংলাদেশেই নয়, সমগ্র ভারতের জপমালা ছিল। কারণ দেশের একটি অবসাদময় পরাজয়ের মুহূর্তে তাঁরা আমাদের আত্মপ্রত্যয় ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। পাশ্চাত্য ভাবধারাকে সুষ্ঠু ও সার্থকভাবে গ্রহণের শক্তি ও প্রেরণা তাঁরা দিয়েছিলেন, নিঃসন্দেহে এই কীর্তির জন্য তাঁরা আমাদের স্মরণীয় এবং বরণীয়, কিন্তু তার চেয়েও বড়-কথা নূতন ভাবধারার কাছে বিনাসর্তে আত্মসমর্পণের লজ্জা হতে তাঁরা আমাদের বাঁচিয়েছিলেন; তার জন্য তাঁরা আমাদের প্রণম্য। কারণ জীবনের নবনব পুষ্প পল্লবের বিকাশের জন্য নূতন রস আহরণ করতে হলে পুরাতন মূল-কাণ্ড-শাখা-প্রশাখাকে বজায় রেখেই তা সম্ভব।

অধুনাকালের ভারতবর্ষে আমাদের নিজস্ব জীবনধারণার সম্বন্ধে শ্রদ্ধাপ্রকাশের কোন বাধা নেই; তথাপি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন লোক প্রচুর আছেন, ভারতবর্ষের গৌরবময় ঐতিহ্যকে জীবনের মধ্যে স্বীকার ক'রে নিতে যাঁরা লজ্জা পান; পরধর্ম নেশায় যাঁদের আত্মবিস্মৃতি পরিপূর্ণ হয়েছে। ইংরেজ আমলের প্রথম দিকে স্বভাবতঃই এই মত্ততার প্রকোপ দেশের দিকে দিকে প্রকট হয়ে উঠেছিল। সে কালে নবীন ভাবধারার মত্ত জোয়ারের ঊর্ধ্বে মাথা তুলে যাঁরা নবীন ও পুরাতনের সমন্বয় ক'রে ভবিষ্যৎ ইতিহাসের দিক্ নির্ণয় করেছিলেন, তাঁদের কাজ ছিল দুরূহ। পুরাতনের গোঁড়ামি এবং কালধর্মের ফেনায়িত উচ্ছ্বাস, এই উভয়-

পক্ষের বিক্ষুব্ধ আঘাত তাঁদের সহ্য করতে হয়েছে পর্বতের মত ধৈর্য ও চরিত্রবলে। যে মহামানবের গিরিশ্রেণী সেদিনের সন্ধিক্ষণে ভারতধর্মকে রক্ষা ক'রে নূতন গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল রবীন্দ্রনাথের তুঙ্গশীর্ষ তাঁদের সবাইকে ছাড়িয়ে উঠেছে।

সাধারণ মানুষের মত মহামানবও যুগ ও পরিবেশের প্রভাবকে অতিক্রম করতে পারেন না এ কথা সত্য। তথাপি শুধু কাল ও পরিবেশের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের মত লোকোত্তর প্রতিভার উৎস খুঁজে পাওয়া যাবে বলে আমি মনে করি না। রান্নার জন্য প্রত্যহ উনুনে যে আগুন জ্বালা হয় এবং আগ্নেয়গিরির জঠরে যে আগুন জ্বলে, এই দুইয়ের মধ্যে জাতিগত পার্থক্য না থাকলেও কারণের যে ভেদ আছে, একজন সাধারণ প্রতিভাধরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ভেদ তেমনি। উনুনে আগুন জ্বলে নৈমিত্তিক কারণে, কিন্তু আগ্নেয় শৈলের উদ্ভব নিত্য কারণে, সৃষ্টির আদিভূত কারণের সঙ্গে তার যোগাযোগ। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও কর্মজীবনের বিবিধ প্রচেষ্টা ও কীর্তির পর্যালোচনা করে আমার মনে হয়েছে যে কাল ও পরিবেশের ফলে প্রকাশের রূপভেদ ঘটলেও, রবীন্দ্র-প্রতিভার শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়েছিল বিশ্বের নিয়ন্তা একটি ধ্রুব এবং শিবময় সত্তার প্রতি অচলপ্রতিষ্ঠ বিশ্বাসে। তিনি যা করেছেন এবং লিখেছেন, আনন্দ ও বেদনা, হতাশা ও উৎসাহ, যা কিছু অনুভব করেছেন, এই সত্তার কাছে তার সব কিছু নিবেদন করে আবার তাকে গ্রহণ করেছেন তাঁর প্রসাদ ব'লে। তাঁর এই নিবেদন ও প্রসাদ-গ্রহণের প্রধান বাহন ছিল তাঁর গান। তাই তাঁর গান তাঁর সৃষ্টিশক্তির অন্তরতম সামগ্রী, যার সুর দিয়ে ইন্দ্রিয়ানুভূতির নাগালের বাইরে সেই ধ্রুব সত্তার চরণস্পর্শ ক'রে আসেন। তিনি ঈশ্বর অথবা ব্রহ্ম যাই হোন, বিচিত্র তাঁর প্রকাশ, অসীম তাঁর ঐশ্বর্য ; কিন্তু সেই ঐশ্বর্য, সেই প্রকাশ-বৈচিত্র্য, তিনি আমাদের মত ক্ষুদ্র ভঙ্গুর আধারে কণায় কণায় বেঁটে ভোগ করে আনন্দ পান। ত্রিভুবনেশ্বরের এই বিচিত্রলীলার আধার হিসাবেই কবি চির-

কাল নিজেকে গণ্য করেছেন। তিনি যখন কবি, যখন সাহিত্যিক, যখন সমাজ-সংস্কারক অথবা শিক্ষাব্রতী অথবা দেশকর্মী, সর্বরূপেই তিনি সেই অখণ্ড-আনন্দের কণা বলেই নিজেকে বিবেচনা করেছেন। তাই জীবনের কোন অবস্থাতেই, কর্মশালার কোনক্ষেত্রেই কবির কণ্ঠে সেই পরমদেবতার আহ্বান স্তব্ধ হয়নি। জীবন যখন রস-রিক্ত মনে হয়েছে তখন করুণাধারায় তাঁর আবাহন, কর্মের ঝড়ে তিনি শান্তি, সঙ্কীর্ণ-আত্ম-পরিতোষে তিনি দর্পহারী রাজ-রাজেশ্বর, অন্যায় বাসনার অন্ধকারে তিনি রুদ্র বজ্রালোক।

তাঁর সাহিত্য ও কাব্য বৈচিত্র্যে ও পরিমাণে বিপুল। তাই আলাদা আলাদা ক'রে বিবেচনা করলে তাঁর সব রচনার মধ্যেই প্রকট বা স্পষ্টভাবে তাঁর ঈশ্বরবিশ্বাসের কথা পাওয়া যাবে না। কারণ তাহলে তাঁর সাহিত্যকীর্তির পরিধি শুধু ধর্ম-সংগীত ও ধর্মাবলম্বী কাব্যে ও সাহিত্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে সত্য, শিব, এবং সুন্দর সত্তার আনন্দ-যজ্ঞে বাঁশি বাজানোর ভার পেয়েছিলেন, তাঁর যজ্ঞশালার পরিধি আব্রহ্মস্তম্ব-পর্যন্ত বিস্তৃত। কাজেই জীবনের যে অংশকে অবলম্বন করেই তিনি কাব্য অথবা সাহিত্য সৃষ্টি করে থাকুন, তা সেই যজ্ঞেশ্বরের তৃপ্তির জন্য। একটি গানে, একটি প্রশ্নে তিনি সেই কথা বলে গেছেন—

> "এই কি তোমার খুশি,
> আমায় তাই পরালে মালা
> সুরের গন্ধ ঢালা?"

এই খুশির আবদার রাখতে ব্যবহারিক অর্থে সারাজীবন যদি বরবাদ হয় ক্ষতি নেই। তাই ঐ গানেই কবি বলেছেন—

> "রাতের বাসা হয়নি বাঁধা দিনের কাজে ত্রুটি
> বিনাকাজের সেবার মাঝে পাইনে আমি ছুটি।

শান্তি কোথায় মোর তরে হায় বিশ্বভুবন মাঝে
অশান্তি যে আঘাত করে তাইতো বীণা বাজে।
নিত্য রবে প্রাণ-পোড়ানো গানের আগুন জ্বালা—
এই কি তোমার খুশি আমায় তাই পরালে মালা,
সুরের গন্ধ ঢালা।”

শুধু কাব্য অথবা সাহিত্যের ক্ষেত্রে নয়, জীবনের নানাবিধ কর্মে মানুষ যে এই খুশির নির্দেশই বহন করে চলে, কবির জীবনে এই বিশ্বাস চিরদিন অটুট ছিল। তাঁর কাব্যে, গানে, উপন্যাসে, নাটকে, প্রবন্ধে এবং বিচিত্র রচনায় এ বিশ্বাসের অজস্র নজীর ছড়িয়ে আছে।

সচরাচর দেখা যায় জীবনের সূর্য অস্তাচলের দিকে ঢলে পড়লেই বিশ্বনিয়ন্তার কথা মানুষের মনে হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এ চৈতন্য তাঁর জীবনবোধের সঙ্গে আবাল্য অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল। এই প্রসঙ্গে নূতন ব্রাহ্মণ-বালক রবীন্দ্রনাথের গায়ত্রী-মন্ত্র অভ্যাসের কাহিনীর উল্লেখ করা যেতে পারে। ‘জীবন-স্মৃতি’তে তিনি লিখেছেন, ‘‘আমার বেশ মনে আছে আমি ‘ভূর্ভুবঃ স্বঃ’ এই অংশকে অবলম্বন করিয়া মনটাকে খুব প্রসারিত করিতে চেষ্টা করিতাম, কী বুঝিতাম, কী ভাবিতাম তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা কঠিন...’’ এবং এই প্রসঙ্গেই কিছু পরে, ‘‘তাই আমার একদিনের কথা মনে পড়ে—আমাদের পড়িবার ঘরে শান-বাঁধানো মেঝের এক-কোণে বসিয়া গায়ত্রী জপ করিতে করিতে সহসা আমার দুই চোখ ভরিয়া জল পড়িতে লাগিল। জল কেন পড়িতেছে তাহা আমি নিজে কিছুমাত্রই বুঝিতে পারিলাম না। অতএব, কঠিন পরীক্ষকের হাতে পড়িলে আমি মূঢ়ের মত এমন কোন একটা কারণ বলিতাম গায়ত্রী মন্ত্রের সঙ্গে যাহার কোনোই যোগ নাই। আসল কথা, অন্তরের অন্তঃপুরে যে কাজ চলিতেছে বুদ্ধির ক্ষেত্রে সকল সময়ে তাহার খবর আসিয়া পৌঁছায় না।’’ কবির অন্তরের অন্তঃপুরে সেই শিশুকালে বিশ্বের মূলীভূত কারণের সঙ্গে আদান-প্রদানের

যে কাজ শুরু হয়েছিল, সারাজীবন তার বিরাম ঘটেনি—সেই সেতু-বন্ধনের পথে কবি তাঁকে আবাহন করেছেন—

"এসো দুঃখে সুখে এসো মর্মে—
এসো নিত্য নিত্য সব কর্মে—
এসো সকল কর্ম অবসানে—
তুমি নবনব রূপে এসো প্রাণে।"

কবির জীবনের বিবিধ চিন্তা ও কর্মের মধ্যে এই আহূত দেবতার পুণ্যদীপ্তি উজ্জ্বল হয়ে আছে। এই দিব্য-প্রভাবে তাঁর চিন্তা কখনো সত্য এবং মঙ্গলের পথ হতে ভ্রষ্ট হয়নি। যে যুগে তাঁর জীবন শুরু হয়েছিল, তখন দুই বিপরীত মহাকর্ষের দোটানায় পড়ে শিক্ষিত সমাজে সুস্থমস্তিষ্ক ব্যক্তিদের সঙ্গীন অবস্থা—এক-দিকে গোঁড়া রক্ষণশীল মতবাদ যা চাইছিল আবার নিয়ম, অনুষ্ঠান ও সংকীর্ণ সংস্কারের নাগপাশে চলনশক্তিহীন স্থাণু ঈশ্বরের সঙ্গে সমাজকে একসঙ্গে বাঁধতে—অন্যদিকে ছিল উগ্র প্রগতিপন্থী যারা দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের বাঁধন ছিঁড়ে কাটা ঘুড়ির মত পাশ্চাত্য ভাবধারার নানাবিধ দমকা হাওয়ায় গা ভাসিয়ে এক অভাবনীয় নব ইংলণ্ডে উত্তীর্ণ হবার স্বপ্নে বিভোর। অসত্য এবং অমঙ্গলের পাল্লা উভয়পক্ষেই সমান ভারী। কাজেই রবীন্দ্রনাথ কোন দলেই নাম লেখালেন না। এক পক্ষের উদ্দেশে তিনি বলতেন, "শিক্ষিত সম্প্র-দায়ের মধ্যে আজ আমরা অনেকেই মনে করি যে ভারতবর্ষে আমরা নানা জাতি যে একত্রে মিলিত হইবার চেষ্টা করিতেছি ইহার উদ্দেশ্য পোলিটিক্যাল বল লাভ করা। এমন করিয়া যে জিনিসটা বড়ো তাহাকে আমরা ছোটোর দাস করিয়া দেখিতেছি।...ইহাতে আমা-দের ধর্ম নষ্ট হইতেছে বলিয়া সকলই নষ্ট হইতেছে।" রক্ষণশীল-দের সম্বন্ধে তিনি বললেন, "অল্পদিন পূর্বে বাংলাদেশে যে মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে সেই বিবেকানন্দও পূর্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্যকে অস্বীকার করিয়া ভারত-

বর্ষকে সঙ্কীর্ণ সংস্কারের মধ্যে চিরকালের জন্য সঙ্কুচিত করা তাঁহার জীবনের উপদেশ নহে। গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার, সৃজন করিবার প্রতিভাই তাঁহার ছিল। তিনি ভারতবর্ষের সাধনাকে পশ্চিমে ও পশ্চিমের সাধনাকে ভারতবর্ষে দিবার ও লইবার পথ রচনার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।" কবির নিজের জীবন-সাধনার প্রকৃতিও বিবেকানন্দেরই অনুরূপ ছিল। তাঁর কবিসত্তা ও কর্মীসত্তা এই একই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ছিল। হাজার অভিজ্ঞতা ও হাজার অনুভূতির লীলাচাপল্যের দোলায় তাঁর কল্পনা হাজার গীতের বর্ণাঢ্য মহিমা বিস্তার করেছিল এবং তার মধ্যে বিশ্বরূপের অখণ্ড মহাকাব্যের আস্বাদ পেয়েছিল। তাঁর কর্মজীবনও তেমনি জাতি-ধর্ম-সংস্কারের বাধাকে অতিক্রম করে অখণ্ড মানবতার সাধনায় নিয়োজিত ছিল।

কবি বিশ্বাস করতেন যে দেশ-কাল নিরপেক্ষ মনুষ্যত্বের সমন্বয় সম্ভব করবার সাধনায় ভারতবর্ষের একটি সুনির্দিষ্ট ভূমিকা আছে। ভারতের এই মহান ভূমিকার যোগ্যতা তার ইতিহাস ও ধর্মবিশ্বাসের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "সম্প্রতি য়ুরোপীয় শিক্ষাগুণে ন্যাশনাল মহত্ত্বকে অত্যধিক আদর দিতে শিখিয়াছি। অথচ তাহার আদর্শ আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যে নাই। আমাদের ইতিহাস, আমাদের ধর্ম, আমাদের সমাজ, আমাদের গৃহ কিছুই নেশন-গঠনের প্রাধান্য স্বীকার করে না। ইউরোপে স্বাধীনতাকে যে স্থান দেয়, আমরা মুক্তিকে সেই স্থান দিই। আত্মার স্বাধীনতা ছাড়া অন্য স্বাধীনতার মাহাত্ম্য আমরা মানিনা। আমাদের সর্বপ্রধান কর্তব্যের আদর্শ এই একটি মন্ত্রেই রহিয়াছে—

> ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ
> যদ্ যৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥

এই আদর্শ যথার্থভাবে রক্ষা করা ন্যাশনাল কর্তব্য অপেক্ষা দুরূহ এবং মহত্তর।"

ইউরোপীয় নেশন-পন্থী সভ্যতার পরিণাম রবীন্দ্রনাথ প্রথম প্রত্যক্ষ করেছিলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পাশব তাণ্ডবের মধ্যে। সেই যুদ্ধের সন্ধিপত্রের মধ্যেই ত্রিকালদর্শী ঋষির চোখ দিয়ে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন আগামী দিনের ভয়াল পরিণতি এবং জীবনের সন্ধ্যাকালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সংঘাত তাঁর ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির সত্যতা প্রমাণ করেছিল। এই সভ্যতার মধ্যে যে নৈতিক দুর্বলতা আছে, যে দুর্বলতা দুরারোগ্য ব্যাধির মত এই তেজস্বী সভ্যতার সার্থক পরিণতিকে বারবার ব্যাহত করছে, কবি তার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, "যে ধর্মনীতি ব্যক্তিবিশেষের নিকট বরণীয় তাহা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে আবশ্যকের অনুরোধে বর্জনীয়, একথা এক প্রকার সর্বজন-গ্রাহ্য হইয়া উঠিতেছে। রাষ্ট্রতন্ত্রে মিথ্যাচরণ, সত্যভঙ্গ, প্রবঞ্চনা এখন আর লজ্জাজনক বলিয়া গণ্য হয় না। যে সকল জাতি মনুষ্যে মনুষ্যে ব্যবহারে সত্যের মর্যাদা রাখে, ন্যায়াচরণকে শ্রেয়োজ্ঞান করে, রাষ্ট্রতন্ত্রে তাহাদেরও ধর্মবোধ অসাড় হইয়া থাকে। সেইজন্য ফরাসী, ইংরেজ, জর্মান, রুশ ইহারা পরস্পরকে কপট ভণ্ড প্রবঞ্চক বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে গালি দিতেছে।" প্রায় ষাট বছর পূর্বে রবীন্দ্র-নাথ এই ব্যাধির নিদান নির্ণয় করেছিলেন। তারপর এই রোগ ইউরোপ এবং আমেরিকা অতিক্রম করে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে এবং আমরাও স্বধর্মচ্যুত হয়ে পরম গৌরবে এই বিশ্বরোগের অংশীদার হয়েছি। যদিও বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগে আমাদের ধর্ম মোটামুটি বজায় আছে, কিন্তু আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে এই রোগ-লক্ষণ তীব্রভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে।

ইউরোপীয় সভ্যতার যা ত্রুটি, নীতির পথ থেকে যত কিছু বিচ্যুতি তা সমগ্রভাবেই কবির চোখে পড়েছিল। তবু এই সভ্যতার মধ্যে যা শ্রেয়, যা গ্রাহ্য, যা বরণীয় সে সম্বন্ধে স্বীকৃতি তিনি অকৃপণ ভাবেই দিয়েছেন। শুধু কাব্যে ও সাহিত্যেই নয়, তাঁর বিস্তৃত কর্মজীবনে অকুণ্ঠ প্রয়োগের মধ্যে সেই স্বীকৃতির অজস্র প্রমাণ ছড়ানো আছে। পাশ্চাত্য জড়-বিজ্ঞান ও তার ব্যবহারিক

প্রয়োগ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, ''তিনি তাঁর সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রে এই কথা লিখে দিয়েছেন বস্তুরাজ্যে আমাকে না হলেও তোমার চলবে ; ওখান থেকে আমি আড়ালে দাঁড়ালুম ; একদিকে রইল আমার বিশ্বের নিয়ম আর একদিকে রইল তোমার বুদ্ধির নিয়ম ; এই দুয়ের যোগে তুমি বড় হও : জয় হোক তোমার, এ রাজ্য তোমারই হোক্—এর ধন তোমার, অস্ত্র তোমারই। এই বিধিদত্ত স্বরাজ যে পেয়েছে অন্য সকল রকম স্বরাজ সে পাবে, আর পেয়ে রক্ষা করতে পারবে।'' আরো অনেক পরে জাপান যাত্রার সময় বিজ্ঞানের জগতে মানুষের দুঃসাহসিক অভিমানকে কৃষ্ণের উদ্দেশে দুর্গম পথে শ্রীমতীর অভিসারের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন, ''মানুষের মধ্যে যে সব মহাজাতি কুলত্যাগিনী তারাই এগোচ্ছে—ভয়ের ভেতর থেকে অভয়ে, বিপদের ভিতর দিয়ে সম্পদে।'' কিন্তু শুধু বৈষয়িক শ্রীবৃদ্ধিকে তিনি কখনো পরমার্থ বলে মনে করেন নি। তিনি দেখেছেন আমেরিকার ঐশ্বর্য, তার শক্তি প্রবল, আয়তন বিপুল। তবু সেদিন সেই ভ্রূকুটি-কুটীল অভ্রভেদী ঐশ্বর্যের সামনে দাঁড়িয়ে ধনমানহীন ভারতের একটি সন্তান প্রতিদিন ধিক্কারের সঙ্গে বলেছে, 'ততঃ কিম্ ?' বৈষয়িক শক্তি-বৃদ্ধির মত্ততায় অন্তরের সত্য যেখানে অবহেলিত, সেখানে যে শ্রেয় নেই কবি তা বুঝেছিলেন। ভোগের সামগ্রীর যোগ্য হতে হ'লে প্রেম ও সংযমের যে প্রয়োজন তাই বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, ''অন্নপূর্ণার সঙ্গে বৈরাগীর যে মিলন, সেই হ'ল প্রকৃত মিলন।''

ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি এই মিলনের বৈরাগী শিব, যার দৃষ্টি অন্তরে, হৃদয়ে প্রেম কিন্তু বহিরঙ্গের প্রতি নিরুত্তাপ ঔদাসীন্য। ইউরোপীয় ঐশ্বর্যময়ী সংস্কৃতি—অন্নপূর্ণা, কিন্তু বৈরাগী শিবকে চরণে দলিত করে ধ্বংসাত্মিকা কালী। কিন্তু মিলনের আগ্রহে শিব যদি বৈরাগ্য বিসর্জন দেয়, সংযম হারায়, তাহলে সেই মিলন ব্যর্থ হবে। কাজেই ভারতকে তার স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত থেকেই মানব-সমন্বয় সাধনা করতে হবে। কবির উক্তি এখানে সুস্পষ্ট,

"আমাদের বুদ্ধি, আমাদের হৃদয়, আমাদের রুচি যে প্রতিদিন জলের দরে বিকাইয়া যাইতেছে, তাহা প্রতিরোধ করিবার একমাত্র উপায়—আমরা নিজে যাহা তাহাই সজ্ঞানভাবে সবলভাবে সচলভাবে সম্পূর্ণভাবে হইয়া উঠা।" এই বাণী অকুণ্ঠ দ্বিধাহীন চিত্তে স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত হবার অমোঘ আহ্বান। কবি এই প্রতিষ্ঠার মধ্যে বিধাতার উদ্দেশ্য প্রত্যক্ষ করেছেন, "আমাদের যে শক্তি আবদ্ধ আছে তাহা বিদেশ হইতে বিরোধের আঘাত পাইয়াই মুক্ত হইবে—কারণ, আজ পৃথিবীতে তাহার কাজে আসিয়াছে। আমাদের দেশের তাপসেরা তপস্যার দ্বারা যে শক্তি সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন তাহা মহামূল্য, বিধাতা তাহা নিষ্ফল করিবেন না। সেইজন্য উপযুক্ত সময়েই তিনি নিশ্চেষ্ট ভারতকে সুকঠিন পীড়নের দ্বারা জাগ্রত করিয়াছেন।" কোন্ ধর্ম ভারত বিশ্বে প্রচার করবে, কোন কর্ম সমাপন করবে তার ইঙ্গিতও কবি দিয়েছেন, "বহুর মধ্যে ঐক্য উপলব্ধি, বিচিত্রের মধ্যে ঐক্য স্থাপন, ইহাই ভারতের অন্তর্নিহিত ধর্ম।" ..."আমরা ভারতের বিধি-নির্দিষ্ট এই নিয়োগটি যদি স্মরণ করি তবে আমাদের লক্ষ্য স্থির হইবে, লজ্জা দূর হইবে—ভারতবর্ষের মধ্যে যে একটি মৃত্যুহীন শক্তি আছে তাহার সন্ধান পাইব।"

অর্ধশতাব্দী পূর্বে রচিত এই প্রবন্ধ যেন আজও সত্যের দ্যুতিতে ঝলমল, যেন ইদানীংকালের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে লেখা। রবীন্দ্রনাথের জন্মের পর শতাব্দীকাল পূর্ণ হ'ল; কিন্তু তখনও যেমন ছিল আজও তেমনি আমাদের দেশে দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে উপহাস ও অবমাননা করবার লোকের অভাব নেই। পাশ্চাত্য জীবনাদর্শের কাছে তাঁরা আত্মসমর্পণ করতে চান। রবীন্দ্রনাথ ষাট বছর আগে পাশ্চাত্য সভ্যতার পরিণাম ও প্রকৃতি সম্বন্ধে যা লিখেছিলেন তা তাঁদের পড়ে দেখতে অনুরোধ করি। দেখবেন, আজকের দিনের জন্যও কবির উক্তির উপযোগিতা অক্ষুণ্ণ রয়েছে। তিনি বলেছিলেন, "কী সন্দেহ ও কী আতঙ্কের সহিত ইউরোপের প্রত্যেক রাজশক্তি পরস্পরের প্রতি ক্রূর কটাক্ষপাত

করিতেছে। রাজমন্ত্রিগণ টিপিয়া টিপিয়া মৃত্যুবাণ চালিতেছে। রণতরী সকল মৃত্যুবাণে পরিপূর্ণ হইয়া পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্রে যমদৌত্যে বাহির হইয়াছে। আফ্রিকায় ইউরোপের ক্ষুধিত লুব্ধকগণ ধীরে ধীরে এক এক পা বাড়াইয়া একটা থাবায় মাটি আক্রমণ করিতেছে এবং আর একটা থাবা সম্মুখের লোলুপ অভ্যাগতের প্রতি উদ্যত করিতেছে।'' ষাট বছর পূর্বের সঙ্গে তফাত এইমাত্র যে, লুব্ধকগণ এখন আর শুধু পাশ্চাত্যেই সীমাবদ্ধ নয়, প্রাচ্য ভূখণ্ডেও এই মহালোভের আদর্শ গৃহীত হয়েছে। কিন্তু এই লোভের বিকৃতির মধ্যে ভারতকে আত্মধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে নিজের জন্য। ''প্রবৃত্তির প্রবলতা ও প্রভুত্বের মমতা, স্বার্থের উত্তেজনা কোন কালেই শান্তি ও পরিপূর্ণতায় লইয়া যাইতে পারে না, তাহার একটা প্রচণ্ড সংঘাত, একটা ভীষণ রক্তাক্ত পরিণাম আছেই। অতএব ইউরোপের রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শকে চরম আদর্শ বিবেচনাপূর্বক তদ্দ্বারা ভারতবর্ষকে মাপিয়া খাটো করিবার প্রয়োজন নাই।'' কিন্তু এই খাটো করার চেষ্টার আজও বিরাম নেই। আমাদের শিক্ষিত সমাজের একটি বিশেষ অংশ ভারতধর্মের প্রতি তাঁদের সুস্পষ্ট অবজ্ঞাকে গোপন করার চেষ্টাও করেন না। তাঁদের সমগোত্রীয়রা সেকালেও ছিলেন। তাঁদের উদ্দেশে কবি বলেছেন, ''দারিদ্র্যের যে কঠিন বল, মৌনের যে স্তম্ভিত আবেগ, নিষ্ঠার যে কঠোর শান্তি এবং বৈরাগ্যের যে উদার গাম্ভীর্য, তাহা আমরা কয়েকজন শিক্ষা-চঞ্চল যুবক বিলাসে অবিশ্বাসে অনাচারে অনুকরণে এখনো ভারতবর্ষ হইতে দূর করিয়া দিতে পারি নাই।...ইংরেজী স্কুলের বাতায়নে বসিয়া যাহার সজ্জাহীন আভাসমাত্র চোখে পড়িতেই আমরা লাল হইয়া মুখ ফিরাইতেছি তাহাই সনাতন বৃহৎ ভারতবর্ষ, তাহা আমাদের বাগ্মীদের বিলাতি পটহ তালে সভায় সভায় নৃত্য করিয়া বেড়ায় না—তাহা আমাদের নদীতীরে রৌদ্র-বিকীর্ণ বিস্তীর্ণ ধূসর প্রান্তরের মধ্যে কৌপীন বস্ত্র পরিয়া তৃণাসনে একাকী মৌন বসিয়া আছে।...আজিকার দিনের বহু আড়ম্বর,

আস্ফালন, করতালি, মিথ্যাবাক্য, যাহা স্বরচিত, যাহা সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে আমরা একমাত্র সত্য, একমাত্র বৃহৎ বলিয়া মনে করিতেছি, যাহা মুখর, যাহা চঞ্চল, যাহা উদ্বেলিত পশ্চিমসমুদ্রের উদ্‌গীর্ণ ফেনরাশি—তাহা, যদি কখনো ঝড় আসে, দশদিকে উড়িয়া অদৃশ্য হইয়া যাইবে,...যখন ঝড়ের গর্জনে অতি বিশুদ্ধ উচ্চারণের ইংরাজী বক্তৃতা আর শুনা যাইবে না, তখন ঐ সন্ন্যাসীর কঠিন দক্ষিণ বাহুর লৌহ বলয়ের সঙ্গে তাহার লৌহদণ্ডের ঘর্ষণ ঝঙ্কার সমস্ত মেঘমন্দ্রের উপরে শব্দিত হইয়া উঠিবে।" এইসব অবিশ্বাসী আত্মনিন্দাপরায়ণ, পরানুচিকীর্ষুদের ব্যবহার অবিনশ্বর ভারতধর্মের কোন ক্ষতি করতে পারবে না, সেই ধর্ম শেষে জয়ী হবেই, স্বদেশে এবং বিদেশে। তারই অমোঘ আশ্বাস কবির বাণীতে ধ্বনিত হয়েছে, "আমরা যাহারা অবিশ্বাস করিতেছি, মিথ্যা কহিতেছি, আস্ফালন করিতেছি, বর্ষে বর্ষে 'মিলি মিলি যাওব সাগরলহরী সমানা।' তাহাতে নিস্তব্ধ সনাতন ভারতের ক্ষতি হইবে না। ভস্মাচ্ছন্ন মৌনী ভারত চতুষ্পথে মৃগচর্ম পাতিয়া বসিয়া আছে—আমরা যখন আমাদের সমস্ত চটুলতা সমাধা করিয়া বিদায় লইব, তখনও সে শান্ত-চিত্তে আমাদের পৌত্রদের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে। সে প্রতীক্ষা ব্যর্থ হইবে না, তাহারা এই সন্ন্যাসীর সম্মুখে করজোড়ে আসিয়া কহিবে,—"পিতামহ আমাদিগকে মন্ত্র দাও।"

তিনি কহিবেন, "ওঁ ইতি ব্রহ্ম।"
তিনি কহিবেন, "ভূমৈব সুখম্, নাল্পে সুখমস্তি।"
তিনি কহিবেন, "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন!"

"মানুষের মন চায় মানুষেরই মন"

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

'কবি কাহিনী' রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ, প্রকাশকালে কবির বয়স সতেরো, রচনাকালে বয়স ছিল ষোল। প্রথম প্রকাশের সুদীর্ঘকাল পরে রবীন্দ্র-রচনাবলীর অচলিত সংগ্রহে ইহা পুনর্মুদ্রিত হয়। কবি নিজের যে সব রচনাকে অস্বীকার করিয়াছেন 'কবি কাহিনী' তাহাদের অন্যতম। উত্তর জীবনে এই কাব্য সম্বন্ধে তিনি যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহাতেও অস্বীকৃতির সুর।

> "এই প্রথম বৎসরের ভারতীতেই 'কবি কাহিনী' নামক একটি কাব্য বাহির করিয়াছিলাম। যে বয়সে লেখক জগতের আর সমস্তকে তেমন করিয়া দেখে নাই, কেবল নিজের অপরিস্ফুটতার ছায়া মূর্তিটাকেই খুব বড় করিয়া দেখিতেছে, ইহা সেই বয়সের লেখা। সেই জন্য ইহার নায়ক কবি। সে কবি যে লেখকের সত্তা তাহা নহে, লেখক আপনাকে যাহা বলিয়া মনে করিতে ও ঘোষণা করিতে ইচ্ছা করে ইহা তাহাই। ঠিক ইচ্ছা করে বলিলে যাহা বুঝায় তাহাও নহে, যাহা ইচ্ছা করা উচিত, অর্থাৎ যেরূপটি হইলে অন্য দশজনে মাথা নাড়িয়া বলিবে, "হাঁ কবি বটে" ইহা সেই জিনিস। ইহার মধ্যে বিশ্বপ্রেমের ঘটা খুব আছে, তরুণ কবির পক্ষে এইটি বড় উপাদেয় ; কারণ ইহা শুনিতে খুব বড় এবং বলিতে খুব সহজ। নিজের মনের মধ্যে সত্য যখন জাগ্রত হয় নাই, পরের মুখের কথাই যখন প্রধান সম্বল, তখন রচনার মধ্যে সরলতা ও সংযম রক্ষা করা সম্ভব নহে। তখন যাহা স্বতই বৃহৎ তাহাকে বাহিরের দিক হইতে বৃহৎ করিয়া তুলিবার দুশ্চেষ্টায়, তাহাকে বিকৃতি ও হাস্যকর করিয়া তোলা অনিবার্য।"[১]

১. ভারতী, জীবনস্মৃতি।

কবির মন্তব্যটির মধ্যে কতক সত্য, কতক অনাবশ্যক আত্ম-ধিক্কার। ইহার মধ্যে "বিশ্বপ্রেমের ঘটা" যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে পরের মুখের কথাই প্রধান সম্বল।[২] রবীন্দ্রনাথের মনে তখনো বিশ্বপ্রেমের সত্য জাগ্রত হয় নাই সত্য আর রচনায় সরলতা ও সংযমের অভাব সে জন্য হওয়াও অসম্ভব নয়। কিন্তু কবির অস্ফুট ছায়ামূর্তি ও কবির নায়কত্ব সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য সম্পূর্ণ সমীচীন মনে হয় না। যে সব কবির প্রতিভায় রোমাণ্টিক চরিত্রটা প্রবল তাহাদের কাব্যের মূল পুঁজি নিজেদের Poetic Personality বা কবিব্যক্তিত্ব। ঊর্ণনাভ যেমন নিজের দেহ হইতে রস বাহির করিয়া স্বকীয় জগৎজাল বয়ন করে—ইহারাও সেইরূপ করিয়া থাকে। এই জন্যই এই শ্রেণীর কবির কাব্যের নায়ক কবি স্বয়ং। ইহাদের প্রথম কবি-কর্তব্য নিজের কবিস্বরূপকে আবিষ্কার-চেষ্টা, দ্বিতীয় কবি-কর্তব্য সেই আবিষ্কৃত কবি-ব্যক্তিকে কাব্যে প্রতিষ্ঠা। ইহাদের প্রত্যেকেরই প্রথম তথা অপরিণত কাব্যে বারে বারে 'অপরিস্ফুট ছায়ামূর্তিটা' প্রতিবিম্ব নিক্ষেপ করিয়াছে। ইহা ভবিষ্যতের পূর্বাভাস বা পূর্বগামিনী ছায়া ছাড়া আর কিছুই নহে। যে কবিধর্মের যে স্বভাব। ইহা অস্বাভাবিক নহে, এমন না হইলেই অস্বাভাবিক হইত।[৩]

"সে কবি সে লেখকের সত্তা তাহা নহে, লেখক আপনাকে যাহা বলিয়া মনে করিতে ও ঘোষণা করিতে ইচ্ছা করে, ইহা তাহাই। ঠিক ইচ্ছা

২. কবি কাহিনীর ৪র্থ সর্গে মানুষের দুঃখদুর্দশার বর্ণনা ও পৃথিবীতে অবতীর্ণ সত্যযুগের বর্ণনা। মূলধন, "পরের মুখের কথা।"

বনফুলের ষষ্ঠ সর্গে যে সত্যযুগের বর্ণনা আছে তাহাও শেলির মুখের কথা।

৮ম সর্গের হিমালয় বর্ণনার মহাজন বিহারীলাল। সমস্ত কাহিনী-টির ছাঁচ আরও দুইজন মহাজনকে স্মরণ করাইয়া দেয়—বঙ্কিমচন্দ্র ও কালিদাস।

৩. এই প্রসঙ্গে প্রধান ইংরেজ রোমাণ্টিক চরিত্রের কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, শেলি, কীটস ও বায়রনের কবি-প্রতিভার স্ফুরণ ও ইতিহাস স্মরণীয়।

করে বলিলে যাহা বুঝায় তাহাও নয়, যাহা ইচ্ছা করা উচিত...হাঁ সেই জিনিসটি।"

এই কবি লেখকের লৌকিক জীবন নয়—ইহা কবিব্যক্তিত্ব বা Poetic Personality-র কতকটা বাস্তবের সঙ্গে মেলে, অনেকটাই মেলে না। যে অংশে মেলে সেই অংশে "লেখক আপনাকে যাহা মনে করিতে ও ঘোষণা করিতে ইচ্ছা করে" তাহাই ; আর যে অংশে মেলে না তাহা কবির সচেতন ইচ্ছার বহির্ভূত শক্তির সৃষ্টি। সচেতন ও অবচেতনের দুই হাতে মিলিয়া যে কবিব্যক্তিত্ব তাহাই এই শ্রেণীর কবির প্রধান নায়ক ও মূল পুঁজি। কবি কাহিনীর লেখক এই শ্রেণীর কবি, কবি কাহিনীর কবি এই শ্রেণীর নায়ক। কবি কাহিনী রবীন্দ্র-প্রতিভার স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত সূচনা—ইহার বিপরীত ঘটিলেই বিস্ময়ের কারণ হইত। রবীন্দ্রনাথের কিশোর কলম আপন অজ্ঞাতসারে কবিব্যক্তিত্বের প্রথম খসড়া অঙ্কিত করিতেছিল, মূল পুঁজির প্রকৃতি ও পরিমাণ জানিতে চেষ্টা করিতেছিল। কবি কাহিনী'র কাব্য রবীন্দ্রনাথের কবিব্যক্তিত্বের প্রথম অস্পষ্ট কাহিনী। এই কারণেই রবীন্দ্র-প্রতিভার ইতিহাসে ইহার অপরিহার্য গুরুত্ব।

কবি কাহিনীর ঘটনা বিশ্লেষণ ও ভাবনা বিশ্লেষণ

এবারে কবি কাহিনীর বিস্তারিত বিশ্লেষণ দিলে কাব্য দুইটির যোগাযোগ বুঝিবার সুবিধা হইতে পারে।

শুন কল্পনাবালা, ছিল কোন কবি
বিজন কুটীরতলে। ছেলেবেলা হতে
তোমার অমৃতপানে আছিল মজিয়া

তারপরে—

যৌবনে যখনই কবি করিল প্রবেশ,
প্রকৃতির গীতধ্বনি পাইল শুনিতে,
বুঝিল সে প্রকৃতির নীরব কবিতা।

কবি ভাবিয়াছিল প্রকৃতির প্রণয়ে শান্তি লাভ করিবে।

হে জননী আমার এ হৃদয়ের মাঝে
অনন্ত অতৃপ্তি তৃষ্ণা জ্বলিছে সদাই,
তাই দেবী পৃথিবীর পরিমিত কিছু
পারে না গো জুড়াইতে হৃদয় আমার,
তাই ভাবিয়াছি আমি হে মহাপ্রকৃতি,
মজিয়া তোমার সাথে অনন্ত প্রণয়ে
জুড়াইব হৃদয়ের অনন্ত পিপাসা।

কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই কবি বুঝিতে পারিল যে তাহার হৃদয়ের শূন্যতা পূর্ণ হইতেছে না, কিসের যেন অতৃপ্তি রহিয়া যাইতেছে। তখন সে বুঝিতে পারিল "মানুষের মন চায় মানুষেরি মন," কিন্তু তেমন মনের মত মানুষ কোথায়? তাহার সন্ধানে তো কবি অনেক ঘুরিয়াছে। কবি যখন অতৃপ্তির গানে কানন ধ্বনিত করিয়া ফিরিতেছে তখন একটি বালিকা আসিয়া তাহার হৃদয়ের শূন্য স্থান পূর্ণ করিয়া দিল—তাহার নাম নলিনী। কবি কিছু-দিনের জন্য শান্তি পাইল। কিন্তু তার পরেই আবার সেই অতৃপ্তি, কবিজনোচিত মহৎ অতৃপ্তি তাহার মনে দেখা দিল।

কবির সমুদ্র-বুক পুরাতে পারিবে কিসে
প্রেম দিয়া ক্ষুদ্র ওই বনের বালিকা।
কাতর ক্রন্দনে আহা আজিও কাঁদিল কবি,
"এখনও পূরিল না প্রাণের শূন্যতা।"

নলিনীতে অতৃপ্ত কবি প্রাণের শূন্যতা দূর করিবার জন্য বিশ্ব-ভ্রমণে বাহির হইল। কাশ্মীরের বনে, রুশিয়ার হিমক্ষেত্রে, আফ্রিকার মরুভূমে তাহার ভ্রমণ করিবার ইচ্ছা। কবি নলিনীকে বলিতেছে—

এইখানে থাক তুমি, ফিরিয়া আসিয়া পুনঃ
ওই মধুমুখখানি করিব চুম্বন।

কবির বিরহে নলিনীর মৃত্যু হইল। এদিকে—

কত দেশ দেশান্তরে ভ্রমিল সে কবি
তুষারস্তম্ভিত গিরি করিল লঙ্ঘন ;
কিন্তু বিহঙ্গের গান, নির্ঝরের ধ্বনি,
পারে না জুড়াতে আর কবির হৃদয়।
বিহগ, নির্ঝরধ্বনি, প্রকৃতির গীত,
মনের যে ভাগে তার প্রতিধ্বনি হয়,
সে মনের তন্ত্রী যেন হয়েছে বিকল।
একাকী যাহাই আগে দেখিত সে কবি,
তাহাই লাগিত তার কেমন সুন্দর,
এখন কবির সেই একি হল দশা,
যে প্রকৃতি শোভা মাঝে নলিনী না থাকে
ঠেকে তা শূন্যের মত কবির নয়নে,
নাইকো দেবতা যেন মনের মাঝারে।
বালার মুখের জ্যোতি করিত বর্ধন
প্রকৃতির রূপচ্ছটা দ্বিগুণ করিয়া,
সে না হলে অমাবস্যা নিশির মতন
সমস্ত জগৎ হত বিষণ্ণ আঁধার।

কবি ফিরিয়া আসিয়া দেখিল ইতিমধ্যে নলিনীর মৃত্যু হইয়াছে। তখন কৃষ্ণবিরহিত পার্থের মতো নিজের সত্যকার শক্তি কোথায় সে বুঝিতে পারিল—বুঝিতে পারিল কত বড় ভুল সে করিয়াছে।

তখন কবি নলিনীকে তুষারে সমাহিত করিয়া সে বন ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল—কোথায় গেল কেহ আর জানিতে পারিল না।

চতুর্থ বা শেষ সর্গে কোন ঘটনা নাই বলিলেই চলে। কবি মনের দুঃখে হিমালয়ে চলিয়া গিয়াছে, সেখানে সে চিন্তা করিতে লাগিল নলিনীর সত্তা কি সত্যই চিরদিনের জন্য লোপ পাইয়াছে? তাহা হইলে কি সান্ত্বনায় কবি আর বাঁচিয়া থাকিবে? দুঃখের অভিজ্ঞতায় কবি যেন বুঝিতে পারিল, মরিলে সব ফুরায় না ;

মৃত্যুর পরে নলিনীর দেহহীন অস্তিত্ব প্রকৃতির সঙ্গে মিশিয়া রহিয়াছে, এবং তাহাতে প্রকৃতি সমৃদ্ধতর প্রিয়তর হইয়া উঠিয়াছে।

দেহ কারাগার মুক্ত যে নলিনী এবে
সুখে দুখে চিরকাল সম্পদে বিপদে
আমারিই সাথে সাথে করিছে ভ্রমণ।

প্রকৃতি এমন সুন্দর, মাতার মতো যার প্রাণে অগাধ স্নেহ, তাহার রাজ্যে কি অমঙ্গল থাকিতে পারে? সান্ত্বনার অভাব থাকিতে পারে? নলিনীর লোপ সম্ভব হইতে পারে?

প্রকৃতি! মাতার মত সুপ্রসন্ন দৃষ্টি
যেমন দেখিয়াছিনু ছেলেবেলা আমি,
এখনো তেমনি যেন পেতেছি দেখিতে।
যা কিছু সুন্দর, দেবি, তাহাই মঙ্গল,
তোমার সুন্দর রাজ্যে হে প্রকৃতি দেবী,
তিল অমঙ্গল কভু পারে না ঘটিতে।
অমন সুন্দর আহা নলিনীর মন,
জীবন্ত সৌন্দর্য, দেবি, তোমার এ রাজ্যে
অনন্ত কালের তরে হবেনা বিলীন।
য আশা দিয়াছ হৃদে ফলিবে তা দেবি,
একদিন মিলিবেক হৃদয়ে হৃদয়ে।
তোমার আশ্বাসবাক্যে হে প্রকৃতি দেবী,
সংশয় কখনো আমি করিনা স্বপনে।

নলিনীর সঙ্গে পুনর্মিলন যদি সম্ভব হয় তবে আর দুঃখ কিসের? অতএব—

বাজাও রাখাল তবে সরল বাঁশরী।
গাও গো মনের সাধে প্রমোদের গান।

এইরূপে হিমালয়ে বাস করিতে করিতে কবির বার্ধক্য উপস্থিত হইল।

সুগম্ভীর বৃদ্ধ কবি, স্কন্ধে আসি তার
পড়েছে ধবল জটা অযত্নে লুটায়ে।
মনে হত দেখিলে সে গম্ভীর মুখশ্রী,
হিমাদ্রি হতেও বুঝি সমুচ্চ মহান্।
নেত্রে তাঁর বিকিরিত কি স্বর্গীয় জ্যোতি,
যেন তাঁর নয়নের শান্ত সে কিরণ
সমস্ত পৃথিবীময় শান্তি বরষিবে।
বিস্তীর্ণ হইয়া গেল কবির সে দৃষ্টি,
দৃষ্টির সম্মুখে তার, দিগন্তও যেন,
খুলিয়া দিত গো নিজ অভেদ্য দুয়ার।

মনুষ্য-জগতে যেমন এই বৃদ্ধ কবি, প্রকৃতির জগতে তেমনি হিমালয় দুজনেই বয়ঃপ্রবীণ, শুভ্রশীর্ষ, বহুদর্শী, শান্ত এবং সমাহিত। কবি স্বভাবতই নিজেকে হিমালয়ের সগোত্র অনুভব করিয়া তহাকে সম্বোধন করিয়া মনের খেদ প্রকাশ করিতেছে। এ খেদ ব্যক্তিগত নয়, কারণ ব্যক্তিগত সান্ত্বনা কবি প্রকারান্তরে লাভ করিয়াছে—এ খেদ মানুষের দুঃখ স্মরণ করিয়া।

কত কোটি কোটি লোক, অন্ধকারাগারে
অধীনতা শৃঙ্খলেতে আবদ্ধ হইয়া
ভরিছে স্বর্গের কর্ণ কাতর ক্রন্দনে,
অবশেষে মন এত হয়েছে নিস্তেজ,
কলঙ্ক শৃঙ্খল তার অলংকার রূপে
আলিঙ্গন করে তারে রেখেছে গলায়।
দাসত্বের পদধূলি অহংকার করে
মাথায় বহন করে পর-প্রত্যাশীরা।
যে পদ মাথায় করে ঘৃণার আঘাত
সেই পদ ভক্তিভরে করে গো চুম্বন।
যে হস্ত ভ্রাতারে তার পরায় শৃঙ্খল,
সেই হস্ত পরশিলে স্বর্গ পায় করে।

স্বাধীন, সে অধীনের দলিবার তরে,
অধীন, সে স্বাধীনের পূজিবারে শুধু।
সবল, সে দুর্বলেরে পীড়িতে কেবল,
দুর্বল, বলের পদে আত্ম বিসর্জিতে।
স্বাধীনতা কারে বলে জানে যেই জন
কোথায় সে অসহায় অধীন জনের
কঠিন শৃঙ্খলরাশি দিবে গো ভাঙিয়া,
না, তার স্বাধীন হস্ত হয়েছে কেবল
অধীনের লৌহপাশ দৃঢ় করিবারে।

হিমালয় তো ইহাই চিরকাল দেখিতেছে, তাহার মত এমন বহু-অভিজ্ঞ সাক্ষী আর কোথায়? কিন্তু ইহাই কি চিরকাল চলিবে? জগতে কি সত্যযুগের আবির্ভাব সম্ভব নয়? কবি সেই সত্যযুগের স্বপ্ন দেখিতেছে—

কবে দেব এ রজনী হবে অবসান?
স্নান করি প্রভাতের শিশির সলিলে,
তরুণ রবির করে হাসিবে পৃথিবী।
অযুত মানবগণ এক কণ্ঠে দেব,
এক গান গাহিবেক স্বর্গ পূর্ণ করি।
নাইক দরিদ্র, ধনি, অধিপতি, প্রজা,
কেহ কারো কুটীরেতে করিলে গমন
মর্যাদার অপমান করিবে না মনে,
সকলেই সকলের করিতেছে সেবা,
কেহ কারো প্রভু নয়, কেহ কারো দাস।
নাই ভিন্ন জাতি আর নাই ভিন্ন ভাষা
নাই ভিন্ন দেশ, ভিন্ন আচার ব্যাভার।
সকলেই আপনার আপনার লয়ে
পরিশ্রম করিতেছে প্রফুল্ল অন্তরে।

কেহ কারো সুখে নাহি দেয় গো কণ্টক,
কেহ কারো দুখে নাহি করে উপহাস।
দ্বেষ নিন্দা ক্রূরতার জঘন্য আসন
ধর্ম আবরণে নাহি করে গো সজ্জিত।
হিমাদ্রি, মানুষ সৃষ্টি আরম্ভ হইতে
অতীতের ইতিহাস পড়েছ সকলি,
অতীতের দীপশিখা যদি হিমালয়
ভবিষ্যৎ অন্ধকার পারে গো ভেদিতে
তবে বল কবে গিরি, হবে সেইদিন
যেদিন স্বর্গই হবে পৃথ্বীর আদর্শ।

সেদিন যদিও আজ দূরে তবু কবি যেন তাহা কল্পনানেত্রে দেখিতে পাইতেছে, তাহার দৃঢ় বিশ্বাস "একদিন তাহা আসিবে নিশ্চয়"।

এ সান্ত্বনা তাহাকে কে দিল? নলিনীর মৃত্যুশোকে যে সান্ত্বনা দিয়াছিল, এক্ষেত্রেও সেই প্রকৃতিই কবিকে আসন্ন সত্যযুগের আশ্বাস দিয়াছে।

আবার বলি গো আমি হে প্রকৃতি দেবী,
যে আশা দিয়াছ হৃদে ফলিবেক তাহা,
একদিন মিলিবেক হৃদয়ে হৃদয়ে।
এ যে সুখময় আশা দিয়াছ হৃদয়ে
ইহার সংগীত দেবি, শুনিতে শুনিতে
পারিব হরষ চিতে ত্যজিতে জীবন।

এমনি করিয়া প্রকৃতির মধ্যে সে কবির ব্যক্তিগত দুঃখ ও মানুষের সমষ্টিগত দুঃখ একই সান্ত্বনায় শান্তি লাভ করিল। নলিনীর মরণোত্তর অস্তিত্ব আর মানুষের সত্যযুগের সম্ভাবনা—এ দুয়েরই সান্ত্বনা প্রকৃতি দিয়াছে। একটা তো কবির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য, কাজেই অপরটা কি মিথ্যা হইতে পারে?

এইরূপে মানুষের দুঃখে অশ্রুপাত করিয়াও সত্যযুগের আশায় বুক বাঁধিয়া কবি হিমালয়ের শিখরে আছে—

বিশাল ধবল জটা বিশাল ধবল শ্মশ্রু,
নেত্রের স্বর্গীয় জ্যোতি গম্ভীর মূর্তি,
প্রশস্ত ললাট দেশ, প্রশান্ত আকৃতি তার
মনে হত হিমাদ্রির অধিষ্ঠাত্রী দেব।

কবি আপন মনে যখন একাকী বসিয়া থাকিত তখন দূর হইতে ''নলিনীর সুমধুর আহ্বানের গান'' শুনিতে পাইত। এমনিভাবে—

একদিন হিমাদ্রির নিশীথ বায়ুতে
কবির অন্তিম শ্বাস গেল মিশাইয়া।
হিমাদ্রি হইল তার সমাধি মন্দির,
একটি মানুষ সেথা ফেলে নি নিশ্বাস।
প্রত্যহ প্রভাত শুধু শিশিরাশ্রু জলে
হরিত পল্লব তার করিত প্লাবিত।
শুধু সে বনের মাঝে বনের বাতাস,
হু হু করি মাঝে মাঝে ফেলিত নিশ্বাস।
সমাধি উপরে তার তরুলতাকুল
প্রতিদিন বরষিত কত শত ফুল।
কাছে বসি বিহগেরা গাইতো গো গান,
তটিনী তাহার সাথে মিশাইতো তান।[৪]

কাহিনীর এই খসড়া পড়িলে বুঝিতে পারা যায় যে, কবি কল্পনার ইঙ্গিতে একটি মহৎ সত্য বুঝিতে পারিয়াছেন, ''মানুষের মন চায় মানুষেরি মন''। কিন্তু কোথায় মানুষ? কবি এখনও মানুষকে চেনেন না, তাই কাব্য লিখিবার কালে কবি কলিকাতার অধিবাসী। সেটা মানুষের জগৎ বটে, কিন্তু মানুষের জগতে থাকিয়াও যে মানুষের সহিত তাঁহার পরিচয় হয় নাই তাহা আগেই

৪. মল্লিখিত কোন পূর্বরচনার অংশবিশেষ।

বলিয়াছি। মানুষের সহিত পরিচয় হইল না সত্য কিন্তু এটুকু বুঝিতে পারিলেন যে "মানুষের মন চায় মানুষেরি মন।" সেই মন না পাইলে আর সমস্তই কেমন লাবণ্যহীন। এই জন্যই প্রথম সর্গের...প্রকৃতি দীর্ঘকাল কবিকে তৃপ্তি দিতে পারে নাই। তার-পরে অবশ্য নলিনীর সঙ্গে কবির সাক্ষাৎকার, পরিচয় ও প্রণয় ঘটিল। তবে নলিনী তাঁহাকে শান্তিদানে অসমর্থ হইল কেন? নলিনী মানুষ নয়। সে শেলির Alastor কাব্যের "veil maid"-এর নূতন সংস্করণ, সে "The 'being' whom he loves"—মানসসুন্দরী ; সে কবিরই মনোরম প্রক্ষেপ মাত্র। "মানুষের মন চায় মানুষেরই মন"—এই যদি কবির আকাঙ্ক্ষা হয় তবে নলিনীতে কবির তৃপ্তি নাই, কেননা নলিনী কবিরই মন, কবিরই বহির্মূর্তি। সেইজন্য মানুষের সন্ধানে কবি বিশ্বভ্রমণে বহির্গত হইলেন, সারা বিশ্বভ্রমণ করিলেন কিন্তু শান্তি মিলিল না। পৃথিবী কি জন-শূন্য? তবে মানুষের সন্ধান কবি পাইলেন না কেন? বাস্তব ক্ষেত্রের মানুষ তখনো তাঁহার অভিজ্ঞতার অতীত, সেইজন্যই কাব্যে তাহার সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না। অবশেষে তাঁহাকে প্রত্যাবর্তন করিতে হইল। ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে নলিনী মৃত। নলিনী, তাঁহার 'কল্পনার বঁধু' মরিয়াছে বটে কিন্তু কবিকে এক-বারে নিঃসহায় করিয়া যায় নাই, প্রেমের রঙে প্রকৃতির উপরে একটি ঘনতর ইন্দ্রজালের মায়া মাখাইয়া দিয়া গিয়াছে। মানব-নিরপেক্ষ প্রকৃতি মানবময় হইয়া না উঠিলেও প্রেমময় হইয়া উঠায় কবিকে আশ্রয় দিতে সক্ষম হইয়াছে। কবি সেই শেষ আশ্রয়ের উপর নির্ভর করিয়া প্রতীক্ষা করিয়াছেন, আশ্বাস পাইয়াছেন কোন একদিন মানুষের মন তাঁহার মিলিবে।

প্রকৃতির সহিত আভাসে পরিচিত মানুষের সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত কবির কাব্য 'কবি কাহিনী'। আভাসে দেখা মানব-নিরপেক্ষ প্রকৃতি তাঁহাকে তৃপ্তি দিতে পারে নাই, কেননা মানুষের সহিত মিলিত না হওয়া পর্যন্ত প্রকৃতি কাব্যের বস্তু হইয়া উঠে না।

...কাব্য হয় না। আর সুখ দুঃখ বিরহ মিলন-পূর্ণ যে মানব-সংসার, তাহার পরিচয় এখনো কবির জীবনেতিহাসের ভাবী অধ্যায়ের অন্তর্গত। মানুষের প্রকৃত সমস্যার সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে নাই বলিয়াই 'বিশ্বপ্রেমের ঘটা' করিতে হইয়াছে, মানুষের সহিত পরিচিত হইবার পরে আর তাঁহাকে বিশ্বপ্রেমের utopia সৃষ্টির বিড়ম্বনা সহ্য করিতে হয় নাই। বিশুদ্ধ প্রকৃতিতে অতৃপ্ত কবির বৃহৎ মানব-সংসারের দিকে প্রথম অনিশ্চিত পদক্ষেপের কাব্য 'কবি কাহিনী'। এই ইঙ্গিতটি মনে রাখিয়া অগ্রসর হইলে তাঁহার পরবর্তী কাব্যসমূহের গতি, প্রকৃতি ও তাৎপর্য সহজবোধ্য হইয়া উঠিবে।

রবীন্দ্রনাথের গল্পে রূপক ও রূপকথা

শ্রীসুকুমার সেন

ধর্মকর্মের বাহিরে সাহিত্যের প্রয়াস প্রথম দেখা গিয়াছিল গল্পে। সে কাজ ছিল মন ভোলানো শিশুর অথবা নিষ্কর্মা বয়স্কের। শিশুর গল্প রূপকথা সব চেয়ে পুরানো হইলেও সাহিত্যে তাহার স্বীকৃতি বিলম্বিত হইয়াছিল। তবে আমাদের দেশে প্রায় গোড়ার দিক থেকেই বালকের অথবা অল্পবুদ্ধি বয়স্কের শিক্ষাসংবিধানে রূপকথাকে সাধারণ জীবনে প্রয়োজনীয় অথবা ধর্মজীবনে অনুকূল উপদেশের হাতল পরাইয়া সাহিত্যের কাজে লাগানো হইয়াছিল। ছেলে ভুলানো গল্পে বিষয়বস্তুর সত্যাসত্য লইয়া কোন চিন্তা নাই, পাত্রপাত্রীর সম্ভবাসম্ভবত্ব লইয়াও মাথা-ব্যথা নাই। দেব দানব, যক্ষ রক্ষ থেকে সিংহ বাঘ, হাতি শিয়াল, সজারু, ইঁদুর, কাক, পিঁপিড়া পর্যন্ত সব বাস্তব অবাস্তব জীব লইয়াই ছেলে ভুলানো গল্পের কারবার। সংস্কৃত সাহিত্যে পঞ্চ-তন্ত্রের কথায়, পালি (বৌদ্ধ) সাহিত্যে চরিত-গল্পে তাহাই দেখি। এ ধরনের গল্পের একটা পরিণতি হইয়াছিল রূপক-গল্পে, ইংরেজীতে যাহাকে প্যারাবল বলে।

নিছক ছেলে ভুলানো গল্পের প্রতি শিক্ষিত বয়স্ক লোকের দৃষ্টিপাত ঊনবিংশ শতাব্দের বিজ্ঞানবুদ্ধি জাগরণের ফল। আমাদের দেশে এ ব্যাপার বিদেশী শিক্ষার ফলেই শুরু হইয়াছিল। ভারতীয় শিক্ষিত ও সাহিত্যিক ব্যক্তিদের মধ্যে রেভারেন্ড লালবিহারী দে সর্বপ্রথম ছেলে ভুলানো গল্পের সংকলন ইংরেজীতে প্রকাশ করেন। তাঁহার বই বিদেশে সমাদৃত হইয়াছিল, দেশেও ইংরেজী ভাষায় পাঠ্যপুস্তকরূপে বহু প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আগে কোন বাঙগালী (বা ভারতীয়) সাহিত্যিক ছেলে

ভুলানো গল্পের যে কোন কিছু মূল্য আছে সে বিষয়ে ইঙ্গিতমাত্র করেন নাই।

রবীন্দ্রনাথ অনেক কিছু ভালো সৃষ্টি করিয়াছেন এবং অনেক কিছু ভালো—যা আমরা আগে গ্রাহ্যের মধ্যে আনি নাই—আমাদের চোখের সামনে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। তাহার মধ্যে একটি ছেলে-ভুলানো ছড়া ও গল্প। শুধু তাই নয়, নিজেও গল্প ও প্রবন্ধ রচনায় রূপকথার (এবং রূপকের) ছাঁচ ও ছাঁদ ব্যবহার করিয়াছেন।

রূপক ও রূপকথা বিজড়িত প্রথম রচনা 'একটা আষাঢ়ে গল্প' সাধনায় ১২৯৯ সালের আষাঢ় সংখ্যায় বাহির হইয়াছিল। ইহার অনেক আগে রীতিমত ছোটগল্প লেখার অস্ফুট প্রয়াসের সময়ের রচনা দুইটিতে (—'ঘাটের কথা' ও 'রাজপথের কথা'—)[১] রূপকের আভাস দেখা দিয়াছিল। একটা আষাঢ়ে-গল্পের আরম্ভ ও শেষ রূপকথার মতো, মাঝখানে রূপকের সঙ্গে রূপকথার জড়াজড়ি। রূপকথায় পাথর-হওয়া অথবা প্রাণহীন মানব-মানবী রাজপুত্রেরা সোনার কাঠির স্পর্শে সজীব হয়। রবীন্দ্রনাথের রচনায় 'তাসের দেশের' নরনারী পাষাণ নয়, নিষ্প্রাণ, অর্থাৎ নির্মনস্ক—ইমোশন বর্জিত, যেন যন্ত্রমানুষ। রাজপুত্রের হৃদয়ের আতপ্ত স্পর্শ পাইয়া একে একে তাহারা মোহ-আবরণ ভেদ করিয়া সুখদুঃখ ভালোমন্দের জীবনে ভূমিষ্ঠ হইল। রূপকটির তাৎপর্য গভীর ও ব্যাপক। রচনাকালে হয়ত রবীন্দ্রনাথের মনে দেশের অবস্থার কথা জাগিয়াছিল। এখন কিন্তু রূপকটির গুরুত্ব অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। পৃথিবীর মানুষকে এখন রাষ্ট্রক্রীড়ার ঘুঁটি রূপে জনপিণ্ড করিবার চেষ্টা চলিয়াছে।

ঠিক এক বছর পরে বাহির হইল 'অসম্ভব গল্প' (পরে অসম্ভব

১. রচনা দুইটি পর পর বাহির হইয়াছিল (ভারতী, কার্তিক ১২৯১; নবজীবন, অগ্রহায়ণ ১২৯১)। এ দুইটি ঠিক গল্প নয় বলিয়া রবীন্দ্রনাথ প্রথমে 'গল্পগুচ্ছ' (১৯০০), হইতে বাদ দিয়াছিলেন।

কথা)। রূপকথার ধাঁচে আগাগোড়া লেখা হইলেও এটি ঠিক গল্প নয়। সেইজন্য প্রথমে গল্পগুচ্ছে (১৩০০, ১৯০৮-৯) সংকলিত হয় নাই, তাহার বদলে বিচিত্র প্রবন্ধে (১৯০৭) প্রথম স্থান পাইয়াছিল।[২] অসম্ভব-কথায় আত্মকথা ও আত্মভাবনা রূপকথার ছাঁদে উপস্থাপিত। ইহার আগে একটি গল্পে ('গিন্নি') রবীন্দ্রনাথ নিজের বাল্যজীবনের অভিজ্ঞতাকে গল্পের বস্তুরূপে ব্যবহার করিয়াছিলেন। অসম্ভব-কথায় জীবনকথা প্রচ্ছন্ন নয় এবং শেষভাগে তাহা রূপকথায় ছায়াচ্ছন্ন। ব্যক্তিজীবনের অনুভাবকে প্রকাশ করিবার রমণীয় কৌশল এই গল্পে দেখা গেল। রচনাটি এই সময়ে লেখা ছেলে ভুলানো ছড়া ইত্যাদি প্রবন্ধের পরিপূরক।

অসম্ভব-কথার দুইমাস পরে 'একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প' বাহির হইল। এটি পুরাপুরি রূপক গল্পের (parable) আঁট-সাঁট ছাঁদে লেখা। রচনাটির লেজামুড়া বাদ দিয়া গল্পটুকু উদ্ধৃত করিতেছি। এটিকে রবীন্দ্রনাথের লেখা আদর্শ ফেব্‌ল্‌ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

> পৃথিবীতে একটি মহানদীর তীরে একটি মহারণ্য ছিল। সেই অরণ্যে এবং সেই নদীতীরে এক কাঠঠোকরা এবং একটি কাদাখোঁচা পক্ষী বাস করিত।
>
> ধরাতলে কীট যখন সুলভ ছিল তখন ক্ষুধানিবৃত্তিপূর্বক সন্তুষ্টচিত্তে উভয়ে ধরাধামের যশকীর্তন করিয়া পুষ্টকলেবরে বিচরণ করিত।
>
> কালক্রমে, দৈবযোগে পৃথিবীতে কীট দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিল।
>
> তখন নদীতীরস্থ কাদাখোঁচা শাখাসীন কাঠঠোকরাকে কহিল, "ভাই কাঠঠোকরা, বাহির হইতে অনেকের নিকট এই পৃথিবী নবীন শ্যামল সুন্দর বলিয়া মনে হয়, কিন্তু আমি দেখিতেছি ইহা আদ্যোপান্ত জীর্ণ।"
>
> শাখাসীন কাঠঠোকরা নদীতটস্থ কাদাখোঁচাকে বলিল, "ভাই কাদা-

২. রাজপথের কথাও বিচিত্র প্রবন্ধে সংকলিত হইয়াছিল।

খোঁচা, অনেকে এই অরণ্যকে সতেজ শোভন বলিয়া বিশ্বাস করে, কিন্তু আমি বলিতেছি, ইহা একেবারে অন্তঃসারবিহীন।"

তখন উভয়ে মিলিয়া তাহাই প্রমাণ করিয়া দিতে কৃতসংকল্প হইল। কাদাখোঁচা নদীতীরে লম্ফ দিয়া পৃথিবীর কোমল কর্দমে অনবরতই চঞ্চু বিন্ধ করিয়া বসুন্ধরার জীর্ণতা নির্দেশ করিতে লাগিল। এবং কাঠঠোকরা বনস্পতির কঠিন শাখায় বারম্বার চঞ্চু আঘাত করিয়া অরণ্যের অন্তঃশূন্যতা প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইল।

বিধিবিড়ম্বনায় উক্ত দুই অধ্যবসায়ী পক্ষী সংগীত-বিদ্যায় বঞ্চিত। অতএব কোকিল যখন ধরাতলে নব-নব বসন্ত সমাগম পঞ্চম স্বরে ঘোষণা করিতে লাগিল, এবং শ্যামা যখন অরণ্যে নব-নব প্রভাতোদয় কীর্তন করিতে নিযুক্ত রহিল, তখন এই দুই ক্ষুধিত অসন্তুষ্ট মূক পক্ষী অশ্রান্ত উৎসাহে আপন প্রতিজ্ঞা পালন করিতে লাগিল।

গল্পটির যে দুইপক্ষ "নীতিকথা" (moral) আছে তাহা চট করিয়া বুঝিয়া ফেলিবার নয়। উপসংহারে রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাহা ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন। গল্পটা পুরাতন বটে। সুখ-দুঃখের কাহিনীও বটে।

কৃষ্ণপক্ষে মরাল্ঃ

বহুদিন হইতেই অকৃতজ্ঞ কাঠঠোকরা পৃথিবীর দৃঢ় কঠিন অমর মহত্ত্বের উপর ঠক্ঠক্ শব্দে চঞ্চুপাত করিতেছে এবং কাদাখোঁচা পৃথিবীর সরস উর্বর কোমলত্বের মধ্যে খচ্খচ্ শব্দে চঞ্চু বিন্ধ করিতেছে—আজও তাহার শেষ হইল না, মনের আক্ষেপ রহিয়া গেল।

শুক্লপক্ষে মরাল্ঃ

ইহার মধ্যে দুঃখের কথাও আছে সুখের কথাও আছে। দুঃখের কথা এই যে, পৃথিবী যতই উদার এবং অরণ্য যতই মহৎ হউক, ক্ষুদ্র চঞ্চু আপনার উপযুক্ত খাদ্য না পাইবামাত্র তাহাদিগকে আঘাত করিয়া আসিতেছে, এবং সুখের বিষয় এই যে, তথাপি শত সহস্র বৎসর পৃথিবী নবীন এবং অরণ্য শ্যামল রহিয়াছে। যদি কেহ মরে তো সে ওই দুটি

বিদ্বেষ-বিষ-জর্জর হতভাগ্য বিহঙ্গ, এবং জগতে কেহ সে সংবাদ জানিতেও পারে না।

'একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প' লিখিবার পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর পরে আবার রবীন্দ্রনাথ রূপক রূপকথাময় গল্প অথবা গল্পাভাস লিখিবার প্রেরণা অনুভব করিয়াছিলেন। সে রচনাগুলি 'লিপিকা'য় সন্নিবিষ্ট আছে। লিপিকার সব রচনাই ঠিক এই শ্রেণীতে পড়ে না। প্রথম অংশে যে চৌদ্দটি রচনা (বা "কথিকা") আছে তাহার মধ্যে দুই তিনটিকে রূপক-রূপকথার শ্রেণীতে জোরজার করিয়া ফেলা যায়। প্রথম কথিকা 'পায়ে চলার পথ' ১২৯১ সালে লেখা 'রাজপথের-কথা'র যেন জের টানিয়াছে। 'পুরানো বাড়ি'র মত ক্ষীণ কথাবস্তু অনেক কাল পরে গদ্য-কবিতায় উপস্থাপিত হইয়াছে।

'লিপিকা'র দ্বিতীয় অংশের সাতটি রচনার সবগুলিতেই অল্পাধিক পরিমাণে গল্পবস্তু আছে। কোন কোনটিতে রূপকের রঙ বেশি, কোন কোনটিতে রূপকথার ছায়া বেশি। 'বিদূষক' ছাড়া কোনটিই নেহাত ক্ষীণকায় নয়। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তিনটি রচনা। 'হিতবাদী'তে প্রকাশিত 'খাতা' গল্পের সহযোগী 'নামের খেলা' গল্পগুচ্ছে স্থান পাইবার যোগ্য। 'রাজপুত্তুর'এ বর্তমান কালের সাধারণ বাঙালী ঘরের ছেলেমেয়ের কাহিনী উপলক্ষ্য করিয়া মানুষের জয়যাত্রা চিরকালের রূপকথার ভাষায় ভণিত। ৬১০ শব্দের একটি মহাকাব্য বলিলে অন্যায় হয় মনে করি না।

> পৃথিবীতে আর সকলে টাকা খুঁজছে, নাম খুঁজছে, আরাম খুঁজছে ; আর যে আমাদের রাজপুত্তুর সে দৈত্যপুরী থেকে রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে বেরিয়েছে। তুফান উঠ্‌ল, নৌকো মিল্‌ল না, তবু সে পথ খুঁজছে।
>
> এইটেই হচ্চে মানুষের সব গোড়াকার রূপকথা, আর সব দেশের। পৃথিবীতে যারা নতুন জন্মেচে, দিদিমার কাছে তাদের এই চিরকালের খবরটি পাওয়া চাই যে, রাজকন্যা বন্দিনী, সমুদ্র দুর্গম, দৈত্য দুর্জয়,

আর ছোট মানুষটি একলা দাঁড়িয়ে পণ করেচে বন্দিনীকে উদ্ধার করে আনব।...

যুগে যুগে শিশুরা মায়ের কোলে বসে খবর পায়,—সেই ঘরছাড়া মানুষ তেপান্তর মাঠ দিয়ে কোথায় চল্‌ল। তার সাম্‌নের দিকে সাত সমুদ্রের ঢেউ গর্জন করচে।

ইতিহাসের মধ্যে তার বিচিত্র চেহারা, ইতিহাসের পরপারে তার একই রূপ,—সে রাজপুত্তুর॥

রূপকথাকে রূপকের আভরণ দিলে যেমন হয় তাহার উদাহরণ পাই 'সুয়োরাণীর সাধ'-এ।

'লিপিকা'র তৃতীয় অংশে সতেরোটি রচনা। দুই একটিতে গল্পবস্তু কিছু নাই। কতকগুলি রচনাকে তত্ত্বগর্ভ গল্পিকা (অর্থাৎ parable) বলিতে পারি। যেমন 'ঘোড়া', 'কর্তার ভূত', 'তোতা-কাহিনী', 'সিদ্ধি', 'রথযাত্রা', ও 'সওগাত'। 'কর্তার ভূত' বাঙ্গালাদেশের মামুলি ভূতের গল্পের রীতি মতো ছাঁদা। রচনাটি গভীর মূলপ্রসারী সত্যগর্ভ এবং অত্যন্ত ঝাঁঝালো। আরব্য উপন্যাসের সিন্ধবাদ একবার এক স্কন্ধচাপা বৃদ্ধের পাল্লায় পড়িয়াছিল। আর আমরা দেশ-কে-দেশ বহু কর্তা-ভূতের দৌরাত্ম্যে নিষ্পিষ্ট। অথচ দোষ মরিয়া ভূত হইয়া থাকা কর্তাদের নয়, দোষ আমাদেরই।

দেশের মধ্যে দুটো একটা মানুষ—যারা দিনের বেলা নায়েবের ভয়ে কথা কয় না—তারা গভীর রাত্রে হাত জোড় করে বলে "কর্তা, এখনো কি ছাড়্‌বার সময় হয় নি?"

কর্তা বলেন, "ওরে অবোধ, আমার ধরাও নেই ছাড়াও নেই, তোরা ছাড়লেই আমার ছাড়া।"

তারা বলে, "ভয় করে যে কর্তা।"

কর্তা বলেন, "সেইখানেই ত ভূত।"

'তোতা-কাহিনী'কে অস্বীকার করিতে পারি না। আমাদের

দেশের শিক্ষাব্যবস্থার যে সমালোচনা আছে তাহার উপযোগিতা বাড়িয়াছে বই কমে নাই।

বেশির ভাগই সোজাসুজি রূপকথার ছাঁদে লেখা। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—'পট', 'নতুন পুতুল', 'উপসংহার', 'পুনরাবৃত্তি', ও 'পরীর পরিচয়'। পরীর-পরিচয় এবং শেষ রচনা 'স্বর্গ-মর্ত্য' আকারে সাধারণ ছোটগল্পের মতোই। 'স্বর্গ-মর্ত্য' নাট্যের ধরনে সংলাপে গাঁথা। গোড়ায় ও শেষে একটি করিয়া গান আছে। প্রথম গানে কথিকাটির রূপক-মর্ম উদ্‌ঘাটিত।

> মাটির প্রদীপখানি আছে মাটির ঘরের কোলে,
> সন্ধ্যাতারা তাকায় তারি আলো দেখ্‌বে বলে'॥
> সেই আলোটি নিমেষহত প্রিয়ার ব্যাকুল চাওয়ার মত,
> সেই আলোটি মায়ের প্রাণের ভয়ের মত দোলে॥
> সেই আলোটি নেবে জ্বলে শ্যামল ধরার হৃদয়তলে,
> সেই আলোটি চপল হাওয়ায় ব্যথায় কাঁপে পলে পলে॥
> নাম্‌ল সন্ধ্যাতারার বাণী আকাশ হ'তে আশীষ আনি,
> অমর শিখা আকুল হ'ল মর্ত্য শিখায় উঠ্‌তে জ্বলে'॥

অদ্ভুতরসের (fantasy) ভিয়ানে পাক করা ছেলে ভুলানো গল্প অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেই ঘটিয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যে এমন গল্প ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রথম লিখিয়াছিলেন। ছোট ছেলেদের একটি পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ একটি অদ্ভুতরসের গল্প লিখিয়াছিলেন, নাম 'ইচ্ছাপূরণ'।[৩] গল্পটি সাদাসিধা, এবং সোজা-সুজি ছেলেদের জন্য লেখা।

শেষ বয়সে রবীন্দ্রনাথ পদ্যে ও গদ্যে অদ্ভুতরসের কাহিনী রচনায় নূতন প্রেরণা অনুভব করিয়াছিলেন। পদ্য রচনাগুলির অধিকাংশেই কাহিনী যৎসামান্য। সেগুলি 'ছড়ার ছবি' (১৯৩৭) ও 'খাপছাড়া'য় (১৯৩৭) সংকলিত আছে। গদ্য কাহিনীগুলি এক-

৩. প্রথম প্রকাশ 'সখা ও সাথী' (আশ্বিন ১৩০২)।

সূত্রে গাঁথা হইয়া 'সে' (১৯৩৭) বইটিতে সংকলিত হইয়াছে।[৪] উপক্রমণিকা বাদ দিলে বইটিতে পনেরোটি গল্প ও গল্পাংশ আছে। সেগুলির এই নাম দিতে পারা যায়,—হুঁহাউ দ্বীপের ইতিহাস, শিবা-শোধন সমিতির রিপোর্ট, গেছো বাবা, সে-র কনে-দেখা কাণ্ড, সে-র অসম্ভব গল্প, বাঘের কাণ্ড, সে-র দেহবদল প্রথম পর্ব, সে-র দেহবদল দ্বিতীয় পর্ব, সে-র মগজ বদল, পুপে-সুকুমারের এডভেঞ্চার, পুপের ছেলেবেলার গল্প, সে-র সংগীত-সাহিত্য সাধনা, মাষ্টার মশায়ের কথা, দাদামশায় ও সুকুমারের কথা। অধিকাংশ গল্পের মধ্য দিয়া একটি প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গকৌতুকের ধারা বহিয়া গিয়াছে। তাহাতে রচনায় নূতন স্বাদ জাগিয়াছে। কিন্তু রচনাগুলির আসল প্রেরণা আসিয়াছিল খেয়ালখুশি হইতে, যে খেয়ালখুশি তাঁহাকে তখন ছবি আঁকিবারও প্রেরণা দিয়াছিল। বইটির 'উৎসর্গ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ সে দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

আমারো খেয়াল ছবি মনের গহন হোতে
ভেসে আসে বায়ুস্রোতে।
নিয়মের দিগন্ত পারায়ে
যায় সে হারায়ে...
যেমন-তেমন এরা বাঁকা বাঁকা
কিছু ভাষা দিয়ে কিছু তুলি দিয়ে আঁকা,
দিলেম উজাড় করি' ঝুলি।

ব্যঙ্গকৌতুকের একটু উদাহরণ দিই। সে-র কাহিনীর সূত্রধার দাদামশায় লেখক নিজে। অনাথ-তারিণী-সভার সভ্য ছেলেদের গান বাজনায় চীৎকারে বাধ্য হইয়া পার্স-এ যা কিছু ছিল—একটাকা ন আনা তিন পয়সা—সবই দিয়া দিলেন। তখনও মাস কাবার হইতে

৪. বইটিতে রবীন্দ্রনাথের আঁকা অনেকগুলি ছবি আছে। সেগুলি গল্পের রস বাড়াইয়াছে। কিছু কিছু কবিতাও আছে।

দুই দিন বাকি। ছেলেরা খুশি হইল না, তাঁহাকে কৃপণ লক্ষপতি বলিয়া গালি দিতে লাগিল।

> এ কথাগুলো পুরোনো ঠেকল, কিন্তু ঐ লক্ষপতি বিশেষণটাতে শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।
>
> এই হোলো সুরু। তারপরে ইতিমধ্যে পঁচিশটা সভার সভ্য হয়েছি। বাংলাদেশে সরকারী সভাপতি হয়ে দাঁড়ালেম। আমি ভারতীয় সংগীত-সভা, কচুরিপানাধ্বংসন সভা, মৃত-সৎকার সভা, সাহিত্যশোধন সভা, তিন চন্ডীদাসের সমন্বয় সভা, ইক্ষু-ছিবড়ের পণ্যপরিণতি সভা, খন্যানে খনার লুপ্তভিটা সংস্কার সভা, পিঁজরাপোলের উন্নতিসাধিনী সভা, ক্ষৌর-ব্যয়নিবারণী-দাড়ি-গোঁফ-রক্ষণীসভা—ইত্যাদি সভার বিশিষ্ট সভ্য হয়েছি। অনুরোধ আসছে, ধনুষ্টঙ্কারতত্ত্ব বইখানির ভূমিকা লিখতে, নব্যগণিত পাঠের অভিমত দিতে, ভুবনডাঙগায় ভবভূতির জন্মস্থান নির্ণয় পুস্তিকার গ্রন্থকারকে আশীর্বাদ পাঠাতে, রাওল-পিন্ডির ফরেষ্ট অফিসারের কন্যার নামকরণ করতে, দাড়িকামানো সাবানের প্রশংসা জানাতে, পাগলামির ওষুধ সম্বন্ধে নিজের অভিজ্ঞতা প্রচার করতে।

মাষ্টারমশায়ের কথা অনেকটা সোজাসুজি গল্প। শুধু মাষ্টার-মশায় ভূমিকাটির জন্যই এটি গল্পগুচ্ছে স্থান পাইবার যোগ্য। দাদা-মশায় তাঁহার এক বন্ধু ইস্কুলের মাষ্টারমশায়ের কথা পাড়িলেন নাতনীর কাছে।

> আজো তাঁর মুখখানা স্পষ্ট মনে পড়ে। ক্লাসে বসতেন যেন আলগোছে, বইগুলো ছিল কণ্ঠস্থ। উপরের দিকে তাকিয়ে পাঠ ব'লে যেতেন, কথাগুলো যেন সদ্য ঝরে পড়ছে আকাশ থেকে।

মাষ্টার ক্লাসে পড়ায় কিন্তু ক্লাসের দিকে তাকায় না। লোকে ভাবে ক্ষ্যাপা।

> তারা বলে, তোমার পড়ানোয় ভুল হয় না কিন্তু পড়াচ্চ যে সেইটেই ভুলে যাও।

মাষ্টার বলে,

> পড়াচ্চি যদি না ভুলি তবে পড়াতে পারতুম না, নিছক মাষ্টারিই করে যেতুম। পড়ানোটা নিঃশেষে হজম হয়ে গেছে, ওটা নিয়ে মনটা আইঢাই করে না।

তাহার পড়াইবার প্রণালী কেমন জিজ্ঞাসা করিলে মাষ্টার উত্তর দিয়াছিল,

> গঙ্গাধারার বহে যাবার প্রণালী যে রকম। ডাইনে বাঁয়ে কোথাও মরু, কোথাও ফসল, কোথাও শ্মশান, কোথাও শহর। এই নিয়ে গঙ্গামায়ীকে পদে পদে বিচার করতে যদি হোত তা হোলে আজ পর্যন্ত সগর-সন্তানদের উদ্ধার হতো না। যাদের যতটা হবার তাই হয়, বিধাতার সঙ্গে টক্কর দিয়ে তার চেয়ে বেশি হওয়াতে গেলেই চলা বন্ধ। আমার পড়ানো চলে মেঘের মত শূন্য দিয়ে, বর্ষণ হয় নানা ক্ষেতে, ফসল ফলে ক্ষেত অনুসারে।

দাদামশায় (লেখক) ও সুকুমারের কথায় গল্পবস্তু আরো একটু পুষ্ট। এটিও গল্পগুচ্ছে স্থান পাইবার অধিকারী। পুপু আর সুকুমার এই দুই শিশুসঙ্গীর মধ্যে সুকুমারের সঙ্গে দাদা-মশায়ের মনের মিল ছিল বেশি। একদিন ছেলেমেয়ে দুইটি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, কি হইতে তাঁহার ইচ্ছা যায়। দাদামশায় হইতে চাহিয়াছিলেন,

> একখানা দৃশ্য অনেকখানি জায়গা জুড়ে। সকালবেলাকার প্রথম প্রহর, মাঘের শেষে হাওয়া হয়েছে উতলা, পুরোনো অশথ গাছটা চঞ্চল হয়ে উঠেছে ছেলেমানুষের মতো, নদীর জলে উঠেছে কলরব, উঁচুনিচু ডাঙায় ঝাপ্‌সা দেখাচ্ছে দলবাঁধা গাছ। সমস্তটার পিছনে খোলা আকাশ, সেই আকাশে একটা সুদূরতা,—মনে হচ্ছে যে অনেক দূরের ওপার থেকে একটা ঘণ্টার ধ্বনি ক্ষীণতম হয়ে গেছে বাতাসে, যেন রোদ্দুরে মিশিয়ে দিয়েছে তার কথাটাকে—বেলা যায়—

এ কল্পনা পুপুর কাছে অত্যন্ত উদ্ভট লাগিয়াছিল। কিন্তু সুকুমারের ভালো লাগিয়াছিল।

> গাছপালা নদী সবটার উপরে তুমি ছড়িয়ে মিলিয়ে গেছ মনে করতে আমার ভারি মজা লাগছে। আচ্ছা, সত্যযুগ কি কোনদিন আসবে।

দাদামশায় জবাব দিলেন,

> যতদিন না আসে ততদিন ছবি আছে কবিতা আছে। আপনার ভুলে গিয়ে আর কিছু হয়ে যাবার ঐ একটা বড়ো রাস্তা।

সে-র শেষ কথাটি রবীন্দ্রনাথকে বুঝিবার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

রবীন্দ্র-মনের দার্শনিক ভিত্তি

শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

চলতি অর্থে যাকে দর্শন বলে, তা একটা বিধিবদ্ধ শাস্ত্র এবং তার ব্যাপারী যাঁরা, তাঁরাই অভিহিত হন দার্শনিক নামে। কিন্তু দর্শনের যা মর্মবস্তু, তা নিহিত থাকে যে-কোন বিভাগের শ্রেষ্ঠ মননশীল মানুষের চিন্তার মধ্যেই। সে হিসাবে তাঁদেরও আমরা দার্শনিক বলি, অবশ্য ব্যাপক অর্থে। রবীন্দ্রনাথও এই অর্থেই দার্শনিক। জগৎ ও জীবনের মর্মলোকে প্রবেশ করেছেন তিনি চলতি ঐতিহ্যের আলোক-রেখা অনুসরণ করে নয়, আপন প্রজ্ঞা-দৃষ্টির আলোয় সব কিছুকে উদ্ভাসিত করে। দর্শন ও মননের এই স্বাতন্ত্র্যই হল দার্শনিকতা এবং পৃথিবীর সমস্ত শ্রেষ্ঠ কবিই এই অর্থে দার্শনিক।

কিন্তু বিপদ হল রবীন্দ্র-দর্শনের নিষ্কর্ষ আহরণ করা এবং তাকে একটি সুসংহত তত্ত্ববস্তুরূপে দাঁড় করানো নিয়ে। রবীন্দ্র-নাথ কি? জাতীয়তাবাদী, না আন্তর্জাতিক মৈত্রী ও বিশ্বমানবতা-বাদী? তিনি আস্তিক, না নাস্তিক, না সংশয়বাদী? আস্তিক হলে, বাক্য মনের অগোচর চৈতন্যময় পরব্রহ্মের উপাসক, না ব্যক্তি-প্রতীকে রূপায়িত লৌকিক দেব-দেবীর উপাসক? তিনি সরল আড়ম্বরহীন বৈরাগ্য ও তত্ত্বজ্ঞানদীপ্ত প্রাচীন তপোবন-সংস্কৃতির সমর্থক, না বিজ্ঞানভূয়িষ্ঠ গতি ও উৎপাদন-সমৃদ্ধ আধুনিকতার অনুগামী?

গোড়াতেই বলে রাখা দরকার যে রবীন্দ্রনাথের সমুদ্রের মতো বিশাল সাহিত্য-সাম্রাজ্যে সব কিছুরই নিদর্শন মিলবে। এমন অনেক গান, কবিতা ও প্রবন্ধ দেখানো যাবে, যা নিছক জাতীয়তাবাদের প্রাণ-রসে পুষ্ট। আবার এমন রচনাও তাঁর সংখ্যায় কম নয়, যাতে

জাতীয়তাকে তিনি অনভিপ্রেত, এমন কি বিপজ্জনক প্রতিপন্ন করেছেন, প্রচার করেছেন উজ্জ্বল আন্তর্জাতিকতার মহিমা। এমন অনেক গান কবিতা ও তত্ত্বব্যাখ্যামূলক নিবন্ধ পাওয়া যাবে, যা থেকে তাঁকে আদি ব্রাহ্মসমাজের একজন আচার্যরূপে দাঁড় করানো কঠিন নয়। আবার এমন রচনাও মিলবে, যা দেখিয়ে তাঁকে ভক্তিবাদী হিন্দুরূপে বিচার করলে দোষের হয় না। তাঁকে নিরীশ্বরবাদী জড় নিসর্গ-শক্তির অনুরাগী প্রমাণ করার মতো রচনাও খুঁজলে খুব অল্প পাওয়া যাবে না। তথাকথিত তত্ত্বজ্ঞান-সমুজ্জল তপোবন-সভ্যতার অনুকূল লেখা পাওয়া যাবে ভূরি ভূরি। আবার বিজ্ঞান বিভাসিত এই গতিশীলতা ও প্রাচুর্যপ্রদীপ্ত যুগধর্মের সমর্থনেও তাঁর বক্তব্য উপস্থিত করা যাবে চেষ্টা করলেই পর্যাপ্ত সংখ্যায়।

তাহলেই দাঁড়াল, রবীন্দ্র-দর্শন বলতে কি বুঝব? কোনখানে তার প্রাণগত ঐক্য? কি ভাবে সমন্বয় স্থাপন করা যাবে এই আপাতবিরোধী মত, পথ ও দৃষ্টিভঙ্গীগুলির মধ্যে? যদি সত্যিই খুঁজে পাওয়া না যায় এই ভগ্নাংশগুলির মধ্যে কোন প্রাণবন্ত যোগসূত্র, সবগুলিকেই যদি বিভিন্ন সময় ও পরিবেশে উদ্ভূত বিচ্ছিন্ন ভাবধারার অভিব্যক্তি বলে নিতে হয়, তাহলে যে মহত্ত্ব আমরা আরোপ করি রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তার ওপর, তা কি সত্য বা সমর্থনীয় বলে প্রমাণিত হবে? বলা বাহুল্য এই জায়গায় রবীন্দ্র-চর্চা আমাদের আজো নিতান্ত দুর্বল ও অসম্পূর্ণ রয়েছে। আমরা খণ্ডখণ্ড ভাবে তাঁর সাহিত্যের নানা বিভাগ নিয়ে, তাঁর জীবন ও কর্মের নানা অংশ নিয়ে আলোচনা করেছি। কিন্তু অখণ্ড মানুষ-টিকে তাঁর পূর্বাপর পরিণতির আলোয় ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করতে পারিনি। পারিনি, কারণ তার প্রয়োজন সম্বন্ধে চেতনাই জাগেনি আমাদের।

এই জন্যেই রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এত রকম খণ্ডিত, বিকৃত ও ঐকদেশিক দৃষ্টি একই সঙ্গে প্রকট হতে দেখা যায়। কেউ তাঁকে বঙ্কিম, বিবেকানন্দ ও র বন্দ প্রচারিত নব্য হিন্দু জা ায়তাবাদের

অপরতম প্রধান পুরোহিত বলে বোঝান। কেউ আবার তাঁকে রলাঁ অয়কেন মান প্রমুখ আন্তর্জাতিকতাবাদীদের সঙ্গে একাসনে বসান। কেউ তাঁকে দেবেন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রনাথের ঐতিহ্যবাহী ব্রাহ্ম আচার্য বলে, কেউ বা বৈষ্ণব যুগলারাধনার ভাবে ভাবিত প্রেমের কবি বলে বোঝান এবং ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, বিপিনচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ ব্রাহ্ম-বৈষ্ণবদের সমপদবীভুক্ত করেন। কেউ তাঁকে অতীত পুনরুজ্জীবনবাদী ওরিয়েন্টালিষ্ট রূপে চিত্রিত করে ঋষি সংজ্ঞা দেন। কেউ আবার তাঁকে বুদ্ধিবিমুক্তির প্রধান নায়করূপে রাম-মোহন-বিদ্যাসাগরের পরই ইদানীন্তন জাতীয় ইতিহাসের মহত্তম স্রষ্টা বলে অভিহিত করেন। একমাত্র রবীন্দ্রনাথকে নাস্তিক বা নিরীশ্বরবাদী বা সংশয়বাদী প্রমাণের লক্ষণীয় কোন চেষ্টা এপর্যন্ত হয়নি এবং তা না হওয়ার কারণ, সে-চেষ্টা আমাদের দেশে ধিক্কৃত ও দণ্ডিত হবার ভয় আছে। তবে হলে হতে পারত তা-ও।

সুতরাং সেই আগের প্রশ্ন, রবীন্দ্রনাথকে তাহলে আমরা কি ভাবে নেব? কি বলে বুঝব তাঁকে? যাঁরা তাঁর গান গেয়ে, নাটক অভিনয় করে, কিংবা তাঁর গল্প-উপন্যাস পড়ে আনন্দ পান, যাঁরা তাঁর প্রবন্ধ-নিবন্ধ পড়ে জ্ঞানার্জন করেন, তাঁদের কাছে এ প্রশ্ন হয়ত নিরর্থক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা সত্যি সত্যি চিনতে চান এবং আমাদের জীবন ও মননের গভীরে তাঁর দানের প্রকৃত তাৎপর্য কি বুঝতে চান, তাঁদের কাছে এ প্রশ্ন শুধু গুরুত্বপূর্ণ নয়, অপরি-হার্য। এদিকটা ঠিক ঠিক না বুঝে রবীন্দ্র-চর্চা সেই গল্পবর্ণিত অন্ধের হস্তীদর্শনের মতোই মর্মান্তিক এবং এখনো পর্যন্ত সেই ব্যাপারই হচ্ছে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে।

মনে রাখতে হবে রবীন্দ্রনাথ যখন কিশোর কবি, তখন প্রথম জাতীয় আন্দোলন রূপে এদেশে হয় হিন্দু মেলার উদ্যোগ এবং রাজনারায়ণ বসু ও নবগোপাল মিত্রের প্রভাবে ঠাকুর ভ্রাতৃবৃন্দ তার সঙ্গে যুক্ত হন ঘনিষ্ঠভাবে। এর পর আত্মপ্রকাশ করে কংগ্রেস জাতীয় মহাসভা এবং তা স্পর্শ করে লোক-চিত্তকে। এ দুইয়েরই

সুস্পষ্ট প্রভাব পড়েছে রবীন্দ্র-মানসিকতার ওপর। তারপর বঙ্গ-ভঙ্গ-প্রতিরোধ আন্দোলনের সঙ্গে এল স্বদেশী আন্দোলন এবং তাতে অন্যতম প্রধান নেতা হয়েই দেখা দিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র-সাহিত্যের জাতীয়তাবাদী অধ্যায়ের সূচনা এখানে। এর পর যখন স্বদেশী আন্দোলন রক্তাক্ত হিংসার মূর্তিতে রূপান্তরিত হল, পিছিয়ে এলেন রবীন্দ্রনাথ এবং সংঘাতশীল হিংস্র জাতীয়তার বিরোধী হতে সুরু করলেন তিনি তখনি আস্তে আস্তে। এরই পরবর্তী পরিণতি হল তাঁর আন্তর্জাতিকতা, যা ১৯১৩ সালে নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির পর থেকে ধীরে ধীরে পরিব্যাপ্ত হয়েছে তাঁর চিন্তা ও রচনায়। জাপানে ও আমেরিকায় প্রদত্ত তাঁর Nationalism পর্যায়ের বক্তৃতাবলীর খবর যাঁরা রাখেন, তাঁরা নিশ্চয় জানেন, হিংস্র জাতীয়তার বিরুদ্ধে অকপট সত্যভাষণের জন্যে কি মূল্য দিতে হয়েছে তাঁকে। ১৯৩১ সালে সোভিয়েট ভ্রমণের পরবর্তী দশ বছরে তাঁর এই আন্তর্জাতিকতা ক্রমশ শোষণবিমুক্ত শ্রেণীহীন সমাজ-রচনার আদর্শের দিকে মোড় ফিরেছে এবং তিনি জয়গান গেয়েছেন শ্রমকারী চাষী ও কারিগর সমাজের অন্তর্ভুক্ত নিরধিকার মানুষের। অর্থাৎ জাতীয়তা থেকে আন্তর্জাতিকতা এবং তা থেকে শ্রেণীবর্জিত বিশ্বমানবিকতায় বিবর্তন তাঁর ছেদহীন একটি ঐতিহাসিক ক্রমানুবন্ধে বাঁধা। এর সবগুলি ধাপ পরের পর মিলিয়ে গেলেই আমরা পাব রবীন্দ্র-মনের একটি অবিচ্ছিন্ন সচলতার ইতিবৃত্ত এবং তার মধ্যে দিয়ে জীবন্ত হয়ে উঠবে তাঁর রাজনীতিক দর্শন।

অধ্যাত্মতত্ত্ব বা জীবন-দর্শনের বিচারেও এই রকম পারম্পর্যের ধারা বা কার্য-কারণের ক্রমানুবন্ধ আবিষ্কার করা যাবে। আদি ব্রাহ্ম সমাজের স্থাপয়িতা ও আচার্য পিতা দেবেন্দ্রনাথ, তাঁর দক্ষিণ হস্ত অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ও অযোধ্যানাথ পাকড়াশী অল্প বয়সেই তাঁকে উপনিষদের, অর্থাৎ তথাকথিত ব্রাহ্ম মতবাদের অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন। ধর্মের তত্ত্বাংশ বনাম ফলিতাংশ নিয়ে আদি ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে যখন বঙ্কিম-শশধর মণ্ডলীর বিরোধ বাধে, তখন

রবীন্দ্রনাথ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন ব্রাহ্মরূপেই এবং পরমহংসদেব যখন ব্রাহ্মদের আক্রমণের বিষয়ীভূত হন, তখনো আমরা দ্বিজেন্দ্র-নাথ-রবীন্দ্রনাথকে দেখি ব্রাহ্মরূপেই। কিন্তু এ-ই তাঁর আসল রূপ নয়। তাছাড়া মনে করার কারণ আছে যে তখনো কবির ধর্মমত কোন সজীব প্রত্যয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। এর পর ঠাকুর-পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পত্নী ও পুত্র-কন্যাসহ তাঁর শান্তি-নিকেতন গমন, ব্রাহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন, পুত্র-কন্যা ও সহধর্মিণীর লোকান্তর, সংসার-জীবনের বিচিত্র বিপর্যয়, স্বদেশী আন্দোলনের অনভিপ্রেত পরিণতি, নানা বাস্তব কারণই জাগিয়ে তুলল প্রবল একটি তত্ত্বজিজ্ঞাসা তাঁর মনে এবং এখান থেকেই ধরা যেতে পারে, তাঁর ধর্মনিরীক্ষার সুরু। এই নিরীক্ষার ভিত্তিতে ছিল তাঁর কৈশোরে পাওয়া উপনিষদের প্রভাব, যৌবনে পড়া সারদাচরণ মিত্র সম্পাদিত এবং নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও বিপিনচন্দ্র পাল আলোচিত বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব, মধ্যমাগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথের কাছে পাওয়া বৌদ্ধ জীবনদর্শন ও বাউল-মরমিয়াদের কাছ থেকে পাওয়া প্রেম-ভক্তি দর্শনের প্রভাব। এসবের মিলিত রসায়নেই ধর্মমতের নানা বিচিত্র দিকের গভীর অভিব্যক্তি হয়েছে তাঁর মধ্য বয়সের গদ্য ও পদ্য রচনায়। ব্রহ্মসংগীতে ও গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্যের গানে ফুটেছে তাঁর ব্রাহ্ম-বৈষ্ণব মানবিকতার রূপটি। শান্তিনিকেতন বক্তৃতামালায় প্রকাশ পেয়েছে বেদোপনিষদ সংস্কৃতির সশ্রদ্ধ অনু-গামিতা। শিক্ষা ও জীবন-চর্যা বিষয়ক রচনাবলীতে এসেছে যুদ্ধের নীতিবিশুদ্ধি ও লোক-মঙ্গলবাদের প্রতিধ্বনি এবং জীবনের মহদর্থ ব্যাখ্যানে তিনি নিয়েছেন সন্ত বাউল মতের নির্দেশনা।

কাজেই এক দিকে তিনি অরূপ অসীমের সন্ধানী, অন্য দিকে প্রেমময় কান্তের সঙ্গে মিলনোৎসুক, এক দিকে রুদ্রকে অন্নপূর্ণাকে লক্ষ্মী ও বীণাপাণিকে চিত্র-প্রতীক রূপে ব্যবহার করেছেন তিনি বার বার নিসর্গ-লীলার নানা অবস্থান্তরকে রূপ দেবার জন্যে ; অন্য দিকে আবার জগৎ ও জীবনের অন্তর্লীন অনির্বচনীয় পরমের

প্রেরণাকে গ্রহণ করছেন তিনি অনেকটা তত্ত্বদর্শী অদ্বৈতবাদী রূপেই। তাঁর মনের এই দ্বৈত রূপটি ব্যাপ্ত থেকেছে অনেক দিন, যৌবন থেকে যৌবনোত্তর কালের শেষ পাদ পর্যন্ত, তাঁর 'তুমি'-মূলক গান ও কবিতায় এবং এখান থেকেই ধীরে ধীরে বার্গসোঁর Elan Vital বা সৃজনশীল দিব্যচেতনার অনুভূতি এসেছে তাঁর চিন্তায়। যে শক্তি এক-একবার এক-এক রকম সৃষ্টির ছক মেলে ধরছে, আবার সব ভেঙেচুরে অন্তহীন কাল-সমুদ্রে বিলীন হয়ে যাচ্ছে, আবার নূতন করে জেগে উঠছে. সেই প্রাণময় অফুরন্তকে রূপের বাঁধনে বেঁধেছেন তিনি।

এর পর পরমাণু বিজ্ঞানের বিশ্লেষণে এসে শেষ জীবনে প্রায় অনিবার্যভাবেই বস্তু থেকে স্বতঃ উৎসারিত প্রাণাত্মিক বিশ্বসৃষ্টির তত্ত্বে উপনীত হয়েছেন তিনি। পুরানো প্রত্যয় ধসে পড়েছে তাঁর এখানে। তার স্থানে মাথা তুলেছে জগৎ-চেতনা ও জীবন-চিন্তা। হাইজেনবার্গ ও আইনষ্টাইনের অনুরূপ বিজ্ঞান-বোধির দিব্যদ্যুতি বিচ্ছুরিত হতে থাকে তাঁর মননভঙ্গী থেকে। বলা যেতে পারে. এই অধ্যায়ে এসে তিনি নিরীশ্বর প্রাকৃতিক শক্তির অসীম সম্ভাবনীয়তা সম্বন্ধে অবহিত হয়েছেন এবং অর্ধশতাব্দীর অধিককাল ধরে লালিত ও প্রচারিত তাঁর জীবন-দর্শনকে ঢেলে সাজার প্রয়োজন অনুভব করেছেন। তাঁর জীবনের সর্বশেষ দশকের কবিতাগুলি এদিক থেকে সযত্নে অনুসন্ধানযোগ্য।

এই ভাবে কবির সমাজদৃষ্টি ইতিহাস-চেতনা এবং শিল্পবোধ নিয়েও পূর্বাপর বিচার করা এবং তার দার্শনিক ক্রমানুবন্ধ দাঁড় করানো যেতে পারে। মনে রাখতে হবে. জন্মসূত্রেই রবীন্দ্রনাথ এমন এক পরিবারে স্থান পান. যার সঙ্গে সাধারণ মানুষের যোগসূত্র ছিল সামান্য। স্কুল-কলেজে তিনি পড়েন নি বললেই চলে. বাল্যে তাই সহপাঠী বন্ধু ছিলেন না কেউ তাঁর। কৈশোর যৌবনে সুহৃদ সহকর্মী রূপেও তাঁর সংস্রবে আসেন নি কোন নিম্নবিত্ত সাধারণ মানুষ। শিলাইদহে গরীব গ্রামের মানুষ. চাষী ও দিন-মজুরদের

সঙ্গে আদান-প্রদান হয়েছে তাঁর, কিন্তু তখন তিনি জমিদার। স্বদেশী আন্দোলনের টানে ছাত্র ও গৃহস্থ সাধারণের সংস্রবে আসতে হয়েছে তাঁকে, কিন্তু তখন তিনি দেশের সর্বজন-সম্মানিত কবি ও জননেতা। তারপর শান্তিনিকেতনে তো তাঁর আবির্ভাব হয়েছে একেবারে গুরুদেব রূপেই। কাজেই সাধারণ মানুষের সঙ্গে অভাব-কৃচ্ছ্রতা ও বেদনার সমভূমিতে দাঁড়িয়ে একাত্মতা লাভের সুযোগই হয়নি তাঁর কোন দিন। সমাজকে, তার সমুদয় সংকট ও সমস্যাকে তাই তিনি দেখেছেন তাঁর সংবেদনশীল ভাব-কল্পনার উচ্চভূমি থেকে। এইজন্যেই তাঁর সাহিত্যে মানুষ এসেছে এক-একটা ভাবের বাহন রূপে এবং এসেছে অনেকটা বিরোধী ভাবের সঙ্গে সংগ্রামের তাগিদে।

এর ফলে তাঁর গল্প, উপন্যাস ও নাটকে এক দিকে যেমন জীবন-দর্শনের মহত্তম উপলব্ধিগুলি রূপায়িত হয়েছে, অন্য দিকে তেমনি প্রতিদিনের মানুষের ক্ষুধাতৃষ্ণা ও বেদনা-বঞ্চনার, অর্থাৎ তার রক্তাক্ত বাস্তবতার রূপটি গেছে অপরূপ কবিকর্মের অভিব্যঞ্জনায় আবৃত হয়ে। সমাজের বাস্তব মৃত্তিকা থেকে যে কারণে চিত্ত তাঁর নিরু-পাধিক ভাবলোকে উধাও হয়েছে, ঠিক সেই কারণেই ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যাও তাঁকে সামান্যই প্রভাবিত করেছে। সরল আড়ম্বর-হীন আত্মজ্ঞানঋদ্ধ এক কল্পিত তপোবন-সংস্কৃতির যুগকে তিনি উপস্থাপিত করেছেন আমাদের সামনে এবং আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রবণতাকে তারি আলোয় চিত্রিত করেছেন এক সমন্বয়-মুখী প্রবাহরূপে, যা যুগে যুগে বৈষম্যের মধ্যে সাম্য ও বহুর মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেছে। বলা বাহুল্য আমাদের সনাতনী একাধিকারের বিরুদ্ধে শূদ্র-দাসদের বিদ্রোহ, বৌদ্ধ-বিপ্লবের অভ্যুদয়, নিম্নবর্ণের হিন্দুর ইসলাম গ্রহণ, পর্যায়ক্রমে ঘটিত সামাজিক ভাঙন ও সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের পটভূমি চেনা যায় না এই ব্যাখ্যা থেকে।

কিন্তু এ হল কবির ব্যাখ্যা, এখানে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মাপকাঠি না হয় না-ই প্রয়োগ করলাম আমরা! এখানে ভাবকে ভাব,

রসকে রস রূপে গ্রহণ করাই ভালো। তবে কবি নিজেই যে জীবন-সায়াহ্নে তাঁর এই ভাব-ভুবনের দরজা খুলে রৌদ্রালোকিত বাস্তবের প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়াচ্ছিলেন, তার স্বাক্ষর মিলবে তাঁর শেষ দশ বছরের চিঠিপত্র, প্রবন্ধ ও কবিতায়। পশ্চিমী গণতন্ত্রগুলির মহান মানবতাশ্রিত সংস্কৃতির আড়ালে রাজনীতিক হিংস্রতা, শাঠ্য ও শোষণ এবং বিজ্ঞানগর্বী ফ্যাসিষ্টদের সর্বগ্রাসী নৃশংসতা অনিবার্যভাবেই তাঁকে সাম্যকামী সর্বাধিকারভ্রষ্ট শ্রমকারী মানুষের চরম জয় সম্বন্ধে আশান্বিত করে তুলেছিল। আশান্বিত করেছিল বিজ্ঞান-সমৃদ্ধ আধুনিকতার সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে। শুধু মানব-পরিজ্ঞান ও ইতিহাস-বিচারের নয়, সমগ্রভাবে জীবন ও শিল্প-চেতনার মাপকাঠিই তাঁর বদলে যাচ্ছিল। অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গে বুকের পাঁজর ও চোখের অশ্রু দিয়ে যুগে যুগে ইতিহাসের বনিয়াদ তৈরি করেছে যারা, যে নিঃসম্বল সাধারণ মানুষ মাটির কাছাকাছি আছে, তাদের সঙ্গে অপরিচয়ের বেদনা তীব্র হয়ে ফুটেছে তাঁর রচনায়। সসম্ভ্রম স্বাগত জানিয়েছেন তিনি সেই অনাগত জনসাধারণের কবিকে, যিনি এই আশাহত বঞ্চিত মানুষের বেদনাকে ভাষা দিয়ে নূতন দিনের অবতারণা করবেন। প্রবর্তন করবেন নূতন সাহিত্য ও শিল্প-ধারার।

এই যে মানসিক রূপান্তর, এ কি আকস্মিক? না এর পূর্বাপর সঙ্গতি ও সম্পর্কসূত্র আবিষ্কার করা যায় রবীন্দ্র-সাহিত্যের আদ্যন্ত মন্থন করলে? নিঃসন্দেহ তা যায়, কারণ জৈব-বিবর্তনের মতো ভাব-বিবর্তনেও অভিব্যক্তির একটা বিজ্ঞানসিদ্ধ ধারাবাহিকতা আছে। কিন্তু সেই ক্রমাভিব্যক্তির ধারাগুলি সযত্নে খুঁজে বের করতে হবে সমুদ্রের মতো বিশাল রবীন্দ্র-সাহিত্য থেকে। একে একে এই বিচিত্র দিকের ক্রমবিকাশের ধারাগুলি হাতে পেলে, তখনি সেগুলি পরস্পর যুক্ত করে রবীন্দ্র-মানসিকতার দার্শনিক ভিত্তি উপস্থাপন করা সম্ভব হবে। সে কাজ আজই করা যাবে না, কারণ সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্য রবীন্দ্র-জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে তন্ন তন্ন করে পড়া এবং

তা থেকে তত্ত্ব ও তথ্যের নিষ্কর্ষ আহরণ করে কোন প্রমাণসহ সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যতখানি পরিশ্রম ও মননশীলতার কাজ, তা করার মতো মানুষ এখনো আমাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু আজ যাচ্ছে না বলে কালও যাবে না, এ কে বলতে পারেন? সেই রকম বোদ্ধা-ব্যাখ্যাতা কেউ উঠবেন আমাদের মধ্যে থেকে, এই আশাতেই রবীন্দ্র-দর্শন অনুসন্ধানের প্রাথমিক কাঠামো একটা খাড়া করলাম এই নিবন্ধে।

রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার লোক-সাহিত্য

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

১৩০১ সালে যখন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়, তখন ইহার মুখপত্র 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'র প্রথম সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ যে প্রথম প্রবন্ধটি প্রকাশ করেন, তাহারই নাম 'ছেলে ভুলানো ছড়া'। ইহার পূর্ব হইতেই যে তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে ছড়া সংগ্রহ করিবার কার্যে নিযুক্ত ছিলেন, তাহা এই প্রবন্ধটি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়; কারণ, ইহাতে যে বিপুল সংখ্যক ছড়া তিনি উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার অননুকরণীয় ভাষায় বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন, তাহা একদিনে সংগৃহীত হইতে পারে নাই; কিংবা তখন তাঁহার সম্মুখে বাংলা ছড়ার কোন সংগ্রহও বর্তমান ছিল না। সংগ্রহের কার্য তাঁহাকে নিজেকেই করিতে হইয়াছে, তারপর সংগৃহীত উপাদানের তিনি রস-বিচার করিয়াছেন। ইহার পূর্বে প্রায় দশ বারোখানি ছোট বড় বাংলা প্রবাদের সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু একখানিও ছড়ার সংগ্রহ প্রকাশিত হয় নাই। বিদেশী ধর্ম-প্রচারকদিগের ভাষাশিক্ষার প্রয়োজনে প্রবাদগুলি সংগৃহীত হইয়া ইহাদের দ্বারা সেই প্রয়োজনই সিদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু ইহাদেরও যে অন্য আবেদন আছে, তখন পর্যন্তও তাহার সন্ধান কেহই জানিতেন না। প্রবাদগুলি তত্ত্বপ্রধান রচনা, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কবি; তত্ত্ব অপেক্ষা রসের আবেদনই তাঁহার নিকট অধিক। সেইজন্য প্রবাদসংগ্রহের গতানুগতিক ধারা পরিত্যাগ করিয়া বাংলার লোক-সাহিত্যের এক স্বতন্ত্র রূপ যে ছড়া তাহার অনুসন্ধানে তিনি প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি নিজেও এই বিষয়ে উল্লেখ করিয়াছেন যে, 'আমাদের ভাষা এবং সমাজের ইতিহাস নির্ণয়ের পক্ষে ছড়াগুলির বিশেষ মূল্য থাকিতে পারে, কিন্তু

তাহাদের মধ্যে যে একটি সহজ স্বাভাবিক কাব্যরস আছে, সেইটিই আমার নিকট অধিকতর আদরণীয় বোধ হইয়াছিল।' ভাষাশিক্ষার প্রয়োজন সাময়িক, কিন্তু কাব্যরসের আবেদন চিরন্তন। কাব্যরসের অস্তিত্বের মধ্য দিয়াই রচনা চিরন্তনত্ব লাভ করে। সুতরাং ছড়াগুলির মধ্য হইতে তিনি সেদিন বাঙালী পাঠককে যে কাব্যরসের সন্ধান দিয়াছিলেন, তাহার প্রতি অতি সহজেই বিদগ্ধ সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাহার ফলে তাঁহার পথ অনুসরণ করিয়া আরও অনেকেই বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের ছড়া সংগ্রহের কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

প্রায় সমসাময়িক কালে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এক সভায় রবীন্দ্রনাথ 'ছাত্রদিগের প্রতি সম্ভাষণ' করিয়া বলিয়াছিলেন, 'সন্ধান ও সংগ্রহ করিবার বিষয় এমন কত আছে, তাহার সীমা নাই। আমাদের ব্রত পার্বণগুলি বাংলার এক অংশে যেরূপ, অন্য অংশে সেরূপ নহে। স্থানভেদে সামাজিক প্রথার অনেক বিভিন্নতা আছে। এ ছাড়া গ্রাম্য ছড়া, ছেলে ভুলাইবার ছড়া, প্রচলিত গান প্রভৃতির মধ্যে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় নিহিত আছে। বস্তুতঃ দেশবাসীর পক্ষে দেশের কোনো বৃত্তান্তই তুচ্ছ নহে, এই কথা মনে রাখাই যথার্থ শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ।' বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়াই রবীন্দ্রনাথ আশা করিয়াছিলেন যে, দেশের এই জাতীয় সম্পদের সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কার্য ইহার ভিতর দিয়াই সুষ্ঠুভাবে নিষ্পন্ন হইতে পারিবে। দেশের ইংরেজীশিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি যখন সম্পূর্ণ পশ্চিমাভিমুখী হইয়া পড়িয়াছিল, তখনই রবীন্দ্রনাথ দেশের এই অবহেলিত রসোপকরণগুলির প্রতি যে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার ফলেই ইহাদের প্রতি দেশবাসী সচেতন হইয়া উঠিল। শুধু প্রবন্ধ রচনা করিয়া নিষ্ক্রিয় সহানুভূতি প্রকাশই নহে, তিনি নিজেও যে প্রকৃত সংগ্রহের কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় তাঁহার নিজস্ব ছড়া-সংগ্রহ প্রকাশের ভিতর দিয়াই তাহা

বুঝিতে পারা যায়। তাঁহার মত ব্যক্তির পক্ষে এই কার্য নিতান্ত সহজসাধ্য ছিল না, এমন কি, এই বিষয়ে পূর্ববর্তী কোন ধারাও আমাদের দেশে প্রবর্তিত হয় নাই। পাশ্চাত্য জগতে লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহ করিবার যে প্রণালী অবলম্বন করা হইয়া থাকে, তাহার সঙ্গে আমাদের দেশে তখন পর্যন্তও কোন পরিচয় স্থাপিত হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ এই দুরূহ কার্যের প্রণালী নিজেই উদ্ভাবন করিয়া লইয়া তাহা নিজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে বাংলা লোক-সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট রূপ সেদিন সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের 'ছেলে ভুলানো ছড়া' প্রবন্ধ ও তাঁহার নিজস্ব ছড়ার সংকলন প্রকাশিত হইবার সুফল অচিরে দেখিতে পাওয়া যাইতে লাগিল। ইহার পর কয়েক বৎসর যাবৎ এক প্রকার নিরবচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন সংগ্রাহক কর্তৃক সংকলিত হইয়া বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের ছড়া ও গান 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'র পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইতে থাকে। এইভাবে বসন্তরঞ্জন রায় কর্তৃক বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জিলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সংগৃহীত হইয়া 'ছেলে ভুলানো ছড়া'র এক অতি মূল্যবান সংগ্রহ ইহাতে প্রকাশিত হয়। রজনীকান্ত গুপ্ত 'সাঁওতাল পরগণার ছড়া' প্রকাশিত করেন। কুঞ্জলাল রায় ও অম্বিকাচরণ গুপ্ত বর্ধমান ও হুগলী জেলার ছড়া সংগৃহীত করিয়া প্রকাশ করেন। সুদূর চট্টগ্রাম হইতে মুন্সী আব্দুল করিম, সাহিত্যবিশারদ, বহুসংখ্যক ছড়ার এক অতি মূল্যবান্ সংগ্রহ পরিষৎ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত করিতে থাকেন। এই পথ অনুসরণ করিয়া দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, রামপ্রাণ গুপ্ত, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, হরিদাস পালিত, জীবেন্দ্রকুমার দত্ত প্রভৃতি বহু সংগ্রাহক প্রত্যেকে নিজেদের অঞ্চল হইতে ছড়া ও গীতি সংগ্রহ করিয়া পরিষৎ পত্রিকায় ক্রমশঃ প্রকাশিত করিতে থাকেন। পরিষৎ পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'ছেলে ভুলানো ছড়া' নামক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইবার পরবর্তী দশ বৎসর কালের

পরিষৎ পত্রিকার পাতা উল্টাইয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধটি কি সুদূর-প্রসারী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তবে এ কথা সত্য, আলোচনা ও সংগ্রহ রবীন্দ্রনাথ এই দুইটি ধারারই প্রবর্তন করা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের আলোচনার ধারাটি কেহই অনুসরণ করিবার প্রয়াস পর্যন্ত পান নাই, প্রত্যেকেই কেবলমাত্র সংগ্রহের পথটিই অনুসরণ করিয়াছেন। তথাপি এ কথাও অস্বীকার করা যায় না যে, তাঁহার সরস আলোচনাই সংগ্রহের প্রেরণা দিয়াছিল, নতুবা কেবলমাত্র তাঁহার সংগ্রহদ্বারা এত ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি কিছুতেই সম্ভব হইতে পারিত না। ছড়াগুলির কাব্যরসই রবীন্দ্রনাথকে ইহাদের প্রতি আকর্ষণ করা সত্ত্বেও ইহাদের সংগ্রহেরও যে প্রয়োজনীয়তা আছে, ইহারা যে সমাজ-মানস হইতে ক্রমাগতই লুপ্ত হইয়া গিয়া জাতির আত্মপরিচয় লাভের পথে বাধা সৃষ্টি করিতেছে, তাহাও তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সংগ্রহের কার্যটিও যে উপেক্ষণীয় নহে, বরং অনুসরণীয়, কবি হইয়াও সমাজ-তত্ত্ববিদের এই দায়িত্বটি তিনি বিস্মৃত হন নাই।

খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীব্যাপী লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন উপকরণের কেবলমাত্র সংগ্রহ-কার্য চলিতেছিল। রবীন্দ্রনাথও উক্ত প্রবন্ধ রচনার পূর্বে ছড়ার সংগ্রহকার্যেই ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি তাঁহার উক্ত প্রবন্ধের প্রথমেই উল্লেখ করিয়াছেন, ‘বাংলা ভাষায় ছেলে ভুলাইবার জন্য যে সব মেয়েলী ছড়া প্রচলিত আছে, কিছুকাল হইতে আমি তাহা সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত ছিলাম।’ অতএব দেখা যাইতেছে সংগ্রাহক রূপেই রবীন্দ্রনাথ বাংলা লোক-সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশ করিয়াছিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি যে ইতিপূর্বে বাংলা ছড়ার কোন সংগ্রহ তাঁহার সম্মুখে বর্তমান ছিল না, সেইজন্য সংগ্রহের আদর্শ তাঁহার নিজেকেই স্থির করিয়া লইতে হইয়াছে। পাশ্চাত্য জগতে লোক-সাহিত্যের যে ভাবে সংগ্রহ-কার্য নিষ্পন্ন করা হয়, তাহা নিতান্তই যান্ত্রিক (mechanical)। এমন কি, আধুনিক পাশ্চাত্য লোক-সাহিত্য-সংগ্রাহকগণ লোক-

সাহিত্যের বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহ করিতে গিয়া শব্দগ্রাহক যন্ত্র ব্যবহার করিবারই পক্ষপাতী। সে দেশে ইহার বিষয়ে গবেষণা করিবার যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, তাহা নিতান্ত মস্তিষ্ক-জাত, হৃদয়ের সঙ্গে তাহার কোন যোগ নাই। কিন্তু লোক-সাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহ করিতে গিয়া হৃদয়ের অনুভূতিকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়া কেবলমাত্র মস্তিষ্ককেই সক্রিয় রাখিলে যে সুফল পাওয়া যাইতে পারে না, তাহা যে কত সত্য, তাহা রবীন্দ্রনাথের 'ছেলে ভুলানো ছড়া' প্রবন্ধটি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। যে বিপুল লোক-সাহিত্যের উপকরণ-সম্ভার আজ পাশ্চাত্য দেশের সংগ্রাহকদিগের পরিশ্রমের ফলে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার তালিকা প্রস্তুত ও শ্রেণীবিভাগ করিবার দুরূহ কার্যে পাশ্চাত্য লোক-শ্রুতিবিদ্‌গণের সময় আজ অতিবাহিত হইতেছে ; কিন্তু যে ক্ষেত্রে ইহাদের প্রত্যক্ষ প্রয়োগ ও রসোপলব্ধি সেখানে তাহা উপেক্ষিত হইতেছে। সাহিত্যের আবেদন হৃদয়ের নিকট, কিন্তু উক্ত সংগ্রাহকগণ যে-ভাবে ইহাদের সংগ্রহ-কার্য নিষ্পন্ন করিতেছেন, তাহাতে হৃদয়ের নিকট ইহাদের কোন আবেদন প্রকাশ পাইতে পারে না, কেবলমাত্র মস্তিষ্কের নিকটই ইহাদের আবেদন প্রকাশ পায়। সুনির্দিষ্ট একটি পণ্ডিতগোষ্ঠীর নিকটই ইহার এই মস্তিষ্কের আবেদনটি প্রকাশ পাইবার যোগ্য ; বৃহত্তর বিদগ্ধসমাজের নিকট তাহার কোন মূল্য নাই। কিন্তু এই শ্রেণীর সংগ্রাহকদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহের একটি স্থূল পার্থক্য আছে। রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র কাব্যরসের দিক হইতেই ইহাদিগকে বিচার করিয়া তাঁহার সংগ্রহ-কার্য করিয়াছেন, এই কাব্যরসের আবেদন হৃদয়ে, মস্তিষ্কে নহে। নৃতত্ত্ব ও জাতিতত্ত্ব বিচারের দিক হইতে যাঁহারা লোক-সাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের অনেকেরই কাব্যরসবোধ বলিয়া কিছু থাকে না, থাকিলে তাঁহারা হৃদয়কে বাদ দিয়া মস্তিষ্ককেই অবলম্বন করিতে পারিতেন না। এমন কি, যদি কাব্যরসবোধ বলিয়া কাহারও কিছু থাকেও তথাপি তিনি তাহা

সম্পূর্ণ রুদ্ধ করিয়া না রাখিলে এ কার্যে অগ্রসর হইতে পারিবেন না। কারণ, তাঁহারা সমাজের মধ্যে যাহা যেমনটি পাইবেন, অবিকল সেইটি তেমনই গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেন। ব্যক্তিগত রস-বিচার-বোধ দ্বারা কোন কারণেই কিছুই পরিত্যাগ কিংবা কিছুই পরিবর্তন করিতে পারিবেন না। কারণ, মানব-সমাজে চিন্তাধারার ক্রমবিকাশ অনুসরণ করিবার জন্য প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি উপকরণেরই বিশিষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে। সুতরাং এই সকল সংগ্রাহকগণ অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ উপকরণ কিংবা গালিগালাজের ভাষাও নির্বিচারে সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতে যত্নশীল হইয়া থাকেন। সম্প্রতি মার্কিন দেশীয় কথ্য ভাষায় slang বা অশ্লীল শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে একখানি অত্যন্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে; পাশ্চাত্য ভাষায় কেবলমাত্র অশ্লীল শব্দের অভিধান পর্যন্ত সংকলিত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থ পাশ্চাত্য লোক-সাহিত্য সংগ্রাহক-দিগের নির্বিচার সংগ্রহের উপর ভিত্তি করিয়াই রচিত হইয়াছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহা তাঁহার বিশিষ্ট কবি-মানসের সৌন্দর্য, সংযম ও রুচিবোধদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। তাঁহার নিজস্ব আদর্শের যাহা সমর্থক, কেবলমাত্র তাহাই তাঁহার সংগ্রহে স্থান পাইয়াছে; নির্বিচার সংগ্রহের পথ তিনি অনুসরণ করেন নাই। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হইতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ নিজের সংগৃহীত একটি ছড়া এই ভাবে উদ্ধৃত কারয়াছেন—

> বোন কাঁদেন বোন কাঁদেন খাটের খুরো ধ'রে।
> সেই যে বোন—

ছড়াটি যে আকারে রবীন্দ্রনাথ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাতে ইহার পর এমন একটি গ্রাম্যভাবাপন্ন শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে যে, তাহা রবীন্দ্রনাথ নিজে এখানে উদ্ধৃত করিতে কুণ্ঠাবোধ করিয়াছেন। সেইজন্য তিনি পাঠকদিগের নিকট এই কৈফিয়ত দিয়াছেন,—

'এইখানে পাঠকদিগের নিকট অপরাধী হইবার আশঙ্কায় ছড়াটি শেষ করিবার পূর্বে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক বোধ করি। যে ভগিনীটি আজ খাটের খুরা ধরিয়া দাঁড়াইয়া অজস্র অশ্রুমোচন করিতেছেন, তাঁহার পূর্ব ব্যবহার কোনো ভদ্রকন্যার অনুকরণীয় নহে। বোনে বোনে কলহ না হওয়াই ভাল, তথাপি সাধারণতঃ এরূপ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া কন্যাটির মুখে এমন ভাষা ব্যবহার উচিত হয় না, যাহা আমি অদ্য ভদ্রসমাজে উচ্চারণ করিতে কুণ্ঠাবোধ করিতেছি। তথাপি সেই ছত্রটি একেবারেই বাদ দিতে পারিতেছি না। কারণ, তাহার মধ্যে কতকটা ইতর ভাষা আছে বটে, কিন্তু তদপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে বিশুদ্ধ করুণ রস আছে। ভাষান্তরিত করিয়া বলিতে গেলে মোট কথা এই দাঁড়ায় যে, এই রোরুদ্যমানা বালিকাটি ইতিপূর্বে কলহকালে তাঁহার সহোদরাকে ভর্তৃখাদিকা বলিয়া অপমান করিয়াছেন। আমরা সেই গালিটিকে অনতিরূঢ় ভাষায় পরিবর্তন করিয়া নিম্নে ছন্দ পূরণ করিয়া দিলাম—

বোন কাঁদেন বোন কাঁদেন খাটের খুরো ধ'রে।
সেই যে বোন গাল দিয়েছেন স্বামীখাকী বলে॥'

ভদ্রসমাজে অনুচ্চার্য কোন শব্দটিকে যে রবীন্দ্রনাথ এখানে 'স্বামীখাকী' বলিয়া পরিবর্তন করিয়া লইয়াছেন, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। অতএব দেখা যাইতেছে, এই সংগ্রহ ও ইহার বিশ্লেষণ সৌন্দর্যবিলাসী ও আদর্শবাদী কবির সংগ্রহ ও বিচার—পাশ্চত্য জগতে নৃতত্ত্ব, জাতিতত্ত্বালোচনার উপকরণ হিসাবে লোক-সাহিত্যের উপকরণ যে ভাবে সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হইয়া থাকে, ইহা তাহা নহে।

সুতরাং দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নিজস্ব রস, রুচি ও সৌন্দর্যবোধ অনুযায়ীই প্রধানতঃ ছড়াগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন ; যে সকল ছড়া তাঁহার মতে অতিরিক্ত গ্রাম্যতা-ভাবাপন্ন তাহা তাঁহার সংগ্রহ ও আলোচনায় স্থান লাভ করিতে পারে নাই। তবে তাঁহার

সংগ্রহের একটি প্রধান গুণ এই যে, তিনি গ্রাম্যতা দোষ-দুষ্ট কোন কোন ছড়া তাঁহার সংগ্রহ হইতে পরিত্যাগ করিলেও কোন ছড়াই নিজে ইচ্ছানুযায়ী পরিবর্তিত করিয়া প্রকাশ করেন নাই। ইহা তাঁহার ছড়াগুলির মৌলিক প্রকৃতি সম্পর্কিত সুগভীর জ্ঞানেরই পরিচায়ক। সুতরাং তাঁহার সংগ্রহ পরিমিত হইলেও ইহার উপর নির্ভর করিয়া সর্বপ্রকার আলোচনাই সার্থক করিয়া তুলিতে পারা যায়।

রবীন্দ্রনাথ যখন বাংলার ছড়াগুলির সংগ্রহকার্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন ইহাদের দ্বারা নৃতত্ত্ব ও জাতিতত্ত্বমূলক কোন গবেষণা সম্ভব হইতে পারে বলিয়া এ দেশর শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে কোনও ধারণাই সৃষ্টি হইতে পারে নাই। নৃতত্ত্ব ও জাতিতত্ত্বের আলোচনা আমাদের দেশে খুব ব্যাপক ভাবে তখনও যেমন আরম্ভ হয় নাই, এখনও তেমনই আছে। বিংশতি শতাব্দীর মধ্যভাগে পাশ্চাত্য জগতের সর্বত্রই যখন লোক-সাহিত্যের ব্যাপক অনুশীলন হইতে দেখা যাইতেছে, তখনও এ দেশের শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যেও লোক-সাহিত্য সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ধারণারই সৃষ্টি হইতে পারে নাই। অতএব রবীন্দ্রনাথ ছড়াগুলির মধ্য হইতে কোনও তত্ত্বকথার অনুসন্ধান না করিয়া যে কাব্যরসই অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, তাহার ফলে ইহাদের প্রতি সর্বসাধারণের দৃষ্টি অতি সহজেই সেদিন আকৃষ্ট হইতে পারিয়াছিল। সেদিন কবির দৃষ্টি লইয়া ইহাদের মধ্য হইতে কাব্যরস অনুসন্ধানের পরিবর্তে যদি কেহ তত্ত্বজ্ঞানীর দৃষ্টি লইয়া দার্শনিক তত্ত্ব কিংবা সামাজিক তথ্য অনুসন্ধান করিতেন, তাহা হইলে ইহাদের আবেদন ব্যর্থ হইত। ভাষাশিক্ষার প্রয়োজনে বৈদেশিক ধর্মপ্রচারকগণ একদিন এ দেশের সমাজ হইতে যে প্রবাদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা আজ পুরাতত্ত্ব গবেষকের অনুসন্ধানের বিষয় হইয়াছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'ছেলে ভুলানো ছড়া' প্রবন্ধ সাহিত্য-পাঠকের নিত্য সঙ্গী হইয়া আছে। ইহা যে বিদগ্ধসমাজে এই স্থান লাভ করিয়াছে তাহা ইহার

কাব্যরসের আবেদনের জন্যই সম্ভব হইয়াছে। পৃথিবীর লোক-সাহিত্য আলোচনার ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের মত আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন প্রতিভাশালী কবির মত কোনও ব্যক্তিকে লোক-সাহিত্য সম্পর্কে এমন সুগভীর সহানুভূতি প্রকাশ করিতে দেখা যায় নাই। পাশ্চাত্য জগতেও যাঁহারা লোক-সাহিত্য লইয়া বর্তমানে আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রায় প্রত্যেকেই প্রধানতঃ জ্ঞানতপস্বী অধ্যাপক কিংবা তথ্যানুসন্ধানকারী গবেষক। সুতরাং তাঁহাদের আলোচনা কোন সাহিত্যিক আবেদন সৃষ্টি করিয়া সর্বজনীন রসোপভোগের বস্তু হইয়া উঠিতে পারে নাই। তাঁহারা প্রধানতঃ সংগৃহীত উপাদান-গুলির শ্রেণীবিভাগ করিয়া থাকেন, দেশাদেশান্তর হইতে সংগৃহীত উপাদানগুলির সঙ্গে নিজেদের সংগৃহীত উপাদানের তুলনামূলক আলোচনা করেন, ইহাদের উৎপত্তি ও বিস্তার (diffusion) সম্পর্কে নানাপ্রকার সম্ভাব্য যুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন, বিরোধী মতাবলম্বী গবেষকগণ তাঁহাদের সেই যুক্তি খণ্ডন করিয়া থাকেন। রবীন্দ্রনাথ সেই পথ সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র নিজের কবি-হৃদয়টি খুলিয়া দিয়া ইহাদিগকে তাহার মধ্যে বরণ করিয়া লইয়াছেন ; রবীন্দ্র-কবি-মানসের শৈশব-স্মৃতির পটভূমিকা হইতে ইহাদিগকে উদ্ধার করিয়া পরিণত বয়সে ইহাদের রসাস্বাদন করিয়া-ছেন। মানুষ বয়সের দিক দিয়া যতই প্রবীণ হইতে থাকুক না কেন, শৈশব-সংস্কার হইতে সে কোনদিনই পরিত্রাণ পায় না। সেইজন্য যে রসানুভূতি লইয়া রবীন্দ্রনাথ ছড়াগুলির বিশ্লেষণ করিয়াছেন, সেই অনুভূতি দ্বারাই পাঠকসমাজ সর্বান্তকরণে তাহা গ্রহণ করিয়াছে।

একটি বিষয় এখানে লক্ষ্য করা যাইতে পারে যে, যদিও রবীন্দ্র-নাথ কাব্যরসের দিক দিয়াই ছেলে ভুলানো ছড়ার বিচার করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার কোন কোন উক্তির মধ্যে পাশ্চাত্য লোক-শ্রুতিবিদ্‌গণের এই বিষয়ক আধুনিকতম সমাজ-বিজ্ঞানসম্মত উপলব্ধির পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার কারণ,

রবীন্দ্রনাথ ছড়াগুলিকে কেবলমাত্র উপরের দিক হইতে বিচার করেন নাই ; এমন কি, তিনি নিজেও যে বলিয়াছেন যে, রসের দিক হইতেই তিনি ইহাদের বিচার করিয়াছেন, এ কথাও পুরাপুরি সত্য নহে ; রসের অতিরিক্ত বিষয়ের মধ্যেও তিনি প্রবেশ করিয়া ইহাদের অন্তর্নিহিত চিরন্তন সত্যের সন্ধান পাইয়াছেন। সেইজন্য ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তিনি যে কথা বলিয়াছেন, বিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগেও স্বাধীন গবেষণা দ্বারা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাহারই সন্ধান পাইয়াছেন। এই প্রকার বিষয়ের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'ছেলে ভুলানো ছড়া' প্রবন্ধের এক জায়গায় লিখিয়াছেন, 'এই সকল ছড়ার মধ্যে একটি চিরত্ব আছে। কোনোটির কোনো কালে কোনো রচয়িতা ছিল বলিয়া পরিচয় মাত্র নাই।' আধুনিকতম সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণও এই কথাই স্বীকার করিয়া থাকেন যে লোক-সাহিত্যের কোন কালেই কোন বিশেষ রচয়িতা থাকে না। ফরাসী সমাজতত্ত্ববিদ্ ডার্খেম সামগ্রিকভাবে সমাজ-মানসই লোক-সাহিত্যের রচয়িতা বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন, তাঁহার মতে ব্যক্তিবিশেষের ইহাতে কোন স্পর্শ নাই ; অনেকেই তাঁহার এই মত স্বীকার করিয়া লইয়া লোক-সাহিত্য যে ব্যষ্টির পরিবর্তে সমষ্টিরই সৃষ্টি, অর্থাৎ collective creation of the folk, তাহাই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, লোক-সাহিত্য 'কোন্ শকের কোন্ তারিখে কোন্‌টা রচিত হইয়াছিল, এমন প্রশ্নও কাহারও মনে উদয় হয় না।' পাশ্চাত্য সমাজতত্ত্ববিদ্-গণও এই সম্পর্কে আধুনিকতম কালে একই কথা বলিয়াছেন যে,

> "A folk-song evolves gradually as it passes through the minds of different men and different generations."

ইহার অর্থ এই যে লোক-সংগীত ব্যক্তি ও বংশ-পরম্পরায় ক্রমবিকাশ লাভ করে, ইহা কদাচ বিশেষ কোন সময়ে ব্যক্তিবিশেষ দ্বারা সৃষ্ট হয় না। এই বিষয়টিই এখনও অনেকে বুঝিতে পারেন না, অথচ

রবীন্দ্রনাথ যখন এই কথাটি বুঝিয়াছিলেন, তখন পাশ্চাত্য পণ্ডিত-গণের মধ্যে বিষয়টি সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ধারণার সৃষ্টি হইতে পারে নাই।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এই প্রবন্ধের এক জায়গায় উল্লেখ করিয়াছেন, 'যেমন পুরাতন পৃথিবীর প্রাচীন সমুদ্রতীরে কর্দমতটের উপর বিলুপ্তবংশ সে কালের পাখীদের পদচিহ্ন পড়িয়াছিল—অবশেষে কালক্রমে কঠিন চাপে সেই কর্দম, পদচিহ্নরেখাসমেত, পাথর হইয়া গিয়াছে—সে চিহ্ন আপনি পড়িয়াছিল এবং আপনি রহিয়া গিয়াছে ; কেহ খোন্তা দিয়া খুদে নাই, কেহ বিশেষ যত্নে তুলিয়া রাখে নাই—তেমনি এই ছড়াগুলির মধ্যে অনেক দিনের অনেক হাসি-কান্না আপনি অঙ্কিত রহিয়াছে।' আধুনিকতম কালে একজন ইংরেজ পণ্ডিত লোক-সাহিত্যের এই বৈশিষ্ট্যটি লইয়াই আলোচনা করিয়া-ছেন, তিনি ইহাকে বলিয়াছেন, 'folk-memory in folk-tales' অর্থাৎ লোক-সাহিত্যে যে আমরা অধুনা অপ্রচলিত বহু বিষয়, যেমন নরবলি, নরমাংসাহার, রাক্ষস-খোক্কস ইত্যাদির কথা শুনিতে পাই, তাহার অর্থই এই যে, বহু প্রাচীনকালে সমাজ-জীবনে ইহাদের অস্তিত্ব ছিল, সমাজ-জীবনের পরিবর্তনের ধারার মধ্য দিয়াও লোক-সাহিত্য হইতে ইহাদের সংস্কার সম্পূর্ণ মুছিয়া যাইতে পারে নাই। আধুনিক জীবনের সংস্কারের সঙ্গে ইহারা কোন দিক দিয়াই সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে পারে না বলিয়া ইহাদের উদ্ভট বলিয়া আমাদের মনে হয়, কিন্তু উহারা উদ্ভট নহে ; প্রস্তরীভূত জীবের যে কঙ্কাল দেখিয়া আজ আমরা বিস্মিত হই, তাহা একদিন যখন জীবিত ছিল, তখন তাহার বিষয়ে বিস্ময়ের কিছুই ছিল না ; লোক-সাহিত্যের মধ্যে বিস্মৃত জগতের বহু বিচ্ছিন্ন উপকরণ এই ভাবে অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পূর্বোদ্ধৃত উক্তির ভিতর দিয়া ইহাই বলিতে চাহিয়াছেন, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও ইহাকেই 'folk-memory in folk-tales' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সমাজ-বিবর্তনের ধারা যাঁহারা গভীরভাবে অনুসরণ করিয়া থাকেন,

তাঁহারাই ইহার উপলব্ধি করিতে পারেন, কেবলমাত্র রসবিচার-দ্বারা এই ব্যবহারিক জীবনের সুগভীর সত্যের উপলব্ধি হইতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'ছেলে ভুলানো ছড়া'র প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন, 'একই ছড়ার অনেকগুলি পাঠও পাওয়া যায়; তাহার মধ্যে কোনটিই বর্জনীয় নহে। কারণ, ছড়ায় বিশুদ্ধ পাঠ বা আদিম পাঠ বলিয়া কিছু নির্ণয় করিবার উপায় অথবা প্রয়োজন নাই।' ইহাও কেবলমাত্র রসজ্ঞের রসোপলব্ধি নহে, ইহার মধ্য দিয়াও সূক্ষ্ম সমাজ-দর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়, আধুনিকতম সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণও লোক-সাহিত্য সম্পর্কে এই কথাই বলিয়া থাকেন। ক্রমপরিবর্তনের ধারার মধ্য দিয়াই লোক-সাহিত্যের প্রাণ-শক্তি রক্ষা পায়, সুতরাং ইহার কোন পরিবর্তিত রূপই পরিত্যক্ত কিংবা পরিত্যাজ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না, কারণ প্রত্যেকটি পরিবর্তিত রূপই সমাজ-মানস কর্তৃক স্বীকৃত, লোক-সাহিত্যের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের ধারা অনেক সময় অগ্রগতি এবং অনেক সময় অবনতির পথ অনুসরণ করিয়া থাকে, অগ্রগতির ধারা অনুসরণ করিবার ফলে ইহার বিকাশ এবং অবনতির ধারা অনুসরণ করিবার ফলে ইহার বিনাশ সাধিত হয়। লোক-সাহিত্যের প্রত্যেকটি পাঠের মধ্য দিয়াই ইহার অবনতিরই হউক কিংবা উন্নতিরই হউক এক একটি বিশিষ্ট রূপ ধরা পড়ে। সুতরাং ইহার কোন রূপই পরিত্যক্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সংগ্রহের মধ্যে একই ছড়ার বিভিন্ন পাঠও গ্রহণ করিয়াছেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ইহাদের তুলনামূলক আলোচনাও করিয়াছেন। 'আগ্‌ডুম্‌ বাগ্‌ডুম্‌' এবং শিবু ঠাকুর বিষয়ক ছড়াগুলিই তাহার প্রমাণ। এই সকল আলোচনা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, রবীন্দ্রনাথ হয়ত কাব্যরসের দিকে আকৃষ্ট হইয়াই বাংলার লোক-সাহিত্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু কেবলমাত্র কাব্য-বিষয়ক অন্তর্দৃষ্টি নহে, সমাজ-জীবন-বিষয়কও তাঁহার যে সুগভীর

অন্তর্দৃষ্টি ছিল, তাহা দ্বারাই তিনি অতি সহজে ইহার অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে ইহার সম্পর্কিত তাঁহার যে উপলব্ধি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা কেবলমাত্র কবিজনসুলভ নহে, আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞান দ্বারাও তাহা সমর্থিত হইবার যোগ্য। সমাজ-বিজ্ঞানের সঙ্গে লোক-সাহিত্যের যে একটি সম্পর্ক আছে, তাহা রবীন্দ্রনাথের চেতনায় যে ভাবে ধরা পড়িয়াছিল, আধুনিকতম পাশ্চাত্য লোক-সাহিত্য গবেষকদিগের চেতনার মধ্যেও সেইভাবেই ধরা দিয়াছে। সুতরাং অর্ধ-শতাব্দী পূর্বে রচিত হইয়াও রবীন্দ্র-নাথের লোক-সাহিত্য সম্পর্কিত আলোচনা এই বিষয়ক আধুনিক-তম গবেষণার ভিত্তি হইতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতি

শ্রীরথীন্দ্রনাথ রায়

প্রতিভার বহুমুখিতা সামগ্রিক বিচারের এক প্রধান অন্তরায়। আবার বহুমুখী জটিলতার ব্যূহ ভেদ করে প্রতিটি অংশও নজরে পড়া কঠিন। রবীন্দ্র-প্রতিভা আলোচনা করতে গেলে এই দু' জাতীয় বিপদেরই সম্মুখীন হতে হয়। সমালোচকের পক্ষেও আংশিকতা দোষ কাটিয়ে ওঠা কঠিন। রবীন্দ্রনাথ কবি, এই বোধ প্রায় সংস্কারে পরিণত হয়েছে, ফলে তাঁর গদ্যরচনাবলীর মূল্য আজ পর্যন্তও তেমনভাবে নির্ণীত হয়নি। তাঁর নাটক অভিনীত হয়, গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যের সংগীত ও নৃত্যের স্বতন্ত্র আবেদন আছে। গল্প-উপন্যাসের অনেকখানি আকর্ষণ এদের কথারস। কিন্তু এগুলি ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের এমন অনেক গদ্যরচনা আছে, যাদের বৈচিত্র্য প্রাচুর্য কম নয়। পত্রসাহিত্য, ভ্রমণ-বিষয়ক ডায়েরী, প্রবন্ধ, সাহিত্য-সমালোচনা, 'লিপিকা' বা 'পঞ্চভূত'-এর মতো নতুন টেক্‌নিকে লেখা বিচিত্র গদ্যরচনাগুলি আজও তেমনভাবে আলোচিত হয়নি। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, পরিধি ও বৈচিত্র্যের দিকে রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনাগুলি বহুক্ষেত্রেই তাঁর অনন্যসাধারণ কাব্যপ্রবাহের সঙ্গে সমান তালে অগ্রসর হয়েছে। কবিতা ও গদ্যের ক্ষেত্রে এমন সব্যসাচী-অধিনায়কত্ব পাশ্চাত্য সাহিত্যেও দেখা যায় না।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গদ্যের তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, প্রথম দিকে গদ্যরচনা করতে গিয়ে তাঁকে প্রতি পদক্ষেপেই ভাবতে হয়েছে, অত্যন্ত সতর্কভাবে পা ফেলতে হয়েছে। অথচ কবিতার ক্ষেত্রে যেন তিনি অনেকখানি বাধামুক্ত। এমন কি পূর্ববর্তী কবিদের কাব্যাচরণ অতিক্রম করতে তাঁকে মোটেই বেগ পেত হয়নি। এমন কি কিশোর বয়সের আখ্যায়িকা কাব্যগুলির

মধ্যেও কবির স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত নয়। 'সন্ধ্যাসংগীত' কাব্য থেকেই কবি যেন অনেকখানি স্বপ্রতিষ্ঠ হয়েছেন। অবশ্য সন্ধ্যাসংগীতের যুগেও কবিমানসের অস্পষ্টতা ও দ্বিধার অন্ধকার কাটে নি। কিন্তু আস্বাদনে ও বৈচিত্র্যে পূর্ববর্তী কবিদের কাব্যের সঙ্গে এর যে পার্থক্য অনেকখানি, তা বুঝতে মোটেই অসুবিধা হয় না। বিহারীলালের মৃত্যুকালের (১৮৯৪) মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কাব্য প্রকাশিত হয়, 'চিত্রা'র অনেকগুলি কবিতা রচিত হয়। অথচ তখনও বাংলাসাহিত্যের ক্ষেত্রে সুদীর্ঘ আখ্যায়িকা কাব্য রচনার মোহ কাটেনি; এই সময়ে নবীনচন্দ্র তাঁর 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' ও 'প্রভাস' কাব্য রচনা করেছেন। সুতরাং কাব্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ যে খুব দ্রুত তাঁর স্বক্ষেত্র আবিষ্কার করেছিলেন, এ কথা বিনা দ্বিধায় স্বীকার করা যায়।

কিন্তু গদ্য সম্পর্কে ঠিক এ কথা বলা যায় না, গদ্যে স্বাধীনতা অর্জন করতে অনেকটা দেরি হয়েছিল, ঐতিহ্যকে কিছুকাল মেনে নিতে হয়েছিল। গদ্যের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে উপন্যাসেই এই অনুসরণ হয়েছিল সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী, ছোটগল্পে প্রথমেই তিনি পথ পেয়েছিলেন—কারণ সাহিত্যের এই নতুন বিভাগটি সম্পূর্ণ-ভাবে তাঁর নিজেরই সৃষ্টি। প্রবন্ধের ক্ষেত্রেও কিছুকাল পূর্ব-সূরীদের পথ ছিল তাঁর সামনে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের গদ্য-রীতিতে উনিশ শতকীয় বাংলাগদ্যের কিছু কিছু প্রভাব লক্ষণীয়। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে তিনি সতর্কভাবে পা ফেলে এগিয়ে চলেছিলেন। 'সবুজপত্র'-পর্বের আগেই গদ্যের ক্ষেত্রেও তিনি আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়েছেন। সাধুভাষা যে কতদূর সাবলীল ও পরিমার্জিত হতে পারে, তার দু'টি শ্রেষ্ঠ উদাহরণ 'গোরা' ও 'জীবনস্মৃতি'র গদ্যরীতি। এতকাল তিনি সতর্কতার সঙ্গে চলে-ছিলেন। কিন্তু পঞ্চাশ বছরের পর সেই দ্বিধার ভাব সম্পূর্ণভাবে কেটে গিয়েছে, এর পর তিনি কবিতার মতো গদ্যের ক্ষেত্রেও বিস্ময়-কর বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছেন। জীবনের শেষ ত্রিশ বৎসরে কবি

গদ্যরীতি নিয়ে নানাভাবে পরীক্ষা করেছেন, নতুন নতুন পথের নির্দেশ দিয়েছেন। আশী বছরের আয়ু-পরিক্রমার পর বাংলা গদ্যকে তিনি যেখানে দাঁড় করিয়েছেন, তার অভিনবত্ব ও পরিমার্জিত সুচিক্কণরূপ বিস্মিত করে। কবিতার তুলনায় গদ্যের ধীরগামিতা ও দ্বিধার ভাব এখানে একেবারেই অনুপস্থিত। মোটকথা, গদ্য-রচনাকে কবি মধ্যযুগের প্রদোষান্ধকার থেকে আধুনিক যুগের আলোকরঞ্জিত পৃথিবীতে প্রবেশাধিকার দিয়ে গেলেন। এত বড়ো মহৎ কবি যে শ্রেষ্ঠ গদ্যশিল্পীও হতে পারেন, সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ তার সর্বোত্তম উদাহরণ।

বাংলা-গদ্যের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের স্থান যে কত বড়ো, তা তাঁর দাক্ষিণ্যেই সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা যায় না। কবিতার তুলনায় গদ্যে তাঁকে স্বভাবতই বেশি পরিশ্রম করতে হয়েছে, এক এক করে অনেক বাধাকে অতিক্রম করতে হয়েছে। রবীন্দ্র-গদ্যের দিকটা তেমনভাবে বিশেষ কারও নজরে পড়েনি। কবির মনেও এ বিষয়ে একটু বেদনা ছিল। তিনি এক সময় বলেছিলেন—

> "তোমরা আমার ভাষার কথা বল, বল যে গদ্যেও আমি কবি। আমার ভাষা যদি কখনো আমার গল্পাংশকে অতিক্রম করে স্বতন্ত্র মূল্য পায়, সে জন্য আমাকে দোষ দিতে পার না। এর কারণ, বাংলা গদ্য আমার নিজেকেই গড়তে হয়েছে। ভাষা ছিল না, পর্বে পর্বে স্তরে স্তরে তৈরি করতে হয়েছে আমাকে। আমার প্রথম দিককার গদ্যে, যেমন 'কাব্যের উপেক্ষিতা', 'কেকাধ্বনি' এ সব প্রবন্ধে, পদ্যের ঝোঁক খুব বেশি ছিল, ও সব যেন অনেকটা গদ্য-পদ্য গোছের। গদ্যের ভাষা গড়তে হয়েছে আমার গল্পপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে। মোপাসাঁর মতো যে সব বিদেশী লেখকের কথা তোমরা প্রায়ই বল, তাঁরা তৈরি ভাষা পেয়েছিলেন। লিখতে লিখতে ভাষা গড়তে হলে তাঁদের কি দশা হত জানিনে।"[১]

১. 'সাহিত্য, গান ও ছবি' (বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে আলোচনার অনুলিপি) প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৪৮।

কবির এই উক্তিটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকাটি যে কতখানি বিশিষ্ট, উক্তিটির আলোকে তা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

২

'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রিকার গ্রন্থসমালোচনা ঐতিহাসিক দিক থেকে কবির প্রথমে প্রকাশিত গদ্যরচনা হলেও প্রকৃতপক্ষে 'ভারতী' পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই তাঁর গদ্যরচনার পরীক্ষাপর্বের সূত্রপাত ঘটে। 'ভারতী' পত্রিকার প্রথম বছরেই কবি গদ্যরচনার বিচিত্র ক্ষেত্রে পদক্ষেপ করেছেন। মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচনা, প্রথম ছোটগল্প 'ভিখারিণী' ও প্রথম উপন্যাস 'করুণা' প্রথম বছরের 'ভারতী'তেই প্রকাশিত হয়। কবি অবশ্য তাঁর এই যুগের রচনাবলীর কোনো মূল্যই দেন নি—

> "ভারতীর পত্রে পত্রে আমার বাল্যলীলার অনেক লজ্জা ছাপার কালির কালিমায় অঙ্কিত হইয়াছে। কেবলমাত্র কাঁচা লেখার জন্য লজ্জা নহে —উদ্ধত অবিনয়, অদ্ভুত আতিশয্য ও সাড়ম্বর কৃত্রিমতার জন্য লজ্জা।"

'ভারতী' পত্রিকার রচনাগুলি সম্পর্কে কবি 'উদ্ধত অবিনয়', 'অদ্ভুত আতিশয্য' ও 'সাড়ম্বর কৃত্রিমতা'র অভিযোগ করেছেন। মন্তব্যের ঔদ্ধত্য, বিচারশক্তির দুর্বলতা ও অসংযম থাকলেও গদ্য-রীতির দিক থেকে এই যুগের রচনাগুলির পুনর্বিচারের প্রয়োজন। তরুণ মনের অপরিণত চিন্তার মধ্যে অস্পষ্টতা ও ভাবালুতা আছে, এ বিষয় সন্দেহের অবকাশ নেই। এ যুগের কবিতাও কি গদ্যের চেয়ে বেশি দূর এগিয়েছে? প্রকৃতপক্ষে 'সন্ধ্যাসংগীত'-এর আগে কবি তাঁর কাব্যের যথার্থ বাহনের সন্ধানই পান নি—তাই একাধিক আখ্যায়িকা কাব্য লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথের এই যুগের গদ্যেও অপরিণতির চিহ্ন বিদ্যমান। কিন্তু ১৮৭৭-৭৮ খ্রীস্টাব্দে বঙ্কিম-পর্বের মধ্যলগ্ন। এই যুগের গদ্যরচয়িতাদের গদ্যরীতির তুলনায় কিশোর রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির স্বরূপ কি, তাই সর্ব-

প্রথম বিবেচ্য। বঙ্কিম-পর্বের ছত্র-ছায়ায় রচিত প্রথম উপন্যাস 'করুণা' নিতান্তই অক্ষম রচনা, কিন্তু গদ্যরীতির দিক থেকে বিচার করলে সে যুগের কোনো উপন্যাসের চেয়ে এর প্রকাশভঙ্গি দুর্বল বলে মনে হয় না। একটি উদাহরণ দিলে বক্তব্য পরিস্ফুট হবে—

"করুণা চলিল। উভয়ে স্টেসনে গিয়া উপস্থিত হইল। গাড়ী ছাড়িতে এখনো দেরী আছে। জিনিষপত্র পুঁটুলী বোঁচকা লইয়া যাত্রীগণ মহা-কোলাহল করিতেছে। কানে কলম গোঁজা রেলোয়ে ক্লার্কগণ ভারি উঁচুচালে ব্যস্তভাবে ইতস্ততঃ ফর্‌ফর্‌ করিয়া বেড়াইতেছিল। পান সোডাওয়াটার নানাপ্রকার মিষ্টান্নের বোঝা লইয়া ফেরিওয়ালারা আগামী গাড়ির জন্য অপেক্ষা করিতেছে। এইরূপ ত অবস্থা। এমন সময়ে একজন পুরুষ করুণার পাশে সেই বেঞ্চে আসিয়া বসিল। করুণা উঠিয়া যাইবে যাইবে করিতেছে, এমন সময়ে তাহার পার্শ্বস্থ পুরুষ বিস্ময়ের স্বরে কহিয়া উঠিল—'মা তুমি যে এখানে?' করুণা পণ্ডিত মহাশয়ের স্বর শুনিয়া চমকিয়া উঠিল।"২

'করুণা' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব সুপরিস্ফুট। আকস্মিকতা, অতিনাটকীয়তা ও অবান্তর ঘটনার কোনো অভাব নেই। কিন্তু এখানে যে গদ্যরীতি অবলম্বন করা হয়েছে, তা সহজ ও স্বচ্ছন্দ। বঙ্কিম-পর্বের গদ্যলেখকদের চেয়ে এই লেখা কোনো অংশেই দুর্বল নয়—বরং স্বচ্ছতায় ও সাবলীলতায় এই রীতি ঐ যুগের অনেক লেখকের চেয়েই অগ্রগামী। এই যুগের প্রবন্ধাবলীর গদ্যরীতির মধ্যেও স্পষ্টতা ও পরিচ্ছন্নতা লক্ষণীয়। আবেগের তীব্রতা ও কল্পনার বর্ণোচ্ছ্বাস এখানে অনুপস্থিত। কোনোরকম আতিশয্যও এখানে নেই—

"গেটে কহেন, বাল্যকালে তিনি ফুলের পাপ্‌ড়ি ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া দেখিতেন তাহা কিরূপ সজ্জিত আছে—পাখীর পালক ছিঁড়িয়া দেখিতেন তাহা ডানার উপর কিরূপে গ্রথিত আছে। বেটিনা তাঁহার

২. করুণা, বিংশ পরিচ্ছেদ : ভারতী, শ্রাবণ ১২৮৫।

প্রণয়িনীদের মধ্যে একজন। তিনি বলেন, রমণীহৃদয় লইয়াও গেটে সেইরূপ করিয়া দেখিতেন। তিনি তাহাদের প্রেম উদ্রেক করিতেন— এবং প্রেম-কাহিনী সর্বস্য সুন্দর করিবার জন্য কল্পনার সাহায্যে নিজেও কিঞ্চিৎ পরিমাণে প্রেম অনুভব করিতেন। কিন্তু সে প্রেম তাঁহার ইচ্ছাধীন, প্রয়োজন অতীত হইলেই সে প্রেম দূর করিতে তাঁহার বড় একটা কষ্ট পাইতে হয় নাই।"৩

এই জাতীয় গদ্যরীতির মধ্যে কোনো দীপ্তি বা বিশেষত্ব নেই সত্য, কিন্তু এই যুগের অন্যান্য গদ্যলেখকদের তুলনায় তা নিতান্ত নিষ্প্রভ নয়। রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনার প্রাথমিক পর্বে তাঁর পরবর্তী উপন্যাস দুটির ('বউ-ঠাকুরাণীর হাট' ও 'রাজর্ষি') ভাষার মধ্যে তেমন কোনো নূতনত্ব নেই। টেক্‌নিকেই শুধু নয়, ভাষাতেও তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের পন্থানুসরণ করেছেন, এমন কি সংলাপ সৃষ্টিতেও তিনি সাধুভাষাই ব্যবহার করেছেন। পরবর্তীকালে 'বউ-ঠাকুরাণীর হাট'এর সূচনায় কবি বলেছেন—"এ যেন অশিক্ষিত আঙুলের আঁকা ছবি ; সুনিশ্চিত মনের পাকা হাতের চিহ্ন পড়েনি তাতে।" মাঝে মাঝে প্রকৃতির বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথের স্বভাবসিদ্ধ কবি-প্রতিভার সামান্য কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এই সাধু-ভাষার রাজপথের পাশে আর একটি ভাষাও যে নিতান্ত অবহেলিত নয়, আঠারো বছরের কিশোর কবির কাছে তা অজ্ঞাত ছিল না। সাধুভাষার সংস্কারকে অতিক্রম করার মতো দুঃসাহস তখনো তাঁর হয়নি। কিন্তু পত্রাবলীতে কিংবা ডায়েরিতে, যেখানে আরো ঘনিষ্ঠ-ভাবে মনের কথা বলা যায়, সেখানে তিনি চলতি ভাষা ব্যবহার করেছেন। 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' (১৮৮১) কবি লিখেছেন 'সবুজপত্র' প্রকাশের প্রায় তেত্রিশ বছর আগে। এখানে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যের কথা একেবারেই ভাবতে পারেন নি, এমন কি

৩. গেটে ও তাঁহার প্রণয়িনীগণ ঃ ভারতী, কার্তিক ১২৮৫।

চলতি ভাষায় লিখতে গিয়ে 'আলালি' বা 'হুতোমি' ভাষার দ্বারাও অভিভূত হন নি।

যে চলতি ভাষা আজ সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগ থেকে সাধু-ভাষাকে স্থানচ্যুত করতে উদ্যত, তার প্রথম রূপ চোখে পড়েছে 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র'গুচ্ছে। দীর্ঘকাল পরে জীবন-সায়াহ্নে কবি এই পত্রগুচ্ছ সম্পর্কে লিখেছেন—

> "য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রশ্রেণী আগাগোড়া অরক্ষণীয়া নয়। এর স্বপক্ষে একটা কথা আছে সে হচ্ছে এর ভাষা। নিশ্চিত বলতে পারিনে কিন্তু আমার বিশ্বাস, বাংলা সাহিত্যে চলতি ভাষায় লেখা বই এই প্রথম। আজ এর বয়স হল প্রায় ষাট। আমার বিশ্বাস বাংলা চলতি ভাষার সহজ প্রকাশপটুতার প্রমাণ এই চিঠিগুলির মধ্যে আছে।"৪

'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র'র ভাষা আধুনিক বাংলা চলতি গদ্যের সর্বপ্রথম রূপ। চলতি ভাষার এই সর্বপ্রথম রূপটির মধ্যেই কবি তাঁর শিল্পদক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। কবি এখানে প্রথম শরক্ষেপেই লক্ষ্যভেদ করেছেন। সাধুভাষার সর্বোত্তম স্টাইল অনুশীলন করতে কবির অনেক সময় লেগেছিল, কিন্তু চলতি ভাষায় কবি অবলীলাক্রমেই সর্বোচ্চ সিদ্ধিতে পেঁাছেছেন। এর কারণ বোধ হয়, চলতি ভাষা তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি। এখানে তিনি তাই অনেক বেশি স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দচারী। এ স্টাইল স্মিতপরিহাসপটু, পরিচ্ছন্ন ও প্রসন্নতায় দীপ্ত।

একদিকে কথা-সাহিত্যে ঐতিহ্যানুসরণ, অন্যদিকে চিঠিপত্র ও ডায়েরি জাতীয় রচনায় নতুন ধরনের চলতি ভাষা সৃষ্টির প্রয়াস—রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের গদ্যরীতিতে এই দ্বিমুখী মেজাজের পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির দ্বিতীয়-পর্বকে

৪. পুনঃসংস্করণের মুখবন্ধ, চারুচন্দ্র দত্তকে লিখিত চিঠি. ২৯ আগস্ট, ১৯৩৬ ; রবীন্দ্র-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড।

সাধারণভাবে 'ছিন্নপত্র ও গল্পগুচ্ছের যুগ' বললেও অত্যুক্তি হয় না। কারণ এই পর্বের প্রতিনিধিস্থানীয় গদ্যরচনা গল্পগুচ্ছের গল্পগুলি ও ছিন্নপত্রের পত্রাবলী। 'ছিন্নপত্র' কবির চব্বিশ থেকে চৌত্রিশ বছর বয়সের (১৮৮৫-৯৫) চিঠির সংকলন। চলতি ভাষা সৃষ্টিতে তিনি এখানে অনেকখানি এগিয়েছেন। য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রে যতটুকু অপূর্ণতা ছিল, ছিন্নপত্রে তা সম্পূর্ণতা লাভ করেছে। য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রে যা শীর্ণজলরেখার আভাসের মতো ক্বচিৎ প্রদীপ্ত, ছিন্নপত্রে তাই বর্ষা-বিস্ফারিত পদ্মার মতো পূর্ণতায় ও প্রাণোচ্ছ্বাসে সমৃদ্ধ। শুধু বিস্তৃতি ও প্রসারেই নয়, গভীর ভাবনার অতলস্পর্শ মহিমাও ছিন্নপত্রের স্টাইলকে বিশিষ্টতা দিয়েছে—

> "আমি এই জলের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবি, বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে গতিটাকে যদি কেবল গতিভাবেই উপলব্ধি করতে ইচ্ছা করি, তাহলে নদীর স্রোতে সেটি পাওয়া যায়। মানুষ, পশুর মধ্যে যে চলাচল তাতে খানিকটা চলা, খানিকটা না চলা, কিন্তু নদীর আগাগোড়াই চলছে, সেইজন্যে আমাদের মনের সঙ্গে আমাদের চেতনার সঙ্গে তার একটা সাদৃশ্য পাওয়া যায়। সেইজন্যেই এই ভাদ্র মাসের পদ্মাকে একটা প্রবল মানসশক্তির মতো বোধ হয়, সে মনের ইচ্ছার মতো ভাঙছে, চুরছে, চলেছে, মনের ইচ্ছার মতো সে আপনাকে বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গে এবং অস্ফুট কলসংগীতে নানাপ্রকার প্রকাশ করবার চেষ্টা করছে। বেগবান একাগ্রগামিনী নদী আমাদের ইচ্ছার মতো, আর বিচিত্র শস্যশালিনী স্থিরভূমি আমাদের ইচ্ছার সামগ্রীর মতো।"৫

রবীন্দ্র-গদ্যের এই দ্বিতীয়পর্বে সাধুভাষারও সমুন্নতি ঘটেছে। 'পঞ্চভূত'এর রচনাবলীর গদ্যরীতিতে সাধুভাষার একটি পরিমার্জিত রূপ চোখে পড়ে। এই পর্বের গল্পগুলি সাধুভাষাতেই লেখা হয়েছে। কিন্তু সাধুভাষার মধ্যে এত ভারসাম্য খুব কমই দেখা যায়। তা ছাড়া এ ভাষার অযথা জটিলতা বা অকারণ চমক-

৫. কুষ্টিয়ার পথে, ২৪শে আগষ্ট, ১৮৯৪ : ছিন্নপত্র।

সৃষ্টির প্রয়াস নেই—যেমন সহজ, তেমনি স্বাভাবিক। অথচ এই স্টাইল যেমন চিত্রধর্মী, তেমনি সংগীতস্পন্দী। গতির মসৃণতায় সুরের নূপুর ঝংকৃত হয়, আবার সুস্পষ্ট রেখাবিন্যাসে ছবিগুলি রূপমণ্ডিত হয়ে ওঠে—

> "পলকের মধ্যে গ্রীবা বাঁকাইয়া, তাহার ঘনকৃষ্ণ বিপুল চক্ষুতারকায় সুগভীর আবেগতীব্র বেদনাপূর্ণ আগ্রহ-কটাক্ষপাত করিয়া, সরস সুন্দর বিম্বাধরে একটি অস্ফুট ভাষার আভাসমাত্র দিয়া, লঘু ললিত নৃত্যে আপন যৌবনপুষ্পিত দেহলতাটিকে দ্রুতবেগে ঊর্ধ্বাভিমুখে আবর্তিত করিয়া মুহূর্তকালের মধ্যে বেদনা বাসনা ও বিভ্রমের, হাস্য কটাক্ষ ও ভূষণজ্যোতির স্ফুলিঙ্গ বৃষ্টি করিয়া দিয়া দর্পণেই মিলাইয়া গেল। গিরিকাননের সমস্ত সুগন্ধ লুণ্ঠন করিয়া একটা উন্দাম বায়ুর উচ্ছ্বাস আসিয়া আমার দুইটা বাতি নিভাইয়া দিত ;... আমার চারিদিকে সেই বাতাসের মধ্যে, সেই আরালী গিরিকুঞ্জের সমস্ত মিশ্রিত সৌরভের মধ্যে যেন অনেক আদর অনেক চুম্বন অনেক কোমল করস্পর্শ নিভৃত অন্ধকার পূর্ণ করিয়া ভাসিয়া বেড়াইত, কানের কাছে অনেক কলগুঞ্জন শুনিতে পাইতাম, আমার কপালের উপর সুগন্ধ নিশ্বাস আসিয়া পড়িত, এবং আমার কপোলে একটি মৃদুসৌরভরমণীয় সুকোমল ওড়না বারম্বার উড়িয়া উড়িয়া আসিয়া স্পর্শ করিত।"৬

গল্পগুচ্ছের গল্পগুলি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একই টানে আঁকা—চড়াই-উৎরাইয়ের ওঠা-নামার আকস্মিকতা এখানে নেই। তাই গল্পগুলির কোনো অংশই হঠাৎ জ্বলে-ওঠা জোনাকির আকস্মিক দীপ্তিতে চমকসৃষ্টি করে না, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একই রকম আলোর লাবণ্য—সে আলো প্রসন্নতার ও পরিতৃপ্তির। গল্পগুলির অন্যতম ঐশ্বর্য এর শান্ত-মধুর স্বভাব-পরিচ্ছন্ন গদ্য স্টাইল, আতিশয্যের সব রকম বোঝা নামিয়ে দিয়ে এ ভাষা ভারমুক্ত ও সহজ। 'ছিন্নপত্র' আগাগোড়া চলতি ভাষায় লেখা, অথচ এই

৬. ক্ষুধিত পাষাণ।

ভাষা 'গল্পগুচ্ছ' প্রথম দুখণ্ডের ভাষার নিকটতম প্রতিবেশী, ঠিক দোসর অবশ্য নয়! প্রথম দিকের কয়েকটি চিঠিতে সাধুভাষার মেজাজ একেবারে অন্তর্হিত হয় নি। কোথায়ও কোথায়ও সমাস-বদ্ধ দীর্ঘ বাগ্‌বিন্যাস গদ্যের গতি মন্থর করে তুলেছে। ক্রিয়া-পদের চলতি রূপই যে চলতি ভাষার সর্বস্ব নয়, এই সত্যটি প্রথম দিকের চিঠিগুলিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অবশ্য কবি ছিন্নপত্রের পরবর্তী চিঠিগুলিতে এই আড়ষ্টতা অনেকখানি কাটিয়ে উঠেছেন। মোটকথা, গল্পগুচ্ছ-ছিন্নপত্র পর্বে সাধু ও চলতি—উভয় ভাষাতেই কবি পূর্ণশক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের সাধুভাষাও যে উনিশ শতকীয় বাংলা গদ্য নয়, 'পঞ্চভূত' গ্রন্থটি থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। টেক্‌নিকের দিক থেকে এই গ্রন্থটি যেমন প্রবন্ধ, কথিকা, একাংকিকা ও ছোটগল্পের বিচিত্র মিশ্রণ, তেমনি গদ্যরীতির দিক থেকেও এ ভাষা, সাধু ও চলতি ভাষার এক অর্ধনারীশ্বর মূর্তি—সাধুভাষার কাঠামোর মধ্যেও চলতি ভাষার মেজাজ অনেক সময় এসে পড়েছে।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশক থেকেই রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির আর এক পর্ব লক্ষ্য করা যায়। তখন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের যুগ। নব পর্যায় 'বঙ্গদর্শন'-এর সম্পাদনা-ভার নিয়ে কবি এই যুগে বহু প্রবন্ধ রচনা করেছেন। ১৯০৫ থেকে ১৯১০-এর মধ্যেই বোধ হয় কবি সবচেয়ে বেশি রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখেছেন। 'আত্মশক্তি', 'ভারতবর্ষ', 'রাজভক্তি', 'দেশনায়ক', 'রাজাপ্রজা' প্রভৃতি বিখ্যাত প্রবন্ধগুলি এই সময়েই রচিত হয়। বিষয়ানুসারে এখানে রচনা-রীতিরও পরিবর্তন ঘটেছে। প্রবন্ধগুলির গদ্যরীতি যেন ইস্পাতের ফ্রেমের উপর তৈরি করা। শব্দপেশল হওয়া সত্ত্বেও এ ভাষা নুয়ে পড়ে না—ঋজুতা ও বলিষ্ঠতাই এ ভাষার বিশিষ্ট সম্পদ। এ ভাষাকে খাঁটি ক্ল্যাসিক্যাল রীতির ভাষা বলা যায়। কোথায়ও ঢিলে-ঢালা বা অগোছালো নয়, সর্বত্রই একটি দৃঢ়-সংহত বাঁধুনিতে গাঢ়বন্ধ। ১৯০৫ থেকে সবুজ পত্রের পূর্ববর্তী পর্বটিকে প্রধানত

প্রবন্ধের যুগই বলা যায়। রাজনৈতিক প্রবন্ধাবলী ছাড়াও কবি 'শান্তিনিকেতন' দুখণ্ডও এই সময়েই প্রকাশ করেন।

এই পর্বের তিনখানি গ্রন্থ রবীন্দ্রগদ্যরীতির বিবর্তনের দিক থেকে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্যঃ 'প্রাচীন সাহিত্য' (১৯০৭), 'গোরা' (১৯১০) ও 'জীবনস্মৃতি' (১৯১২)। 'প্রাচীন সাহিত্য'র গদ্যরীতিতে একটি অনন্যসাধারণ রাজকীয় ঐশ্বর্য আছে। প্রাচীন সাহিত্যের গদ্যরীতি আবেগস্পন্দিত, বর্ণময় ও চিত্রধর্মী। দীর্ঘসমাসবদ্ধ পদবিন্যাস, তৎসমশব্দসমৃদ্ধ ভাষা ও সালংকার বাগ্‌বিভূতি প্রতিপদক্ষেপে ঐশ্বর্য ছড়িয়েছে। কিন্তু এই গদ্যরীতিতে আতিশয্যও আছে। গদ্যের ফেনস্ফীত ও উচ্ছ্বাসবহুল রীতি অনেক সময় অতিকথনে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। 'চোখের বালি' ও 'নৌকাডুবি' উপন্যাসের গদ্যরীতির মধ্যে বিশেষ কিছু নূতনত্ব নেই। ছোটগল্পের ক্ষেত্রে কবি যেমন সহজেই নিজের পথ খুঁজে পেয়েছিলেন, উপন্যাসের ক্ষেত্রে তেমন সম্ভব হয়নি। তাই অনেককাল পর্যন্ত তাঁকে পূর্বসূরীদের পথেই পা ফেলতে হয়েছে।

কিন্তু রবীন্দ্র-জীবনের মধ্যলগ্নে রচিত 'গোরা' উপন্যাসটির গদ্যরীতির বিশেষত্ব আছে। এই উপন্যাসে পূর্ণায়ত ও নিটোল পরিণতি যেমন তৃপ্তিদায়ক, তেমনি এর ভাষা ও স্টাইলের মধ্যেও ভারসাম্য আছে—কোথায়ও অতিরিক্ত রংয়ের কারসাজি দেখানো হয়নি। কিন্তু গদ্যস্টাইলের দিক থেকে 'জীবনস্মৃতি' 'গোরা'র চেয়েও পরিণত ও পরিমার্জিত। এক গল্পগুচ্ছের কতকগুলি গল্প ছাড়া এমন ভারসাম্যময় গদ্যরীতি রবীন্দ্র-সাহিত্যেও দুর্লভ। আতিশয্য নেই, চমক দেওয়ার প্রয়াস নেই, কোনো একটি অংশের উপর অকারণে জোর দেওয়ার চেষ্টা নেই—অনবদ্য এর গদ্যরীতি। এর বাইরের রূপ সাধুভাষার, কিন্তু সাধুভাষার বিলম্বিত মন্থরতা ও অতিকথনের ভার এখানে একেবারে অনুপস্থিত। জীবনস্মৃতির গদ্যরীতি অখণ্ড প্রবাহের মতো, যেন সহজ লাবণ্যের অব্যাহত ধারা। মসৃণ পরিমার্জিত ও সুমিত গদ্যরীতি অলংকার-বর্জিত নয়।

যেটুকু অলংকার না থাকলে এ ভাষা বেমানান হয়, ততটুকু অলংকারই এখানে আছে।

৪

রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির চতুর্থ-পর্বকে 'সবুজপত্রের পর্ব' বলা যায়। চলতি ভাষার প্রতিষ্ঠা নিয়ে এই পর্বে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল 'সবুজপত্র' ছিল তার পুরোধা। রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ সমর্থন লাভ করে চলতি ভাষা সেদিন সাহিত্যিক কৌলীন্য লাভ করেছিল। এতকাল উপন্যাস রচনায় কবি সাধুভাষাই ব্যবহার করেছেন, কিন্তু এই পর্বে কবি বর্ণনায় ও সংলাপ রচনায়—উভয়-ক্ষেত্রেই চলতি ভাষাই ব্যবহার করেছেন। গদ্যরীতির ক্ষেত্রে কবি এই যুগে যে সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা করেছেন। একই সঙ্গে 'চতুরঙ্গ' ও 'ঘরে বাইরে' প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু গদ্যরীতির কত পার্থক্য! 'চতুরঙ্গ' কবির সাধুভাষায় রচিত শেষ উপন্যাস, 'ঘরে বাইরে' চলতি ভাষায় লেখা প্রথম উপন্যাস। চতুরঙ্গের সাধু-ভাষার আবরণের মধ্যে চলতি ভাষার বক্রশীর্ষ ফলক এক এক সময় চোখ ধাঁধিয়ে দেয়—সাধু ও চলতি ভাষার প্রভেদ যে শুধু ক্রিয়াপদের পার্থক্যের উপরে নির্ভর করে না, এ বিষয় কবি যেন শেষবারের মতো প্রমাণ করে দিলেন। 'ঘরে বাইরে'র স্টাইল সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। সাধুভাষার শতাব্দীব্যাপী শাসনপাশ ছিন্ন করে বন্ধনমুক্ত চলতি ভাষা বেরিয়ে পড়ল বিদ্রোহিণীর মেজাজ নিয়ে। চলতি ভাষায় প্রথম উপন্যাস লিখতে গিয়ে আতিশয্য ও উগ্রতা প্রকাশ পেলো। 'ঘরে বাইরে'র ভাষায় চমক সৃষ্টির চেষ্টা আছে, রং লাগানোর নেশা আছে—উচ্ছল ভঙ্গি ও অসংযত পদক্ষেপে দেখা দিয়েছে ভারসাম্যের অভাব। এ ভাষায় নৃত্যের তালে তালে অলংকারের ঝংকার, কটাক্ষে বিদ্যুৎ, আর দু'হাত দিয়ে ছড়িয়ে-দেওয়া চূর্ণ মুক্তার অজস্র বর্ষণ। কবি যেন গ্রীক ভাস্কর পিগ্‌মেলিয়নের মতো নিজের সৃষ্টির প্রেমে পড়েছেন—তাই তাঁর নবীন ভাষায় রক্তিম সুরার ফেনোচ্ছ্বাস।

সবুজপত্রের যুগে কবি শ্লেষগাঢ়, বুদ্ধিদীপ্ত ও অম্লমধুর তির্যক রীতির গদ্যও ব্যবহার করেছেন। 'সবুজপত্র'-সম্পাদক প্রমথ চৌধুরীর গদ্যরীতির সঙ্গে এই গদ্যের জ্ঞাতিত্বও অনুমান করা যায়। প্রধানত এই যুগের প্রবন্ধের মধ্যেই উক্ত রীতির সবচেয়ে বেশি পরিচয় পাওয়া যায়। এই যুগের প্রবন্ধগুলিতেও প্যাঁচালো ও তির্যক ভঙ্গি অবলম্বন করা হয়েছে—

> "দুর্ভাগ্যক্রমে পৃথিবীর এই ক্ষীরসরের বড়ো বড়ো ভাণ্ডগুলো প্রায় আছে দুর্বলদের জিম্মায়। এইজন্য যে ত্যাগশীলতায় সত্যকার শান্তি সেই ত্যাগের ইচ্ছা প্রবলদের মনে কিছুতেই সহজ হতে পারছে না। যেখানে শক্ত পাহারা সেখানে লোভ দমন করতে বেশি চেষ্টা করতে হয় না। সেখানে মানুষ সংযত হয় এবং নিজেকে খুব ভালো ছেলে বলেই মনে করে। কিন্তু আলগা পাহারা যেখানে সেখানে ভয়ও থাকে না, লজ্জাও চলে যায়।"৭

বাংলা গদ্যের চলতি ভঙ্গির প্রবর্তন করতে গিয়ে প্রথমেই কবির পূর্ণ সাফল্য ঘটেনি। কোনো কোনো সময় মনে হয় ভঙ্গিটির দিকেই যেন কবির বেশি নজর পড়েছে। নতুন ভাষা তৈরি করতে গিয়ে এ আতিশয্য হবেই।

রবীন্দ্র-গদ্যের শেষপর্বেও কয়েকটি বিস্ময়কর গদ্যরীতির নমুনা চোখে পড়ে। কবি কবিতা ও গদ্যের ভাশুর-ভাদ্রবৌ সম্পর্ক স্বীকার করেন নি—'ভাষার জলস্থল ও ভাষার গৃহস্থালী'কে মিলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। 'শেষের কবিতা'য় কাব্যধর্মী গদ্যরীতি চূড়ান্ত শীর্ষে আরোহণ করেছে। এখানে গদ্য হয়ে উঠেছে কবিতার প্রতিস্পর্ধী। নববর্ষার প্রথম সমাগমে শিলং পাহাড়ের বর্ণনা দিচ্ছেন কবি—

> "তাই ও যখন ভাবছে পালাই, পাহাড় বেয়ে নেমে গিয়ে পায়ে হেঁটে শিলেট শিলচরের ভিতর দিয়ে যেখানে খুশি, এমন সময় আষাঢ় এল

৭. বাতায়নিকের পত্র : সবুজ পত্র, আষাঢ় ১৩২৬।

পাহাড়ে পাহাড়ে বনে বনে তার সজল ঘনচ্ছায়ার চাদর লুটিয়ে। খবর পাওয়া গেল, চেরাপুঞ্জির গিরিশৃঙ্গ নববর্ষার মেঘদলের পুঞ্জিত আক্রমণ আপন বুক দিয়ে ঠেকিয়েছে ; এইবার ঘনবর্ষণে গিরিনির্ঝরিণী-গুলোকে খেপিয়ে কুল ছাড়া করবে। স্থির করলে, এই সময়টাতে কিছুদিনের জন্য চেরাপুঞ্জির ডাকবাংলোয় এমন মেঘদূত জমিয়ে তুলবে যার অলক্ষ্য অলকার নায়িকা অশরীরী বিদ্যুতের মতো চিত্ত-আকাশে ক্ষণে ক্ষণে চমক দেয়, নাম লেখে না, ঠিকানা রেখে যায় না।"

কিন্তু কাব্যধর্মিতাই শেষের কবিতার গদ্যের একমাত্র ধর্ম নয়, ঝাঁঝালো বাঁকাভঙ্গি শ্লেষ-বিদ্রূপে শাণিত, কাটাকাটা তীক্ষ্ণচূড় মন্তব্যগুলি মরুভূমির রৌদ্রদীপ্ত বালুকণার মতো অগ্নিকটাক্ষ বর্ষণ করে। নরেন মিটারের চরিত্রদ্যোতক বর্ণনাটি এই রীতির একটি শ্রেষ্ঠ উদাহরণ—

"য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ দরজিশালার রেজেস্ট্রি বহিতে ওর গায়ের মাপ নম্বর লেখা, এমন সব কোঠায়, যেখানে খুঁজলে পাতিয়ালা-কর্পূরতলার নাম পাওয়া যেতে পারে। ওর স্ল্যাঙ-বিকীর্ণ ইংরেজি ভাষার উচ্চারণটা বিজড়িত বিলম্বিত, আমীলিত চক্ষুর অলস কটাক্ষ সহযোগে অনতি-ব্যক্ত : যারা অভিজ্ঞ তাদের কাছে শোনা যায় ইংলণ্ডে অনেক নীলরক্তবান আমীরদের কণ্ঠস্বরে এইরকম গদ্‌গদ জড়িমা। এর উপরে ঘোড়-দৌড়ীয় অপভাষা এবং বিলিতি শপথের দুর্বাক্যসম্পদে সে তার দলের লোকের আদর্শ পুরুষ।"

রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষদিন পর্যন্ত গদ্যরীতির বিচিত্র প্রসাধন ও রূপরচনায় নিযুক্ত ছিলেন। শেষদিকের গল্প-উপন্যাসের গদ্য-রীতি বাগ্‌বৈদগ্ধ্যে ও সূক্ষ্ম কারুকার্যে কবির জরামৃত্যুজয়ী প্রতিভার সোনার স্বাক্ষরে সমুজ্জ্বল। 'তিনসঙ্গী'র ভাষা যেমন তেমন ভাবে কবি মোড় ফিরিয়েছেন, কত সহজ ও অবলীলাকৃত এর গতি! ভাষার অসিক্রীড়ায় কবির কত সহজ নৈপুণ্য! 'ল্যাব-রেটরি' গল্পের একটি অংশকে নমুনা হিসেবে উদ্ধার করা যাক—

"নীলার যৌবনের আঁচ লাগত তারও মনে, তুলত তাকে তাতিয়ে অনির্দেশ্য কামনার তপ্ত তাপে। মুগ্ধের দল ভিড় করে আসতে লাগল এদিকে ওদিকে। কিন্তু দরওয়াজা বন্ধ। বন্ধুত্ব প্রয়াসিনীরা নিমন্ত্রণ করে চায়ে টেনিসে সিনেমায়, নিমন্ত্রণ পৌঁছয় না কোনো ঠিকানায়। অনেক লোভী ফিরতে লাগল মধুগন্ধভরা আকাশে, কিন্তু কোনো অভাগ্য কাঙাল মোহিনীর ছাড়পত্র পায় না। এদিকে দেখা যায় উৎকণ্ঠিত মেয়ে সুযোগ পেলে উঁকিঝুঁকি দিতে চায় অজায়গায়। বই পড়ে যে বই টেক্সট বুক কমিটির অনুমোদিত নয়, ছবি গোপনে আনিয়ে নেয় যা আর্টশিক্ষার আনুকূল্য করে বলে বিড়ম্বিত।"

এই স্টাইলের পাশাপাশি 'ছেলেবেলা'র স্টাইলের তুলনা করলে দেখা যাবে এ দুইয়ে কত পার্থক্য। 'ছেলেবেলা'র বলার ভঙ্গির সঙ্গে রূপকথার আমেজ মেশানো। তরল-মধুর বিলম্বিত লয়ের গদ্যে সুকুমার নমনীয়তা। পঞ্চাশোর্ধ্ব রবীন্দ্রনাথ বাংলা গদ্যকে এক শিল্প-সমুজ্জ্বল বিচিত্র কারুখচিত মহিমান্বিত রূপজগতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কোথায়ও এ ভাষা তৈলচিত্রের মতো বর্ণময়, কোথায়ও এ ভাষা ঋজু বলিষ্ঠ মহিমায় স্বপ্রতিষ্ঠ, কোথায়ও বা আভিজাত্য-মন্থর পদক্ষেপে মহার্ঘ, কোথায়ও বা অপ্সরীর মতো সূক্ষ্ম রূপময়ী, কোথায়ও বা অগ্নিকটাক্ষে ও তির্যক ভ্রূভঙ্গিতে বহ্নিদীপ্ত, কোথায়ও কবিকল্পনার অজস্র বর্ষণে সমৃদ্ধ, আবার কোথায়ও বা করুণ-মধুর ব্যঞ্জনায় বিষণ্ণ—রবীন্দ্র-গদ্যের বিস্ময়কর রূপপরিবর্তনগুলি চেতনার প্রতিটি স্তরে সংবেদন জাগায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যরীতিকে রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনের গদ্যরীতির মধ্যে আবিষ্কার করা অসম্ভব। পরবর্তী যুগের বাংলা গদ্যে রবীন্দ্রনাথের পথকে অনুসরণ করার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু সব সময় এতে সুফল হয় নি। রবীন্দ্র-গদ্যের রূপরচনা ও রমণীয়তার দিকেই যেন বেশি নজর পড়েছে, শক্তির দিক হয়েছে উপেক্ষিত। রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের মতো তাঁর গদ্যও ব্যক্তিগত সিদ্ধির ইতিহাস। পূর্ববর্তী বাংলাসাহিত্যের মধ্যে যেমন তার সব নজির

মিলবে না, তেমনি পরবর্তী বাংলাসাহিত্যের পক্ষেও তা অনুকরণ করা সম্ভব নয়—এর ফলে দুর্বলতাই প্রকট হবে মনে হয়। শেষ-জীবনে রবীন্দ্রনাথ নতুন নতুন রূপরচনা ও আর্টফর্মের দিকে ঝুঁকেছিলেন, গদ্যরীতির অভিনব প্রবর্তনা তারই একটি দিক মাত্র, এর সঙ্গে বাংলাগদ্যের ঐতিহ্যের কোনো যোগ ছিল না। তা ছাড়া, এ গদ্যরীতি পরিণত রসবুদ্ধির, কৌতূহলী শিক্ষানবিসির নয়। এ গদ্য আকর্ষণ করে সত্য, কিন্তু তার চেয়েও সত্য হল এই যে এর অনুকরণ এমন কি অনুসরণও দুঃসাধ্য, শুধু দুঃসাধ্য নয় মারাত্মকও। তাই বাংলাগদ্যের সমতলভূমির বহু ঊর্ধ্বে রবীন্দ্র-গদ্যের নিঃসঙ্গ দীপ্তি—যা প্রলুব্ধ করে, আবার দুর্লভের বেদনায় ব্যথিতও করে।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভারতের মর্মবাণী

শ্রীশিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য

ভারতের পুরাকালের ঐতিহ্য ভারতবাসীর চরম সৌভাগ্যের নিদর্শনরূপে এই ভারতভূমিতে জন্মকে নির্দেশ করিয়া আসিয়াছে। কবিও 'নীলসিন্ধুজল ধৌতচরণতল অনিল-বিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল অম্বরচুম্বিত ভাল হিমাচল শুভ্রতুষার-কিরীটিনী জনকজননী'র প্রতি তাঁহার অন্তরের বন্দনা উদাত্ত ভাষায় কীর্তন করিয়াছেন। পাশ্চাত্য কবি কবি-ভাবনার কীর্তিস্থলীকে 'সুবর্ণময়ী' (golden clime) বিশেষণে অভিহিত করেন।[১] মানুষের রচিত বিলাস-বৈভবের কৃত্রিমতা পরিহার করিয়া তাহার শুদ্ধ বুদ্ধ অপাপবিদ্ধ স্বরূপের সন্ধানের যাত্রায় বর্তমান শিক্ষা-শৈলীতেও নিষ্ঠাবান হইতে উপদেশের তাৎপর্য ঘোষিত হইতে আমরা শুনিয়া থাকি। দেশমাতৃকার মহিমা ভারতের নবজন্মের সূত্রপাতে মনীষী বঙ্কিমচন্দ্রকে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির ভঙ্গীতে বর্ণনা করিতে শুনি 'ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে'। কি গভীর আকুতির আহ্বানে না কবির আত্মা উচ্ছ্বসিত ভঙ্গীতে আত্মনিবেদন করিয়াছে—'ছেড়ে দিবে তুমি আমারে কি একেবারে ওগো মাতৃভূমি যুগযুগান্তের মহামৃত্তিকা-বন্ধন সহসা কি ছিঁড়ে যাবে?' 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এ দেশে'. এ শুধু কবির অর্থহীন কথার বিন্যাস নহে। দেশের প্রাকৃত বিভূতি ও তাহার অতিপ্রাকৃত দিব্যমূর্তি—'পাদোইস্য বিশ্বা ভূতান ত্রিপাদ-স্যামৃতংদিবি'—এই দুইয়ের সহযোগের স্বীকৃতিতে কবির জন্মের সার্থকতা।

The poets in a golden clime was born
With golden stars above,
Dower'd with the hate of hate the scorn of scorn
And the love of love.—*Tennyson.*

ভারতের শান্তসমাহিত সচেতন পল্লীপ্রকৃতি এই আকর্ষণের মূলে নিহিত এ কথা অস্বীকার করা চলে না। গ্রাম বিধাতার সৃষ্টি, নগর মানুষের। রবীন্দ্রনাথ নগরের বিক্ষিপ্ত বিপর্যস্ত বহুকেন্দ্রিক জীবন-মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় কল্পনার কল্পলোকে প্রকৃতির স্নিগ্ধ-নীড়ে শান্তিনিকেতন পল্লীর মাঝে ধূলা-জঞ্জালভরা আপনাকে হারাইতে, আসল আপনাকে চিনিতে চান। কুটীরবাসীর প্রশস্তি তাঁহার কবিতায় পাই—'যা কিছু আসে যায় মাটির 'পরে পরশ লাগে তারি আমার ঘরে নাইকো রেষারেষি পথে ও ঘরে।' কবির ও কবির সমধর্মী ভ্রাতুষ্পুত্র অবনীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়ীর চিত্রে যে কঠোর কর্তব্যশৃঙ্খলার নাগপাশের মধ্যেও প্রাচীন পরিবারের স্বপ্রতিষ্ঠ স্বয়ংপূর্ণ সাবলীল পরিবেশের সন্ধান মিলে, তাহা এই শান্তিকামী কবির অন্তরাত্মার আভাসে উজ্জ্বল। তথাপি নগরের আধিব্যাধি আগন্তুক ও আকস্মিকরূপে দেখা দিয়া কবি-চিত্তে যে অস্বস্তি ও বেদনা সৃষ্টি করিত তাহা হইতে মুক্তির প্রয়াসে কবি এখনও ভাগীরথীতীরে পেনেটির বাগানে (যাহা বর্তমানের মত বৃহত্তর মহানগরীর অপরিচ্ছেদ্য অংগরূপে কবির বাল্যে ও কৈশোরের কালে পরিগণিত হয় নাই) শিলাইদহে পদ্মার-তীরের প্রতি, অথবা শান্তিনিকেতনের আপাতরুক্ষ প্রকৃতির সূক্ষ্ম-স্নিগ্ধ স্পর্শের জন্য লালায়িত হইতেন। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে সমাজের বিলাসবহুল অথচ নির্মম আচরণে জর্জর সাম্য-বাদী সমাজতান্ত্রিককে মানুষ মানুষের কি না সর্বনাশসাধন করিয়াছে (what man has made of man) তাহার মর্মান্তিক উপলব্ধির চাপে প্রকৃতির শুদ্ধপূত জীবন-নিশানার (Nature's holy plan) মুখোমুখি হইতে উৎসুখ দেখি। কবি রবীন্দ্রনাথকেও 'স্বর্গ হ'তে বিদায়ের ছবি'কে নিজের কাছে পাইবার জন্য, দম্ভের দাপট ও অন্তরাত্মার দৈন্যকে বিদায় দিতে অন্য প্রসংগে প্রকাশিত তাঁহার অন্তরাত্মার আকূতির মত 'প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু, চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু' এই প্রার্থনায়

'ছায়াসুনিবিড় শান্তির নীড়ে' পল্লীর আশ্রয় লইতে দেখি। সহরের অভ্রভেদী আত্মঘোষণার মুখরতা সনাতন পল্লীপ্রকৃতিকে কলুষিত করে না—তাহার আবেদন কবির কাব্যে ও প্রাণে স্বকীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। কবির বাসনা তাঁহার আদিসুরের কবিতা পঙ্‌ক্তিতে পাই —'আমি গাহিব নীরব করে ভবে নব জীবনের গান'। জীবন নব হইলেও তাঁহার গান সেই কালের শাশ্বত বাণী।

পল্লীপ্রকৃতির ক্রোড়েই ভারতীয় আর্যগণের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ উপনিষদ্-সাহিত্য লালিত ও পুষ্ট হইয়াছিল। বৈদিক সংহিতা-গুলির মন্ত্রভাগ মানুষের সংহত কবিপ্রতিভার অতুলনীয় দান। এই মন্ত্র লইয়া যে বিচার-আলোচনা তাহার নামই ব্রাহ্মণ-সাহিত্য। জনবহুল জনপদে ইহার অধিষ্ঠান ইহাকে যে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি দিয়াছিল, তাহার নিরাকরণ অরণ্যে আশ্রয়ী তৃতীয় আশ্রমের আশ্রমী (বানপ্রস্থাবলম্বী) আর্যমনীষিগণের চিন্তাধারায় 'আরণ্যক' নামে কথিত হয়—'আরণ্যক'এর শেষ (পরিণত) অংশ উপনিষদ্। যাহাকে বেদশিরাঃ বা বেদান্ত বলিয়া কথিত হয়। উত্তরকালে অপরিহার্য কারণে যখন 'ব্রাহ্মণ' বা 'আরণ্যক'এর অবকাশ ছিল না, তখনও তত্ত্বদর্শীর রহস্যময় মর্মবাণী উপনিষদ্ নামেই প্রচলিত হইতে থাকে। শুধু ভারতের সাহিত্যে, সারা পৃথিবীর মানবের নিকট উপনিষদের আহ্বান ও আবেদন গৌরবময় স্বীকৃতিলাভ করিয়াছে। যুগমানব রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতি ও পারিবারিক পরিবেশের বশে এই উপনিষদের রহস্যের উপলব্ধি ও তাঁহার নিজ রচনায় প্রচার ও প্রসার করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীনগণের শান্তিনিকেতন তপোবনে এই শান্ত শিব ও সুন্দরের পরিমণ্ডল (cult) পুষ্ট হয়। তপোবনেই আদিকবির আবির্ভাব—তপোবনের প্রবল আকর্ষণের বার্তা বহন করিয়াই উত্তরযুগের শ্রেষ্ঠকবি কালিদাস তাঁহার কাব্যভাণ্ডার সমৃদ্ধ ও শোভন করিয়াছেন। উপনিষদের প্রভাব ব্যতীত, এই দুই কবি রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ করিয়া প্রভাবিত করেন। তপোবনের অনবদ্য আদর্শেই ভারতের বিদ্যায়তন গুরুকুল বা ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রচলন।

কর্ম জ্ঞান ও ভক্তির স্পৃহণীয় ত্রিবেণীসঙ্গম এখানেই সাধিত হয়। কবি রবীন্দ্রনাথ ঋষির দৃষ্টিতে ও 'গুরুদেব'-এর অনুশাসনে উপনিষদের প্রভায় উদ্ভাসিত তাঁহার পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বঙ্গের পল্লীপ্রান্তে বোলপুরের ব্রহ্মচর্যাশ্রমকে শান্তিনিকেতনে পরিণত করিতে স্বকীয় শক্তি, প্রতিপত্তি ও পূর্বপুরুষ হইতে প্রাপ্ত আর্থিক সম্পদের বিনিয়োগ করেন। উপনিষদের অভীপ্সিত তপোবনের কায়িক ও প্রতিষ্ঠানগত বিধিনিষেধের কালোচিত পুনরুদ্ভাবন করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। যখনই সম্ভব হইয়াছে প্রয়োজনের নির্দেশে উৎসবের আয়োজনের ব্যবস্থা করিয়াছেন, যেখানে শিক্ষার্থিগণ জীবনের তুচ্ছ প্রয়োজনের দাবিদাওয়াকে অতিক্রম করিয়া যে একটা মহত্তর উদ্দেশ্য আছে তাহা অন্তরের অন্তরাত্মায় উপলব্ধি করিয়া আপনাদিগকে ধন্য বোধ করিয়াছে। শ্রুতির ঋষির কণ্ঠে আচার্যরূপে 'এষ আদেশঃ। এষ উপদেশঃ। এষা বেদোপনিষৎ। এতদনুশাসনম্।' বলিয়া জলদগম্ভীর নাদে আহ্বান, কবিগুরুর 'শান্তিনিকেতন' নামে প্রকাশিত গ্রন্থের বিষয়সূচীতে, বক্তব্যের পারিপাট্যে, আলোচনাগুলির প্রতি পঙ্‌ক্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ইহাই যে ভারতীয়ের বদ্ধমূল সংস্কার তাহা কত না ছন্দে কত না বন্ধে বলা হইয়াছে। এইজন্যেই আমাদের ঘরের মাঝখানেই আমাদের কাজকর্মের হাটের মধ্যেই দিনরাত রব উঠেছে, হরি আমায় পার করো। এইখানেই সমুদ্র, এইখানেই পার। 'কিছুই থাকে না বলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছি—তেমনি কিছুই নড়ে না বলে হতাশ হয়ে পড়ছি নে। থাক্‌ছেও বটে যাচ্ছেও বটে, এই দুইয়ের মাঝখানে আমরা ফাঁকও পেয়েছি আশ্রয়ও পেয়েছি—আমাদের ঘরও জুটছে, আলোবাতাসও মারা যায়নি।' উচ্ছ্বসিত হৃদয়ের মূর্ত অভিব্যক্তি তাঁহার কত না গানে এই রহস্যের কথা শুনি। 'আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে দেখতে আমি পায়নি। বাহির পানে চোখ মেলেছি হৃদয়পানেই চায়নি'। 'আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না। এই জানারি সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা কত জনম মরণেতে তোমারি ঐ

চরণেতে আপনাকে যে দেবো তবু বাড়্‌বে দেনা।' মায়ীর্ মায়ার ফাঁকের মধ্য দিয়া তার আনন্দময় সত্তার উপলব্ধি কত না সুকৃত-রাশির পরিণতি। তাঁকে নিজের মধ্যে পাওয়া চাই 'তার অন্ত নাই গো যে আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ। তার অণু পরমাণু পেল কত আলোর সঙ্গ'।

'এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর হে সুন্দর। পুণ্য হলো অঙ্গ মম ধন্য হলো অন্তর'। 'তোমার মাঝে এমনি করে নবীন করি লও-যে মোরে, এই জনমে ঘটালে মোর জন্ম-জনমান্তর'। যে জালের ফাঁদে তিনি আমাদিগকে ধরিয়া রাখিয়াছেন—উপনিষদের কথায় 'স এব জালবানীশত ঈশনীভিঃ', তার পরের যাওয়াই তো জন্মান্তর।

অন্তরাত্মা ও অবচেতন মনের গহন গুহার বাহিরে ও চেতন মননশীল মনের উপর ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যের যে বিশাল পরি-মণ্ডল—রামায়ণ মহাভারত বৌদ্ধ গ্রন্থের ও পরিণত-প্রজ্ঞা ক্রান্তদর্শী কবিগণের চিন্তারাজ্যে কবিমন যে অহরহ বিচরণ করিয়া আত্মতৃপ্তি ও নিবৃতির সন্ধান পাইয়াছে, তাহার কথা কোন্ রবীন্দ্র-রচনার পাঠকের নিকট অবিদিত? এই সকল গ্রন্থের পঠন-পাঠনে ও ধ্যান-ধারণায় কবির সমালোচনা যে পরিমাণে সহায়তা করিতেছে ও বিদগ্ধ-সমাজে অনুপ্রেরণা যোগাইয়াছে তাহার তুলনা করা চলে না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। জাতীয় জীবনগঠনে রামায়ণের উপযোগিতা অনুধাবন করিতে হইলে পাঠককে স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেনের 'রামায়ণী কথা'র কবিলিখিত ভূমিকা অবশ্য পাঠ করিতে হয়। ধম্মপদের নৈতিক ও পারমার্থিক ভিত্তির পরখ করিতে হইলে তাঁহারই লিখিত সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ বাঙ্গালা অনুবাদের পরিচিতি অনেকে দিন পর্যন্ত সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিবে। কালিদাসের কুমারসম্ভব, মেঘদূত ও শকুন্তলার রসপিপাসু তত্ত্বদর্শী পাঠকের কাছে রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বোদ্‌ঘাটন অমূল্য সম্পদ্। অনন্যসাধারণ শক্তির সাধক বাণভট্টের সারস্বত সাধনার সূক্ষ্ম সন্ধান তাঁহার কাদম্বরী কাব্যের সংক্ষিপ্ত খণ্ডবিন্যাসে পত্রলেখা চরিত্রের

প্রশস্তিতেই মিলে। বাঙ্গালায় অপার্থিব প্রেমভক্তির সাধক বৈষ্ণব-মহাজনের পদাবলী তাঁহার মনে যে রেখাপাত করিয়াছিল তাহার আভাস তাঁহার 'বৈষ্ণব কবির গানের' মূল্য নির্ধারণে ও স্বকীয় কবি-জীবনের পুরোভাগে 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'তে প্রকট। 'কো তুঁহুঁ বোলবি মোয়। হৃদয়মাহ মঝু জাগসি অনুখন, আঁখউপর তুঁহুঁ রচলহি আসন—অরুণ নয়ন তব মরমসঙে মম নিমিখ ন অন্তর হোয়॥...কো তুঁহুঁ কো তুঁহুঁ সবজন পুছয়ি, অনুদিন সঘন নয়নজল মুছয়ি—যাচে ভানু, সব সংশয় ঘুচায়ি জনম চরণ'পর গোয়॥' এ-পদ সংশয়চ্ছেদী প্রশ্নোত্তর।

এই রাজ্যে বিচরণ করিয়া কবি ভারতের মর্মবাণী অন্তরে অনুভব করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, কবি তাঁহার স্নিগ্ধোজ্জ্বল বুদ্ধি-দীপ্ত প্রতিভার সাহায্যে এই ক্ষেত্রে সোনা ফলাইয়াছেন। বাঙ্গালীর মহাপ্রাণের দুইটি ধারা—তার তীক্ষ্ন ধীশক্তি ও তার সরসতা—কবি-কৃতিকে বরেণ্য করিয়া তুলিয়াছে। আদিকবি বাল্মীকি এক ক্রৌঞ্চ-মিথুনের নিদারুণ বিপৎপাত্‌কে কাব্যের রসে জারিত করিয়া অনন্য-সাধারণ করিয়া তুলিয়াছেন। সূত্রিত বা সূচনায় নির্দিষ্ট এই করুণরস তাঁহার দীর্ঘরচনার সর্বত্র ওতপ্রোত থাকিয়া পরিণতিতে প্রতিষ্ঠিত।[২] যুক্তিতে নির্ভরশীল ভাববিহ্বল কবি এই পরিণতিতে মর্মন্তুদ বেদনায় অধীর হইয়া ভাবিলেন—কবি! এই কি তোমার মনে ছিল? (বাল্মীকে! এষ কিং তে কাব্যার্থ্যঃ)। কিশোর কবি রবীন্দ্রনাথও কবির পরিণতির স্বীকৃতিতে সরস্বতীর মুখ দিয়া বলাইলেন,—'যে করুণ রসে আজি ডুবিল রে ও হৃদয়, শত-স্রোতে তুই তাহা ঢালিবি জগৎময়'। তাঁহার 'বাল্মীকি-প্রতিভা' নামক গীতিনাট্যে ক্রৌঞ্চমিথুনের ঘটনার সহিত দেবী সরস্বতীর অবতারণা

২. রামায়ণে হি করুণো রসঃ স্বয়ম্ আদিকবিনা সূত্রিতঃ 'শোকঃ শ্লোকতামাগত' ইত্যেবংবাদিনা। নির্ব্যূঢ়শ্চ স এব সীতাত্যন্তবিয়োগপর্যন্ত-মেব সপ্রবন্ধমুপরচয়তা। (ধ্বন্যালোক—চতুর্থ উদ্দ্যোত)।

করিয়া 'বাল্মীকি-প্রতিভা'য় সরস্বতীর জয় ঘোষিত করিলেন। সরস্বতীর জয় কবির জয়। বাল্মীকির এই জয় (যাহা কিছু পরে সংস্কৃত-পারদর্শী প্রবন্ধ-লেখকের প্রবন্ধে নবতর চিত্রপটে উদ্ভাসিত হইয়াছিল) কবির মহত্ত্বসংবাদে ভবিষ্যদ্বাণী। সরস্বতী বলিলেন —'আমি বীণাপাণি. তোরে এসেছি শিখাতে গান। তোর গানে গোলে যাবে সহস্র পাষাণ-প্রাণ'। মহাভারতের আখ্যানে কর্ণ-চরিত্র যুগপৎ বিস্ময় ও কৌতূহলের উদ্রেক করে। উত্তরযুগে সংস্কৃত-সাহিত্যের এক প্রথিতযশাঃ নাট্যকার তাঁহার মুখ দিয়া পৌরুষের ব্যাখ্যান করিয়াছেন। (দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মদায়ত্তং তু পৌরুষম্)। কবি-গুরু তাঁহার কাব্য-নাট্য 'কর্ণকুন্তী সংবাদে' এই কর্ণেরই মুখ দিয়া শুনাইলেন—'হেরিতেছি শান্তিময় শূন্য পরিণাম। যে পক্ষের পরাজয় সে পক্ষ ত্যজিতে মোরে কোরো না আহ্বান। জয়ী হোক্, রাজা হোক্ পাণ্ডবসন্তান—আমি রব নিষ্ফলের হতাশের দলে'। কি অপূর্ব চরিত্রের তাৎপর্যনির্ণয়! মহাভারতের আখ্যান লইয়া রচিত আর এক কাব্যনাট্যে, 'গান্ধারীর আবেদন'-এ ভারতের প্রাচীন কবির অভিপ্রায় নির্ধারণে গান্ধারী চরিত্রের অতুলনীয় মহিমা —বাৎসল্য ও ন্যায়বিধানের সংঘর্ষে স্বপ্রতিষ্ঠ দেখি। 'ধর্ম নহে সম্পদের হেতু, মহারাজ, নহে সে সুখের ক্ষুদ্র সেতু; ধর্মেই ধর্মের শেষ'। নিয়তির নির্মম শাসনকে মাথা পাতিয়া লইবার সংকল্প তাঁহার কি স্পষ্ট ও অবিসংবাদিত। 'লুটাও লুটাও শির, প্রণম রমণী সেই মহাকালে, তার রথচক্রধ্বনি দূর রুদ্রলোক হ'তে বজ্র-ঘর্ঘরিত ওই শুনা যায়। তোর আর্ত জর্জরিত হৃদয় পাতিয়া রাখ্ তার পথতলে'।...'নমো নম সুনিশ্চিত পরিণাম, নির্বাক নির্মম দারুণ করুণ শান্তি! নমো নমো নম কল্যাণ কঠোর কান্ত, ক্ষমা স্নিগ্ধতম'! ইংরেজ কবির—'His honour rooted in dishonour stood and faith unfaithful kept him falsely true,' এই বাচনভঙ্গীর কাছে ম্লান ও হতপ্রভ। 'বিদায়-অভিশাপ' নামক কাব্য-নাট্যে অবমানিত নারীপ্রেমের দৃপ্ত বাণী—'তোমা 'পরে এই

মোর অভিশাপ—যে বিদ্যার তরে মোরে কর অবহেলা, সে বিদ্যা তোমার সম্পূর্ণ হবে না বশ ; তুমি শুধু তার ভারবাহী হয়ে রবে, করিবে না ভোগ'। উত্তরে কর্মব্রত মুনিপুত্রের শান্তসৌম্য উক্তি—'আমি বর দিনু দেবী, তুমি সুখী হবে। ভুলে যাবে সর্বগ্লানি বিপুল গৌরবে'—কবির আদর্শনির্ভর ও শিল্প-সংযমের চূড়ান্ত নিদর্শন। বৌদ্ধ-কাহিনীতে কবির 'পূজারিনী' কবিতায় ''মুক্ত-কৃপাণে পুররক্ষক তখনি ছুটিয়া আসি শুধালো, 'কে তুই ওরে দুর্মতি, মরিবার তরে করিস্ আরতি'? মধুর কণ্ঠে শুনিল, 'শ্রীমতী, আমি বুদ্ধের দাসী','' ও 'অভিসার' কবিতায় নগরীর নটী 'নিদারুণ রোগে মারীগুটিকায়...রোগমসী-ঢালা কালী তনু' হইলে সন্ন্যাসী উপগুপ্তের সেবাপরায়ণতা শুধু এখনকার বৌদ্ধ অবদান সাহিত্যপাঠে অনভ্যস্ত পাঠককে নহে, কাব্যরসরসিক সকল কালের পাঠককে চমৎকৃত ও পুলকিত করে। সত্য, অহিংসা, বিশ্বমৈত্রী ও জনসেবার এই কালপরম্পরাগত আদর্শে প্রত্যয়সম্পন্ন না হইলে, নিজের উদ্দেশ্যে নিষ্ঠাবান্ না হইলে এমন চিত্রবিন্যাস কি সম্ভব হইতে পারে?

সম্ভব হইয়াছিল শুধু ঐকান্তিকতা ও অক্লান্তভাবে আত্ম-নিয়োগের দ্বারা। উপনিষদ্ প্রজাকাম প্রজাপতির প্রজাসৃষ্টির মূলে এই ঐকান্তিকতার নির্দেশ করিয়াছেন, যাহার শাস্ত্রীয় নাম 'তপঃ'।[৩] কবিসৃষ্টি প্রজাসৃষ্টির সদৃশ ব্যাপার হইলেও তাহার বৈশিষ্ট্য তাহাকে নিয়তির নিয়মের গণ্ডীর বাহিরে রাখিয়া কবির মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছে। তপস্যার সহায় অনাসক্তি—কবির সৃষ্টিতে ও দৃষ্টিতে এই অনাসক্তির (detachment) রেশ সহজলভ্য, 'যার যাহা আছে তার থাক্ তাই, কারো অধিকারে যেতে নাহি চাই, শান্তিতে যদি থাকিবারে পাই

৩. প্রজাকামো বৈ প্রজাপতিঃ স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা মিথুন-মুৎপাদয়তে রয়িঞ্চ প্রাণঞ্চেতি, এতৌ বৈ বহুধা প্রজাঃ করিষ্য ইতি। (প্রশ্নোপনিষদ্)।

একটি নিভৃত কোণে। শুধু বাঁশিখানি হাতে দাও তুলি, বাজাই বসিয়া প্রাণমন খুলি, পুষ্পের মতো সংগীতগুলি ফুটাই আকাশভালে'।... 'সংসার-মাঝে কয়েকটি সুর রেখে দিয়ে যাব করিয়া মধুর, দু-একটি কাঁটা করি দিব দূর—তারপরে ছুটি নিব'। 'পুরস্কার' কবিতায় কবি কবির উদ্দেশ্য (mission) সম্বন্ধে ও তাহার জন্য সাধনার এইভাবে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়াছেন। প্রজাপতির সৃষ্টির জন্য বেদে 'অভীদ্ধ' (প্রকৃষ্টভাবে উদ্দীপিত) তপের সাধকতার উল্লেখ আছে। কবি-সৃষ্টিতে সেইরূপ তীব্র সংবেদনা, আকুল আত্মহারা তৎপরতা চাই। কাব্যে কবির এই বেদনা সার্থক হইয়া উঠে। সিদ্ধির মূলে আত্ম-প্রত্যয়—শ্রুতি বলেন—তদৈক্ষত। বহু স্যাং প্রজায়েয়। কবির কথায় 'আমার সকল কাঁটা ধন্য ক'রে ফুটবে গো ফুল ফুটবে। আমার সকল ব্যথা রঙিন হয়ে গোলাপ হয়ে উঠবে'। এমন অঘটন ঘটিয়া থাকে অল্প কবিরই ভাগ্যে। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের যে সিদ্ধি তাহার অনুরূপ সিদ্ধি বাঙ্গালী কবিকুলের মধ্যে এক প্রেমের কবি চন্ডী-দাসের পক্ষে পাই। সত্য, শিব ও সুন্দরের উপলব্ধি সহজ কথা নহে। আধিব্যাধিজর্জরিত সংসারের সান্ত্বনা যাহাতে হয় তাহা কখনও কখনও আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মত আকস্মিক হইলেও নৈসর্গিক ঘটনা। এমনই প্রখর বেদনাবোধ ও নিজের উদ্দেশে অস্খলিত প্রত্যয়ই কবিকে তাঁহার সংকল্পে প্রতিষ্ঠিত করে—'আমি ঢালিব করুণাধারা, আমি ভাঙ্গিব পাষাণকারা, আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া আকুল পাগল-পারা'।

এই উদ্বেল হৃদয়-সমুদ্র মন্থনে উঠে যাহা, তাহার দুইটি অঙ্গ আছে—একটি বহিরঙ্গ, অপরটি অন্তরঙ্গ। উপনিষদের ভাষায় একটি হইল 'রয়ি', অপরটি 'প্রাণ'। মূর্তি হইল 'রয়ি'—ইহাই হইল সেই হিরণ্ময় পাত্র যাহার দ্বারা প্রাণের (সত্যের) মুখ আবৃত।[৪]

৪. হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে॥

বৈদিক রয়ি শব্দের সাঙ্কেতিক অর্থ ধন—উহার লৌকিক আকার (রৈ) সম্পত্তি ও সুবর্ণ দুই অর্থেই প্রসিদ্ধ। উহার অর্থ উপনিষদের নির্দেশে গৃহীত হইলে দাঁড়ায়, কবি প্রজাপতির সৃষ্টিতে তাহার মূর্তি বা বাহিরের বাহন ভাষা ছন্দ ও তাহার আনুষঙ্গিক কারুকার্য। রবীন্দ্রনাথের রচনায় এই বহিরঙ্গ যেরূপ সৌষ্ঠব ও গৌরবের দাবি করে, অতি অল্প কবির রচনা তার সমকক্ষতা পাইতে পারে। লালিত্য, চিত্তোন্মাদক আবহাওয়া সৃষ্টি যদি রচনার সম্পদ্ বলিয়া গ্রহণযোগ্য হয়, তবে 'গহন কুসুম-কুঞ্জ মাঝে মৃদুল মধুর বংশি বাজে', শীর্ষক ভানুসিংহের পদ ; 'পোহাল পোহাল বিভাবরী পূর্বতোরণে শুনি বাঁশরী'—'সুন্দর হৃদি রঞ্জন তুমি নন্দনফুলহার' প্রভৃতি গানে আদ্যোপান্তে, 'ক্রন্দনময় নিখিল হৃদয় তাপদহন দীপ্ত, বিষয়বিষ বিকারজীর্ণ দীর্ণ অপরিতৃপ্ত' ; 'ধ্যানগম্ভীর এই-যে ভূধর, নদী-জপমালা-ধৃত প্রান্তর, হেথায় নিত্য হেরো পবিত্র ধরিত্রীরে' ; 'জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে' প্রভৃতি বিচ্ছিন্ন পঙ্‌ক্তিতে যে উদাত্ত গাম্ভীর্যের, অথবা 'অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দমধুর হাওয়া' ; 'কেন বাজাও কাঁকন কনকন কত ছল ভরে' ; 'অলকে কুসুম না দিয়ো...কাজল-বিহীন সজল নয়নে' ; 'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে তব অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে কোরো না বিড়ম্বিত তারে' প্রভৃতি গানের কলিতে, 'চলচপলার চকিত চমকে করিছে চরণ বিচরণ'— ; 'ছায়াসুনিবিড় শান্তির নীড় ছোটো ছোটো গ্রাম-গুলি' ; 'স্তব্ধ অতল দিঘি-কালোজল নিশীথশীতলস্নেহ' প্রভৃতি কবিতার পঙ্‌ক্তিতে মধুরকোমল শব্দচয়ন এই বহিরঙ্গের সমৃদ্ধির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। গদ্য-রচনায় শব্দচিত্রদ্বারা অথবা বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া (যেমন 'ক্ষুধিত পাষাণ' ও 'পঞ্চভূত'-এর বিচিত্র পরিবেশে), ঋতু-নাট্যগুলিতে ঋতুর বিভববিন্যাসে, কৌতুকনাট্যে ও তত্ত্বনাট্যে সহজ, সরল, অথচ সরস সংলাপে কবি তাঁহার সৃষ্টির বহিরঙ্গকে অনিন্দ্যসুন্দর করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন।

উপনিষদের পটভূমিকায় 'রয়ি' হইতে 'প্রাণের' দাবি বড়, যদিও

মিথুনভাবে অর্ধনারীশ্বরের মূর্তির মত উহারা অখণ্ডভাবে সংযুক্ত। রয়ি হইল মোহ প্রমোদের উপাদান আর এই প্রকরণের প্রাণ হইল—অন্যত্র যাহা হৃদয় বা মনের পর্যায়রূপে কল্পিত সংজ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রজ্ঞান, মেধা, ধৃতি, মতি, মনীষার ধারক। কবির কাব্যেও এই প্রাণ তাৎপর্যব্যঞ্জক বৈশিষ্ট্য ও আভিজাত্য দিয়াছে। শরবৎ তন্ময়ভাবে, কোথায়ও বা কল্পনার কল্পলোকের মধ্যে পাঠকের অন্তরাত্মাকে নিমজ্জিত করিয়া, কোথাও যুক্তির জটিল জালে বিস্মিত করিয়া অতর্কিত ভঙ্গীতে কবি আমাদিগকে আকৃষ্ট করেন। 'জড়ায়ে আছে বাধা ছাড়ায়ে যেতে চাই, ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে' ; 'আমার আর হবে না দেরি আমি শুনেছি ঐ বাজে তোমার ভেরী' প্রভৃতি গানের তাৎপর্যে প্রথমোক্ত শ্রেণীর প্রকাশ। 'তুমি কেমন করে গান কর হে গুণী আমি অবাক হয়ে শুনি, কেবল শুনি' ; 'হেরি অহরহ তোমারি বিরহ ভুবনে ভুবনে রাজে হে। কত রূপ ধরে কাননে ভূধরে আকাশে সাগরে সাজে হে' প্রভৃতি গান দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণীর। 'গোরা' 'ঘরে-বাইরে' 'যোগাযোগ' প্রভৃতি মননসর্বস্ব গদ্য-রচনায় সচরাচরই তৃতীয়-নির্দিষ্ট পদ্ধতির পরিচয় পাই। তাঁহার শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি এই কবি-প্রজাপতির প্রাণশক্তিতে প্রাণবন্ত। 'মেঘদূত' কবিতায় শেষের দিকে প্রশ্ন—'কে দিয়েছে হেন শাপ, কেন ব্যবধান? কেন ঊর্ধ্বে চেয়ে কাঁদে রুদ্ধ মনোরথ'? এই প্রাণের এক সমস্যাময় স্তর। 'দুই বিঘা জমি' কবিতায় 'তুমি মহারাজ সাধু হ'লে আজ, আমি আজ চোর বটে', এই প্রাণের মননের এক পূর্ণচ্ছেদ। 'শা-জাহান' কবিতায়—'হে সম্রাট্ কবি এই তব হৃদয়ের ছবি, এই তব নব মেঘদূত, অপূর্ব অদ্ভুত ছন্দে গানে উঠিয়াছে অলক্ষ্যের পানে...' ; 'যুগে যুগান্তরে কহিতেছে একস্বরে চিরবিরহীর বাণী নিয়া—ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া'! প্রভৃতি প্রাণের অনশ্বর অবদানে ভাস্বর। 'উর্বশী' কবিতার 'স্বর্গের উদয়াচলে মূর্তিমতী তুমি হে উষসী, হে ভুবনমোহিনী উর্বশী। জগতের অশ্রুধারে ধৌত তব তনুর তনিমা, ত্রিলোকের হৃদিরক্তে আঁকা তব চরণশোণিমা' প্রভৃতি পঙ্‌ক্তিতে বহি-

রঙ্গ ও অন্তরঙ্গের অপূর্ব সমন্বয়। বহিরঙ্গকে অতিক্রম করিয়া অন্তরঙ্গকে উদ্ভাসিত করিতে, রূপকে অভিভূত করিয়া রসকে প্রকট করিবার প্রকৃষ্ট নিদর্শন কবির 'রক্তকরবী', 'ডাকঘর', 'রাজা' ভাব-নাট্যে আমরা লক্ষ্য করি। বিশেষতঃ 'রক্তকরবী'তে বর্তমান যুগের যান্ত্রিক সভ্যতার করালরূপ ও মানবতার ধিক্‌কারের ভয়াবহ পরিণতি ব্যঞ্জনার ছটায় বিচ্ছুরিত হইয়া কাব্যখানাকে অপূর্ব সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত করিয়াছে। রূপ ও রসের মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনা নাই—সহৃদয় প্রাচীন সমালোচকেরা রূপকে রসের উপাদান বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। আলঙ্কারিকের ভাষায় রূপের বিভাববাদের সহযোগে রসের নিষ্পত্তি। সাহিত্যের রাজ্যে লক্ষ্যের দিক্ দিয়া দেখিলে রস ও তত্ত্ব এই দুইয়ের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। অবশ্য রস ও তত্ত্বের অভেদ তখনই ঘটে যখন জ্ঞান ও আনন্দের একাধারে উপলব্ধি হয়—তাহা কেবল এক অদ্বিতীয় পরমার্থেই সম্ভবে। ভারতের শ্রেষ্ঠ আলঙ্কারিক[৫] কবির দুইটি দৃষ্টির কথা বলিয়াছেন। এই দুই-বৃত্তি সহকারিণীভাবে কল্পিত হইলেও, সর্বত্র সহযোগিনীরূপে ব্যক্ত হয় না। পাঠকের রসাস্বাদনের দিক দিয়া, কবির দিক দিয়া, রসনিষ্পাদনের ব্যাপারে প্রযুক্ত কবি-প্রতিভার মূর্ত বিকাশরূপে বিশ্বের বৈচিত্র্যকে সমসূত্রে গ্রথিত করিয়া বিশ্বের অন্তরের যে আনন্দ তাহার স্ফূর্তি। কয়েকটি প্রমাণ-প্রয়োগদ্বারা তত্ত্বের বুদ্ধি কল্পিত সন্ধান বা তত্ত্বাববোধ। প্রথমটিকে রসানুপযোগী ব্যাপার আশ্রয় করিয়া আছে, দ্বিতীয়টিকে বলা হয় বৈপশ্চিতী দৃষ্টি। বিশ্বের নির্বর্ণন ঐ দুইটির কোন একটির দ্বারা সম্যক্

৫. যা ব্যাপারবতী রসান্ রসয়িতুং কাচিৎ কবীনাং নবা
দৃষ্টির্যা পরিনিষ্ঠিতার্থ(পরিনিশ্চিতার্থ)বিষয়োন্মেষা চ বৈপশ্চিতী।
তে দ্বে অপ্যবলম্ব্য বিশ্বমনিশং নির্বর্ণয়ন্তো বয়ং
শ্রান্তা নৈব চ লব্ধমব্ধিশয়ন ত্বদ্ভক্তিতুল্যং সুখম্॥
(ধ্বন্যালোক—তৃতীয় উদ্দ্যোত)।

নিষ্পন্ন হয় না। জগতের সকল শ্রেষ্ঠ কবিতে ইহাদের প্রকাশ লইয়া প্রবন্ধ নিবন্ধ। সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ ইহাদের কোনটির কোনটির উৎকর্ষ। সম্পূর্ণ শক্যধর্মী সাহিত্যে তত্ত্বজ্ঞান, রসাস্বাদন মুখ্য। প্রবন্ধে তত্ত্বোন্মেষ মুখ্য বা ঐকান্তিকভাবে বিরাজমান। সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের লেখক রবীন্দ্রনাথ আপনাকে বহুধা বিভক্ত করিয়া সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে যথাসম্ভব দুই দৃষ্টিকে সহযোগিনী করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে পুরাণাদিতে আখ্যানের উপস্থাপনে একটি মামুলি ধারা আছে যাহাতে এই বিরোধ পরিহৃত হইয়াছে। বর্তমান যুগের রসসৃষ্টি-ভূতিতে শক্তিশালী লেখক সংকট হইতে সর্বত্র আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। অসীম শক্তি-শালী মনীষী বঙ্কিমচন্দ্রের 'ত্রয়ী' বলিয়া নির্দিষ্ট হয় তিনখানি উদ্দেশ্যমূলক উপন্যাস—'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতা-রাম' গ্রন্থ, ও কথাসাহিত্যের প্রয়োগকুশলী শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' ও 'শেষপ্রশ্ন'র উল্লেখ করা যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সে লেখা 'গোরা', 'ঘরে-বাইরে', 'যোগাযোগ'-এ সংকট যে না আসিয়াছে তাহা নহে। সমগ্র কাব্যের দৃষ্টিভঙ্গিতে কল্যাণময় পরতত্ত্বের ভারতীয় সাধনার অবিভাজ্য অখণ্ড সত্যের দিক্ দিয়া দেখিলে এ সমস্যার সমাধান হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গান—এই দুই ধারাকে উপলব্ধির দিক্ দিয়া ভিন্ন কোঠায় ফেলা কঠিন—রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলীর সম্পাদকগণ ইহা স্বীকার করিয়াছেন। প্রমাণস্বরূপ 'গীতবিতানে' বা 'গীতা-ঞ্জলিতে' ও 'চয়নিকা' বা 'সঞ্চয়িতা'তে 'হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে'; 'যাবার দিনে এই কথাটি বলে যেন যাই'; 'মরণ রে তুঁহুঁ মম শ্যাম-সমান' সমানভাবে অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। এই রস-ব্যাপারের অপূর্ব ও অসংকীর্ণ নিদর্শন পাওয়া যায়। জগতের আনন্দযজ্ঞে নিমন্ত্রণ, কবি এই প্রণালীতে মর্যাদায় ও মাধুর্যে রক্ষা করিয়াছেন। 'জীবনে যত পূজা হ'ল না সারা, জানি হে, জানি তাও হয়নি হারা';

'কত অজানারে জানাইলে তুমি' ; 'এই করেছ ভালো নিঠুর এই করেছ ভালো, এমনি করে হৃদয়ে মোর তীব্র দহন জ্বালো' ; 'জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণাধারায় এসো' ; 'সীমার মাঝে, অসীম, তুমি বাজাও আপন সুর' ; 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা' ; 'মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না' ; 'হৃদয়নন্দন বনে নিভৃত এ নিকেতনে' ; 'পথের সাথী নমি বারম্বার' ; 'ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে' ; 'ডেকেছ আজি, এসেছি সাজি, হে মোর লীলাগুরু' ; 'গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা' ; 'শ্রাবণগগন ঘিরে ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে, শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি—যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী' ; 'দেবী, অনেক ভক্ত এসেছে তোমার চরণতলে অনেক অর্ঘ্য আনি' ; 'নীল নবঘনে আষাঢ়গগনে তিল ঠাঁই আর নাহি রে' ; 'অন্তর মম বিকশিত কর অন্তরতর হে' ; 'আমার না-বলা বাণীর ঘন যামিনীর মাঝে তোমার ভাবনা তারার মতন রাজে' ; 'তোমার রাগিণী জীবনকুঞ্জে বাজে যেন সদা বাজে গো' ; 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে' ; 'হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ-প্রাণ' ; 'মধুর, তোমার শেষ যে না পাই'—ইত্যাদি কত না অর্ঘ্য তাঁহার এই অন্তরের অন্তস্তল ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন সমালোচকেরা তোমার মহিমা বর্ণনা করিতে শ্রান্তিবোধ করিয়াছেন ; 'তোমার ভক্তিতুল্য মুখ নাই' এই খেদোক্তির অবসানকল্পে রবীন্দ্র-নাথের কবিতা চরমকল্প।

সাহিত্যিকের সাহিত্যপ্রয়াস চরিতার্থ হয় তখনই যখন তাহার মূলে থাকে রূপ ও রসের প্রকৃত পারিপার্শ্বিক উপলব্ধি ও সেই উপলব্ধির জন্য দৃঢ়ব্রততা ও ঐকান্তিকতা। তাহার ঐতিহ্য সহৃদয়ের ভাবক্ষেত্রে এবং তাহার সাধন হইতেছে শব্দের সুপ্ত নিহিত শক্তির আবিষ্কারে। আলঙ্কারিকের ভাষায় কবির শক্তি ও প্রতিভা কাব্যার্থ-তত্ত্বজ্ঞের নিকট তাঁহার তত্ত্বের নিবেদন ও কাব্যের ব্যঞ্জনার দ্বারা তাৎপর্যবিন্যাস। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে তাঁহার মানসীর উদ্দেশে এই ঐকান্তিক প্রয়াণ 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' প্রভৃতি কবিতাতে প্রকট। 'বলো

দেখি মোরে, শুধাই তোমায় অপরিচিতা...হোথায় কি আছে আলয় তোমার ঊর্মিমুখর সাগরের পার, কোথা আছ ওগো, করহ পরশ নিকটে আসি।' কবি জয়দেবের শ্রীরাধার 'পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে শঙ্কিতভবদুপযানং'-এর অনুভূতির মত 'আমারো চিত্তের মাঝে তেমনি অজ্ঞাত ব্যথাভরে তেমনি অচেনা প্রত্যাশায় অলক্ষ্য সুদূরতার উঠেছে মর্মর স্বর'। কবি-হৃদয়ের বাক্যের রাজ্যের যাহা ঊর্ধ্বে স্থিত, বস্তু ও চিত্রকে অতিক্রম করিয়া যাহার আবেদন তাহার জন্য সাধনা। লক্ষ্য বিষয়ে তাঁহার আকূতি 'যথাস্থান' প্রভৃতি কবিতায় চটুলভাবে ও অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং শিরসি মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ, এই প্রবচনের তালে 'নিন্দুকের প্রতি নিবেদন' প্রভৃতি কবিতায় আত্মপ্রত্যয়ের সহজ তেজে বিচ্ছুরিত। ব্যঞ্জনার স্বাতন্ত্র্য ও শক্তিমত্তা তাঁহার 'ছবি' কবিতায় 'এই তৃণ, এই ধূলি, ওই তারা, ওই শশীরবি, সবার আড়ালে তুমি ছবি, তুমি শুধু ছবি'। 'তুমি কেমন করে গান ক'র হে গুণী' গানে 'সুরের আলো ভুবন ফেলে ছেয়ে, সুরের হাওয়া চলে গগনে বেয়ে, পাষাণ টুটে ব্যাকুল বেগে ধেয়ে বহিয়া যায় সুরের সুরধুনী', এই পঙ্‌ক্তি উপমার ছলে দেখানো হইয়াছে। শব্দের পাখ্‌না (winged words) আছে এই উক্তির সারবত্তা, ব্যঞ্জনাশক্তির সার্থকতা কবির ঘনসন্নিবদ্ধ 'অহল্যার প্রতি', 'এবার ফিরাও মোরে', 'শা-জাহান', 'যেতে নাহি দিব' প্রভৃতি কবিতায় অন্তরে অনুভূত এই অন্তরের অনুরণন যার সম্বন্ধে কবির ইঙ্গিত 'আমি কান পেতে রই আমার আপন হৃদয়-গহন-দ্বারে'। প্রাচীন আলঙ্কারিকের ভাষায় এই অঙ্গনার লাবণ্যের মত (লাবণ্যমিবাঙ্গনায়াঃ), সুন্দরীর কটাক্ষের মত (কটাক্ষ ইব বামাক্ষ্যাঃ), কবির ভাষায় 'ইচ্ছা হয়ে ছিলি মনের মাঝারে'। ইহা কবির হৃদয়গত ভাব। 'কী যে গান গাহিতে চাই বাণী মোর খুঁজে না পাই' এই 'ধরি ধরি করি ধরিতে না পারি'র প্রণালীর আভাস দেয়।

একজন বিদগ্ধ সমালোচক রবীন্দ্রনাথের নাট্যে তাহার বহির্মণ্ডল ও অন্তর্মণ্ডল, বস্তুমণ্ডল ও জ্যোতির্মণ্ডলের উল্লেখ করিয়াছেন।

আখ্যানবস্তুকে অতিক্রম করিয়া ভাবের, কখনও তত্ত্বের, অনেক ক্ষেত্রে রসের এই পরিমণ্ডল শব্দ ও অর্থের ব্যঞ্জনাশক্তির দ্বারা সাধিত হয়। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে পৃথিবীর সমস্ত শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের শ্রেষ্ঠত্ব এই অন্তর্মণ্ডলের মাপকাঠিতে ধরা পড়ে—ইহার প্রক্রিয়া সমানভাবে সক্রিয়। না বলা বাণীই অন্তরালে বাজে কথার ব্যাজে (কবির কথায় যাহাদের মূল্য বিষয়বস্তুগৌরবে নয়, রচনারসসম্ভোগে)। আপাততঃ অবান্তর চরিত্রের অবতারণায়, আবার কখনও অহেতুকী কল্পনার অসংকুচিত প্রসারে, কখনও ভাবপারিপাট্যের বিহ্বলতায় কবি আমাদের বিস্মিত ও চমৎকৃত করিয়াছেন। সাহিত্যের যথার্থ স্বরূপ সমাজচেতনার অভিব্যক্তি (expression of society) তাহার কলা-কৌশল এই ব্যঞ্জনাকে আশ্রয় করিয়া। রচনার নামকরণ-শৈলী ও ব্যঞ্জনার এই হৃদয়গ্রাহিত্বকে পরিস্ফুট করিয়াছে যেমন 'কড়ি ও কোমল', 'সোনার তরী', 'নৈবেদ্য', 'খেয়া', 'চোখের বালি', 'চৈতালি', 'আকাশপ্রদীপ', 'বলাকা', 'স্ফুলিংগ', 'শেষ সপ্তক', 'সানাই', 'শিশু ভোলানাথ' এবং উত্তরযুগে বহু প্রথিতযশাঃ লেখককে অনু-প্রেরণা দিয়াছে। শরের মত তন্ময়ভাবে শব্দের কার্যকারিতা ও সার্থকতা কবির বিচ্ছিন্ন কবিতা ও ছোটগল্পের মধ্যে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহার সমর্থনে তাঁহার 'কৃষ্ণকলি'. 'রাহুর প্রেম', 'ক্ষুধিত পাষাণ' ও 'ডাকঘর' প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। একাধিক ছোটগল্প ও উপন্যাসে তাঁহার সংযম ও সহসা গল্পের অবসানও এই ব্যঞ্জনার প্রয়োগের সুন্দর নিদর্শন বলিয়া মনে হইয়াছে। এই ব্যঞ্জনারূপ পরম মূর্তি কবি তাঁহার গানে প্রকাশিত করিয়াছেন—'দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে', 'আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসি', 'শেষের মধ্যে অশেষ আছে এই কথাটি মনে, আজকে আমার গানের শেষে জাগছে ক্ষণে ক্ষণে', 'তারে যখন আঘাত লাগে বাজে যখন সুরে সবার চেয়ে বড় যে গান সে রয় বহুদূরে'। ইংরাজ কবি আবেগের উচ্ছ্বাসে এক চিরন্তন অনু-যোগই করিয়াছেন—Star to star sheds light, why not man

to man strike through a finer element of his own? ভারতের কবির লক্ষ্য আরও দূরে—বহু দূরে 'যতো বাচো নিবর্তন্তে' সেই অসীমের চরণপ্রান্তে।

কবির বৈপশ্চিতী তত্ত্বদৃষ্টির পরিচয়ে বলিতে হয় ইহা তাহা ও সুদূরপ্রসারী। প্রভেদ এইটুকু মাত্র যে তাহা মনন বা তত্ত্বোন্মেষের সীমায় সীমিত। রসসৃষ্টি ব্যাপারের মত তাহা উপলব্ধি বা স্বীকৃতির স্বরূপ নহে—রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দীভবতি। ইহা শ্রবণ মননের অধিকারভুক্ত—বিশেষ করিয়া পূর্বে-পশ্চাতে বুদ্ধিকে প্রসারিত করিয়া নিশ্চয়ে বা নির্ণয়ে অধিষ্ঠিত। শাস্ত্রীয় 'শ্রবণ'-এর কালপরম্পরাগত তত্ত্বরূপে সমাহিত বিস্তার-নিদর্শন রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের নির্যাস আধুনিক সংশয়জ্ঞ মানবমনে আহরণ করার সাক্ষ্য আমরা প্রবন্ধের প্রারম্ভে উপস্থাপিত করিয়াছি। কবির নিজের রচনাকে আবর্তিত ও বিবর্তিত করিয়া—কখনও বা বাহিরের অজুহাতে কখনও বা প্রাণের প্রেরণায় আমরা তাঁহার রচনায় 'নবকলেবর' প্রাপ্তির প্রক্রিয়া লক্ষ্য করি—যেমন 'প্রায়শ্চিত্ত' ও 'পরিত্রাণ'-এ, 'বৌঠাকুরাণীর হাট্'-এ, 'নটীর পূজা'য়; 'পূজা-রিনী'তে, 'কর্মফল' ছোটগল্পে, 'শোধবাধ', 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' নব-ন্যাসের 'চিরকুমার সভা'য়, 'রাজর্ষি' উপন্যাসের 'বিসর্জন'-এ, 'গোড়ায় গলদ', 'শেষ রক্ষা'য়, 'পুরস্কার' নামক দীর্ঘ কবিতার 'ঋণশোধ'-এ, 'একটি আষাঢ়ে গল্প'র 'তাসের দেশে', 'রাজা' নাটকের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ 'অরূপরতনে', 'অচলায়তন' নাটকের লঘুতর আকার 'গুরু' নাটকে, 'পরিশোধ' কবিতার শ্যামা ও শ্যামার পরিশিষ্টরূপে গীতি-নাট্যে, 'শারদোৎসব'-এর 'ঋণশোধ'-এ বিপরিণতি। লক্ষ্য করিবার বিষয় এগুলির নবকলেবর নাট্যে—যাহা কাব্যে চিন্তার ঘনীভূত সংশ্লিষ্ট মূর্তি। ইহাদের মধ্যে ধনঞ্জয় বৈরাগী, কবিশেখর, ঠাকুরদাস নামের চরিত্রে যে অনাসক্ত স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিত্বের সন্ধান পাই তাহা ভারতের শাশ্বত শিক্ষার আধার 'গীতা'র অনাসক্তিযোগের প্রতীক্। 'যারা অপর্যাপ্ত প্রাণকে বুকের মধ্যে পেয়েছে, জগতের কিছুতে যাদের

উপেক্ষা নাই, জয় করে তারা, ত্যাগ করে তারাই, বাঁচতে জানে তারা, মরতে জানেও তারা। কবিশেখরের এ বাণী 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ' শ্রুতির প্রতিধ্বনি।

গীতিধর্মী কবিতা ও বৈচিত্র্যধর্মী উপন্যাস হইতে বিচার (বা) —নির্ণয়ধর্মী নাট্যে এ ধারার পরিণতি কবির শিল্প-কৌশলে সাধিত হইয়াছে—যদিও এক ক্ষেত্রে ভারতের ভাবসভায়, অন্যক্ষেত্রে সংলাপের সুযোগ এই পরিণতির পথ প্রশস্ত করিয়াছে। প্রবন্ধ-সাহিত্যে তত্ত্বানুসন্ধিতে লেখকের পক্ষে এই বৈপশ্চিতী দৃষ্টির উপযোগিতা ও উপকৃতি স্বতঃসিদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে ও তাঁহার সময়ের বহু মনীষী বাঙগালা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন—মনস্বী ভূদেব-তাঁহার সামাজিক প্রবন্ধ, পারিবারিক প্রবন্ধ ও ভারতবর্ষের স্বপ্নলব্ধ ইতিহাসে ; ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার ধর্ম, সমাজ ও অনুশীলন তত্ত্বের আলোচনায় ; সুধী চন্দ্রনাথ বসু তাঁহার ত্রিধারায়। বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রের 'অব্যক্ত' গ্রন্থে ও সত্যপ্রজ্ঞ রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞান ও দর্শনের মিলন ক্ষেত্র নির্দেশে তাঁহার 'প্রকৃতি' প্রভৃতি গ্রন্থে। শিক্ষাব্রতী মহাপ্রাণ গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের 'জ্ঞান ও কর্মে' ; স্বদেশ আত্মার বাণীমূর্তি শ্রীঅরবিন্দ ও চিন্তাশীল বিপিনচন্দ্র পাল তাঁহাদের দেশ ও ধর্ম লইয়া প্রবন্ধসমূহে এ বিভাগে অসামান্য কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ইঁহাদের অবলোচিত সকল বিষয়েই নিয়োজিত এবং সর্বত্রই নিজের স্বতন্ত্র দৃষ্টির পরিচায়ক। তাঁহার 'ধর্ম', 'স্বদেশী সমাজ', 'ভারতবর্ষের ইতিহাস', 'সাহিত্যের পথে', 'আধুনিক সাহিত্য', 'বিচিত্র প্রবন্ধ', 'পঞ্চভূত', 'পরিচয়', 'বিশ্বপরিচয়' প্রভৃতি বহুতর প্রবন্ধে তাঁহার বিশ্লেষণী শক্তির সহিত সমন্বয়-প্রবণ সংস্কারের ধারা ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রাণবেদীতে রচিত হইয়া ভাবুক কলাকুশলী উভয়েরই যথেষ্ট চিন্তার উপাদানের অবতারণা করিয়াছে এবং উত্তরকালের সাহিত্য-শিল্পীর পক্ষে সবল সরস ও প্রজ্ঞাঘন আদর্শ স্থাপন করিয়াছে। একাধিক ক্ষেত্রে তাঁহার মতবাদের সমালোচনা প্রসঙ্গে

যে সাহিত্যের সঞ্চয় হইয়াছে, তাহা কৌতূহলী ভারতেরও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী দেশ-বিদেশের মানবের পক্ষে অবধারণের বিষয়।

দেশ-বিদেশের কথায় বলিতে হয়—এ বিষয়ে বর্তমান যুগে পথিকৃৎ বঙ্কিমচন্দ্রের মত রবীন্দ্রনাথও বিদেশের চিন্তার ধারা হইতে আপনাকে দূরে রাখেন নাই। কবির কথা 'পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার, সেথা হ'তে সবে আনে উপহার, দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে'। বস্তুতঃ ভারতের শিক্ষা-দীক্ষা সর্বসহা সর্বদেশ হইতে চিন্তারত্ন আহরণ করিয়াছে ও তাহাকে আত্মস্থ করিয়াছে। জীবন প্রবাহরূপে গতিশীল ধাবমান। মানুষের চিন্তাও এক কল্প হইতে অন্য কল্পে (from precedent to precedent) সার্থকতার উদ্দেশে যাত্রা করিয়া চলিয়াছে—ইহা হইল পশ্চিমের দর্শন ও বিজ্ঞানের মূল তত্ত্ব। কবি ইহাকে ভারতীয় সাধনার সহিত সামঞ্জস্য করিয়া গ্রহণ করিতে কোন দ্বিধা বোধ করেন নাই। প্রকৃতপক্ষে এ মত ভারতের প্রাচীন সম্প্রদায়েও বেশ প্রবলভাবে প্রচলিত ছিল। কাল, স্বভাব, নিয়তি জীবের কর্মশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে, কালের পরিপাকে জগতের গতি ও স্থিতি।[৬] নৈরাত্ম্যবাদী বৌদ্ধ দর্শনের এক ভঙ্গীতে বিপরিণামকেই (flex) চূড়ান্ত তথ্য বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। এই ভাবের প্রকাশ কবির কবিতায় ও গানে কখনও কবিসুলভ বা অনুতাপের সুরে (যেমন 'দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইল না, কান্না হাসির বাঁধন তারা সইল না') কখনও উদাসীনভাবে—'হেথা হতে যাও পুরাতন, হেথায় নূতন খেলা আরম্ভ হয়েছে' ; 'জীবনের খরস্রোতে ভাসিছ সদাই ভুবনের ঘাটে ঘাটে'—, 'এক হাটে লও বোঝা, শূন্য করে দাও অন্য হাটে'। কিন্তু এই প্রবাহের ধারাকে সংহত

৬. কালঃ স্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা ভূতানি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্যম্।
সংযোগ এষাং ন ত্বাত্মভাবাদাত্মাপ্যনীশঃ সুখদুঃখহেতোঃ॥
(শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ)।
ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্ত্তা। (মহাভারত)।

করিয়া যে কালের মূর্তি অনন্তের বাণী, তাহাই সারা কাব্যে অহরহ ধ্বনিত। 'আমারে ফিরায়ে লহো সেই সর্ব-মাঝে যেথা হতে অহরহ অংকুরিছে মুকুলিছে, মুঞ্জরিছে প্রাণ শতেক সহস্র রূপে', 'হে অতীত, তুমি ভুবনে ভুবনে কাজ করে যাও গোপনে গোপনে, মুখর দিনের চপলতা-মাঝে স্থির হয়ে তুমি রও', 'মরে না মরে না কভু সত্য যাহা শত শতাব্দীর বিস্মৃতির তলে', 'যাওয়া সে যে তোমার পানে যাওয়ার পথে চলা সেই তো তোমায় পাওয়া'। 'সেই চলতি আসনে বসে কোন কারিগর গাঁথছে ছোট ছোট জন্মমৃত্যুর সীমানায় নানা রবীন্দ্রনাথের একখানা মালা', 'দেখছি নিত্যের জ্যোতি দুর্যোগের মাত্রার আড়ালে'।

দীর্ঘ জীবনে নানান প্রয়োজনে কবিকে পৃথিবীর নানান দেশে যাইতে হইয়াছিল, তাদের বহিরাকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতি কবি-মনে যে সব রেখাপাত করিয়াছিল, তাহার নমুনা পাইতেছি তাঁহার 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র', 'পাশ্চাত্য ভ্রমণ', 'য়ুরোপ যাত্রী' প্রভৃতি রচনায়। বিশেষ করিয়া আকৃষ্ট করে চীন, জাপান ও রুশদেশ সম্বন্ধে তাঁহার ভ্রমণলব্ধ অভিজ্ঞতা, যাহা এখনকার পাঠকের পক্ষে কৌতূহলোদ্দীপক চমকপ্রদ। বাহিরের সংগে নিবিড় পরিচয়ে কবির অন্তরাত্মার অকুণ্ঠ আকাঙ্ক্ষা দেশের মধ্যে সাধারণের জন্যই নূতনতর পরিস্থিতিতে লোকশিক্ষা প্রচলিত করা মূর্তি পাইবার সুযোগ পায়—যার ফলে বিশ্ব-ভারতী কর্তৃক 'লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা' কল্পনা। এই প্রসংগে 'বুদ্ধিকে মোহমুক্ত ও সতর্ক করার' জন্য বিজ্ঞানচর্চাকে বিস্তৃত করিবার আগ্রহ তাঁহার 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থ, যেখানে ছাত্র-পাঠকের প্রতি ভূমিকায় এই নূতন জ্ঞানের রাজ্যে তাদের সখটা জাগানোর ঐকান্তিক চেষ্টা করিয়াছেন। এই উভয় খাতে তাঁর রচনাপ্রবাহ দেশের যে প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছে, তার থেকে কম হয় নাই তাঁর বিদেশী মনীষি-গণের সংগে সংস্পর্শের কারণে প্রত্যক্ষভাবে ভারতের ঐতিহ্যসম্পদে যাঁহারা বিশ্বাসী, সেই সকল জ্ঞানীগুণীকে বিশ্বভারতীতে আনিয়া তাঁহাদের সংগে ভারতীয় পণ্ডিতদের আলাপ-আলোচনা প্রভৃতির

দ্বারা দেশে ও বিদেশে ভারতীয় সাহিত্যের প্রতি অনুরাগকে উদ্বুদ্ধ করা। এই প্রচেষ্টার দূরপ্রসারী ফলের জন্য কালের পরিণতির মোড়ে বর্তমানে আমরা আসিয়া পৌঁছিয়াছি। প্রতীচীর ভারতীয় বিদ্যায় পারদর্শিতার জন্য ভারতীয়দের যেমন আজ প্রায় বিশ বৎসর যাবৎ যে একমুখী গতিবিধি (one way traffic) ছিল, তাহার অন্যমুখী হইবার যে লক্ষণ দেখা যাইতেছে, তাহা দূরদর্শী রবীন্দ্র-নাথের উদ্যোগেই মুখ্যতঃ ঘটিয়াছে একথা অস্বীকার করা চলে না। বাঙ্গালা দেশে চীনা সংস্কৃতি, তিব্বতীয় ভাষা অনুশীলনের ধারা প্রচলিত করিবার চেষ্টার মূলে তাঁহার আগ্রহ। চীনের ও তিব্বতের ভাষায় অনূদিত অনেক অমূল্য বৌদ্ধ গ্রন্থ একেবারে বিলুপ্ত হইতে পারে নাই। ইহার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে পূর্বাভাস জ্ঞানীবরেণ্য রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় যাঁহাকে কবি সব্যসাচী বলিয়া সম্মান করিয়াছেন এবং শরৎচন্দ্র দাসের ব্যক্তিগত প্রয়াসেই সীমাবদ্ধ ছিল। শুধু বাসভূমির গণ্ডীর দিক্ দিয়া নহে, চিন্তারাজ্যের দিক্ দিয়া কবির এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের রহস্য কবির কবিতার কথায় প্রকাশ করিতে হইলে বলিতে হয়—'প্রয়াস আমার নাহিক নাহিক কোথাও নাহিক রে।' গীতার 'অনিকেত' সাধক তিনি, সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের 'বহূদক' শ্রেণীভুক্ত, যাঁহার সাধনা জীবনের প্রতি মুহূর্তকে 'সত্য শিব সুন্দরে'র সন্ধানে ব্যাপৃত রাখিয়াছে।

কবির দীর্ঘজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে, স্থান অধিকার করিয়াছে, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদে প্রবর্তিত স্বদেশী আন্দোলন ও পরের যুগের ভারতীয় স্বাধীনতার আয়োজন। প্রথমটি তাঁহার জীবনের প্রায় মধ্যভাগে সংঘটিত হয়। এই আন্দোলনে তিনি মনে প্রাণে যোগ-দান করেন। দ্বিতীয় প্রয়াসটির মূলে যে নিদারুণ ঘটনাটি ছিল, তাহা তাঁহার হৃদয়কে মথিত করিয়া ধৈর্যের অবসান ঘটায়—যাহার নিদর্শন তখনকার রাজপ্রতিনিধিকে লেখা তাঁহার পত্র। পারিবারিক শোকতাপের ধারা তাঁহাকে তেমন ব্যথিত করিতে পারে নাই, যেমন এই ঘটনাটি করিয়াছিল। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে দেশাত্মবোধে

দীপ্ত তাঁহার লেখা 'ও আমার দেশের মাটি, তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা, তোমাতে বিশ্বময়ী বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা' গানে দেশমাতৃকার এক অনবদ্য স্নেহোজ্জ্বল মূর্তির আভাস পাই। কবির দেশাত্মবোধ বিশ্বাত্মবোধের অন্তর্ভুক্ত—উপনিষদের এক আত্মসম্পূর্ণ থাক, সর্বসন্ধ সর্বকাম সর্বরসসত্তা। 'দুই বিঘা জমি'তে যে বাস্তুভিটা বা ক্ষুদ্র সীমায় সীমিত জ্ঞান তাহার মূলে অনুভূতির (sentiment) তীব্রতা। ইহার সর্বগ্রাসী একদেশদর্শী স্বভাব তাঁহার এই যুগের কয়েকটি কবিতায় ও উত্তরযুগের রোমন্থনে উত্থিত 'ঘরে-বাইরে' ও 'চার অধ্যায়'-এ হিংসার গোপন লীলা বা বিভীষিকা-পন্থার প্রতি তাঁহার অন্তরের বৈমুখ্যের সূচনা পাই। শেষোক্ত উপন্যাসের বা বড় গল্পের ভূমিকায় কবির আভাসে অন্ধ উন্মত্ততার নানাবিধ উৎপাতের উপসর্গের কথাও তখনকার দেশের ইতিহাসে পাই। একদিন নামকরা চিন্তাশীল কর্মী, তাঁহার ব্রহ্মচর্যাশ্রম সহকর্মী, বৈদান্তিক সন্ন্যাসী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাদের জোড়াসাঁকো বাটীতে অল্প-বিশ্রম্ভালাপের ছলে অনুতাপের ভঙ্গীতে বলেন—'রবিবাবু আমার খুব পতন হয়েছে'। আমরা কবির ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রশস্ত রাজপথ 'হিংসাকে হিংসার দ্বারা দমন করা যায় না', এই সত্যের উপর অকুণ্ঠ বিশ্বাস দেখিতে পাই। বিদেশী কর্তৃপক্ষের যথেচ্ছাচার ও নির্মমতায় যে তিনি উদাসীন ছিলেন না, বা তাহাতে তাঁহার স্বদেশপ্রীতি আঘাত পায় নাই, এ অভিযোগ যে ভিত্তিহীন তাহার প্রমাণ তাঁহার 'কালান্তর' নাম দিয়া গ্রথিত বিভিন্ন প্রবন্ধের নির্দেশ করিতে হয়। দেশের মুক্তি কাজটা খুব বড় অথচ তার উপায়টা খুব ছোট হইবে, এরূপ প্রত্যাশা করার ভিতরেই একটা গলদ আছে। এই প্রত্যাশার মধ্যেই রহিয়া গিয়াছে ঝুঁকির 'পরে বিশ্বাস, বাস্তবের 'পরে নয়; নিজের শক্তির 'পরে নয়। এইখানে গীতার উপদেশ আমাদের মনে করাইয়া দিতে হয় যে কাজেরই অধিকার আমাদের, ফলের অধিকার নয়। 'সমস্যা' প্রবন্ধ সম্বন্ধে তাঁহার সুচিন্তিত মন্তব্য 'কেউ কেউ বলে আমার কথাগুলো কবির

মত শুনতে ভালো, কাজে ভালো নয়। আর কিছুদিন পরে এই কথাগুলো তারা আওড়াবে অম্লানবদনে ওগুলো তাদেরই চিরদিনের নিজের ভাবা কথা' প্রভৃতি কবির মন্তব্য আমাদের মূল বক্তব্যের সারবত্তার নির্দেশ করে। এই প্রবন্ধ সংকলনে পরিশিষ্টরূপে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে 'স্বাধিকারপ্রমত্ত', স্বরাজসাধন ও আন্দামানে রাজনৈতিক বন্দীদের প্রায়োপবেশন উপলক্ষে গ্রথিত তাঁহার প্রচলিত 'দণ্ডনীতি' প্রবন্ধ—এ প্রসঙ্গে বিশেষ উপযোগী।

শুধু রাজনীতিক্ষেত্রে কবির এই শক্তিসাধনার উপদেশ এ কথা মনে করলে তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে। 'রক্তকরবী' প্রভৃতি নাট্যে যেখানে স্বার্থলিপ্সুর অত্যাচারে পীড়িত হৃদয় রক্তকরবীর মত রঙ্গীন হয়ে উঠেছে, সেখানেও কি মুক্তি হতে পরিত্রাণের ঐ একই উপায়। এই কথাই গানে প্রকাশিত হয়েছে—'বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা, বিপদে আমি না যেন করি ভয়'।

কবির জীবনে এই সাধনা সমভাবে চলিয়াছে। এই শক্তি অহঙ্কারের আস্ফালন নহে, মোহের দম্ভ নহে, উন্মত্তের তাণ্ডব নহে। এ বিনয়ের নতি, অশরণের গতি। 'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধুলার তলে', উপনিষদের আনন্দ, কবির রস, ঘনভাবে বদ্ধ হয় এই সাধনায়। 'এই মোর সাধ যেন এ জীবন মাঝে তব আনন্দ মহাসঙ্গীতে বাজে'।...'তব আনন্দ পরমদুঃখে মম জ্বলে ওঠে যেন পুণ্য আলোক সম'। এই সাধনা কখনও কখনও মধুর রসের সাধক বৈষ্ণব কবির ভাবে বিভোর হইয়া উচ্ছ্বসিত সুরে জাগিয়া উঠিয়াছে—'ওহে অন্তরতম, মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ আসি অন্তরে মম'?...'নিতুই নব প্রার্থনা জাগা', 'নতুন করিয়া লহো আরবার চিরপুরাতন মোরে'—আকুলভাবে ডাকিয়াছেন—'ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে'। কখনও বাৎসল্যের আবেগে জীবনের ঠাকুরকে শিশুরূপে দেখিয়া বালগোপাল মূর্তিতে তাহার ভজনা করেন। 'নির্নিমেষে তোমায় হেরে, তোর রহস্য বুঝি নে রে—

সবার ছিলি আমার হলি কেমনে'। কখনও বা জননীরূপে তাঁর সাধনা—'কোন শক্তি মোরে ফুটাইল এ বিপুল রহস্যের ক্রোড়ে অর্ধরাত্রে মহারণ্যে কুসুমের মত'। তখন 'অজ্ঞাত এই রহস্য অপার নিমেষেই মনে হল মাতৃবক্ষসম নিতান্তই পরিচিত একান্তই মম।' 'রূপহীন জ্ঞানাতীত ভীষণ শকতি, ধরেছে আমার কাছে জননী মূরতি'। উপনিষদে তাঁহার উদ্দেশে মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্। তন্ত্র তাঁহার বিশেষণে বলেন, 'ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাম্'। এই-রূপে বীরাচারীর সাধনা। এইরূপে কবি আপনাকে ভারতীয় সাধকদিগের গোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন—সকল কবিই মূলতঃ সাধক। ভারতের এই সাধকরা যুগে যুগে আসিয়া যুগোপযোগী সাধনার ধারা প্রবর্তিত করেন—এই সাধকগণ "অমৃতের পুত্র"। রবীন্দ্রনাথের বাল্যের আকাঙ্ক্ষা জীবনে সার্থক হইয়াছে। সাধনার পুরস্কার সাধনায়—'আমার নাই বা হ'ল পারে যাওয়া'।

এই সাধনাই যে ছিল তাঁহার আত্মপ্রকাশের ভঙ্গী—কবি তাঁহার প্রকৃত আত্মসংবেদন—'জীবনস্মৃতি', 'ছেলেবেলা', 'ছিন্নপত্র', 'বঙ্গবাসী' পত্রিকা অফিস হইতে প্রকাশিত 'বঙ্গভাষার লেখক' (আত্মপরিচয়) প্রভৃতিতে ছোট ছোট নির্দেশের মধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন। নিম্নে কয়েকটি উদ্ধৃতি দেওয়া হইল যেগুলিকে তাঁহার জীবনদর্শন বলা যাইতে পারে—

> 'আমার জীবনের ভিতরে ভিতরে একটি সাধনা ধরে রাখতে হচ্ছে। সে সাধনা হচ্ছে আবরণ মোচনের সাধনা, নিজকে দূরে রাখার সাধনা। আমাকে আমি থেকে ছাড়িয়ে নেবার সাধনা।'
>
> 'আমি আত্মাকে বিশ্বপ্রকৃতিকে বিশ্বেশ্বরকে স্বতন্ত্র কোঠায় খণ্ড খণ্ড করিয়া রাখিয়া আমার ভক্তিকে বিভক্ত করি নাই।'
>
> 'বিশ্বকে গ্রহণ করিয়া এই সংসারকে বিশ্বাস করিয়া এই প্রত্যক্ষকে শ্রদ্ধা করিয়া আমরা যথার্থভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করিতে পারি।'
>
> 'মানুষ যখন...অহংকেই চিরন্তন ক'রে রাখতে চাচ্ছে তখন তার চেষ্টা বৃথা হ'চ্ছে। এই যে জীবনটি ভোগ করা গেল অহংটিকে তার খাজনা-

স্বরূপ মৃত্যুর হাতে দিয়ে হিসাব চুকিয়ে যেতে হবে। ওটি কোন-মতেই জমাবার জিনিস নয়।'

'পৃথিবীতে সৃষ্টির যে লীলাশক্তি আছে সে যে নির্লোভ, সে নিরাসক্ত, সে অকৃপণ—সে কিছু জমতে দেয় না—কেন না জমার জঞ্জালে তার সৃষ্টির পথ আটকায়—সে যে নিত্যনূতনের নিরন্তর প্রকাশের জন্যে তার অবকাশকে নির্মল ক'রে রেখে দিতে চায়।'

'মানবীয় সত্যকে তিনভাগে ভাগ করে দেখা যেতে পারে। সেই তিন বিভাগের শাশ্বত ভিত্তি সন্ধান করতে গেলেই উপনিষদের বাণীর আশ্রয় করা ছাড়া আমাদের পক্ষে আর কোন উপায় নেই।'

'তোমার অসীমে প্রাণমন ল'য়ে যত দূরে আমি চাই—কোথাও দুঃখ কোথাও মৃত্যু কোথাও বিচ্ছেদ নাই।'—এ হেন ভঙ্গীতে রবীন্দ্র-সাহিত্যের আবেদন ভারতের প্রাচীন শিক্ষা-দীক্ষার সম্পদের ভিতর দিয়ে, আর সেই শিক্ষা-দীক্ষা ও মানবীয়তার অবদানে ভাস্বর বলিয়া তার এত আদর। এই গৌরবে উপনিষদের মত ইহাদের ভারতের বাহিরেও স্বীকৃতি সম্ভব হইয়াছিল। নোবেল-পুরস্কার প্রাপ্তির মূলে ইহা যে অনেকটা কাজ করিয়াছিল তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। আজ চাকা ঘুরিয়াছে—ভারতের স্নিগ্ধভাবরাশি সাহিত্যে, সমাজে, রাষ্ট্রনীতিতে সমভাবেই প্রবুদ্ধ মনকে ভক্তিবিহ্বল করিয়া তুলিতেছে। পৃথিবীর সর্বত্র বিদগ্ধমণ্ডলে রবীন্দ্র-সাহিত্য—প্রায় অনেকস্থান তাহার মূল বাঙ্গালার রূপ ও তাত্ত্বিক শ্রী লইয়া বেশ নাড়াচাড়া দিতেছে। আমাদের মধ্যে রবীন্দ্র-রচনার বস্তুতন্ত্রতার দিকে ঝোঁক কম দেখিতেছি না—কিন্তু এহ বাহ্য। ইহার আদর্শ-তন্ত্রতা ইহাকে ভারতের মর্মবাণীরূপে ঘোষণা করে। মধ্যে মধ্যে বাহিরের চিন্তায় অন্য সুর না শুনা যায় এমন নহে, ইহারা ভারতের ধর্ম বা আধ্যাত্মিক চিন্তাজগতের সমস্যা সমাধানে সমর্থ নহে (India's religion is no answer to the problems of Europe)[৭]। সাধারণের অবিসংবাদিত মত ইহার অনুকূলে।

৭. একজন চিন্তাশীল ইংরেজ কবি সমালোচক বলিয়াছেন।

শান্তির সন্ধান—বর্তমান ক্ষণে জগতের প্রকৃত সমস্যা। রবীন্দ্রনাথের শেষ রচনার কয়টি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করিয়া আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়টির উপসংহার করি—

"তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনাজালে
হে ছলনাময়ী।
মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে
সরল জীবনে।
এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বেরে করেছ চিহ্নিত ;
তার তরে রাখনি গোপন রাত্রি।
তোমার জ্যোতিষ্ক তারে
যে-পথ দেখায়
সে যে তার অন্তরের পথ,
সে যে চির স্বচ্ছ
সহজ বিশ্বাসে সে যে
করে তারে চির সমুজ্জ্বল।
বাহিরে কুটিল হোক অন্তরে সে ঋজু,
এই নিয়ে তাহার গৌরব।
লোকে তারে বলে বিড়ম্বিত
সত্যেরে সে পায়
আপন আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে
কিছুতে পারে না তারে প্রবঞ্চিতে,
শেষ পুরস্কার নিয়ে যায় সে যে
আপন ভাণ্ডারে।
অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার।"

ইংরাজীশিক্ষক রবীন্দ্রনাথ

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য

শিক্ষাক্ষেত্রে ইংরাজী ভাষার স্থান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব কি ছিল তাহা আমাদের অজ্ঞাত নহে; কারণ, এ বিষয়ে তাঁহার বক্তব্যে কিছুমাত্র অস্পষ্টতা ছিল না। বিদ্যালয়ে ইংরাজীর প্রাধান্য বিদ্যাশিক্ষার প্রধান অন্তরায় বলিয়া তিনি মনে করিতেন। তিনি বলিতেন, মাতৃভাষাকে কেবলমাত্র বাল্যকালে নহে সর্বকালেই শিক্ষার বাহনরূপে গ্রহণ করা উচিত। তাহা করিতে পারি নাই বলিয়াই আমাদের ধারণাশক্তি বলিষ্ঠ হয় নাই, স্বাধীন চিন্তা করিবার সাহস আমরা হারাইয়াছি। বিদেশী ভাষার পুঁথি পড়িয়া এবং তাহার বুলি মুখস্থ করিয়া আমরা অনেক তথ্য শিখি কিন্তু প্রকৃত বিদ্যা অনায়ত্ত থাকিয়া যায়। বিদেশী ভাষাই যখন আদানপ্রদানের প্রধান অবলম্বন হয় তখন মনের সহজ ভাব সহজে প্রকাশ করা যায় না। বিদেশী ভাষার আবরণের আড়ালে ভাবপ্রকাশের চেষ্টাকে কবি মুখোশের ভিতর দিয়া ভাবপ্রকাশের অভ্যাসের অনুরূপ বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছেন। ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিতে গিয়া আমাদের শক্তি ও সময়ের যে নিদারুণ অপব্যয় হয় তাহা জাতির পক্ষে অপূরণীয় ক্ষতি। পরভাষার দ্বারা ভারাক্রান্ত হওয়ায় অনেকের প্রতিভা শৈশবেই পঙ্গু হইয়া যায়। মাতৃভাষার স্বাভাবিক পথে মানুষ হইবার সুযোগ পাইলে সেই প্রতিভার স্বচ্ছন্দ বিকাশ সম্ভব হইত। জাতীয় সম্পদ হিসাবে তাহার মূল্য যে অপরিমেয় একথা আমরা বুঝিতে পারি নাই বলিয়া তিনি সারাজীবন আক্ষেপ করিয়াছেন। সে আক্ষেপে কর্ণপাত করিবার মত মানুষ তখন বেশী ছিল না।

১৩০৮ সালে (ইং ১৯০১) ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠা হয়। কবি

কল্পনানয়নে ভারতবর্ষের পক্ষে উপযোগী যে আদর্শ বিদ্যালয়ের ছবি দেখিয়াছিলেন ব্রহ্মচর্যাশ্রম তাহারই একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিরূপ।

প্রাচীন ভারতের তপোবনকে এ যুগের উপযোগী করিয়া ফিরাইয়া আনিবার আকাঙ্ক্ষাতেই এই বিদ্যালয়ের জন্ম। কিন্তু এই তপোবনেও কবি ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা রাখিয়াছিলেন। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে ইংরাজী শিক্ষা যে এদেশের পক্ষে অত্যাবশ্যক ইহা তিনি কখনও অস্বীকার করেন নাই। তিনি চাহিয়াছিলেন, শিক্ষার বাহন হিসাবে নয়, শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে ইংরাজী ভাষা আমাদের শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে। অচিরকালব্যাপী স্কুলজীবনের অভিজ্ঞতায় এবং সহজবুদ্ধিবলে ইহাও তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে এদেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ইংরাজী শিক্ষার আয়োজন যতই বিপুল হউক না কেন ছাত্রদের শিক্ষার পক্ষে তাহা একান্ত অনুপযোগী। কেন অনুপযোগী তাহা তিনি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন।

ইংরাজী ভাষার সহিত ভারতীয় ভাষার কোন মিল নাই, উহা "অতিমাত্রায় বিজাতীয় ভাষা"। শব্দবিন্যাসে পদবিন্যাসে ভারতীয় ভাষা ও ইংরাজী ভাষার মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। ভাববিন্যাসেও একের সহিত অন্যের পার্থক্য বিস্তর।

এহেন অতিমাত্রায় বিদেশী এবং একান্ত অপরিচিত ভাষা আয়ত্ত করা শিশুদের পক্ষে সহজ নয় অথচ শিশুকাল হইতেই তাহাদের ইংরাজী শিক্ষণ শুরু হয়। সেটাও নিতান্ত মন্দ হইত না, যদি শিক্ষার ভার পড়িত উপযুক্ত শিক্ষকের হাতে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাদের শিক্ষার ভার পড়ে যাহাদের হাতে শিক্ষক হিসাবে তাহারা অযোগ্য। "নিচের ক্লাসে যে সকল মাষ্টার পড়ায় তাহারা কেহ এণ্ট্রেন্স পাস, কেহ বা এণ্ট্রেন্স ফেল, ইংরেজি ভাষা ভাব আচার ব্যবহার এবং সাহিত্য তাহাদের নিকট কখনই সুপরিচিত নহে। তাহারাই ইংরেজির সহিত আমাদের প্রথম পরিচয় সংঘটন করাইয়া থাকে। তাহারা না জানে ভালো বাংলা, না জানে ভালো

ইংরেজি...।”[১] ইংরাজী শিক্ষাদান বিষয়ে শিক্ষকের অযোগ্যতার জন্য কবি যে-কালে আক্ষেপ করিয়াছিলেন তাহার পর হইতে এক শতাব্দীর ত্রিপাদকাল অতিক্রান্ত হইতে চলিল, আজিও কি সে অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে? ঘটে নাই যে তাহার প্রধান কারণ শিক্ষাপদ্ধতির কলকব্জার একটু এদিক্ ওদিক্ হইলেও তাহার কাঠামোর উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় নাই। সেদিন যে শিক্ষক নীচের ক্লাসে ইংরাজী পড়াইতেন তিনি বাংলা কম জানিতেন, ইংরাজী জানিতেন আরও কম। এ যুগেও উন্নতির কোন কারণ ঘটে নাই। এ যুগে প্রবেশিকা হইতে বি.এ. পর্যন্ত সকল পরীক্ষায় ইংরাজী বিষয়ে পরীক্ষার মান কত নামিয়াছে তাহা কাহারও অবিদিত নয়। ইংরাজী পরীক্ষা পাসের ব্যাপারটা বর্তমানে একটা সামাজিক সমস্যার আকার গ্রহণ করিয়াছে। যাহারা নিজগুণে পাস করিতেছে না, জাতীয় নেতারা তাহাদের গুণ টানিয়া কূলে উত্তীর্ণ করিয়া দিতেছেন, এবং পরক্ষণেই তাহারা আসিয়া বিদ্যালয়ের কেদারা টানিয়া লইয়া শিশুশিক্ষায় ব্রতী হইতেছে। ফল, পূর্বে যাহা হইত আজও তাহা অপেক্ষা অধিকতর সন্তোষজনক হইতেছে না।

যাহারা শিক্ষা দিতেছে তাহাদের দোষ দেওয়া যায় না। নোটবই অভিধান দেখিয়া দুই চার ছত্র ইংরাজীর অর্থ যদি বা আন্দাজমত একটা খাড়া করিয়া তুলে, অন্যকে বুঝাইতে গেলেই বুদ্ধির হালে পানি পায় না। রবীন্দ্রনাথ একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়া আমাদের ইংরাজীশিক্ষকের দুরবস্থার প্রকৃত চিত্রটি তুলিয়া ধরিয়াছেন। Horse is a noble animal—বাক্যটিকে কঠিন কেহ বলিবে না। ব্যাকরণের দিক দিয়া তো নিরতিশয় সরল, অর্থের দিক দিয়াও জটিল বলা যায় না। তথাপি বাক্যটির অর্থপ্রকাশ করিয়া বলিতে হইলেই আর কথা যোগায় না। “ঘোড়া একটি মহৎ জন্তু, ঘোড়া উঁচুদরের জানোয়ার, ঘোড়া জন্তুটা খুব ভালো—কথাটা কিছুতেই

১. শিক্ষার হেরফের—১২৯৯।

তেমন মনঃপূত রকম হয় না।” এবং হয় না বলিয়াই গোঁজামিল দিতে হয়। যে শিক্ষকের বিদ্যা কম তাহার হাতে শিক্ষার ভার থাকিলে গোঁজামিল ছাড়া পথ থাকে না। অত্যল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত শিক্ষকের নিকট অধীত যে বিদ্যা তাহা নিষ্ফলা হইলেও তত দুঃখ ছিল না কিন্তু সে বিদ্যা যে বিষফল প্রসব করে।

আমাদের ইংরাজী শিক্ষার আর এক অন্তরায় ইংরাজী পুস্তকের বিষয়প্রসঙ্গ। ইংরাজের লেখা ইংরাজী বইয়ের সাহায্যে যখন আমরা ইংরাজী পড়া আরম্ভ করি তখন পাঠ্য বিষয় আমাদের অপরিচিত ঠেকে। বিদ্যালয়ে যাহা পড়ি—“জীবনের সঙ্গে, চারিদিকের মানুষের সঙ্গে ঘরের সঙ্গে তাহার মিল দেখিতে পাই না। বাড়িতে বাপ মা ভাই বন্ধুরা যাহা আলোচনা করেন বিদ্যালয়ের সঙ্গে তাহার যোগ নাই।”[২] ফলে, ধারণা জন্মিবার পূর্বেই ছেলেরা মুখস্থ করিতে বাধ্য হয়। দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—

> “হয়তো কোনো একটা শিশুপাঠ্য reader এ haymaking সম্বন্ধে একটা আখ্যান আছে, ইংরেজ ছেলের নিকট সে ব্যাপারটা অত্যন্ত পরিচিত, এইজন্য বিশেষ আনন্দদায়ক; অথবা snowball খেলায় Charlie ও Katie র মধ্যে যে কিরূপ বিবাদ ঘটিয়াছিল তাহার ইতিহাস ইংরেজ সন্তানের নিকট অতিশয় কৌতুকজনক কিন্তু আমাদের ছেলেরা যখন বিদেশী ভাষায় সেগুলা পড়িয়া যায় তখন তাহাদের মনে কোনোরূপ স্মৃতির উদ্রেক হয় না, মনের সম্মুখে ছবির মতো করিয়া কিছু দেখিতে পায় না, আগাগোড়া অন্ধভাবে হাতড়াইয়া চলিতে হয়।”[৩]

অথচ একথা সত্য যে বিশুদ্ধ ইংরাজী লিখিতে হইলে ইংরাজ লেখকের রচিত পুস্তকই পাঠ করা আবশ্যক। ইংরাজী সমাজে বাস করিতে পারিলে, অন্ততঃ ইংরাজী যাহার মাতৃভাষা এমন শিক্ষকের

২. শিক্ষাসমস্যা—১৩১৩।

৩. শিক্ষার হেরফের।

কাছে প্রাথমিক পাঠ লইতে পারিলে, আরও ভাল হয়। রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবনে তাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কিশোর বয়সে তিনি যখন বিলাতে যান তখনই একথা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ইংরাজের পরিবারে বাস করিয়া যে-ইংরাজী শেখা যায় তেমন শিক্ষা কোন বই পড়িয়া হয় না। পরবর্তী জীবনে নিজের বিদ্যালয়ে দেখিয়াছিলেন, শুধু ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হইতেই নয় বিদেশ হইতেও কত শিক্ষার্থী আসিয়া অনায়াসে বাঙ্গালা শিখিয়াছে। শিক্ষণপদ্ধতি অপেক্ষা শিক্ষার্থীর পরিবেশই যে এই শিক্ষার প্রধান সহায়ক সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই।

ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় যখন স্থাপিত হয় তখন দেশে ইংরাজী শিক্ষার উপকরণ বিরল ছিল এবং যাহা ছিল তাহাও সংগ্রহ করা কবির পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না। সুতরাং ছেলেদের ইংরাজী শিক্ষার ভার কবি স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। এই প্রবন্ধে আমরা ইংরাজীশিক্ষক রবীন্দ্রনাথের পরিচয় পাইবার চেষ্টা করিব।

বাঙ্গালী বালকদের ইংরাজী শিক্ষাদানের জন্য যে ধরনের বই আবশ্যক সে বই দেশে নাই তাহা তিনি জানিতেন আর শিক্ষক যে ততোধিক দুর্লভ তাহাও তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। এই সমস্যা-সমাধানকল্পে তিনি স্বয়ং ইংরাজীশিক্ষার পুস্তকরচনায় উদ্‌যোগী হইলেন।

ইংরাজী শিখাইবার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ যতগুলি বই লিখিয়াছেন তাহার প্রায় সব কয়টিই শিক্ষকের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া রচিত। অর্থাৎ তিনি যে বই লিখিলেন তাহা শিক্ষার্থীর পাঠ্য নহে শিক্ষাদাতার পাঠ্য। সেদিক দিয়া রবীন্দ্রনাথকে এদেশে শিক্ষক-শিক্ষণ বিশেষতঃ ইংরাজী শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার পথপ্রদর্শক বলা চলে। ভারতবর্ষে প্রত্যক্ষ শিক্ষণ-পদ্ধতিরও প্রথম প্রবর্তক তিনি। শুধু ইংরাজী শিক্ষার নয়, তাঁহার রচিত সংস্কৃত শিক্ষার বইগুলিও প্রত্যক্ষ পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁহার চিন্তা এবং অনুশীলনের সুস্পষ্ট পরিচয় বহন করে।

রবীন্দ্রনাথকে লিখিত এক পত্রে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় এ বিষয়ে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। "ইংরাজিসোপান" গ্রন্থ সম্বন্ধে তিনি লেখেন—

"আমি যতদূর জানি, এইরূপ পুস্তক বাঙ্গালায় এই প্রথম মুদ্রিত হইল। ইহার প্রণালী অত্যন্ত সুসঙ্গত—Otto, Ollendorf ও Saner প্রভৃতি ভাষাপুস্তক প্রণেতাগণ এই প্রণালী কিয়ৎ পরিমাণে অবলম্বন করিয়াই কৃতকার্য হইয়াছেন। আপনার উদ্ভাবনীশক্তির নিকট বঙ্গদেশ চিরঋণী, এই ইংরাজিশিক্ষা বিষয়েও আপনি পথপ্রদর্শকের কার্য কারয়াছেন।"

রবীন্দ্রনাথ-রচিত পুস্তকগুলিতে ইংরাজী ভাষা শিক্ষণের যে প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছিল তাহার বৈশিষ্ট্য কি এবং প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির সহিত তাহার পার্থক্য কোথায় সে আলোচনার পূর্বে বইগুলির নাম করিয়া লই।

১. ইংরাজিসোপান

ইহা দুইটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ডের প্রকাশকাল ১৯০৪-এর মে মাস। দ্বিতীয় খণ্ড দুই বৎসর পরে অর্থাৎ ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে প্রকাশিত হয়।

প্রথম খণ্ড দুই অংশে বিভক্ত ছিল। প্রথম অংশ উপক্রমণিকা —ইহার পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৪ এবং দ্বিতীয় অংশ ইংরাজিসোপান— প্রথম ভাগ—পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪১।

দ্বিতীয় খণ্ডেরও দুই অংশ—ইংরাজিসোপান দ্বিতীয় ভাগ এবং ইংরাজিসোপান তৃতীয় ভাগ। এই দুইটি ভাগ যথাক্রমে ৩৮ এবং ৪৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ছিল।

২. ইংরাজি পাঠ

১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে রচিত। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪২। Lesson 1 হইতে Lesson 18 পর্যন্ত ১৮টি পাঠে এই পুস্তক সম্পূর্ণ হইয়াছে।

৩. ইংরেজি শ্রুতিশিক্ষা

ইংরাজিসোপানের প্রথম খণ্ডের প্রথম অর্থাৎ উপক্রমণিকা অংশটি পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন করিয়া এই পুস্তক রচিত হয়। পৃষ্ঠাসংখ্যা বাড়িয়া হয় ২৪-এর স্থলে ৩০। প্রকাশকাল সম্ভবতঃ ১৯০৯।

৪. ইংরেজি সহজশিক্ষা

ইংরেজি সহজশিক্ষার দুই ভাগ। প্রথম ভাগের পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪৮ এবং দ্বিতীয় ভাগের ৫৮। দুই ভাগ যথাক্রমে ১৯২৯ ও ১৯৩০-এ প্রকাশিত হয়। সহজশিক্ষাও নূতন বই নয়। ইহার প্রথম ভাগ ইংরাজিসোপান প্রথম ভাগের এবং দ্বিতীয় ভাগ ইংরাজিসোপান দ্বিতীয় ভাগের পরিবর্তিত সংস্করণ।

৫. অনুবাদচর্চা

অনুবাদচর্চা বইটিও দুই খণ্ডে বিভক্ত। এক খণ্ডে "বিবিধ বিষয়ঘটিত বিবিধ ইংরেজি রচনারীতির বাক্যাবলী সংগ্রহ করা হয়েছে।" অন্য খণ্ডে আছে তাহারই আদর্শ বাঙ্গালা অনুবাদ। অনুবাদচর্চার প্রথম প্রকাশকাল ১৯১৭।

রবীন্দ্রনাথ রচিত ইংরাজী শিক্ষার প্রথম পুস্তক 'ইংরাজি-সোপান' যে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ইংরাজী শিখাইবার উদ্দেশ্যেই রচিত হইয়াছিল তাহা উক্ত পুস্তকের 'বিশেষ দ্রষ্টব্য' শীর্ষক বিজ্ঞপ্তি হইতেই জানিতে পারি। ইংরাজিসোপান প্রথম খণ্ডের প্রকাশকাল ১৯০৪ একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। বইটি লেখা হইল কবে? গ্রন্থকার বিজ্ঞপ্তিতে জানাইতেছেন, 'কয়েক বৎসর বোলপুর বিদ্যালয়ে এই প্রণালীতে শিক্ষা দিয়া যেরূপ ফললাভ করা গিয়াছে তাহাতে অসংকোচে এই গ্রন্থ সর্বসমক্ষে উপস্থিত করিতে সাহসী হইয়াছি।' গ্রন্থরচনা ও প্রকাশনার মধ্যে 'কয়েক বৎসর' কাটিয়াছে, যে কয়েক বৎসরে গ্রন্থকার স্বীয়

প্রস্তাবিত শিক্ষাপ্রণালীর উপযোগিতা পরীক্ষা করিবার অবকাশ পাইয়াছেন এবং তৎসম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া বলিতে পারিয়াছেন, 'ইহার সাহায্যে অল্পদিনেই শিক্ষার্থিগণ ইংরাজি ভাষা শিক্ষায় দ্রুত অগ্রসর হইতে পারিবেন ইহা আমাদের জানা কথা।' বালকবয়সী ছাত্র ছাড়া দুই-একজন বয়স্ক ছাত্রের উপরেও এই গ্রন্থের পরীক্ষা হইয়াছিল কিনা জানি না, হয়তো হইয়া থাকিবে। কারণ, 'যাঁহারা অধিক বয়সে ইংরাজি শিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাঁহাদের পক্ষেও এই গ্রন্থ বিশেষ উপযোগী হইয়াছে বলিয়া' গ্রন্থকারের ধারণা।

ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয় ১৩০৮ সালের পৌষ মাসে অর্থাৎ ইংরাজী ১৯০১-এর ডিসেম্বরে। সুতরাং বিদ্যালয়ের কাজ ১৯০২-এর গোড়া হইতেই আরম্ভ হইয়াছে ধরিয়া লইতে পারি। শিক্ষাদানের কাজে হাত দিয়াই রবীন্দ্রনাথ এই বই লিখিয়া থাকিলে ১৯০২ সালই ইহার রচনাকাল বলা চলে। ১৯০৪-এর মে মাসে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। ১৯০২-এর গোড়া হইতে ১৯০৪-এর মে মাস পর্যন্ত যে সময় তাহার পরিমাণ প্রায় আড়াই বৎসর। ''কয়েক বৎসর'' বলিতে এই আড়াই বৎসরই বুঝিতে হইবে। বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে আড়াই বৎসর সময়ের মধ্যেই কবি নিজের প্রবর্তিত শিক্ষাপ্রণালীর পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফল লাভ কারয়াছেন।

আজ হইতে ষাট বৎসর পূর্বে এদেশের শিক্ষার্থীকে ইংরাজী শিখাইবার জন্য তিনি কোন্ প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা জানিতে হইলে রবীন্দ্রনাথ-রচিত ইংরাজী পাঠ্য পুস্তকগুলির বিশেষতঃ আলোচ্য গ্রন্থ ইংরাজিসোপান প্রথম খণ্ডের বিষয়বস্তুর পরিচয় লইতে হইবে।

এই গ্রন্থের প্রথম ভাগ অর্থাৎ উপক্রমণিকা অংশকে লেখক ''ভাষাশিক্ষার ড্রিল'' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ''ছাত্রগণ যখন অক্ষর পরিচয়ে প্রবৃত্ত তখনই ইংরাজি ভাষার সহিত তাহাদের পরিচয়সাধন এই অংশের উদ্দেশ্য।'' ইংরাজী বই পড়িতে আরম্ভ

করিবার পূর্বেই ইংরাজী শব্দ ছাত্রদের কর্ণে ও তাহার অর্থ তাহাদের মনে অভ্যস্ত হওয়া আবশ্যক—ইহাই ছিল লেখকের ধারণা। তিনি অনুভব করিয়াছিলেন, ছাত্রদের ইংরাজী শব্দের উচ্চারণ ও অর্থ অভ্যাস করা থাকিলে "শিক্ষাকার্য অনেক পরিমাণে সহজসাধ্য হইবে।"

এই উপক্রমণিকায় কয়েকটি পাঠ আছে। পাঠগুলি আর কিছু নয়, কয়েকটি অনুজ্ঞাবাচক ইংরাজী বাক্যের সমষ্টিমাত্র। এই পাঠগুলি ক্লাসে কিভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে সে নির্দেশ বাঙালায় বাক্যগুলির পাশে পাশে (যেখানে যেখানে প্রয়োজন) লিখিত আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রথম পাঠটি উদ্ধৃত করিতেছি—

(১)

Come here কুমুদ। (এইরূপ প্রত্যেক ছাত্রকে) Sit down কুমুদ।

(প্রত্যেককে) You sit here. You sit there, ইত্যাদি।

(প্রত্যেককে) Stand up. You stand here. You stand there, etc.

(প্রত্যেককে) Go. You go there.

(প্রত্যেককে) Run. Stop. Come back. Sit down. Lie down. Get up. (এইরূপ প্রত্যেককে)

উপক্রমণিকার শেষাংশে এই পাঠেরই প্রয়োগ সম্পর্কে আরও বিশদ নির্দেশ দেখিতেছি। তাহার কিয়দংশ পূর্বপাঠের পুনরাবৃত্তি। যেমন—

Come here কুমুদ (এইরূপে নাম ধরিয়া প্রত্যেক ছাত্রকে)

Sit down কুমুদ।

(ভিন্ন ভিন্ন ছাত্রকে ভিন্ন ভিন্ন স্থান নির্দেশ করিয়া)

You sit here. You sit there.

Stand up Kumud.

(ভিন্ন ভিন্ন নির্দেশ করিয়া) You stand here.

You stand there.

Go. You go there. (প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে)

এই পুনরাবৃত্তি হইতে পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে শিক্ষাদানের প্রণালীর দিকেই গ্রন্থকারের লক্ষ্য কেন্দ্রীভূত। মুদ্রণে কিছু কিছু অসংগতি আছে। যেমন, 'কুমুদ' শব্দ ইংরাজী পাঠের মধ্যেও বাঙগালায় দুই-একবার ছাপা হইয়াছে। সে-দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। বই-এর এ অংশ তো শিক্ষার্থীর পাঠের জন্য নয়, শিক্ষকের পাঠনের জন্য। কাজেই মুদ্রণের ছোটখাটো অসংগতি থাকিলেও ক্ষতি হইবে না বলিয়াই বোধ হয় সে দিকে তেমন নজর দেন নাই।

উপক্রমণিকার প্রথমাংশ অনুজ্ঞাবাক্যের সমষ্টি। শিক্ষক এক একটি বাক্য বলিবেন, ছাত্ররা বারংবার শুনিয়া তাহার অর্থ বুঝিবে। বাক্যের অন্তর্বর্তী শব্দগুলির সঙ্গে তাহাদের পরিচয় হইয়া যাইবে। অনুজ্ঞাবাক্যের অন্তর্গত ক্রিয়াপদগুলির অর্থ কি তাহা শিক্ষক স্বয়ং দেখাইয়া দিবেন এবং ছাত্ররা আদিষ্ট হইলে তদনুরূপ আচরণ করিবে। এইভাবে অনেক ক্রিয়াপদের অর্থ তাহাদের মনে থাকিয়া যাইবে। come, go, run, walk, jump, stand, sit, take, bring, open, shut, touch, smell—প্রভৃতির লিখিত রূপ দেখিয়া বানান মুখস্থ করিবার আগেই ছাত্ররা এইসব ক্রিয়াপদের অর্থ শিখিয়া ফেলিবে। এই সঙ্গে বস্তুবাচক বহুশব্দের ইংরাজী প্রতিশব্দও তাহাদের শেখা হইয়া যাইবে। এইরূপে কিছুদূর অগ্রসর হইলে আরম্ভ হইবে কথোপকথন।

উপক্রমণিকার প্রথম অংশে ছাত্ররা শিক্ষকের নির্দেশ শুনিয়া নিরুত্তরে তাহা পালন করিতেছিল। উপক্রমণিকার দ্বিতীয় অংশে আছে প্রশ্ন। শিক্ষক প্রশ্ন করিবেন ছাত্র উত্তর দিবে। যে শব্দগুলি এতদিন কানে শুনিয়া তাহারা অভ্যস্ত হইয়াছে—এখন মুখে বলিয়া তাহার প্রয়োগ করিবে। এইভাবে তাহাদের অজ্ঞাতসারে ব্যাকরণের কাজও কিছুটা হইয়া যাইবে।

প্রথম অংশে কুমুদকে বলা হইয়াছিল— Come here কুমুদ।

দ্বিতীয় অংশে সে কথা তো বলা হইলই, তাহার পর কুমুদ আসিলে প্রশ্ন করা হইল—Have you come here? কুমুদ তাহার উত্তর দিবে। হয়তো ভুল উত্তর দিবে। শিক্ষক তাহার ভুল সংশোধন করিয়া বলিয়া দিবেন Yes, I have come here. ইহার পর যদু, মধু, হরিকে ডাকিয়া যখন একই প্রশ্ন করা হইবে তখন তাহাদের উত্তর আর ভুল হইবে না। ইংরাজী ব্যাকরণের present perfect tense-এর প্রয়োগ-পদ্ধতি এই ভাবে তাহার শেখা হইয়া গেল। এই ভাবে ক্রিয়াপদের আর দুই-এক প্রকার ব্যবহারও মোটামুটি জানা হইবে। উপক্রমণিকার কাজ যখন শেষ হইল তখন অনেকগুলি শব্দ শেখা হইয়া গিয়াছে। কেবল কানে শুনিয়া শেখা হইয়াছে, চোখের পরিচয় হয় নাই, হইলেও ঘনিষ্ঠ হয় নাই। ইংরাজিসোপান প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় অংশে (অর্থাৎ ইংরাজিসোপান প্রথম ভাগে) চোখের কাজ শুরু হইয়াছে।

দ্বিতীয় অংশের প্রথম পাঠটি দেখিলেই তাহা বুঝা যাইবে। এই পাঠে বারটি ইংরাজী শব্দ এবং উহাদের পাশাপাশি বাঙ্গালা প্রতিশব্দ দেওয়া আছে। শব্দগুলির মধ্যে পাঁচটি বিশেষ্য এবং পাঁচটি বিশেষণ।

The man—মানুষ	Big—বড়
The boy—ছেলে	Mad—পাগল
The cat—বিড়াল	Red—লাল
The dog—কুকুর	Bad—খারাপ
The pen—কলম	New—নূতন
The cow—গাভী	Fat—মোটা

পাঠের গোড়াতেই শিক্ষকের প্রতি নির্দেশ দেওয়া আছে, "বাঙ্গালা অর্থ সহিত বোর্ডে লেখা থাকিবে।" বোর্ডে তো শব্দগুলি লেখা হইল। তাহার পর শিক্ষকের কর্তব্য কি?—সে বিষয়ে বিশদ নির্দেশ আছে—

১৪

"উল্লিখিত শব্দগুলি ও তাহার অর্থ শিক্ষক ছাত্রের কণ্ঠস্থ করাইয়া দিবেন। বাঙগালা শব্দটি বলিয়া তাহার প্রতিশব্দ, ইংরাজি শব্দটি বলিয়া তাহার বাঙগালা প্রতিশব্দ বলাইয়া লইবেন। ক্রমশঃ পাঠ-গৃহস্থিত বা তন্নিকটবর্তী কোনও কোনও বস্তুর ইংরাজি নাম বলিয়া দিবেন এবং সেই বস্তুটি নির্দেশ করিয়া তাহার ইংরাজি নাম বলাইয়া লইবেন। শিক্ষক দেখিবেন যে ইংরাজি নাম বলিবার সময় the কথাটি যথাস্থানে প্রয়োগ করে, যথা the book, the ball ইত্যাদি।"

এই অংশে মোট চব্বিশটি পাঠ এবং প্রত্যেক পাঠের সহিত কবি পাঠনের নির্দেশ দিয়াছেন। প্রচলিত ব্যাকরণ ও তথাকথিত পাঠ্য-পুস্তকের বন্ধুর পথে না গিয়া সহজে ছাত্রদের বিশুদ্ধ ইংরাজী শিখাইবার উপায় উদ্ভাবনের জন্য কবি যে কিরূপ চিন্তা করিয়া-ছিলেন এই পাঠগুলির মধ্য দিয়া তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রথম পাঠে যে বিশেষ্য ও বিশেষণ শব্দগুলি আছে দ্বিতীয় পাঠে তাহাদের সংযুক্ত করিয়া দেখানো হইয়াছে।

The big man. The mad dog ইত্যাদি। এখানে শিক্ষকের প্রতি নির্দেশ আছে—

"শিক্ষক নিম্নলিখিত প্রকারে বিশেষ্য বিশেষণ সংযুক্ত করিয়া তাহার অর্থ বলাইয়া লইবেন। বিশেষ্য ও বিশেষণ কাহাকে বলে তাহা উদা-হরণ দিয়া বুঝাইয়া দিবেন। ইংরাজিতে বিশেষণ যে the ও বিশেষ্যটির মাঝখানে থাকে তাহা দেখাইয়া দিবেন।"

তৃতীয় পাঠে নির্দেশ আছে—বিশেষ্য ও বিশেষণ কাহাকে বলে শিক্ষক তাহার পুনরাবৃত্তি করাইবেন এবং বোর্ডে কতকগুলি বিশেষ্য ও বিশেষণ শব্দ (বাঙগালা প্রতিশব্দ সমেত) The ink—কালী, The sun—সূর্য, The bed—বিছানা, Hot—গরম, Wet—ভিজা, The mat—মাদুর ইত্যাদি লিখিয়া "ছাত্রকে কোন্‌গুলি বিশেষ্য ও কোন্‌গুলি বিশেষণ বাছিতে বলিবেন।"

বৈয়াকরণ রবীন্দ্রনাথ ছাত্রকে মুখে মুখে ব্যাকরণ শিখাইতেছেন

আর সঙ্গে সঙ্গে তাহার শব্দ-ভাণ্ডার বাড়াইয়া চলিয়াছেন। ভাষার বনিয়াদ শব্দ। ব্যাকরণ সাহায্যে বাক্যরচনার প্রণালী জানা যায় কিন্তু যথেষ্ট সংখ্যক শব্দ জানা না থাকিলে ব্যাকরণের বিদ্যা কাজে লাগে না। তাই দেখিতেছি শব্দশিক্ষার দিকে তাঁহার মনোযোগ বেশী। পুরাতন পাঠের শব্দ পরবর্তী পাঠে বারংবার ব্যবহৃত হইতেছে। এক শব্দের সহিত অন্য শব্দের মিলিত প্রয়োগের শিক্ষা দিতেছেন। নবপ্রযুক্ত শব্দের সহিত পূর্বপরিচিত শব্দের যোজনা করিয়া দেখাইতেছেন। ছাত্র যখন নূতন নূতন বিশেষ্য ও বিশেষণ শব্দ যোজনা করিতেছে তখন তাহারা যেন অর্থসংগতির কথা মনে রাখে শিক্ষককে সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে নির্দেশ দিতেছেন।

রবীন্দ্রনাথ-রচিত পাঠ্যপুস্তকগুলির আলোচনা করিলে দেখিতে পাইব, ভাষাশিক্ষণের পক্ষে প্রত্যক্ষ প্রণালীর আবশ্যকতা উপলব্ধি করিলেও কবি উহার উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করেন নাই। তাহার একটি বড় প্রমাণ অনুবাদের অনুশীলন। ইংরাজী শিখাইবার জন্য শুধু বাঙ্গালা হইতে ইংরাজী নহে, ইংরাজী হইতে বাঙ্গালা অনুবাদ অভ্যাস করাও আবশ্যক। এই দৃঢ় বিশ্বাস তাঁহার ছিল। এই গ্রন্থের প্রায় সকল পাঠেই অনুবাদের অনুশীলনী আছে। ভাষাশিক্ষার পক্ষে অনুবাদের উপযোগিতা কতখানি এবং শিক্ষক কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া ছাত্রদের অনুবাদ শিখাইবেন সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বিশদ মতামত 'অনুবাদচর্চা' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। এই প্রবন্ধে উক্ত গ্রন্থ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার স্থান নাই।

ইংরাজিসোপানের অনুবাদ-অনুশীলনীর লক্ষ্য কিন্তু ব্যাকরণ-শিক্ষা এবং বাক্যগঠনের মধ্য দিয়া ঐ ব্যাকরণজ্ঞানের প্রয়োগ, পরীক্ষা ও অভ্যাস। তাই লেখক প্রত্যেক পাঠের প্রারম্ভে প্রশ্নোত্তর সাহায্যে ব্যাকরণের এক একটি অধ্যায়ের অথবা বাক্যরচনার এক একটি প্রক্রিয়ার পরিচয় দিয়া সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদ সাহায্যে সেই পরিচয়কে

দৃঢ়মূল করিয়া লইতেছেন। স্বভাবতঃই এই সকল পাঠে কবি ইংরাজী ব্যাকরণের কূটকচালের মধ্যে যান নাই।

The-র প্রয়োগ, বিশেষ্য ও বিশেষণ শব্দের ব্যবহার, is ক্রিয়াপদের ব্যবহার, has ও is-এর অর্থে ও প্রয়োগে পার্থক্য, ইতিবাচক শব্দকে নেতিবাচক করিবার নিয়ম, একবচন বহুবচন, There is দিয়া বাক্যরচনা—মোটামুটি এই কয়টি বিষয়ের পাঠ ও অনুশীলনী এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। সকল বাক্যেরই ক্রিয়াপদ নিত্য বর্তমান (present indefinite); অতীত ভবিষ্যৎ কালের উদাহরণ নাই কিন্তু গ্রন্থের পরিশেষে গ্রন্থকার নির্দেশ দিয়াছেন, "গ্রন্থের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সমস্ত পাঠগুলিকে অতীত ও ভবিষ্যৎ কাল করাইয়া লইতে হইবে।" অতীত এবং ভবিষ্যৎ বলিতে কবি যে past indefinite এবং future indefinite বুঝাইয়াছেন তাহা সুস্পষ্ট।

ইংরাজিসোপানের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম হইতে বিভিন্ন কালের প্রয়োগ-শিক্ষার দিকে নজর দেওয়া হইয়াছে। প্রথম ভাগের অনুবৃত্তিস্বরূপ দ্বিতীয় ভাগের প্রথম পাঠে কতকগুলি নিত্য বর্তমান কালবাচক সরল ইংরাজী বাক্য, যেমন—The boy eats, the girl laughs ইত্যাদি দিয়া সেগুলি অনুবাদ করিতে বলা হইয়াছে। পাঠের নিম্নে শিক্ষকের প্রতি লেখকের নানাবিধ নির্দেশ দেখা যাইতেছে। একটি হইল—"অতীত ও ভবিষ্যৎ করাও।" কি-ভাবে অতীত ও ভবিষ্যৎ করাইতে হইবে তাহাও বিশদভাবে বলা হইয়াছে। "'অতীত কর' 'ভবিষ্যৎ কর' শুদ্ধমাত্র এইরূপ আদেশ করিলে চলিবে না—বলিতে হইবে 'বালকটি খাইতেছিল' বা 'বালকটি খাইবে' ইংরাজিতে কি হইবে বল। নতুবা, অতীত বা ভবিষ্যৎ বলিতে কি বুঝায় তাহা স্পষ্ট না জানিয়াও অভ্যাসক্রমে ছাত্রগণ ঠিক উত্তরটি দিতে পারে, অবশেষে বাংলা করিতে বলিলে ভুল করিয়া বসে।"—এ নির্দেশ যে স্বীয় অভিজ্ঞতার ফল তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

সরল বাক্য কয়টি ধরিয়া অনেক রকমের অনুশীলন হইতে পারে। বাক্যস্থ বিশেষ্য শব্দগুলিকে (সকল শব্দই একবচনে আছে) বহুবচনে রূপান্তরিত করা যায়। যেমন, The boy eats, the boys eat; the girl laughs, the girls laugh ইত্যাদি।

বাক্যগুলি সব ইতিবাচক, ওগুলিকে নেতিবাচক করা যায়। সকল কালে এবং সকল বচনেই নেতিবাচক করা যাইতে পারে। "যথা, The boy does not eat, the boys do not eat. The boy did not eat, the boys did not eat. The boy will not eat, the boys will not eat." শিক্ষককে এস্থলে নির্দেশ দেওয়া আছে "প্রথমে বাংলা করিয়া তাহা হইতে ইংরাজি অনুবাদ করাইতে হইবে।"

একই পাঠে ক্রিয়াবিশেষণের প্রয়োগও আরম্ভ করা হইয়াছে। আলোচ্য পাঠের বারটি বাক্যে গ্রন্থকার যথাক্রমে এই বারটি ক্রিয়া-বিশেষণের—greedily, sweetly, silently, quickly, swiftly, rapidly, correctly, fluently, soundly, brightly, slowly, suddenly ব্যবহার করিয়া উহাদের প্রয়োগ শিক্ষা দিতে চাহিয়াছেন।

এই শব্দগুলি যাহাতে ভালরূপে অভ্যাস হয় এইজন্য গ্রন্থকার শিক্ষকের প্রতি নির্দেশ দিয়াছেন—

> "ক্রিয়ার বিশেষণ সহ বাক্যগুলি পুনর্বার অতীত ভবিষ্যতে নানারূপে নিষ্পন্ন করাইয়া লইতে হইবে।"

দ্বিতীয় ভাগের পাঠসংখ্যা সতের। এই সতেরটি পাঠে নূতন শব্দ আনা হইয়াছে, অনেক নূতন বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে এবং সংগে সংগে পুরাতন পাঠের অভ্যাস ও পুনরাবৃত্তি চলিয়াছে। দ্বিতীয় হইতে দশম পাঠ পর্যন্ত নয়টি পাঠে কয়েকটি অতিপ্রচলিত preposition—at, in, on, to, into, from, with, for-এর ব্যবহার শিখানো হইয়াছে। যে সকল preposition একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয় তাহাদের প্রয়োগশিক্ষণ বিষয়ে গ্রন্থকার শিক্ষক-দিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন।

The potter makes a cup *with* clay এবং The boy comes to school *with* his brother—এই দুই বাক্যে with -এর অর্থ যে অভিন্ন নয়, একটির অর্থ 'দিয়া' এবং অন্যটির 'সঙ্গে', ইহা দুইটি স্বতন্ত্র পাঠে বহু অনুশীলনীর দ্বারা বুঝানো হইয়াছে। with-এর সঙ্গে সঙ্গে without-শব্দটির ব্যবহারও শিখাইবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। preposition-গুলির অর্থ শিখাইয়াই কবি নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। ছোট বাক্যকে বড় করিয়া বড় বাক্যকে ভাঙিগয়া ছোট করিয়া, তাহাদের প্রয়োগ শিখাইয়াছেন। বাঙগালায় অনুবাদ করিবার জন্য ইংরাজী বাক্য আছে—The blacksmith makes a razor to shave with. বাক্যে তারকাচিহ্ন দিয়া পাদটীকায় বলিয়া দিতেছেন, "With প্রভৃতি Preposition গুলির অর্থসঙ্গতি ও আবশ্যকতা বুঝাইয়া দিতে হইবে। বুঝাইবার সময়, বাক্যগুলিকে, A man shaves, a man shaves with a razor, the blacksmith makes a razor to shave with, এইরূপে ভাঙিয়া লইতে হইবে।"

এইরূপে বহুতর উদাহরণ সহযোগে preposition সমূহের ব্যবহারশিক্ষণ শেষ করিয়া ১১শ পাঠে কবি ক্রিয়াপদের কাল সম্বন্ধে পুনরনুশীলন আরম্ভ করিলেন। নিত্য বর্তমানের দিকেই (present indefinite) লক্ষ্য কেন্দ্রীভূত ছিল, আর সঙ্গে সঙ্গে অতীত ও ভবিষ্যতের সাধারণরূপের (indefinite) ব্যবহারও কথোপকথনের মধ্যে কিছু কিছু চলিতেছে। present perfect-এর বাক্যও দুই চারিটি ব্যবহৃত এবার শিক্ষককে imperfect-এ হাত দিতে বলা হইল।

এইখানে কবি বিজ্ঞ বৈয়াকরণ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকের দৃষ্টি দিয়া বাঙগালা ক্রিয়ার কাল এবং ইংরাজী ক্রিয়ার কালের ব্যবহারে ও অর্থে কোথায় কতখানি সাম্য এবং কি পরিমাণ বৈষম্য আছে তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনি দেখিয়াছেন ইংরাজী বর্তমান indefinite (কবি indefinite ও continuous-এর অনুবাদ করিয়াছেন

অভ্যাসসূচক ও কিয়ৎকালব্যাপী) স্থানবিশেষে continuous-এর অর্থ গ্রহণ করে। "'খাইতেছে' 'হাসিতেছে' 'খে শব্দগুলি ইংরাজিতে eats, laughs, plays ও is eating, is laughing, is playing—উভয়রূপেই তর্জমা করা যাইতে পারে।" অন্যত্র আরও বিশদভাবে বলিতেছেন, "বাঙলায় 'খায়' ও 'খাইতেছে' 'হাসে' ও 'হাসিতেছে' প্রভৃতি শব্দগুলির অর্থ একরূপ নহে। 'খায়' 'হাসে' ইত্যাদি শব্দে 'খাইয়া থাকে', 'হাসিয়া থাকে' ইত্যাদি বুঝায়। শিক্ষক বুঝাইয়া দিবেন—The boy goes to the school বলিলে 'বালকটি স্কুলে যাইতেছে' বুঝায় এবং 'বালক স্কুলে গিয়া থাকে' ইহাও বুঝায়।"

রবীন্দ্রনাথের কালে বি.টি. বিদ্যার প্রবর্তন হয় নাই, কাজেই বি.টি. পড়িবার সুযোগ তাঁহার ছিল না, কিন্তু প্রখর সহজবুদ্ধি এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে তিনি বিদেশী ভাষা শিক্ষণের যে পথ কাটিয়া গেলেন, এ যুগের পণ্ডিতেরা বিলাতী যষ্টি ধরিয়া অনেকে নূতন বিদেশী নামাঙ্কিত সেই পুরাতন পথেই পদচারণা করিতেছেন তাহা তাঁহাদের স্মরণ থাকে না।

রবীন্দ্রনাথের সত্যানুধ্যান

শ্রীভবতোষ দত্ত

১৯৩১-এ প্রকাশিত 'দি রিলিজিয়ন অব ম্যান' গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন উপলক্ষে তিনি যে সব বক্তৃতা ও ভাষণ দিয়েছেন, তাদের মূল বক্তব্য নিয়ে হিবার্ট বক্তৃতা রচিত। তাঁর বলার বিষয় সর্বত্রই যে একই ছিল এতে তিনি ক্রমেই নিঃসন্দিগ্ধ হয়েছেন যে, 'মানুষের ধর্ম' তাঁর কাছে নিছক বিতর্কের বিষয় রূপেই ছিল না। এই ভাবনা ধর্মবোধরূপে কবির মনে দীর্ঘ-কাল ধরে গড়ে উঠেছে। বস্তুত প্রথম যৌবন থেকে শেষ পর্যন্ত কবির রচনাধারা এই ধারণারই এক অনবচ্ছিন্ন বিবর্তনের ইতিহাস বহন করে চলেছে।

রবীন্দ্রনাথ এখানে যে অখণ্ডিত ধারণার কথা বলেছেন, সে তাঁর সমগ্র জীবনবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। শুধু কাব্য বা অন্য কোনো সাহিত্যকর্মের নয়, এই ধারণা তাঁর কেন্দ্রীয় জীবনতত্ত্বের। রবীন্দ্র-নাথ এই উপলব্ধির ইতিহাস দিয়েছেন 'জীবনস্মৃতি'তে, 'মানুষের ধর্মে', 'মানবসত্য' প্রবন্ধে এবং অন্যত্র। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' এবং 'প্রভাতসংগীত' এই উপলব্ধি থেকেই উৎসারিত। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, তখন থেকেই তাঁর সাধনা অখণ্ড জীবনের বিশ্বতোমুখী অভিজ্ঞতাকে লাভ করবার লক্ষ্যে এগিয়ে গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের এই ঘটনাকে তাঁর কাব্যজীবনের দিগ্দর্শন হিসাবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজে একে কেবল কাব্যানু-ভূতির ব্যাপার বলে মনে করেন নি, অর্থাৎ এ শুধু তাঁর কবিসত্তারই জাগরণ নয়; এ জাগরণ তাঁর সমগ্র জীবনের এমন কি অস্তিত্বের। শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন—এই তিনেরই মর্মে ছিল একটিই জিজ্ঞাসা। এই জিজ্ঞাসা তাঁর কবিজীবনের প্রথম থেকেই তাঁকে উৎকণ্ঠিত

এবং শেষে তিনি একটি দৃঢ় বিশ্বাসে উপনীত হতে পেরে-

ছিলেন। কবি রবীন্দ্রনাথ নিভৃতে শুধু কাব্যসাধনাই করেন নি; তাঁর পারিপার্শ্বিক সমাজ ও জীবনের তীক্ষ্ণ বেদনা তাঁকে স্পর্শ করেছিল। আর সেই জন্যই কবিতার সঙ্গে সঙ্গে গদ্যের ঐশ্বর্য এমন ফলবান্ হয়েছিল। প্রত্যক্ষ যে সমস্ত সমস্যার ঘূর্ণাবর্তে চারিদিকে সৃষ্টি হয়েছে, তারই কেন্দ্রে থেকে তিনি চিন্তার মূল লক্ষ্য স্থির করে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। সমস্যার তীক্ষ্ণতা যেমন কবিকে রেখেছে জাগিয়ে, সাময়িকতার ঊর্ধ্বে তাদের সত্যকার মূল্যমান তাঁকে তেমনি অবহিত করেছে একটি কেন্দ্রীয় জীবনতত্ত্বে।

বাল্যকাল থেকেই নানা অনুকূল পরিবেশে তাঁর মন সমগ্রতা-বোধেরই অভিমুখী হয়েছে,—'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ এই কথা-টাই বলতে চেয়েছেন। বিশ্বের সঙ্গে ব্যক্তির অখণ্ড যোগের ভিতরেই সত্য—সুস্পষ্টভাবে তত্ত্বের আকারে কবি এটা বুঝতে না পারলেও নানা দৃষ্টান্তে তিনি তাঁর তখনকার মনের ভাবটি বুঝিয়ে দিয়েছেন। কালিদাসের কাব্যের ধ্বনিগৌরব এবং সংগীতসৌন্দর্য তাঁর বালক-মনকে অভিভূত করেছিল কিন্তু ব্যাখ্যাত অর্থের সূক্ষ্মতা তাঁকে পীড়িত করেছিল। মেডিকেল কলেজে একটি মৃতদেহ তাঁর মনকে বিচলিত করে নি কিন্তু একটি খণ্ডিত দেহাংশ তাঁকে চঞ্চল করে তুলেছিল। বিশেষ করে গায়ত্রী মন্ত্রে প্রথম দীক্ষা লাভ করে মনকে তিনি কি ভাবে দ্যুলোক ও ভূলোকে প্রসারিত করবার চেষ্টা করে-ছিলেন, সে কথাও 'জীবনস্মৃতি'র পাঠকরা জানেন। এই সমগ্রতাকে ব্যক্তিজীবনে সমাজজীবনে কাব্যে ও নৈতিক আচরণে অনুভব করাই যে সত্য-সাধনা এ বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের জীবনে ক্রমেই দৃঢ় হয়েছে এবং সবশেষে 'মানুষের ধর্ম' রচনাকালে তত্ত্বরূপে এই বিশ্বাসটি তাঁর মনে স্থায়ী ভাবে মুদ্রিত হয়েছিল। জীবন সম্পর্কে রবীন্দ্র-নাথের এই মূল্যবোধের বিভিন্ন পর্যায়গুলি পর্যালোচনার যোগ্য।

সত্যবোধ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম অবহিত হলেন বঙ্কিম-চন্দ্রের সঙ্গে বিতর্কে। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে বিষয়

নিয়ে মতভেদ হয়েছিল, তার পটভূমি দীর্ঘকালের। ঊনবিংশ শতাব্দীর নৈতিক মূল্যমানের পরিবর্তনের সঙ্গে এই ঘটনা জড়িত। রামমোহনের সময় থেকেই মানবিক শুভবুদ্ধির উপর হিন্দু সমাজের আচার অনুষ্ঠানকে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা চলেছিল। সে যুগের সামাজিক সংস্কারের মূলে ছিল এই লোকশ্রেয়শ্চেতনা। মধ্যযুগের সংকীর্ণ সত্যধারণার পরিবর্তে এক উদারতর বিশ্ব-মানবিক নীতিবুদ্ধিকে সৃষ্টি করে তুলতেই তাঁরা চেয়েছিলেন। এককালে আমরা ভেবেছি, সত্য আছে শুধ শাস্ত্রের বিচারহীন অনুসরণের মধ্যে। সেই শাস্ত্র যে-সমাজের এবং যে-যুগের উপ-যোগিতা চিন্তা করে রচিত হয়েছিল সেই সমাজ এবং যুগ অতীত হলেও শাস্ত্রের বিধি রইল অটল হয়ে। শাস্ত্রবিধি পালনে অন্ধ অভ্যাস ছাড়া আর কিছুই থাকল না। হয়তো চিরকাল সব দেশেই এমনই ঘটে থাকে। সমাজকে স্থায়িত্ব দেবার জন্য সাধারণ মানুষের স্বাধীন বিচারণার অভাবে একটা নির্দিষ্ট আদর্শ ঋষিরা রচনা করে যান এবং সেটাই সকলের অনুসরণীয়রূপে থেকে যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই নতুনতর শিক্ষায় শিক্ষিত-সমাজের স্বাধীন বিচারবুদ্ধিতে যে সংশয় দেখা দিয়েছিল, তার পরিণাম হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। সেকালের ইতিহাস বিভিন্ন উদ্যম এবং সংস্কার-কর্মে পূর্ণ। যে নতুন সমাজ দেখা দিচ্ছে, সে সমাজ এখন আর পুরাতন ভৌগোলিক সীমায় বদ্ধ নয়। কার্য-কারণবিধির সার্বভৌমিকতা, ন্যায়ান্যায়ের ব্যক্তিনিরপেক্ষ আদর্শ, বিশ্বজীবনের সঙ্গে ব্যক্তিজীবনের আধিভৌতিক যোগ, সমাজ-ভাবনানিরপেক্ষ রাষ্ট্রানুগত্য বাঙালী সমাজের নিকট এক নতুন যুগান্তর নিয়ে এল। প্রাকৃতিক নিয়মের অনুশাসনে মানুষ এখন ধর্মনির্বিশেষে চালিত ও নিয়ন্ত্রিত। এই পরিবর্তিত যুগের ভূমিকায় ঊনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দুধর্ম-খ্রীষ্টানধর্মের সংঘাত, শিক্ষাসংস্কারের অবশ্যম্ভাবিতা, ব্রাহ্মধর্মের উদ্ভব ও বিকাশ, হিন্দুধর্মের নবরূপ, রাজনৈতিক একত্ববোধের শুচিতাবোধ, সাম্প্র-

দায়িক কঠোরতার শিথিলতা—এক কথায় আমাদের প্রাচীন সত্য-বোধের ক্রমপরিবর্তন ঘটছিল। যার জন্য জীবন-উৎসর্গ এককালে গরিমাময় বলে মনে হত, এখন সেটা গৌণ হয়ে গেল। নতুন আদর্শ আমাদের চেতনাকে অধিকার করল, তারই মর্যাদায় জীবন-উৎসর্গ হয়ে উঠল শ্রদ্ধার্হ।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন ধর্মতত্ত্বের আলোচনা আরম্ভ করলেন ('নব-জীবন'-এ ধারাবাহিক প্রকাশ ১২৯১-৯২), সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ চব্বিশ বৎসরের যুবক। এই সময়টাকে অনেকে অভিহিত করেছেন হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থানের যুগ বলে। একদিকে বঙ্কিমচন্দ্র যেমন হিন্দুধর্মের আলোচনা আরম্ভ করেছেন, তেমনি অপর দিকে শশধর তর্কচূড়ামণি, কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীও নতুন করে হিন্দু ধর্মের ব্যাখ্যা আরম্ভ করেছেন। রামকৃষ্ণদেবের ধর্মান্দোলনও আরম্ভ হয়েছে। সকলেই কিন্তু ব্যক্তিগত মুক্তি বা আধ্যাত্মিক উন্নয়নে মাত্র লক্ষ্যবদ্ধ না থেকে লোকশ্রেয় বা সমাজহিতৈষার কল্যাণব্রতকে খুব বড়ো করেই সম্মুখে স্থাপন করেছেন। সুতরাং প্রাচীন হিন্দুধর্মের আচারসর্বস্বতার সঙ্গে যুক্ত হল এক নতুন নীতিবোধ। প্রাচীন সমাজে যে নীতিবোধ ছিল না, তা নয়। তার সার্থকতা এবং ব্যর্থতা নির্ধারিত হত শাস্ত্রবিধি পালনে। কিন্তু এ যুগের নীতিবোধ নির্মিত হল বৃহত্তর জীবনের প্রতি কর্তব্য পালনের বাধ্যতায়। বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মতত্ত্বের চিন্তা করেছিলেন একটি শিক্ষিত মার্জিত ব্যক্তিত্বের বিকাশ-সাধনেরই উদ্দেশ্যে। শুধুমাত্র প্রাচীন শাস্ত্রের অনুগামিতায় নয়, বিশ্বের প্রতি কর্তব্য নির্ণয়ে মানুষের ব্যক্তিত্বকে এ যুগে নতুন হয়ে গড়ে উঠতে হবে। এই জন্য বঙ্কিমের শিক্ষা-কল্পনায় বিজ্ঞান ও ইতিহাস অধ্যয়নের আবশ্যকতা খুবই বেশি। মার্জিত শিক্ষিত জাগ্রত মন সত্যকে নির্ণয় করে নিতে সক্ষম হবে। শিক্ষার আলো যারা পায় নি, নির্দিষ্ট বিধি-বিধানের হাত-ধরা হয়ে চলা ছড়া তাদের গত্যন্তর নেই। এইজন্য বঙ্কিমের অনুশীলন-ধর্ম মুষ্টিমেয় বুদ্ধিবাদীরই সাধ্য।

সেকালে বঙ্কিমচন্দ্রই ছিলেন প্রধান মনীষী, যিনি সামাজিক বাদপ্রতিবাদ ও আন্দোলনের ঊর্ধ্বে যুগের মূল্যমানকে বুঝতে পেরেছিলেন। এই মূল্যমান সৃষ্টি করে তুলবার পিছনে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির দীর্ঘস্থায়ী সাধনা ছিল এবং তারই দানে আমাদের দেশেরও সংস্কৃতিতে এক পরিবর্তিত সত্যধারণা গড়ে ওঠার সহায়তা হয়েছিল। বঙ্কিম সাময়িক সমস্যা নিয়ে বিশেষ লেখেন নি। এ সব আলোড়ন-আন্দোলনের মূল কারণটি ছিল যে নতুন মূল্যমান, বঙ্কিম তাকেই বোঝবার ও বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। রবীন্দ্র-নাথ বঙ্কিমচন্দ্রের সত্যধারণার প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, "কোন খানেই মিথ্যা সত্য হয় না ; শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিমবাবু বলিলেও হয় না। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিলেও হয় না।" ('ভারতী', অগ্রহায়ণ ১২৯১, পৃঃ ৩৪৮)। রবীন্দ্রনাথ এই উক্তিতে সত্যকে অবিচল এবং অনড় রূপেই কল্পনা করেছেন। তখন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ সত্যকে ব্যক্তি সমাজ দেশ এবং কালের অতীত অচঞ্চল আদর্শরূপেই দেখতে অভ্যস্ত। সত্য যদি আধ্যাত্মিক হয়, তবে সে এক এবং অদ্বিতীয়-রূপেই সাধকের সাধনীয় হবে। কিন্তু সত্যকে যদি লোকব্যবহারের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চাই, তবে জীবনের বিবর্তন-ধারার সঙ্গে সঙ্গে সত্যের বিবর্তনকে স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। তা না হলে জীবন হয়ে পড়ে অচল স্থিতিশীল। ঊনবিংশ শতাব্দীর য়ুরোপে স্পেন্সার ডারউইনের বিবর্তনবাদ জীবনের যে রূপটিকে নির্ণয় করে দিয়েছে, তাতে সমাজ বা ব্যক্তিকে আর অচল বলে নিশ্চিন্ত থাকা সম্ভব ছিল না। এই যুগচিন্তা তখন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের মনকে অতখানি গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল কিনা সন্দেহ। তখন পর্যন্ত তিনি এক বিশেষ দৃষ্টিতেই সত্যকে ধারণা করছিলেন।

কথাটা একটু বিচিত্র শোনাতে পারে। রবীন্দ্রনাথের অভিমতকে বঙ্কিমচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের অভিমত বলেই গ্রহণ করেছিলেন। এ বিষয়ে রবীন্দ্র-জীবনীকারও বঙ্কিমের অনুমানকেই সত্য বলে মনে

করেছেন। রবীন্দ্রনাথ যদি ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধিত্বই করে থাকেন, তবে তাঁর বিশ্বাসের মধ্যে নতুন চিন্তাই ধ্বনিত হবে, এটাই প্রত্যাশিত ছিল। কারণ ব্রাহ্মসমাজ সেদিন নবীন চেতনারই নেতৃত্ব করেছিল। কিন্তু রামমোহনের স্থাপিত আদর্শ যে পরিবর্তিত মূল্যমানের বাণী বহন করেছিল, সেই যুক্তি এবং ঔদার্য অব্যাহত ছিল কিনা ভেবে দেখা দরকার। রামমোহন কোনো সম্প্রদায় স্থাপন করেন নি —তার অর্থ, সত্যবোধকে তিনি সম্প্রদায়ের সম্পদমাত্র মনে করতে চান নি। দেবেন্দ্রনাথ যে সমাজ স্থাপন করলেন, তার প্রতি বিদ্রোহাচরণেই কেশব প্রমাণ করলেন সত্যকে আরও মুক্ত করা দরকার। শিবনাথ শাস্ত্রীর নতুন আদর্শ আবার সন্ধান দিল বিস্তৃততর দিগ্বলয়ের। এই সব বিভিন্ন মতবাদ কতখানি সংগত বা অসংগত, সেই বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া অপ্রাসঙ্গিক হলেও এই বিভিন্নমুখী আদর্শের দ্বারা এটাই পরোক্ষে প্রমাণিত হয় যে, সত্যবোধ জিনিসটা ক্রমবিস্তারশীল। কোনো সম্প্রদায়ের গণ্ডির মধ্যে সত্যকে বাঁধা সত্যই কঠিন। মধ্যযুগীয় সাম্প্রদায়িক সত্যবোধের অন্তঃসারশূন্যতা নতুন যুগের আলোয় অবিলম্বেই স্বতঃপ্রকাশিত হয়ে গেল। প্রথম প্রশ্ন এই যে, সত্যকে আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে বিচার করব কিনা। যদি অধ্যাত্ম সত্যই একমাত্র সত্য হয় তবে আর কোনো প্রশ্নের অবকাশ নেই। কিন্তু সত্যকে যদি ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্রেই বিচার করে দেখতে হয় তবে, দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, সেখানে সত্যকে অপরিবর্তনীয়রূপে দেখা সম্ভব কিনা।

আমাদের দেশে অধ্যাত্ম সত্য এক অবিচল এবং অদ্বিতীয়রূপে আরাধ্য হয়ে এসেছে। আবার জীবনের নিত্যকার ব্যবহারে সত্যের আলাদা বিচার্যতা নেই একমাত্র শাস্ত্রানুগমনের সার্থকতা ছাড়া। আবার শাস্ত্রবিধি যদিও তৎকালীন উপযোগিতার বিবেচনাতেই রচিত, তবু পারত্রিক লক্ষ্যকেই সকলের সর্বকর্মের উদ্দিষ্ট করায় আমাদের সামাজিক ব্যবহার স্থিরতাকেই স্বীকার করে নিয়ে অভ্যাসের বাঁধনে বাঁধা পড়েছে। এদিক থেকে বিচার করলে রবীন্দ্র-

নাথও সেই লোকব্যবহারের সত্যকে আধ্যাত্মিক সত্যের অবিচলতাই দিতে চেয়েছিলেন। সেখানে তাঁর অপরিণত ভাবনার ত্রুটিও ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর চিন্তা যদি প্রাকৃতিক নিয়মে দৃঢ় আস্থা এনে থাকে, তবে তারই সঙ্গে সমাজের বিবর্তনধারার সম্বন্ধে বিশ্বাসকেও সৃষ্টি করে তুলেছে। সে ক্ষেত্রে সত্যকেও এই বিবর্তনশীলতার সঙ্গে যুক্ত করে দেখাই যথার্থ দেখা। এই চেতনা স্পষ্ট হতে আরম্ভ হয়েছে আরও কিছুদিন পরে।

কিন্তু বঙ্কিম-রবীন্দ্রের বিতর্কের কিছু পরে রবীন্দ্রনাথ ধর্ম ও সত্যকে নতুন ভূমিকায় দেখতে আরম্ভ করেছেন। বাংলা দেশের বিভিন্ন ধর্মান্দোলন রবীন্দ্রনাথকে ধর্মের রহস্যচিন্তায় অনুপ্রাণিত করেছে। কোনো বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের দৃষ্টি দিয়ে না দেখে জীবনের পরম সত্যকে যদি সম্পূর্ণ খোলা মন নিয়ে ধ্যান করি তবে জীবনের এক আশ্চর্যরূপ চোখে পড়ে। সাম্প্রদায়িক চিন্তার বাইরে জীবনের যে দুর্জ্ঞেয় বিকাশ রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করল তার পরিচয় ছড়িয়ে আছে রবীন্দ্রনাথের সে সময়কার প্রায় দশ বৎসরব্যাপী সাহিত্যে। কোনো কোনো সমালোচকের মতে রবীন্দ্রনাথের এই সময়ের সাহিত্যের অনুরূপ আর কিছু দেখা যায় নি। এ কথা মনে করবার কারণ, কবির অসাধারণ রূপতন্ময়তা ও জীবন-প্রেম। গল্পগুচ্ছের গল্প, কাহিনীর কবিতা, ছিন্নপত্রের পত্রসম্ভার, বিচিত্র প্রবন্ধের রমণীয় রচনাগুলি কবিব্যক্তির যে পরিচয় বহন করছে, সত্যই তা জগতের শ্রেষ্ঠ কবির জীবননিষ্ঠারই সমধর্মী। নীতি তত্ত্ব বা দর্শন সে রকম প্রবল হয়ে উঠে কবির রসচেতনাকে অনুশাসিত করে নি বলেই কবি যেন জীবনকে মানুষের তৈরী ধর্ম এবং আদর্শের বাইরে তার সম্পূর্ণ নিজস্ব ধর্ম দিয়েই গ্রহণ করেছিলেন। এই যুগে রবীন্দ্রনাথের জীবন-সত্যের কল্পনা সত্যই অসাধারণ।

'মালিনী' নাটকে (কাব্যগ্রন্থাবলীতে প্রকাশিত, ১৮৯৬) রবীন্দ্রনাথ যে বক্তব্যকে উপস্থাপিত করলেন তা কি বিশেষ কোনো

ধর্মের? মানবহৃদয়ের সত্যকেই কবি লোকধর্ম এবং রাজধর্মের উপর শক্তিশালীরূপে দেখিয়েছেন। প্রকৃতির অব্যর্থ বিধানকে নীতি বা ধর্ম খণ্ডন করতে শেষ পর্যন্ত পারে না। তাই বারবার নতুন সন্ধিক্ষণে সে আত্মপ্রকাশ করে এবং মানুষের সত্যধারণাকে প্রকৃতির এই নির্দেশেই যথাযথ হয়ে উঠতে হয়। মানুষের গৌরব কোথায়? তার গৌরব হৃদয়ধর্মকে সম্মান করে বৃহত্তর বিশ্ববিধানের সঙ্গে যুক্ত করে নেওয়ায়। রাজকন্যা মালিনী বৌদ্ধধর্মের আহ্বানে নিজেকে লোকমাতারূপে কল্পনা করতে গিয়েছিল। নারীহৃদয়ের অনিবার্য আবেগে তার সেই স্বপ্ন যেমন চূর্ণ হল, তেমনি লৌকিক ধর্মের ব্যর্থতাও প্রমাণিত হল ক্ষেমংকরের মধ্যে। এরই জের চলেছে 'বিসর্জন' নাটকেও (১৮৯০)। প্রকৃতির নিয়মে সাম্প্রদায়িক ধর্মের শূন্যতাকে উদ্‌ঘাটিত করে রঘুপতি একদিন ভেঙে পড়ল। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' বারবার নানাভাবেই ফিরে এসেছে রবীন্দ্রনাথের কল্পনায়। এই সব নাটকে রবীন্দ্রনাথের সত্যবোধ প্রকাশিত হয়েছে কোন্ দিক দিয়ে? মানুষের গড়া ধর্মের আদর্শের ঊর্ধ্বে চিরন্তন জীবনপ্রকৃতির অমোঘতার ভাবনাতেই রবীন্দ্রনাথের সত্যধারণা আভাসিত হয়েছে।

ঋষি বলেছিলেন ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ তপসোঽভীদ্ধাদজায়তে। বিশ্বপ্রকৃতির বিধান এবং মানবহৃদয়ের বিধান—সবই একটি অনাদি অনন্ত সর্বব্যাপী নিয়তির শৃঙ্খলে বন্ধ, তার নাম ঋত। মানুষের কল্পিত নীতি-নিয়ম, ধর্ম, ন্যায়বোধ সবই এই দুর্নিরীক্ষ্য বৃহৎ ঋতকে চিন্তার মধ্যে নিয়ে আসবার চেষ্টা ছাড়া আর কি? মনীষী রামেন্দ্রসুন্দর বলেছিলেন—

> "যাহাতে মানবসমাজকে ধরিয়া আছে, তাহাকে ধর্ম নাম দাও আর যাহাতে সৌরজগৎকে ধরিয়া আছে বা জীবসমাজকে ধরিয়া আছে তাহাকে ধর্ম নাম না দাও, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু উভয়ই একটা বৃহত্তর ব্যাপারের অঙ্গ; সেই বৃহত্তর ব্যাপারের নাম ঋত। সমস্ত বিশ্বজগৎ তাহার অধীন; জগতের কোন অঙ্গ, কোন প্রত্যঙ্গ

তাহার বন্ধন ছাড়িয়া চলিতে পারে না। এই যে ঋত, যাহা জগতের নিয়ামক, যাহার নাম নিয়তি, যাহা তোমার আমার অধীন নহে তাহা সর্বত্র বর্তমান—তাহা ব্যবহারিক বিশ্বজগতের সত্যের সহিত অভিন্ন—বিজ্ঞানবিদ্যায় তাহার নামান্তর সত্য।"—ধর্মের জয়।

রামেন্দ্রসুন্দর যে ধর্ম বা ঋতের কথা বলছেন, তা মানববুদ্ধিকে অতিক্রম করে বিরাজিত। সে ঋত সুনীতিও নয়, দুর্নীতিও নয়। আমাদের দেশে এই ধর্মকে বোঝবার চেষ্টা যে হয় নি, তা নয়। গীতায় নীতি-দুর্নীতির ঊর্ধ্বে যে বিশ্ববিধানকে নিষ্কামচিত্তে গ্রহণ করবার কথা আছে, সেই বিধান এই বিশ্বধর্মেরই (সদসৎ তৎপরং যৎ) দুর্জ্ঞেয় নির্দেশ। রবীন্দ্রনাথ এই সত্যকে এ যুগের সাহিত্যে গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'কাহিনী'র কবিতাগুলিতে তার প্রমাণ আছে। 'কর্ণকুন্তীসংবাদ'-এ কুন্তীর সমস্যা কি নৈতিক? না কর্ণের সমস্যাই নৈতিক? দু'জনেই অবস্থার ঘূর্ণাবর্তে আত্মহারা। 'গান্ধারীর আবেদন'-এ গান্ধারীর ব্যাকুলতা উৎসারিত হয়েছে কোন্ বেদনা থেকে? সে শুধু পুত্র দুর্যোধনের নীতিবিরোধী আচরণের ব্যক্তিগত ক্ষোভে নয়। দুর্যোধনের রাজধর্ম পালনে যুক্তি কিছু কম ছিল না, পিতা ধৃতরাষ্ট্রের সংশয়চিত্তের সব জিজ্ঞাসারই ঋজু বলিষ্ঠ প্রত্যয়পূর্ণ উত্তর তিনি দিয়েছিলেন, তবু জননী গান্ধারীর উপস্থিতি তিনি সহ্য করতে পারলেন না। কারণ জননী যে সেই বিশ্ববিধানেরই দূতী—যে-বিধানের কাছে দুর্যোধনের সব লৌকিক স্বার্থসাধনের যুক্তিই স্তম্ভিত হয়ে যায়। কুন্তী নিয়তির হাতে দুর্বল ক্রীড়নক, তাই তিনি বলেন—

হায় ধর্ম, একি সুকঠোর
দণ্ড তব।

আর গান্ধারী দূরদর্শিনী ধর্মগৌরবা, তাই তিনি বলেন—

হে আমার
অশান্ত হৃদয়, স্থির হও। নতশিরে

প্রতীক্ষা করিয়া থাকো বিধির বিধিরে
ধৈর্য ধরি। যে দিন সুদীর্ঘ রাত্রি-পরে
সদ্য জেগে উঠে কাল সংশোধন করে
আপনারে, সে দিন দারুণ দুঃখদিন।"

জননী গান্ধারী এখানে ধর্মকেই জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন, যে ধর্ম ঋত। সমগ্রভাবে এই ঋতকে ধারণা করতে পারে কে? মানুষ আপনার সীমায়িত বুদ্ধি দিয়ে এই ধর্মকে চিহ্নিত করবার চেষ্টায় ন্যায়-নীতি স্মৃতি-সংহিতা রচনা করে। 'নরকবাসে' রাজা সোমক তাঁর এই সীমায়িত বুদ্ধি দিয়ে পুত্র-বিসর্জনের ধর্ম পালন করতে গিয়েছিলেন। অসহায়া জননী কুন্তীও একদিন সামাজিক ধর্ম পালনের জন্যই পুত্রকে জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু মানব-বুদ্ধিকে অতিক্রম করে যে বিশ্ববিধান বিরাজিত, একদিন সে আপন নিয়মে অবস্থার গ্রন্থিবন্ধন করল। লোকধর্ম রাজধর্ম সমাজধর্মের অপূর্ণতাও প্রকাশিত হয়ে পড়ল। গান্ধারীকে কবি ঠিক এদের মতো কল্পনা করেন নি। সৃষ্টির যে সত্যের দিকে তাকিয়ে ব্যক্তিগত ধর্মচিন্তা স্তব্ধ হয়ে যায়, গান্ধারীর মধ্যে তাকেই তিনি ভাষা দিয়েছেন। গান্ধারীর মধ্যে আছে সত্যের ধ্যান, আর কুন্তীর মধ্যে আছে সত্যের লীলা।

এ যুগের সত্যানুধ্যান শ্রেষ্ঠ নাটকীয় কল্পনারই সগোত্র। লোকধর্ম রাজধর্মের নৈতিক চেতনা থেকে মুক্ত করে জগৎসত্যকে কবি গভীর বস্তুনিষ্ঠার সঙ্গে এঁকেছেন। এইজন্য এই কল্পনার জগৎ মহাকবি শেক্সপীয়রের জগৎকেই বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়। তবু রবীন্দ্রনাথের সত্য-ধারণার বৈশিষ্ট্যও আছে। অধ্যাপক ব্র্যাডলি শেক্সপীয়রের জগৎকে বলেছিলেন নৈতিক শৃঙ্খলার জগৎ। তিনি বলেছিলেন—

> "We remain confronted with the inexplicable fact or the appearance of a world, travailing for perfection but bringing to birth an evil, which it is able to overcome only by self-torture and self-waste."

সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার মহাশয় ব্র্যাডলির এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ গ্রহণ করেন নি। (দ্রষ্টব্যঃ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, 'বঙ্কিমচন্দ্র ও শেক্সপীয়র'-অধ্যায়)। শেক্সপীয়রের কল্পনাকে তিনি নীতির ঊর্ধ্বে বলেই মনে করেন। শেক্সপীয়র সম্পর্কে ব্যাখ্যা যেটাই সত্য হোক, লক্ষ্য করবার বিষয়, রবীন্দ্রনাথের সত্য-ধারণা কিন্তু সম্পূর্ণ নীতিবোধমুক্ত নয়। মানুষের অন্যায় আচরণের প্রতিক্রিয়া যে বিশ্ববিধানে ঘটে থাকে তাকে অ-নৈতিক বলা চলে না। গান্ধারীর বিচারবোধ জাগ্রত, তাই দুর্যোধনের আচরণের ন্যায়ান্যায় সম্বন্ধে তিনি সচেতন এবং এ বিশ্বাসও তাঁর দৃঢ় যে, এই অন্যায়ের প্রতিবিধান একদিন অবশ্যই ঘটবে। প্রশ্ন এই যে, দুর্যোধনের আচরণ যে অন্যায় এটা বুঝলেন কি করে। এই বিচারের মানদণ্ড কি? এই প্রশ্নের নিঃসন্দিগ্ধ উত্তর রবীন্দ্রনাথ তখনও আয়ত্ত করেন নি। এই উত্তর পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল পরবর্তী যুগে। কিন্তু সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষিত বাঙালী-চেতনায় যে প্রখর নীতিবোধ জেগে উঠেছিল, রবীন্দ্রনাথের সত্যধারণা তার ভিতর থেকেই গড়ে উঠেছিল। পরবর্তী কালেও আমরা দেখব সত্যকে তিনি সর্বদাই এক বৃহত্তর নীতির অঙ্গীভূত করেই দেখেছেন।

এইভাবেই বিশ্বনিয়তির কাছে আত্মনিবেদনের যে তৃপ্তি, তা কি সত্যই সব মানুষের পক্ষে সম্ভব? এতে কি এক ধরনের নিস্পৃহতাই প্রশ্রয় পায় না, যার ফলে নিরুদ্যম আসতে পারে? কাব্যরসে অথবা দার্শনিক চিন্তায় এই সত্যবোধ মহত্তম উপলব্ধি হলেও কর্মের ক্ষেত্রে এর প্রযোজ্যতা কতখানি? এ প্রশ্ন সহজেই করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের সত্যবোধ কি শুধু কাব্যের? সে কি জীবনের সর্বক্ষেত্রে সর্বব্যাপক নয়? কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই যুগে শুধুই কাব্যসাধনা করেন নি। এই সত্যবোধ মনে শুধু নির্বেদই জাগিয়ে তুলবে, এটাই যদি কবির অভিপ্রেত হত তবে রবীন্দ্রনাথকে আমরা কর্মনেতারূপে পেতাম না। রবীন্দ্রনাথের এই যুগের কর্ম-

সাধনার সঙ্গে তাঁর সত্যধারণার একটা মিল কোথায়ও আছে। এ সময়ে তিনি জাতীয় আন্দোলনে, সমাজচিন্তায় ও শিক্ষাসংস্কারে নানা দিক দিয়ে ব্যাপৃত।

এর একটা সামাজিক পশ্চাদ্‌পট আছে। ইংরেজ রাজত্বের উপর যে ভরসা ঊনবিংশ শতকের বাঙালী রেখেছিল, নানা কারণে ওই শতাব্দীর শেষের দিকে সেই ভরসা ক্ষুণ্ণ হতে আরম্ভ করে। তারই প্রতিক্রিয়ায় এবং জাতীয়তাবাদের পরিণামে দেশের গঠনমূলক কর্ম-পন্থার উপর সবাই আশ্রয় খুঁজেছে। স্বভাবতই সে সময় জাতীয়তা-বোধই ছিল সব উদ্যমের সার্থকতার মূল্যমান। রবীন্দ্রনাথও তখন একান্তভাবে স্বাদেশিকতার মন্ত্রে আবিষ্ট ছিলেন। এতে মনে হতে পারে, রবীন্দ্রনাথ একটা লৌকিক আদর্শকেই জীবনের চরম মূল্য দিয়েছেন। কিন্তু এ বিষয়ে, অন্যান্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের স্বাতন্ত্র্যও ছিল। রবীন্দ্রনাথের এই যুগের চিন্তার বৈশিষ্ট্য যাঁরা লক্ষ্য করেছেন, তাঁরা দেখেছেন, তাঁর চেষ্টা সর্বদাই ছিল বাঙালীকে আত্মস্থ করে তুলবার দিকে। সমাজ ও জীবনের গঠনমূলক কর্মে তিনি সবাইকে আহ্বান করেছেন এবং এই কর্মের স্বরূপ হচ্ছে অনৈক্য এবং বিভেদকে ঘুচিয়ে একচিত্ততার সমগ্রতাবোধকে উপলব্ধি করানো। প্রত্যক্ষভাবে বিদেশী শাসকের সঙ্গে সংঘর্ষ ও বিরোধের পথকে প্রথমেই গ্রহণ করতে না বলে নিজেদের মধ্যে মিলনকে সম্পূর্ণ করে তুলতেই বলেছেন। খণ্ডিত প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্যসাধনে সত্য নেই, সত্য আছে সামগ্রিক উদ্দেশ্যসাধনে। কর্মের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ তাই চেয়েছেন ভেদবুদ্ধি দূর করে অন্তরকে মুক্ত ও উদার করে তুলতে। সত্যকে লোকধর্মে, সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতায় যেন খণ্ডিত করে না দেখি। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

> "আমাদের দেশের সকল অমঙ্গলের মূল কোথায়। যেখানে আমরা বিচ্ছিন্ন। অতএব আমাদের দেশে বহুকে এক করিয়া তোলাই দেশ-হিতের সাধনা। বহুকে এক করিয়া তুলিতে পারে কে। ধর্ম। প্রয়োজনের

প্রলোভনে ধর্মকে বিসর্জন দিলেই বিশ্বাসের বন্ধন শিথিল হইয়া যায়।"
—'দেশহিত', রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২ পৃঃ ৬৪১।

কাহিনীর যুগে কবি যে অখণ্ড জীবনসত্যকে মহিমান্বিত করে দেখিয়েছিলেন, স্বাদেশিক আন্দোলনের যুগের আদর্শে সেই সত্যকেই প্রতিফলিত করেছিলেন। এর মধ্যে সত্যই কি অনুবর্তন আছে? কাহিনীর যুগে কবি যদি লোকধর্মের ঊর্ধ্বে নিত্যধর্মের কল্পনা করে থাকেন, পরবর্তী যুগে তেমনি সামাজিক কর্মপ্রয়াসেও নিত্যসত্যকে তাৎপর্যমণ্ডিত করে তুলতে চেয়েছেন। মানুষ যখন খণ্ডিত উদ্দেশ্য নিয়ে খণ্ডকালের দিকে তাকিয়ে কর্মলিপ্ত হয়, তখন সে নিত্যসত্যকেই অপমানিত ও পরাস্ত করতে থাকে। এ কথা ঠিক যে, বিশ্বসত্যকে সমগ্রভাবে চিত্তে ধারণা করা কঠিন, তবু মানুষ যখন সংকীর্ণতার মোহ থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করে, তখন সে সেই চিরজাগ্রত বিশ্বসত্যেরই প্রসন্নতা অর্জন করে। এ বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের অটুট ছিল বলে তিনি সমগ্রতারই সাধনা করেছেন। সে সাধনা যেমন ধ্যানের তেমনি কর্মের।

বিশ্ববিধানের এই বৃহৎ সত্য-তাৎপর্যটিতে লক্ষ্যবদ্ধ থেকে মানুষের কর্মপ্রয়াস পরিচালিত হবে—এই বিশ্বাসে রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী আদর্শ স্থিতিলাভ করল। সত্যের উপলব্ধি কর্মকে নিরোধ করে না—কর্মকে অবারিত করে। মানুষের জীবনে কর্মের বিকাশ অফুরন্ত। সমাজে সভ্যতায় নতুন নতুন পরিবেশের উদ্ভবে কর্মের ক্ষয় না হয়ে বরং জটিলতাই বেড়ে চলেছে। আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যে বলা হয়েছে আত্মা কর্মের বন্ধন মোচন করেই শান্তি ও শিবকে লাভ করে। এ যুগের চিন্তা অন্য রকম। কর্মের ভিতর দিয়েই মানুষ জগতের সত্যকে চরিতার্থ করে চলেছে। যে-পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষা কর্মের গৌরবকে লঘু করে, সে-পূর্ণতায় আজ আর মানুষের আগ্রহ নেই। কর্মের নিত্য নবীন ব্যাপ্তির মধ্যে দিয়েই সত্যেরও নিত্য নতুন বিকাশ ঘটছে। সংকীর্ণ স্বার্থসাধনে বদ্ধ হওয়া যেমন কর্মের অসম্মান, সত্যস্বরূপকে চিরকালের জন্য অপরি-

বর্তনীয় ও অচল রাখাও তেমনি সত্যের অপমান। যে জানে কর্মের মহিমা, সে জানে বিচিত্ররূপী সত্যের মহিমাকেও। একটা যুগ এল যখন রবীন্দ্র-মানসে ধর্ম প্রতিভাত হল গতিময় কর্মের রূপ নিয়ে। 'যাত্রার পূর্বপত্রে' রবীন্দ্রনাথ বললেন—

> "য়ুরোপের ধর্ম য়ুরোপকে সেই দুঃখপ্রদীপ্ত সেবাপরায়ণ প্রেমের দীক্ষা দিয়াছে। ইহার জোরেই সেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন সহজ হইয়াছে। ইহার জোরেই সেখানে দুঃখতপস্যার হোমাগ্নি নিবিতেছে না এবং জীবনের সকল বিভাগেই শত শত তাপস আত্মাহুতির যজ্ঞ করিয়া সমস্ত দেশের চিত্তে অহরহ তেজ সঞ্চার করিতেছেন। সেই দুঃসহ যজ্ঞহুতাশন হইতে যে অমৃতের উদ্ভব হইতেছে তাহার দ্বারাই সেখানে শিল্প বিজ্ঞান সাহিত্য বাণিজ্য রাষ্ট্রনীতির এমন বিরাট বিস্তার হইতেছে।"—পথের সঞ্চয়।

পশ্চিমে রবীন্দ্রনাথ দেখলেন সত্য প্রকাশ পাচ্ছে কর্মের মধ্যে। মানুষের সঙ্গে মনুষের প্রেমের মিলনের দ্বারাই বিচিত্রমুখী কর্মের আয়োজন পাশ্চাত্য সভ্যতাকে চলিষ্ণু করে রেখেছে। অর্থাৎ আধুনিক সভ্যতা মধ্যযুগীয় জীবনাদর্শের জায়গায় এক নতুন সমাজ-বোধকে গড়ে তুলেছে, যেখানে সীমাবদ্ধ সাম্প্রদায়িক ধর্মের পরি-বর্তে নতুনতর বৃহত্তর স্বার্থসাধন মানুষকে মিলনের সূত্রে বেঁধেছে। ১৯১২-র পাশ্চাত্য ভ্রমণ জীবনের এক জঙ্গম সত্যের সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ ঘটাল। 'বলাকা'য় আমরা কবির এই সত্যানুধ্যানের যে পরিচয় পাই, 'পথের সঞ্চয়'-এ তারই পূর্বাভাস সূচিত হয়েছিল। এবারের য়ুরোপভ্রমণকে তিনি অভিহিত করলেন 'তীর্থযাত্রা' বলে। এবারে কবি সত্যধর্মকে নতুন করে লাভ করলেন।

সত্য যে স্থির নয়, সত্য যে পরিবর্তিত রূপপ্রবাহের মধ্যে দিয়ে আত্মার শক্তিকে জাগ্রত করে রাখে—এটা আধুনিক দর্শনের কথা। গতির তত্ত্ব আমাদের দেশে কিছু নতুন নয়। বৌদ্ধদর্শন ও শঙ্কর-দর্শন গতিবাদকে অস্বীকার করতে পারে নি। পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন

সেন গতিবাদের বহু পূর্বসূত্রের উল্লেখ করেছেন। তবু এ কথাও সত্য যে শংকর যেমন গতিকে বলেছেন মায়া, বুদ্ধও তেমনি গতিকে বলেছেন দুঃখের মূল। উভয়েই এই গতির বন্ধন ক্ষয় করে মুক্ত হতে বলেছেন। পাশ্চাত্য গতিদর্শন যেমন প্রত্যক্ষ জীবনে ফলপ্রসূ হয়ে জীবনপিপাসাকে লালিত ও সিসৃক্ষু করেছে, ভারতীয় গতি-দর্শন তেমনি এর সম্পূর্ণ বিপরীত লক্ষ্যকেই বাঞ্ছিত করে তুলেছে। রবীন্দ্র-কাব্যপাঠকমাত্রই জানেন এই মুগ্ধ স্বগতোক্তি কোনো নির্বাণ-কামীর হতেই পারে না—

"ওরে কবি তোরে আজ করেছে উতলা
ঝংকারমুখরা এই ভুবনমেখলা,
অলক্ষিত চরণের অকারণ অবারণ চলা।
নাড়ীতে নাড়ীতে তোর চঞ্চলের শুনি পদধ্বনি,
বক্ষ তোর উঠে রণরণি।"

এই সৃষ্টিরূপ যদি সত্য হয়, তবে সত্যের একাধিক ভূমি কল্পনা করতেই হবে। আমরা যখন রাত্রির আকাশের দিকে তাকাই, তখন নক্ষত্রকে স্থির বলেই দেখি কিন্তু বিজ্ঞান জানে নক্ষত্র স্থির নয়। রবীন্দ্রনাথ বলছেন—

"When we follow truth in its parts which are near, we see truth moving. When we know truth as a whole, which is looking at it from a distance, it remains still."—*Personality*, 1917. (The world of personality.)

রবীন্দ্রনাথ বলছেন, সাহসের সঙ্গে স্বীকার করাই ভালো যে দুটোই সত্য। সত্য বিভিন্ন ভূমিকায় বিভিন্নরূপে প্রকাশমান। তাই সত্য অস্থির। বৈদান্তিক চিন্তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পার্থক্য এখানেই। বরং পাশ্চাত্য জীবনতত্ত্বের সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের মিল পাওয়া যাবে। 'বলাকা' কাব্যের 'ঝড়ের খেয়া' কবিতাটির মধ্যে সত্যের বিভিন্ন ভূমিকার ইঙ্গিত আছে। সেখানে কবির বক্তব্য, এক এক যুগের সত্যের বন্দরে মানুষের সভ্যতার তরী থাকে লগ্ন ; তার-

পর একদিন বন্ধনকাল শেষ হয়, নতুন সভ্যতার বাণিজ্য করতে সেই তরীকেই আবার সংশয় ও অবিশ্বাসের মধ্যে বেরিয়ে পড়তে হয়। তখন জীর্ণ মূল্যবোধকে আঁকড়ে থাকাই সত্যের অপমান—'বঞ্চনা বাড়িয়া উঠে ফুরায় সত্যের যত পুঁজি'। এই মূল্যবোধ ক্ষয় পায়, নতুন বোধের জন্ম হয়। এই পরিবর্তনেই তো সত্য। এই কবিতারই আবার শেষাংশে কবির আর এক সত্য-ধারণা—

"তোর চেয়ে আমি সত্য, এ বিশ্বাসে প্রাণ দিব, দেখ্।
শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক।"

এখানে আবার কবিকে দেখতে পাই সত্যের চিরন্তনতায় অটুট আস্থা রাখতে।. এই দুয়ের মধ্যে কি কোনো বিরোধ আছে? আসলে বিরোধ নেই। কারণ এই চিরন্তন সত্যরূপটি গতির থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। কবির বক্তব্য, গতির সত্যই চিরন্তন। পরিবর্তনকে স্বীকার করে নেওয়াই জীবন, এই ভাবেই মৃত্যু-পরম্পরাই চির-কালের সত্য, তার অমৃত। এই চলা শুধু যে অণু-পরমাণুরই চলা, তা নয়—এ চলার আবেগ মানুষের চিন্তায় ভাবনায় সাধনায় ও কর্মে। চিন্তায় গতির আবেগ আছে বলেই তো মনের জগতেও যুগান্তর আসে। সেই যুগান্তরণেই আবার সত্যবোধের পরিবর্তন ঘটতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ বলছেন—

"The methods of our moral training have been based upon the fact that by changing our mental focus, our perspective, the whole world is changed and becomes in certain respects a different creation with things of changed value."
—(The world of personality.)

চিরন্তনতা ও ক্ষণিকতা—এই দুই দৃষ্টির মিলন ঘটতে পারে মানুষের আত্মিক চেতনায়। জড়ের বা পশুর সঙ্গে মানুষের ভেদ এখানেই যে, মানুষ তার আত্মচেতনা দিয়ে এই গতিস্বরূপের অনু-ধাবন করতে পারে। জড় কালের হাতে ক্ষয় পেতে পেতেই চলে আর মানুষ কালের সহযোগিতায় আপনাকে সৃষ্টি করেই চলে।

যে কালের সহযোগিতা করতে পারল না, সত্যকার মৃত্যু হল তারই। এই জন্যই কবি যৌবনের গান গেয়েছেন। নবীনতা তো বিশ্বেরই ধর্ম, প্রকৃতি তো চিরযৌবনময়ী, পরিবর্তন তো অবশ্যম্ভাবী। পরিবর্তনের নিয়তি তো মানুষের আনুকূল্যের প্রতীক্ষায় বসে নেই। যে জীর্ণদশা কালের নিয়মেই ঘুচবে, তাকেই ভাঙবার জন্য আবার আবাহন কিসের। মানুষের সচেতন সহযোগিতাতে সেই ভগ্নতাই যে আবার নতুন সৃষ্টি হয়ে উঠবে। কল্পনা মানুষেই করে, বিচারণা মনুষ্যত্বেরই শক্তি। এ শক্তি পশুর নেই, জড়ের নেই। এই গৌরবেই মনুষ্যত্ব ঐশ্বর্যবান্। কবি মানুষের সৃষ্টিশক্তিকে বন্দনা করলেন। বলাকার যুগ হচ্ছে সেই যুগ যখন কবি আবাহন করেছেন সত্যকে নতুন করে নির্মাণ করতে—ধ্যান দিয়ে কল্পনা দিয়ে কর্ম দিয়ে এবং মৃত্যু দিয়ে।

পাশ্চাত্য ফরাসী দার্শনিক বার্গসঁ এ যুগে গতিতত্ত্বের অবতারণা নতুন করে করেছিলেন। সেই তত্ত্ব পূর্বযুগের বিবর্তনবাদের সূত্রেই এসেছিল। আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ সেই গতিতত্ত্বকেই জীবনসত্যরূপে নতুন করে দেখালেন। এই ধারণা যে অনেকটাই আধুনিক এবং প্রবল জীবনানুরাগের ফলেই রবীন্দ্রমানসে উদ্ভাসিত হয়েছে, তা বুঝতে পারি পাশ্চাত্যে রবীন্দ্রনাথের 'Sadhana' এবং 'Personality' গ্রন্থের সমাদর দেখে। সে দেশের লোক বার্গসঁর চিন্তার সঙ্গে এর সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছিল। বার্গসঁ নিজে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার সঙ্গে মিল স্বীকার করেছিলেন।

> "বের্গসঁ ইংরেজি বলিতে পারিতেন, সুতরাং কবির সহিত মন খুলিয়া কথাবার্তা হইল। তিনি বলিলেন, কবির অনেক তত্ত্বই তিনি স্বীকার করেন। তবে তাঁহার মতে য়ুরোপীয় মন বেশি precise আর ভারতীয় মন বেশি intuitive। তাহার কারণও তিনি দর্শাইলেন ; য়ুরোপীয়কে প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিতে হয় বলিয়া তাহাকে বস্তুজগৎ সম্বন্ধে অত্যধিক জ্ঞান আয়ত্ত করিতেই হইয়াছে, বস্তুজগতের প্রতি অত্যন্ত

মনঃসংযোগ প্রয়োজন ; সেই জন্যই precision-এর উদ্ভব। সর্বশেষে বের্গস' বলিলেন, কিন্তু আপনি আপনার Sadhana ও Personality গ্রন্থদ্বয়ে যে তত্ত্বে উপনীত হইয়াছেন তাহা প্রকৃত intuition হইতে। এই দিকে ভারতীয়দের মনীষা বিশেষভাবে মহত্ত্ব লাভ করিয়াছে।" —শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্র-জীবনী', তৃতীয় খণ্ড, ১৩৫২, পৃঃ ৪৩।

সত্যকে কৃত্রিম নিয়মের বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে, মননকে অভ্যাসের মোহ থেকে উদ্ধার করে রবীন্দ্রনাথ অগ্রসর হয়ে চললেন। জীবনের দিকে তাকানোর বিভিন্ন দৃষ্টিকোণেই সত্যের বৈচিত্র্য। বৈচিত্র্যের অধিকার আয়ত্ত করার অর্থ সত্যের চলিষ্ণুতায় বিশ্বাস করা। এটা সম্ভব হয় ব্যক্তির আত্মিক চেতনায়। এই চেতনা বিভিন্ন দিক থেকে খণ্ডকে অতিক্রম করে যেতে পারে। অবশেষে জীবনের অখণ্ড চঞ্চলরূপপ্রবাহের সমগ্রতাকে ধারণা করতে সক্ষম হয়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বহির্বিশ্বের যোগ নিবিড় হয়েছে। খণ্ডিত স্থানিক সমস্যাকে বিশ্বসমস্যার ভূমিকায় স্থাপন করে কবি মানবতার এক নতুন তাৎপর্য সন্ধানে রত হলেন। এই সময়ে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চিন্তা-নায়কদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগ লক্ষণীয়। সেই সব মনীষী মানুষেরা এক বিশ্বসমাজ কল্পনা করেছিলেন বলে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন। এক আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"আরো ভাঙবে, সংকীর্ণ বেড়া ভেঙে যাবে, ঘরছাড়ার দলকে এখনো পথে পথে ঘুরতে হবে। পাশ্চাত্য দেশে দেখে এসেছি, সেই ঘরছাড়ার দল আজ বেরিয়ে পড়েছে। তারা এক ভাবী কালকে মানসলোকে দেখতে পাচ্ছে যে কাল সর্বজাতির লোকের। চাকভাঙা মৌমাছির দল বেরিয়ে পড়েছে আবার নূতন করে চাক বাঁধতে। শঙ্খের আহ্বান তাদের কানে পৌঁচেছে। রোম্যাঁ রোলাঁ, বারট্রান্ড রাসেল প্রভৃতি এই দলের লোক। এরা যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল বলে অপমানিত হয়েছে, জেল

খেটেছে ; সার্বজাতিক কল্যাণের কথা বলতে গিয়ে তিরস্কৃত হয়েছে। এই দলের কত অখ্যাত লোক অজ্ঞাত পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে ; বলছে, প্রভাত হতে আর বিলম্ব নেই। পাখির দল যেমন অরুণোদয়ের আভাস পায়, এরা তেমনি নূতন যুগকে অন্তর্দৃষ্টিতে দেখেছে।"

রবীন্দ্রনাথ যোগ দিলেন সেই দলে। এই বিশ্বসমাজের কল্পনায় রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব ছিল। অনৈক্য দূর করবার কথা তিনি আগে থেকেই বলে আসছেন। মানবিক সর্বানুভূতিকে জাগাতে তিনি চেষ্টা করেছেন। এই সামগ্রিক উপলব্ধিতেই যে মানুষের মনুষ্যত্ব, এ সব কথা কিছুই নতুন নয়। তবু প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে রবীন্দ্রনাথের এই পুরনো কথাগুলি ধীরে ধীরে নতুন অর্থে মণ্ডিত হতে থাকল। এতদিন দেশ এবং সমাজের ঘাতপ্রতিঘাত সংঘাত এবং আবর্তের মধ্যে থেকে মানুষের একটা বিশেষিত রূপই দেখে-ছিলেন। সে মানুষ বাঙালী অথবা ভারতবাসী। তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা সুখ দুঃখের ছাঁচ এক ধরনের। তাদের সমাজের গঠন ঐক্য ও বিচ্ছেদ এক ধরনের। এই সমাজের কেন্দ্রে থেকে রবীন্দ্রনাথ মনুষ্যত্বের কল্পনা করেছিলেন। কিন্তু অতঃপর রবীন্দ্রনাথ মনুষ্য-জাতিকে অন্য পটভূমিতে দেখলেন। য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে ঘুরে ঘুরে সমগ্র মানুষের সমস্যাকে অন্য আকারে তিনি পেলেন—জাতীয়তার অন্ধতা, যন্ত্রনির্ভরতা, শিক্ষাসঙ্কোচ ও ব্যক্তিত্বনিরোধ। তাঁর মনে হল সমস্যা কোনো এক দেশের নয়—সমস্যা সব মানুষের। পাশ্চাত্য মহাদেশের জাতিগুলি প্রগতিশীল বলে যে তারা সর্ব-সমস্যামুক্ত—এ কথা কিছুতেই বলা যায় না। আজ যা তাদের শক্তি, কাল তাই তাদের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াবে। জাতিস্বার্থ সর্বমানব-সমাজের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে তুলছে, যন্ত্র মানুষের কল্যাণ-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করছে। কিন্তু মানুষের মনুষ্যত্ব চরিতার্থ হয় মিলনে। মানুষকে মিলতে হবে মোহে নয়, মুক্তবুদ্ধিতে। য়ুরোপের রেণাসাঁসের পর ধর্মগত সমাজের বন্ধন শিথিল হয়েছে এবং ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের উদ্ভবে মানুষের সঙ্গে মানুষের পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে

সত্য কিন্তু আবার এক নতুন সমাজও গড়ে উঠেছে। বিজ্ঞানসাধনায় বহু ব্যক্তির সম্মিলিত সহযোগিতার দরকার। রাসেল বলেছিলেন—

> "Its tendency therefore is against anachism and even individualism since it demands a wellknit social structure. Unlike religion it is ethically neutral."

একদিক থেকে মানুষের নতুন ঐক্য যেমন সত্যই তৃপ্তির বিষয়, আর একদিক থেকে এই ঐক্যের নীতিহীনতা অত্যন্ত বিপজ্জনক। রবীন্দ্রনাথ এই দিক দিয়েই ভাবছিলেন। এই ঐক্যের নীতি-হীনতা অত্যন্ত বিপজ্জনক। Nationalism নামক বক্তৃতা-গুলিতে রবীন্দ্রনাথ নতুন বিপদের আশঙ্কা প্রকাশ করলেন। রবীন্দ্রনাথের এই যুগের নাটকগুলি তাঁর পরিবর্তিত দৃষ্টিকোণের পরিচায়ক। 'রক্তকরবী'তে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকীর্ণতাকে তিনি ধিক্‌কার দিলেন—'মুক্তধারা'য় দিলেন যান্ত্রিকতা ও জাতীয়তাকে। বিশ্বের দিকে তাকিয়ে তিনি যে বিপদ দেখতে পেয়েছিলেন, স্বদেশে আবার সেটাই যেন অঙ্কুরিত হয়ে না ওঠে এ-দিকেও তাঁর দৃষ্টি ছিল সতর্ক। বহু রচনায় তিনি সমালোচনা করলেন এমন রাজনৈতিক কর্মপন্থাকে যা বিশ্বসমাজ থেকে ভারত-বাসীকে বিচ্ছিন্ন করে। আবার সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন এমন আন্দোলনের বিরুদ্ধে যা মানুষের উপস্থিত প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে ভবিষ্যৎ বিকাশের পথ রুদ্ধ করে। তাঁর বিখ্যাত 'শিক্ষার মিলন' এবং 'সত্যের আহ্বান' স্মরণীয়। নতুন যুগের নতুন মূল্যমান দিয়ে যে মিলন রচিত হবে, সত্যের প্রতিষ্ঠা সেখানে। সংকীর্ণ মূল্যমান নিয়ে যে বিচ্ছেদের ব্যবধান রচিত হয়, সত্য সেখানে নেই। নতুন সমাজের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তি—

> "যেমন ব্যক্তিগত মানুষের পক্ষে তেমনি তার সমাজের পক্ষে একটি সত্যের কেন্দ্র থাকা চাই। নইলে সে বিচ্ছিন্ন হয়, দুর্বল হয়, তার অংশগুলি পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করতে থাকে। সেই কেন্দ্রটি এমন একটি সর্বজনীন সত্য হওয়া চাই, যা তার সমস্ত বিচ্ছিন্নতাকে

সর্বাঙ্গীণ ঐক্য দিতে পারে—নইলে তার না থাকে শান্তি, না থাকে শক্তি, না থাকে সমৃদ্ধি ; সে এমন কিছুকে উদ্ভাবন করতে পারে না যার চিরকালীন মূল্য আছে। সমাজ মানুষের সকলের চেয়ে বড়ো সৃষ্টি। সেই জন্যেই দেখি ইতিহাসের আরম্ভ হতেই যখন থেকে মানুষ দলবদ্ধ হতে আরম্ভ করেছে তখন থেকেই সে তার সম্মিলনের কেন্দ্রে এমন একটি সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে যা তার সমস্ত খণ্ডকে জোড়া দিয়ে এক করতে পারে। এইটের উপরেই তার কল্যাণের নির্ভর। এইটেই তার সত্য, এইটেই তার অমৃত, নইলে তার বিনষ্টি।"—'রামমোহন রায়', ১৩৩৫।

সাম্প্রদায়িক ধর্ম এই সত্যটি নির্মাণ করতে পারে না, এ কথা তিনি বারবারই বলেছেন। অথচ সম্মিলিত সমাজের কেন্দ্রে একটি পরম সত্যের মূল্যমান থাকা দরকার। এই সত্যটিকে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'মানবধর্ম'—অক্সফোর্ডে হিবার্ট বক্তৃতায় তিনি 'রিলিজিয়ন অব ম্যান' নামে তার ব্যাখ্যা করলেন। মানববুদ্ধির অতীতরূপে কোনো সত্যকেই তিনি স্বীকার করতে চাইলেন না। তাঁর ভাষায়—

> "When our universe is in harmony with Man, the eternal, we know it as truth, we feel it as beauty."—*Religion of Man.* Appendix II.

ঐক্যবোধেই মানুষের মনুষ্যত্বের পূর্ণতা আর তার সৌন্দর্য। এই মনুষ্যত্ব জাতিধর্মদেশ নির্বিশেষে এই জাগতিক সম্পর্কের মধ্যেই প্রকাশিত। এই বোধকে জাগাতে হয় মুক্তবুদ্ধি দিয়ে। বিজ্ঞানের রং নেই, তাই বুদ্ধিগত সত্যোপলব্ধিরও বর্ণ নেই। এই জন্যই রবীন্দ্রনাথ-কল্পিত এই মানবসমাজ নিরাকার এবং বর্ণাতীত। বরীন্দ্রনাথের এই সত্যবোধও আধুনিক, কারণ মানুষ এ যুগে বিশ্বসমাজের স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু যাঁরা অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক বিশ্বসমাজের কল্পনা করেছেন, তাঁদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পার্থক্য এখানেই যে, রবীন্দ্রনাথের এই ঐক্যবোধ নৈতিকরূপেও সার্থক।

কিন্তু অন্যান্যদের কল্পনায় নির্বিশেষ কল্যাণের আদর্শ কিংবা মানুষের স্বাভাবিক বিকাশের ধারা নেই। রবীন্দ্রনাথও মানুষকে ছকে ফেলে ভাবেন নি। এই জন্য পজিটিভিস্টদের মতো ইহমুখিনতা তাঁর প্রধান লক্ষণ হলেও মানুষের ব্যক্তিত্ব বা সমাজকে সুনির্দিষ্ট করে দেখেন নি। ব্যক্তিত্বের অবারিত বিকাশ, বুদ্ধির নিরঙ্কুশ বর্ধিষ্ণুতায় রবীন্দ্র-মানস ক্লান্ত নয়। এই বুদ্ধি 'মানবসত্য' নামক বিশিষ্ট সত্যধারণাকে অবলম্বন করে প্রকাশ পায়। রবীন্দ্রনাথের এই 'পরামানব' (Supreme Person) এবং সাধকদের ঈশ্বর বা ভগবান এক নয়। কারণ তিনি বলেন, মানুষের বুদ্ধিকে অতিক্রম করে এই পরামানবের অস্তিত্ব নয় ; আবার মানবসাধারণের অস্তিত্বের সমষ্টিমাত্রই পরামানব নয়। কারণ, তাহলে মানুষের সংকীর্ণতা ও ক্ষুদ্রতাও তার বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। তাহলে তো মানুষের পূর্ণতা লাভের উদ্যমেরও কোনো অর্থ হয় না। কিন্তু এই নিরন্তর অতিক্রমণের দ্বারাই মানুষ মানবসত্যকে প্রমাণিত করেছে।

একালে বিভিন্ন দেশের মনীষীরা মানুষকে কেন্দ্রে রেখেই বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পৃথিবীর কল্পনা করেছেন। এই সব চিন্তার ফলে অতিমানববাদেরও উদ্ভব। মানবসমাজকে যিনি নতুন করে গড়ে দেবেন তিনি পূর্ণ শক্তি ও আদর্শের বিগ্রহ। সমগ্র মানবজাতি তাঁরই প্রতীক্ষায় আছে। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু ঠিক এই ধরনের অতি-মানব কল্পনা করেন নি। সমগ্র মানবচেতনার অখণ্ড রূপেরই তিনি অনুধ্যান করেছিলেন। জীবনের একেবারে শেষে একটি কবিতায় তিনি মহামানবের আসন্ন আবির্ভাবের বন্দনা করেছিলেন—

"ঐ মহামানব আসে ;
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্ত্য ধূলির ঘাসে ঘাসে।
সুরলোকে বেজে উঠে শঙ্খ,
নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক—
এল মহাজন্মের লগ্ন।

আজি অমারাত্রির দুর্গতোরণ যত
ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন।
উদয়শিখরে জাগে মাভৈঃ মাভৈঃ রব
নবজীবনের আশ্বাসে।
জয় জয় জয় রে মানব-অভ্যুদয়,
মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে।"

এই মহামানব ব্যক্তি নয়—অখণ্ড চিন্ময় মানব-সত্তা। তিনি বলেছেন—

> "If we really believe this, then we must uphold an ideal of life in which everything else—the display of individual power, the might of nations—must be counted as subordinate and the soul of man must triumph and liberate itself from the bond of personality which keeps it in an ever-revolving circle of limitation."—*The Religion of Man*, 1949, p. 202.

এই যুগের সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে কবির এই সত্যবোধ প্রকাশিত। বিশেষ করে 'পুনশ্চ'র কবিতাগুলি স্মরণীয়। 'পুনশ্চ'র কতকগুলি কথিকায় দেখা গেল অন্ত্যজ মানুষের হৃদয়ের অপরিমেয় ঐশ্বর্য আর সেই সঙ্গে ধিক্‌কৃত হল সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় অন্ধতা। 'মানবপুত্র' এবং 'শিশুতীর্থ' কবিতা দুটিতে সঙ্কেতিত হয়েছে এক বৃহৎ মানবমহিমা। হিবার্ট বক্তৃতাতে মধ্যযুগের সন্ত এবং বাংলার বাউলদের মানবধর্ম অবলম্বনে কবি নিজের জীবনের মানবিক ঐক্যানুভূতির তত্ত্ব রচনা করেছিলেন, 'পুনশ্চ' এবং 'পত্রপুটে' তাদের ফিরে ফিরে আসতে দেখি। রবীন্দ্র-মানসের এই পর্যায়ে হৃদয়াবেগকে ছাড়িয়ে গিয়েছে মননশীলতা। কল্পনায় বিরল হয়ে এসেছে বর্ণ। রবীন্দ্রনাথের ছবি যেমন হল abstract পন্থী, গল্পও তেমনি হল মননপ্রধান। গল্পগুচ্ছের যুগের গল্পের সঙ্গে তুলনা করলেই বোঝা যায়, এই সব গল্পের পরিবেশ এবং বক্তব্য লৌকিক বর্ণ-বর্জিত। যে যুগে জাতীয়তাবোধ ধর্মবোধ ও ঐশ্বর্যবোধ

বাঙালীকে মধ্যযুগীয় অন্ধতা থেকে মুক্তি দিয়েছিল, সেখান থেকে দীর্ঘ পরিক্রমাশেষে রবীন্দ্রনাথ তাকে পৌঁছে দিলেন সর্বজনীন মানবত্ববোধের অবর্ণ যুগান্তরে। মানবাত্মার সর্বশেষ মন্ত্রটি উচ্চারণ করলেন—

"আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন
সকল মন্দিরের বাহিরে
আমার পূজা আজ সমাপ্ত হল
দেবলোক থেকে
মানবলোকে,
আকাশে জ্যোতির্ময় পুরুষে
আর মনের মানুষে আমার অন্তরতম আনন্দে।"—পত্রপুট।

রবীন্দ্রনাথ ও উনবিংশ শতাব্দী

শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সংস্কৃতি ও জীবনসাধনা ক্ষয়হীন মর্মরপ্রাসাদ নয়; প্রাণের ধর্ম বিকশিত হওয়া, বিবর্তিত হওয়া, রূপান্তরিত হওয়া। মানুষের জীবধর্মী প্রাণসত্তা সূক্ষ্মতর চৈতন্যকে অবলম্বন করে সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত হয়। প্রাণধর্ম ও সংস্কৃতির ধর্ম মূলতঃ এক; উভয়ের নানা রূপান্তর ও ভাবান্তরের বিকাশপরম্পরা জাতি ও মানসকে আশ্রয় করে। তাই জাতি ও জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দৃঢ়মূল ঐতিহ্যেরও রূপান্তর হতে পারে। কারণ সংস্কৃতির অর্থ —নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়া বহমান জীবনচেতনার নিগূঢ় নির্যাস। আমাদের বাঙলাদেশের উনিশ শতকের জীবন ও সাধনার সামান্য পরিচয় নিলে একথাটাই সপ্রমাণ হবে যে, বাঙলার যে-সংস্কৃতি উত্তরাপথের উত্তরাধিকার থেকে প্রাণরস সংগ্রহ করেছে, সেই সংস্কৃতিই গত শতাব্দীর প্রথম দিকে রূপান্তরের সম্মুখীন হল এবং দ্বিতীয়ার্ধে পশ্চিম সমুদ্রতীরের লবণাক্ত বায়ুবেগে বাঙলার পূর্বতন ঐতিহ্যের জীর্ণ প্রাসাদ প্রায় ধূলিসাৎ হয়ে পড়ল। এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। তখন মুঘল রাজমহিমার উজ্জ্বল দীপশিখা নিভে আসছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই সহস্র-এক রজনীর রূপকথার দ্রুত অপসরণ হল এবং বহির্ভারতীয় গৃধ্নু বৈশ্যতন্ত্র রাজতখ্‌তে আসীন হল। তার পরের কথা ইতিহাসের বিষয়। কিন্তু উনিশ শতকেই বোঝা গেল যে, এত দিন ধরে "শকহূনদল পাঠানমোগল" ভারতীয় আর্যসভ্যতার যে মিশ্ররূপ দিয়েছিল, তার পরিবর্তন আসন্ন।

পরিবর্তন এল। রাষ্ট্রের আকার-আয়তন বদলাল, রাষ্ট্রচেতনার আমূল রূপান্তর হল, সমাজজীবনও অটুট রইল না। জ্ঞানবিজ্ঞানের

সীমা বাড়ল ; জম্বুদ্বীপের বাইরে যে সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা রয়েছে, তার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হল। মধ্যযুগীয় সমাজ, ধর্ম ও ঐতিহ্য-চেতনা ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কলেবর পরিত্যাগ করে যখন নব বেশে আবির্ভূত হল, তখন বাঙালী-মানসের জন্মান্তর হয়েছে। মধ্যযুগীয় গ্রামীণ জীবনাদর্শ ভেঙে পড়েছে, নব সভ্যতার আদ্যাপীঠ কলকাতা তখন বণিক-ধণিক-মুৎসুদ্দি-আমলামামলার কলরবে উচ্চকিত হয়ে উঠেছে। সুতোনুটী-গোবিন্দপুর-কলকাতার হোগ্‌লার বন যেন রাতারাতি আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের ছোঁয়ায় লোপ পেল এবং রম্যানগরী রঙ্গসজ্জা করে নতুন অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হল। সে আলাদিন—শ্বেত বণিক। ধীরে ধীরে কলকাতার চার পাশ ঘিরে একটি বৈশ্য সভ্যতা গড়ে উঠল, নাগরিকতার সৃষ্টি হল। এখন আর গৌড়, টাঁড়া, রাজমহল, ঢাকা, মুর্‌শিদাবাদ নয় ; এ হল কলকাতা—যার অদূরে নীল সমুদ্র, যে সমুদ্রের সঙ্গে গৈরিক গঙ্গার মিতালি, যে গঙ্গা নাগরিক সভ্যতার বাণিজ্যবাহিনী। সেই গঙ্গার তীরে ১৮৬১ খ্রীঃ অব্দে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অষ্টম পুত্র, প্রিন্স্‌ দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্র, দর্পনারায়ণ ঠাকুরের বংশধর রবীন্দ্রনাথের জন্ম হল।

১

১৮৬১ খ্রীঃ অব্দ থেকে উনিশ শতকের শেষভাগের মধ্যে বাঙলাদেশের ওপর দিয়ে যে বিচিত্র পরিবর্তনের স্রোত বয়ে গেছে, তার ঐতিহাসিক মূল্য অবশ্যস্বীকার্য ; কিন্তু বাঙালীর সমগ্র চেতনার আমূল রূপান্তরই অধিকতর কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষণীয়। কাজকর্মের সুবিধার জন্য ইংরেজ বণিক যৎসামান্য বিলাতী বিদ্যার চাষ আরম্ভ করেছিল ; মনের উর্বর মাটিতে সামান্য আবাদ করতেই সোনা ফলল। ইংরাজি বিদ্যা বাঙালীর মধ্যযুগীয় সংস্কারে প্রচণ্ড আঘাত দিল। ইংরাজি ভাষার মারফতে সারা পশ্চিমী সভ্যতাকে আমরা এক নজরেই চিনে নিতে পারলাম। ঐহিক লাভ তো

হলই ; সব চেয়ে বড় লাভ, দীর্ঘকালের তন্দ্রাজড়িমাকে জীর্ণবস্ত্রের মতো পরিত্যাগ করে আমরা জাগ্রত জীবনের রাজপথে এসে দাঁড়ালাম। আম্রবনচ্ছায়াশীতল গ্রামজীবনের নিরুদ্বিগ্ন অবকাশের কাল ক্রমেই হ্রস্বতর হয়ে এল। তখনও বাউল-কীর্তন-ভাটিয়ালি গানে বাঙলার কুটীরপ্রান্তর মুখরিত ছিল বটে ; কিন্তু উনিশ শতক থেকেই আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিমা মানবমুখী হতে আরম্ভ করল। এতদিন দেবতা, দেবতার অবতার বা ভক্ত মানুষের কথা সাহিত্য ও জীবনে প্রধান হয়েছিল ; কিন্তু পাশ্চাত্য জীবন ও সভ্যতার সংস্পর্শে আসার ফলে আধুনিক শিক্ষিত বাঙালী য়ুরোপের জীবন-বাদী সভ্যতাকে আপন বলে বেছে নিল। সুতরাং জীবনসমুখ তত্ত্বকথা অধিকতর জনপ্রিয় হল, রাষ্ট্রশাসন ও রাজনীতি জীবনের প্রান্তে হানা দিল, নিদ্রাতুর অজগর-সমাজ ঘুম ভেঙে জেগে উঠল, স্থাবর ও স্থাণু জঙ্গম ও গতিশীল হল। জীবনের বহিরঙ্গ, বাস্তব প্রয়োজন, পার্থিব আকাঙ্ক্ষা সদাসন্তুষ্ট চিত্তপ্রবাহকে কল্লোল-মুখর করে তুলল, জীবনের মূল্যমানেরও রূপান্তর হতে শুরু হল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রামমোহন, ডিরোজিওগোষ্ঠী ও 'ইয়ং বেঙ্গল', বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার প্রভৃতি মনীষী-দের আত্মনিয়োগের ফলে প্রবহমান জীবনধারাকে আমরা নতুন করে পরীক্ষা করে নিতে আরম্ভ করলাম। এতদিন ধরে নির্বিচারে সব-কিছুকে উদাসীনভাবে স্বীকৃতি জানিয়ে আসছিলাম। এইবার এল বাদপ্রতিবাদের যুগ। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাদপ্রতিবাদের মধ্য দিয়ে একটা সমন্বয়ের রেখা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠল। এই যুগে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব।

বিচিত্র প্রতিভাধর রবীন্দ্রনাথের গীতিকাব্যেই আত্মার মুক্তি, ছন্দের পাখায় ভর করে চিদাকাশে তাঁর মহাসঞ্চরণ। সব সাহিত্যই অল্পাধিক সমাজের সঙ্গে অন্বিত। কিন্তু গীতিকবিরা আপন ব্যক্তিচেতনার হর্ম্যচূড়ায় স্বেচ্ছাবন্দী। তাই তাঁরা অনায়াসে দেশ-কালের বন্ধন ছাড়াতে পারেন। অবশ্য তাঁদের কাব্যে যে দেশকালের

পরিবেশ রচিত হয়, তা তাঁদেরই চেতনাসৃষ্ট দেশকাল। সুতরাং গীতিকবি যদি "সমাজ সংসার মিছে সব" বলে পরিদৃশ্যমান জগৎ-প্রতীতিকে পাশ কাটিয়ে যান, তা হলে তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ গীতিকবি। গীতিকবির আত্মকেন্দ্রিক মনোধর্ম তাঁর অন্যান্য রচনাতেও কখনও প্রত্যক্ষভাবে, কখনও বা পরোক্ষভাবে ছায়া ফেলেছে। কিন্তু তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের যে দেশকালে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তার প্রভাব তাঁকেও যে কতখানি চঞ্চল ও কর্মব্যাকুল করে তুলেছিল, তা তদানীন্তনকালের সামান্য পরিচয় নিলেই জানা যাবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এলোমেলো ঝড়ো হাওয়ার উদ্দাম গতি অনেকটা স্তিমিত হয়ে এসেছে; সাহিত্য, জীবন, সমাজ, ধর্ম ও রাজনীতিতে খানিকটা স্থায়ী বিকাশ পরিস্ফুট হতে আরম্ভ করেছে। সেই পরিমণ্ডল রবীন্দ্রনাথকেও আবিষ্ট করল। বাতাসের মধ্যে বাস করে বায়ুচাপের বাইরে যাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথও ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে বাস করে শতাব্দীর বাণী ও বার্তার বাইরে যেতে পারেন নি। সমকালীন দেশ, সমাজ, রাষ্ট্র-আন্দোলন, ঐতিহ্যচিন্তার সংঘাত-সংঘর্ষ তাঁকে নিশ্চিন্ত থাকতে দেয়নি। তাঁকেও উনিশ শতকের ঝঞ্ঝাবাতাসে ঝাঁপ দিতে হয়েছিল। তাঁর উক্তি—

> "আমাদের ছিল মস্ত একটা সাবেক কালের বাড়ি, তার ছিল গোটাকতক ভাঙা ঢাল বর্শা ও মরচেপড়া তলোয়ারখাটানো দেউড়ি, ঠাকুরদালান, তিন-চারটে উঠোন, সদর-অন্দরের বাগান, সম্বৎসরের গঙ্গাজল ধরে রাখবার মোটামোটা জালাসাজানো অন্ধকার ঘর। পূর্বযুগের নানা পাল-পার্বণের পর্যায় নানা কলরবে সাজে সজ্জায় তার মধ্য দিয়ে একদিন চলাচল করেছিল, আমি তার স্মৃতির বাইরে পড়ে গেছি। আমি এসেছি যখন, এ বাসায় তখন পুরাতন কাল সদ্য বিদায় নিয়েছে, নতুন কাল সবে এসে নামল, তার আসবাবপত্র তখনও এসে পৌঁছয়নি।"

এ ১৮৬১ সালের কথা। ঠাকুরবাড়ীর সদর দেউড়ি পার হয়ে

আগন্তুক পাশ্চাত্য সভ্যতা তখন অন্দরমহলে প্রবেশাধিকার লাভ করেছে। ইতিপূর্বে কলকাতার ইংরাজি-জানা মহলে এই নতুন কাল এসে গেছে। ঠাকুরবাড়ীতে তখন একদিকে চলেছে ঔপনিষদিক সাধনা, আর একদিকে স্বাদেশিকতার দীক্ষামন্ত্র এবং শেকস্‌পীয়র ওয়ল্টর স্কটের সাহিত্যরসসম্ভোগ। তারই মধ্যে ঠাকুরবাড়ীর কনিষ্ঠ সন্তান জন্মগ্রহণ করলেন। সমসাময়িক ঘটনার একটু নিরিখ নেওয়া যাক।

সিপাহীবিদ্রোহের পর রবীন্দ্রনাথের জন্মের প্রায় তিনবৎসর আগে ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের রাণী ভিক্টোরিয়ার শাসনাধীনে গেল (১লা নভেম্বর, ১৮৫৮)। এর সামান্য কিছু পরে ১৮৫৯ সালে বাঙলার যশোহর, খুলনা, পাবনা প্রভৃতি অঞ্চলের রায়তেরা জমিতে নীল চাষ করতে অস্বীকার করল। ফলে মধ্যবিত্ত ও সম্পন্ন কৃষকদের মধ্যে নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে সংহত প্রতিরোধ সৃষ্টি হল। হরিশ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'Hindu Patriot' পত্রে নীল আন্দোলন উপলক্ষ করে তীব্র ব্রিটিশবিরোধিতা শুরু হল। এই কৃষাণবিদ্রোহ মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়েরও সমর্থন ও সহানুভূতি লাভ করল, নাটকে ছড়াগানে তার প্রভাব সঞ্চারিত হল। হরিশ মুখোপাধ্যায় নীলচাষীদের পক্ষ সমর্থন করে শ্বেতাঙ্গরোষে সর্বস্বান্ত হয়ে গেলেন। এই সময়ে ১৮৫৯ সালের গোড়াতেই কবি ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যু হল এবং প্রায় একই সময়ে রঙ্গলাল, মধুসূদন, দীনবন্ধু, প্যারীচাঁদ আবির্ভূত হলেন। রবীন্দ্রনাথের ছয় বৎসর বয়সের সময়ে ঠাকুরবাড়ীর তরুণেরা নব-নাট্যান্দোলনে যোগ দিলেন এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, গুণেন্দ্রনাথ, যদুনাথ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণবিহারী সেন (কেশবচন্দ্রের ভ্রাতা), অক্ষয় চৌধুরী—এঁরা মিলিত হয়ে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'নবনাটক' অভিনয়ে (১৮৬৭) প্রস্তুত হলেন। এর আগেই দেশের মধ্যে বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলন (১৮৫৬ সালের ১৬ জুলাই বিধবাবিবাহ আইন পাস হয়) প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছে। ১৮৬৫ সালের পর বঙ্কিমচন্দ্র ধীরে ধীরে

সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন, ১৮৬৭ সালে Bengal Social Science Association-এর প্রতিষ্ঠা হয়েছে, এই বছরেই ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার Indian Association for the Cultivation of Science স্থাপন করেছেন। ১৮৫৭ সালের মিউটিনির বৎসরে প্রতিষ্ঠিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৬৭ সালের মধ্যে ইংরাজি-শিক্ষিতের সংখ্যা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। একদল চাকুরীকামী মধ্যবিত্ত যুবক তখন ডেপুটীস্বর্ণমৃগের প্রতি মহোল্লাসে ধাবমান।

ব্রাহ্মসমাজকে কেন্দ্র করে তখন নানারকম আন্দোলন প্রবলাকার ধারণ করেছে। ১৮৬৬ সালে কেশবচন্দ্র সেন মহর্ষি ও আদি ব্রাহ্ম-সমাজের সান্নিধ্য ত্যাগ করে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' ('নববিধান') গঠন করেন। কিন্তু ব্রহ্মানন্দ শেষ পর্যন্ত ভক্তিভাবের অতিরেক ত্যাগ করতে পারলেন না। ফলে তরুণ ব্রাহ্মেরা তাঁর কথা ও কাজকে শিরোধার্য করতে অক্ষম হলেন। তাঁদের অধিকাংশই তাঁকে পরি-ত্যাগ করে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' গঠন করলেন (১৮৭৮)। তখন রবীন্দ্রনাথ সতের বৎসরের উত্তর-কিশোর। ব্রাহ্মসমাজ ত্রিধাবিভক্ত হলে বঙ্কিমচন্দ্রের নেতৃত্বে পুরাণাশ্রয়ী হিন্দু ঐতিহ্য আবার জেগে উঠল। 'বঙ্গদর্শন', 'সাধারণী', 'নবজীবন', 'প্রচার' প্রভৃতি পত্রে বঙ্কিম ও তাঁর শিষ্যদের পরিকল্পিত ও প্রচারিত নব্য হিন্দুধর্ম ক্রমে ক্রমে শিক্ষিত হিন্দুর আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পুনরুজ্জীবিত করল। আদি ব্রাহ্মসমাজ কোন দিনই হিন্দু ঐতিহ্যকে সর্বপ্রকারে বর্জন করেনি। রাজনারায়ণ বসুর 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' (১৮৮৭) পুস্তিকায় একটি উদারতর পটভূমিকায় হিন্দু ও ব্রাহ্মধর্মের সমন্বয়ের কথা প্রচারিত হল। কেশবচন্দ্র এবং শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি ব্রাহ্মনেতারা সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তায় প্রগতিশীল মনোভাবের পরিচয় দিলেও উনিশ শতকের শেষ দুই দশকে শিক্ষিত হিন্দুসমাজে বঙ্কিম-প্রচারিত তত্ত্বকথা ও ধর্মাদর্শ অতিশয় জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। অবশ্য তার জন্য শুধু

বঙ্কিমচন্দ্রই দায়ী নন। তিনি হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের জন্য মূলতঃ যুক্তিবাদকে আশ্রয় করেছিলেন। শশধর তর্কচূড়ামণির 'বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্মের' ভোজবাজিতে তিনি কিছুকাল সম্মোহিত হয়ে থাকলেও অচিরে যুক্তিবুদ্ধিকে পুনরুদ্ধার করেছিলেন। অবশ্য শেষ জীবনে তিনি কোঁতের সঙ্গে গীতার, জ্ঞানের সঙ্গে কর্মের যুক্তির সঙ্গে ভক্তির সমন্বয়চেষ্টা করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত প্রচেষ্টার মূলে ছিল প্রবল স্বাদেশিকতা—যে স্বাদেশিকতা বুদ্ধি-কেন্দ্রিক হলেও দেশের বহমান সংস্কৃতিকে নির্মমভাবে প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। আদি ব্রাহ্মসমাজ, নববিধান, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এবং বঙ্কিমচন্দ্র—এঁদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও বুদ্ধিকে কেন্দ্র করেই এঁদের চিত্তজগতে অভিযান শুরু হল। মহর্ষি শান্তভক্তির উপাসক হলেও অক্ষয়কুমারের প্রভাবে শেষ পর্যন্ত বেদের অপৌরুষেয়ত্ব পরিত্যাগ করে নির্মোহ যুক্তি-বুদ্ধির গৌরব স্বীকার করলেন।

বাঙলার সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলন আর একটি ব্যাপারে নতুন জীবনপ্রত্যয়ের সামনে এসে দাঁড়াল। দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস এবং তাঁর শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ বাঙালী সমাজে অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করলেন। পরমহংসের উদার ধর্মমত ও মানবজীবনের সুখদুঃখের প্রতি অসীম মমতা এবং স্বামীজীর প্রচণ্ড পৌরুষ, জ্ঞানকর্মের বজ্রনির্ঘোষ এবং পতিত মানুষের প্রতি অখণ্ড প্রত্যাশা ধর্মকলহজর্জর হিন্দু সমাজে নতুন প্রত্যয়ের অনির্বাণ আলোক-পিপাসা সৃষ্টি করল।

ইতিপূর্বে ১৮৬৭ সালে রাজনারায়ণ বসু, নবগোপাল মিত্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ, গণেন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রবর্তনায় এবং নব-গোপালের অদম্য উৎসাহে হিন্দুমেলার (চৈত্রমেলা) বার্ষিক অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়েছে। বস্তুতঃ এই সময় থেকেই জাতীয়তা বা 'ন্যাশনাল' কথাটি শিক্ষিতসমাজে জনপ্রিয়তা অর্জন করল। যদিও পাশ্চাত্যের আদর্শে চারিদিকে 'ন্যাশনালে'র ছড়াছড়ি পড়ে গেল, কিন্তু একথা

স্বীকার করতে হবে যে, এই হিন্দুমেলা থেকেই গঠনমূলক স্বাদেশিকতার যথার্থ আরম্ভ হল। এই মেলার কর্তৃপক্ষ শুধু উত্তেজনার আগুন সৃষ্টি না করে জাতির শিল্প, সাহিত্য ও ব্যবসা-বাণিজ্যের গৌরবময় ঐতিহ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করেন। যখন এই মেলার প্রথম অনুষ্ঠান হয়, তখন রবীন্দ্রনাথ পাঁচ বৎসরের শিশুমাত্র। এই হিন্দুমেলার স্বাদেশিক আন্দোলনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বাল্য ও কৈশোরের অনেকটা অতিবাহিত হয়। একটু সন্ধান করলেই লক্ষ্য করা যাবে যে, পরবর্তী রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে হিন্দুমেলার ঐতিহ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। উনিশ শতকের শেষাংশের রাষ্ট্র-আন্দোলন বিশুদ্ধ রকমের রাজনৈতিক আন্দোলন। বহুদিন এই আন্দোলন একচক্ষু হরিণের মত রাজনৈতিক উত্তেজনাকে রাজনৈতিক চেতনা বলে মনে করত।

রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রচেতনার কৌলীন্য কিন্তু অন্যপ্রকার। দেশের সামগ্রিক জাগরণ ও বিকাশকেই তিনি যথার্থ রাষ্ট্র-আন্দোলনের মূল্য দিয়েছেন ; এর প্রথম শিক্ষা হয় হিন্দুমেলা থেকে। মেলার নবম অধিবেশনে (১৮৭৫) চৌদ্দ বৎসরের কিশোর রবীন্দ্রনাথ 'হিন্দুমেলার উপহার' নামক স্বরচিত কবিতাটি আবৃত্তি করেন। কবিতাটির গুণাগুণ বিচার না করেও বলা যায় যে, রাজনৈতিক উদ্দীপনা, পরাধীন ভারতের জন্য লজ্জা এবং মাতৃভূমিকে পূর্ব-গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য দেশবাসীকে একসূত্রে মিলিত করার আহ্বান ধ্বনিত হয়েছিল একটি চতুর্দশবর্ষীয় কিশোরের কণ্ঠ থেকে। তখন চারিদিকে রাজনৈতিক উত্তেজনার উন্মত্ততা শুরু হয়েছে। ক্ষুব্ধ সুরেন্দ্রনাথ ('সারেন্ডার নট্') বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি—এঁরা ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন (১৮৭৬) স্থাপন করেছেন। এঁরাই সর্বপ্রথম সমগ্র ভারতকে রাজনীতির দিক থেকে একসূত্রে বাঁধবার পরিকল্পনা করেন। ভারত সরকার দুর্ভিক্ষ তহবিলে সঞ্চিত টাকা আফগান যুদ্ধে ব্যয় করায় দেশে ভয়ানক অসন্তোষ দেখা দিল,

সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভ মুখর হয়ে উঠল। এর প্রতিবিধানে পাস হল ভার্নাকুলার প্রেস এ্যাক্ট (১৮৭৮); দেশীয় সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ হল। এই বৎসরেই অস্ত্রআইন জারি হল। সরকারের সমালোচনা বা আত্মরক্ষার ক্ষীণতম প্রচেষ্টাও রাজদ্রোহ বলে বিবেচিত হল। ১৮৮২ সালে ইলবার্ট বিল নিয়ে 'কালাধলা'র মধ্যে চূড়ান্ত বিরোধ ঘনিয়ে এল। ১৮৮৫ সালে ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রতিনিধিমূলক সরকার গঠন, অস্ত্রআইনের প্রত্যাহার, সিভিল সার্ভিসের বাধা দূর ও সংস্কার প্রভৃতি প্রস্তাব গৃহীত হল। এই ১৮৮৫ সালেই বোম্বাই শহরে জাতীয় কংগ্রেসেরও প্রথম অধিবেশন শুরু হল।

এই উত্তেজক রাজনৈতিক আবহাওয়ায় রবীন্দ্রনাথ যে কিঞ্চিৎ উত্তপ্ত হয়েছিলেন, তার কিছু কৌতূহলজনক প্রমাণ পাওয়া গেছে। মাৎসিনির 'কার্বনারি' (*Carbonari*) নামক গুপ্তসভার অনুকরণে বৃদ্ধ রাজনারায়ণ এবং ঠাকুরবাড়ীর তরুণের দল ঠন্‌ঠনের পড়ো বাড়ীতে 'সঞ্জীবনী সভা' নামে একটি গুপ্ত সভা স্থাপন করলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই সভার একটি গুপ্ত নামও দিয়েছিলেন—'হাম্‌চুপামুহাফ্‌'। এর কাজকর্ম হত সাঙ্কেতিক ভাষায়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথই সেই সাঙ্কেতিক ভাষার উদ্ভাবন করেন। 'হাম্‌-চুপামুহাফ্‌' এবং এর সাঙ্কেতিক ভাষা শুধু এই সভার দীক্ষিতেরাই জানতেন। বেদপাঠ, মড়ার খুলি, মন্ত্রগুপ্তি প্রভৃতির দ্বারা সভার উদ্যোক্তারা বেশ তান্ত্রিক অভিচারের আয়োজন করেছিলেন। "যেদিন নূতন কোন সভ্য এই সভায় দীক্ষিত হইতেন সেদিন অধ্যক্ষ মহাশয় (রাজনারায়ণ বসু) লাল পট্টবস্ত্র পরিয়া সভায় আসিতেন। সভার নিয়মাবলী অনেকই ছিল, তাহার মধ্যে প্রধান ছিল মন্ত্রগুপ্তি; অর্থাৎ এ সভায় যাহা কথিত হইবে, যাহা কৃত হইবে এবং যাহা শ্রুত হইবে, তাহা অ-সভ্যদের নিকট কখনও প্রকাশ করিবার কাহারও অধিকার ছিল না।" (জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি)। উত্তরকালে অবশ্য রবীন্দ্রনাথ এই সভাপর্বের রোমহর্ষক রহস্যময়তাকে কৌতুক-

হাস্যের দ্বারা লঘু করে বলেছেন, "অভিনয় সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে, ফোর্ট উইলিয়মের একটি ইষ্টকও খসে নাই এবং সেই পূর্বস্মৃতির আলোচনা করিয়া আজ আমরা হাসিতেছি।" কিন্তু বেশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে, ১৮৭৬-৭৭ সালে দিকে দিকে গুপ্তসমিতির পরিকল্পনা পঞ্চদশবর্ষের কিশোরের মনেও বাসা বেঁধেছিল। অবশ্য ১৮৭১ সালে ওয়াহাবি নেতা আবদুল্লা কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচার-পতিকে কলিকাতা টাউনহলের সামনে হত্যা করলেও তখনও হিন্দু-সমাজে গোপনীয় ষড়যন্ত্র ও সশস্ত্র সংঘর্ষকে কার্যসিদ্ধির উপায়-রূপে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করা হয়নি। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদের গুপ্তমন্ত্রকে বিশেষ স্বীকৃতি দিতে সম্মত হননি—'ঘরে বাইরে' ও 'চার অধ্যায়' তার প্রমাণ। কৈশোর জীবনের উত্তেজক রাজনৈতিক আবহাওয়া রবীন্দ্রনাথকে আরও কয়েকবার বিক্ষুব্ধ করেছিল। ১৮৭৬ সালে লর্ড্ লিটনের দিল্লী দরবারের অন্তঃসারশূন্যতাকে আক্রমণ করে কিশোর কবি লিখলেন একটি দীর্ঘ কবিতা ; সেটি তিনি আবৃত্তি করলেন হিন্দুমেলার অধিবেশনে ('রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়')। দিল্লীর রাজসূয় যজ্ঞে নতজানু রাজন্য-বর্গকে ধিক্‌কার দিয়ে লেখা কবিতাটিতে কবির যে অন্তর্জ্বালা ব্যক্ত হল, তার কাব্যমূল্য যাই হোক, কবির কিশোর মনে এই ঘটনা যে কিরকম তীব্র অগ্নিকণা বিচ্ছুরিত করেছিল, তা আমরা এখনও অনুমান করতে পারি।

২

ঊনবিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক ঘটনাবর্ত ও বাগ্‌বিতণ্ডা রবীন্দ্রনাথকে যে কিভাবে ধীরে ধীরে আকৃষ্ট করল, তা সমসাময়িক ঘটনার সামান্য পরিচয় নিলেই দেখা যাবে। ১২৮৮ সালের 'ভারতী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তার স্বরূপ এবং শাসক-শাসিতের সম্পর্ক নিয়ে নিতান্ত তরুণ বয়সে যে সমস্ত প্রবন্ধ লিখতে শুরু করলেন, তাতে তাঁর গঠনপন্থী ও ক্রিয়াবান মন ও প্রাণের বলিষ্ঠ

স্বরূপ ফুটে উঠল। পাশ্চাত্য জাতির লোভলোলুপতা সারা বিশ্বে যে কিরকম মারণযজ্ঞের আয়োজন করছে, ঐ বৎসরের 'ভারতী'তে তিনি তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিলেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণীয়। ১২৮৮-৮৯ সলের মধ্যে 'ভারতী' পত্রে তাঁর 'বৌঠাকুরাণীর হাট' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় এবং ১৮৮৬ সালে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। উপন্যাসটির শিল্পকলার বিশ্লেষণ আমাদের বর্তমান প্রসঙ্গে প্রয়োজন নেই। কিন্তু কবি যে কৈশোরের 'সঞ্জীবনী সভা'র উত্তেজনা কাটিয়ে উঠে উদ্ধত জঙ্গী মনোভাবের প্রতি বিরূপ হয়েছেন, তার প্রমাণ পাওয়া গেল এই উপন্যাসে—প্রতাপাদিত্যের চরিত্রে। এ বিষয়ে পরবর্তীকালে তিনি যা বলেছেন, তা থেকে তাঁর মতটি পরিস্ফুট হবে—

"স্বদেশী উদ্দীপনার আবেগে প্রতাপাদিত্যকে এক সময়ে বাংলা-দেশের আদর্শ বীরচরিত্ররূপে খাড়া করার চেষ্টা চলেছিল। এখনো তার নিবৃত্তি হয়নি। আমি যে সময়ে তাঁর সম্বন্ধে ইতিহাস থেকে যা কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিলুম তার থেকে প্রমাণ পেয়েছি তিনি অন্যায়কারী অত্যাচারী নিষ্ঠুর লোক, দিল্লীশ্বরকে উপেক্ষা করবার মত অনভিজ্ঞ ঔদ্ধত্য তাঁর ছিল, কিন্তু ক্ষমতা ছিল না।...আমি যে সময়ে এই বই অসঙ্কোচে লিখেছিলুম তখনো তাঁর পূজা প্রচলিত হয়নি।" কথাটা ঐতিহাসিক তথ্যের দিক থেকে অতিশয় সত্য। উদ্ধত, সর্বগ্রাসী পাশ্চাত্য রাজনীতির প্রতিক্রিয়া তাঁর মনে এই সময় থেকে প্রবল হতে থাকে—এখানে তার সূত্রপাত। এই একই কারণে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'-এর প্রতি বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন না ('পুরাতন প্রসঙ্গ'—২য়)।

শাসকশক্তির মূঢ়তার ফলে সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলন ক্রমেই উচ্চকণ্ঠ হয়ে উঠছিল। আবেদন-নিবেদনের ভাষাও শাণিত হল। ইলবার্ট বিলের ব্যাপারে সুরেন্দ্রনাথ অগ্নিবর্ষী বাগ্মিতার গুণে চারিদিকে উত্তেজনা সঞ্চার করেছিলেন। ভারত সরকার মিথ্যা অজুহাতে সুরেন্দ্রনাথকে কয়েদ করলেন। তখন সারা কলকাতার

ছাত্র ও যুবসমাজ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। অথচ বিস্ময়ের বিষয় রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে 'ভারতী' পত্রে রাজনৈতিক প্রবন্ধের সূচনা করলেও সুরেন্দ্রনাথের গ্রেফতার প্রসঙ্গে নীরব রইলেন। জনসমুদ্রের জোয়ার যেন তাঁকে স্পর্শ করতে পারল না। এই সময়ে উনবিংশ শতাব্দীর উত্তপ্ত আন্দোলন থেকে তিনি যেন ধীরে ধীরে সরে যেতে লাগলেন। রবীন্দ্র-জীবনীকার অবশ্য মনে করেন যে, রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে কলকাতায় ছিলেন না বলেই এই রাজনৈতিক উত্তেজনার খবর রাখতেন না। "তখন তিনি কারোয়ারে সত্যেন্দ্রনাথের নিকট বাস করিতেছিলেন, কলিকাতার ছাত্রজনতার উত্তেজনা তিনি দেখেন নাই, দেখিলে কবির স্পর্শচেতন মন নিশ্চয়ই সাড়া দিত।" (রবীন্দ্র-জীবনী—১ম)। আমাদের কিন্তু ঘোরতর সন্দেহ হয়। ইলবার্ট বিল উপলক্ষ করে কলকাতার জনবিক্ষোভ ও রাজনৈতিক 'এ্যাজিটেশন'-এর প্রতি সম্ভবতঃ কবি আকৃষ্ট হননি। ১২৮৯ থেকে ১২৯৩ সনের মধ্যে তিনি এই রাজনৈতিক আন্দোলনকে কোন কোন ক্ষেত্রে ঈষৎ আক্রমণ করেছিলেন। প্রতিবাদ ক্রমে ব্যঙ্গবিদ্রূপে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠতে লাগল। তাঁর উক্তি, "আমাদের দেশে Political agitation করার নাম ভিক্ষাবৃত্তি করা।...ভিক্ষুক মানুষেরও মঙ্গল নাই, ভিক্ষুক জাতিরও মঙ্গল নাই।" কবি প্রথম যৌবনে উনিশ শতকী রাষ্ট্র-আন্দোলনের কোটালের জোয়ারে ভেসে গেলেন না, দেশ-চেতনার বিরাট পটভূমিকায় সমগ্র জাতিমানসের নবজাগরণের পরিকল্পনা করলেন। কৈশোরে সঞ্জীবনী সভা-প্রসঙ্গে "উত্তেজনার আগুন পোহানো" ('জীবনস্মৃতি') একদা তাঁর কাছে কৌতুকজনক মনে হয়েছিল ; যৌবনে রাজনৈতিক তাণ্ডবের দিনে তাতে বিতৃষ্ণা এল। বাক্‌সর্বস্ব আন্দোলন, রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং ইংরেজ-বিরোধিতার দ্বারা জাতি যে কোন দিক দিয়েই লাভবান হবে না, রবীন্দ্রনাথ উনবিংশ শতাব্দীর শেষে সুদৃঢ় স্বরে এই কথাটাই ঘোষণা করলেন। 'স্বদেশী সমাজ'-এ তিনি পরবর্তী কালে যা বলেছেন, প্রথম যৌবনে স্পষ্ট করে সেই কথাটাই উচ্চারণ করলেন,

"ছোট কাজই বাস্তবিক দুরূহ, প্রকাণ্ডমূর্তি কাজের ভান ফাঁকি মাত্র। আমাদের চারিদিকে আমাদের আশেপাশে আমাদের গৃহের মধ্যে আমাদের কার্যক্ষেত্রে।" রবীন্দ্রনাথ উত্তরকালে যে ধরনের জাতি, জীবন ও রাজনীতির সর্বাঙ্গীণ মূর্তি অঙ্কন করেছেন, 'আত্মশক্তি'তে যার যথার্থ পরিচয় পরিস্ফুট হয়েছে, উনিশ শতকের অষ্টম দশকের দিকেও সেই আদর্শ তাঁর মনের মধ্যে ধীরে ধীরে মূর্তি পরিগ্রহ করেছে। পরবর্তী কালে বড়লাটের মন্ত্রীসভায় ভারতীয় নিয়োগ সম্বন্ধে তিনি প্রবন্ধ ('মন্ত্রী অভিষেক'—ভারতী, ১২৯৭) রচনা করলেন, কিন্তু এর ভাষা যথেষ্ট প্রখর হল না। ইংরাজ সরকারের প্রতি অভিযোগ থাকলেও তাতে তখনও অবিশ্বাস বা ঘৃণা সঞ্চারিত হয়নি।

কিন্তু ক্রমেই বিতৃষ্ণা এল। 'সাধনা'য় (১৩০১) 'অপমানের প্রতিকার' প্রবন্ধে তিনি দেখালেন যে, ক্রোধের বিরুদ্ধে ক্রোধ প্রয়োগ না করে সমগ্র জাতি ও মানসের উন্নয়ন সাধনই যথার্থ রাজনৈতিক চেতনা। 'সাধনা' পত্রে তিনি নানা প্রবন্ধে রাজনৈতিক জীবনের নতুন সংজ্ঞা নির্ণয় করলেন। 'রাজাপ্রজা' গ্রন্থে সেই সমস্ত প্রবন্ধ সংকলিত হল। তিনি দেখলেন, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা সত্ত্বেও আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন আবেদন-নিবেদন ও মান-অভিমানের পালা ছাড়িয়ে বেশি দূর যেতে পারেনি। আমরা উচ্চশিক্ষিতেরা দল বেঁধে বিদেশী শাসকের কাছ থেকে চাকুরী ও খেতাব আদায়ের জন্য আন্দোলন করেছি, সমস্ত দেশকে ডাকতে পারিনি। কংগ্রেসের অধিবেশনে আলাপ-আলোচনা—সমস্তই ইংরাজিতে হত। সুতরাং সে প্রতিষ্ঠান ও আন্দোলন মূলতঃ কাদের জন্য? রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী কালে—'আত্মশক্তি' গ্রন্থেও সেই কথাটা ব্যাপকভাবে আলোচনা করেছেন। তিলকের কারাবরণ উপলক্ষ করে সারা দেশে যে আন্দোলন সৃষ্টি হল, রবীন্দ্রনাথ তার থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারলেন না। 'কণ্ঠরোধ' প্রবন্ধে তিনি সরকারী অন্যায়ের সুদৃঢ় প্রতিবাদ করলেন, প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলনে যোগ

দিলেন, অন্যতম প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করলেন। কিন্তু কেবলই তাঁর মনে হতে লাগল, "কেবল রাজনৈতিক আন্দোলনের দ্বারা আমাদের লজ্জা দূর হইবে না।" উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত থেকে তিনি যেন মনে মনে ক্লান্ত হয়ে উঠেছিলেন। শঙ্কার সঙ্গে তিনি লক্ষ্য করলেন, সরকারী চণ্ড-নীতির প্রতিক্রিয়ার বশে এদেশের রাজনৈতিক আন্দোলন প্রকাশ্য পথ ছেড়ে সুড়ঙ্গপথে ভীষণের অভিসারে যাত্রা করতে উন্মুখ। হিন্দুমেলা থেকে আরম্ভ করে উনিশ শতকের যাবতীয় স্বাদেশিক আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে, মনেপ্রাণে স্বদেশসেবার ব্রত নিয়ে তিনি এই ধরনের নির্জলা রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। কবি সারা জীবন ধরে যেকথা প্রচার করেছেন, তা হল জীবনের সর্বাঙ্গীণতা, সম্পূর্ণতা—মানবতার অখণ্ড অবিভাজ্য গোটা রূপ। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে রাজ-নৈতিক আন্দোলন সমাজ, জীবন, সাধনা ও ঐতিহ্যকে বাদ দিয়ে শুধু উত্তেজনাময় উত্তাপের কাছে আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছিল দেখে তিনি মনে মনে অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিলেন। এর পরে বিশ শতকের গোড়ার দিকে দেশবিভাগ নিয়ে যে আন্দোলন আরম্ভ হল, কবি তাকে একটা সামগ্রিক দেশচেতনার বিশাল রক্তশতদলে স্থাপন করতে অভিলাষী হলেন। 'বঙ্গভঙ্গ' আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থেকে তিনি বাঙালীর উজ্জীবন নতুনভাবে প্রত্যক্ষ করলেন; অবশ্য এর পরেও এই আন্দোলনের সঙ্গে তিনি কতটুকু যোগাযোগ রাখতে পারলেন, তার ইতিহাস এখানে আলোচনার অবকাশ নেই, তবে এইটুকু লক্ষণীয় যে, রবীন্দ্রনাথ উনিশ শতকের রাজনৈতিক চেতনার বিকাশপরম্পরার সঙ্গে নিবিড় যোগ রেখেছিলেন; কোথাও তার পক্ষ নিয়ে, কোথাও-বা তার বিরুদ্ধে সাবধান-বাণী উচ্চারণ করে উনিশ শতকের জাগ্রত চেতনাকে নিজ চিত্তে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

৩

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালী-মানসের আর একটি স্বরূপ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল। প্রাচীন ঐতিহ্য ও পুরাণ-সংস্কৃতিকে আধুনিক জীবনের বাতায়নে বসে নিরীক্ষণ করা এই সময়ের বাঙালীর সাহিত্য ও চিন্তার একটা সাধারণ লক্ষণ। ইতিপূর্বে রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথ বেদ, উপনিষদ ও বেদান্তের আদর্শ সম্বন্ধে নিজেরাও অবহিত হয়েছিলেন, দেশবাসীকেও অবহিত করতে চেয়েছিলেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ব্রাহ্মসমাজের অন্ত-র্বিরোধের সুযোগে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম আবার প্রাধান্য অর্জনে প্রস্তুত হল। বস্তুতঃ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ যে নব্য হিন্দু-ধর্মের পুনরুত্থান বলে পরিচিত হয়েছে, সেটি কিছু অযৌক্তিক নয়। হিন্দুধর্মের এই পুনর্জাগরণকে কেউ কেউ প্রতিক্রিয়াশীল ও পশ্চাদ্‌গামিতা বলে ঊনার্থক মন্তব্য করেছেন। আমরা সে-সব মত-বিরোধের জল্পনা ছেড়ে দিয়ে সহজদৃষ্টিতে দেখতে পাব যে, এই হিন্দুধর্মের স্বাতন্ত্র্যলাভের যুগে একটি ভক্তি-আশ্রয়ী, আর একটি জ্ঞান-আশ্রয়ী মতবাদ শিক্ষিত মহলে প্রভাব বিস্তার করেছিল। কবি নবীনচন্দ্র সেন এবং শিশিরকুমার ঘোষ বৈষ্ণব ভক্তিবাদকেই একটু আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দর্শন করলেন। আধুনিক বলতে পুরাতনী নিঃশ্রেয়স ভক্তির সঙ্গে আধুনিক মানবতন্ত্রবাদের সাযুজ্য-সাধন নির্দেশ করা যাচ্ছে। কেশবচন্দ্রের মধ্যেও এই ভক্তিবাদ একদা বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করেছিল। বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মত তিনিও সদলবলে নগ্নপদে খোল করতাল সহ নগরসংকীর্তনে যেতেন, তাঁর ভক্তিবিগলিত কণ্ঠে ধ্বনিত হ'ত—

> "নরনারী সাধারণের সমান অধিকার,
> যার আছে ভক্তি, পাবে মুক্তি, নাহি জাতবিচার।"

অবশ্য তিনি কৃষ্ণের মানবতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর অনুচর উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় তাঁরই প্রভাবে 'শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্মে'

(১৮৮৯ খ্রীঃ অঃ) কৃষ্ণের ভাগবতধর্মকে আধুনিক ঐতিহাসিক ও মানববাদী আদর্শের স্বরূপ দিতে চেষ্টা করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর শিষ্যেরা হিন্দুর পৌরাণিক সংস্কৃতিকে আধুনিক জীবনজিজ্ঞাসার অনুকূলে ব্যাখ্যায় অগ্রসর হলেন। অবশ্য 'বঙ্গবাসী', 'সাহিত্য', 'হিতবাদী' প্রভৃতি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে একটা উগ্র ধরনের হিন্দু পৌরাণিক আদর্শ ও স্মার্ত আচার-আচরণপ্রণালী শিক্ষিত সমাজে জনপ্রিয় হবার প্রয়াসী হল। এই সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের আবির্ভাব। ভক্তি, যুক্তি ও মানবপ্রেমকে একসূত্রে বিধৃত করার চেষ্টা যুবসমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জনে সার্থক হল।

ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি, উনিশ শতকের রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত না হয়েও রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর আত্মজাগরণের গৌরবকে নিজ চিন্তা ও কর্মে গ্রহণ করেছিলেন। তেমনি এই যুগের সমাজ ও ধর্মসংক্রান্ত আন্দোলনের অনেকটাই তাঁর প্রীতিকর না হলেও এদিক থেকে তিনি মুখ ফিরিয়ে থাকেন নি। কবি বাল্যকাল থেকেই আদি ব্রাহ্মসমাজের শান্ত স্থিতধী ঔপনিষদিক ভক্তিরসে লালিত হয়েছিলেন; এটাই ছিল তাঁদের কৌলিক আদর্শ। তাঁর এই উক্তিটি তাঁদের পারিবারিক আদর্শকে এক নিরিখেই ফুটিয়ে তুলেছে—

> "উপনিষদের ভিতর দিয়ে প্রাক্‌পৌরাণিক যুগের ভারতের সঙ্গে এই পরিবারের ছিল ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। অতি বাল্যকালেই প্রায় প্রতিদিনই বিশুদ্ধ উচ্চারণে অনর্গল আবৃত্তি করেছি উপনিষদের শ্লোক। এর থেকে বুঝতে পারা যাবে সাধারণত বাংলাদেশে ধর্মসাধনায় ভাবাবেগের যে উদ্বেলতা আছে আমাদের বাড়িতে তা প্রবেশ করেনি।"

এই নিরুদ্বেগ ধর্মবোধের উত্তরাধিকার রবীন্দ্রনাথ দুহাত পেতে নিলেও সমকালীন বিভিন্ন ধর্মান্দোলনের উত্তাপকে তিনি যে একেবারে পরিত্যাগ করতে পেরেছিলেন, তা মনে হয় না।

ঊনিশ শতকের মানববাদ ও যৌক্তিকতা তাঁর কাছে শ্রদ্ধার আসন পেয়েছিল।

ব্রাহ্মসমাজ যখন অন্তর্বিরোধের ফলে দ্বিধা হয়ে যাচ্ছিল এবং দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের মতবিরোধ ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠছিল, তখন রবীন্দ্রনাথ বালকমাত্র। কিন্তু কেশবচন্দ্র ও নব্য ব্রাহ্মদের মতান্তরের সময়ে (১৮৭৮) রবীন্দ্রনাথ নবীন যুবক। তিনি উত্তরকালে নব্য ব্রাহ্মদের হিন্দুবিদ্বেষী মনোভাব বোধহয় সমর্থন করতে পারেননি—যেমন পারেননি, 'সাধারণী', 'নবজীবন', 'প্রচার'-এ বঙ্কিমচন্দ্র, চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতির পৌরাণিক হিন্দু মতের অকুণ্ঠ অনুসরণ। তাঁর অভিমতটি উদার ও যুক্তিপূর্ণ—"হিন্দুধর্মের শিরোভূষণ যাঁহারা, আমরা তাঁহাদের নিকট হইতে ধর্মশিক্ষা লাভ করি। অতএব ব্রাহ্ম ও হিন্দু বলিয়া দুই কাল্পনিক বিরুদ্ধ পক্ষ খাড়া করিয়া যুদ্ধ বাধাইয়া দিলে গোলাগুলির বৃথা অপব্যয় করা হয় মাত্র।" (ভারতী, শ্রাবণ, ১২৯২)। চন্দ্রনাথ বসু ও তাঁর গুরু অযৌক্তিক 'আর্যামি'র হাস্যকর অভিমান রবীন্দ্রনাথের অসহ্য মনে হল। ঊনপঞ্চাশী পবনের উন্মত্ততার সময় স্থিতপ্রজ্ঞ হবার সাধনা করা সহজ নয়। রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে ব্রাহ্ম-হিন্দুর কলহ এবং 'বঙ্গবাসী' ও 'সঞ্জীবনী'র তর্কযুদ্ধের মলিনতার মাঝখানে কিছু-কাল আটক হয়ে পড়েছিলেন। হিন্দুর পৌরাণিক সনাতন ধর্মের জয়গান করতে গিয়ে সমকালীন সাহিত্যরথীদের অনেকের কণ্ঠস্বর ক্রমেই তালেবেতালে চৌদুনে উঠল। বঙ্কিমচন্দ্রের যুক্তিবাদী আধুনিক মনোভাব তাঁর শিষ্যদের মধ্যে জঙ্গী প্রতিক্রিয়ায় পর্যবসিত হল। শশধর তর্কচূড়ামণি পরিবেশিত বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম নামক 'দিল্লীকা লাড্ডু' অনেকেই মহানন্দে চর্বণ করতে লাগলেন। তন্ত্র-সাধক কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন ১২৯০ সনের দিকে সহসা অবতারত্ব লাভ করে সমস্যা আরও জটিল করে তুললেন। তিনি ঘোষণা করলেন যে, ভূ-ভার হরণের জন্য কল্কি-অবতার হয়ে তিনি গৌড়ধামে অবতীর্ণ হয়েছেন। এই সমস্ত আর্যামির জ্যাঠামি রবীন্দ্রনাথের কাছে দুঃসহ

মনে হল। তিনি বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে এই বিষয় উল্লেখ করে একটি ব্যঙ্গপত্র লিখলেন—

"ক্ষুদে ক্ষুদে আর্যগুলো ঘাসের মতো গজিয়ে ওঠে
ছুঁচোলো সব জিবের ডগা কাঁটার মতো পায়ে ফোটে।
তাঁরা বলেন, 'আমি কল্কি', গাঁজার কল্কি হবে বুঝি
অবতারে ভরে গেল যত রাজ্যের গলিঘুঁজি।"

এই সময় পুরাণাশ্রয়ী হিন্দুধর্ম হঠাৎ শক্তি অর্জনের চেষ্টা করছে এবং যা কিছু প্রাচীন এবং পুঁথিগত, তাকেই শিরোধার্য করে উদ্ধত আন্দোলন শুরু করে দিয়েছে। চন্দ্রনাথ বসুই ছিলেন এই দলের সবচেয়ে প্রতিষ্ঠাবান ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি। তিনি তথাকথিত সনাতন হিন্দুধর্মের প্রতিটি অক্ষরকে আধুনিক কালে প্রয়োগ করতে বদ্ধপরিকর হলেন। সেই উত্তেজনার দিনে রবীন্দ্রনাথ কবিতার দ্বিরদহর্ম্যে চুপ করে বসে থাকতে পারলেন না, 'বঙ্গবাসী'র যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু এবং চন্দ্রনাথ বসুকেই বোধ হয় ব্যঙ্গ করে 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় 'দামু ও চামু' কবিতা লিখে অনর্থক বাদানু-বাদের সম্মুখীন হলেন। কবিতাটির ব্যঙ্গের সুর তীব্র হয়েছে এবং সর্বত্র সুরুচির মান রক্ষিত হয়নি। অবশ্য 'হিং টিং ছট', কিছু ব্যঙ্গনাটিকা, 'মানসী'র কিছু কবিতায় পরোক্ষে এবং 'ভারতী'তে প্রত্যক্ষভাবে উচ্চতর আদর্শের পক্ষ থেকে এই সমস্ত হিন্দুয়ানীর বুদ্ধিহীন উগ্রতাকে তিনি আক্রমণ করলেন। সে যুগে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে সবচেয়ে মান্য করতেন; সেই বঙ্কিমচন্দ্রই যখন এই পাগলামির বিরুদ্ধে যথোচিত কঠোর হতে পারলেন না, তখন তরুণ কবির মনে ক্ষোভ সঞ্চারিত হল। ক্ষোভ অনেক সময়ে সত্যদৃষ্টি কেড়ে নেয়। এই মতামতের ধূলিঝড়ে পড়ে রবীন্দ্রনাথ কিছুকাল অস্বচ্ছদৃষ্টি হয়ে পড়েছিলেন। বাল্যবিবাহ, লয়তত্ত্ব, নিরামিষ-আমিষ আহার ইত্যাদি ব্যাপার নিয়ে তিনিও সমান তালে চন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে দ্বৈরথে প্রবৃত্ত হলেন। কিন্তু তার কোন প্রয়োজন ছিল না। চন্দ্রনাথের মানসিক একগুঁয়েমি ও যুক্তিহীনতার ঋজুতাকে

নমনীয় করতে গিয়ে তিনি অনর্থক কালিকলম ও সময়ের অপব্যয় করেছেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রকে তিনি বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। তাই তাঁকে বিপরীত পথের প্রতি কিছু অনুকূল হতে দেখে সাভিমানে বললেন, "বঙ্কিমবাবু যে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন ও শশধর তর্কচূড়ামণির ধুয়া ধরিয়া হিন্দুধর্মের পক্ষপাতী হইয়াছেন একথা মুহূর্তকালের জন্যও প্রণিধানযোগ্য নহে।" ('সাধনা', পৌষ, ১২৯৮)

বঙ্কিমচন্দ্র তখন কোঁতের ধ্রুববাদের বিশেষ ভক্ত এবং কোঁৎ ও গীতার সমীকরণের জন্য অতিশয় ব্যস্ত। এই নিয়ে প্রথমে ব্রাহ্মসমাজ ও বঙ্কিমের মধ্যে বিরোধের সূচনা হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের কোঁৎকে হিন্দু বানাবার প্রচেষ্টা 'তত্ত্ববোধিনী'র সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথের বিশেষ প্রীতিকর হয়নি। এই পত্রে দ্বিজেন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের কোঁৎ-সংক্রান্ত মতের প্রখর সমালোচনা করলেন। ফলে হিন্দুসম্প্রদায়ের মুখপত্র 'বঙ্গবাসী' এবং ব্রাহ্মমতের মুখপত্র 'সঞ্জীবনী'তে হিন্দু ও ব্রাহ্মদের মধ্যে কলহ ঘনিয়ে এল। ১২৯১ সালে দ্বিজেন্দ্রনাথ 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সম্পাদক এবং রবীন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক হলেন। ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ চন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে হিন্দুধর্ম নিয়ে বাদপ্রতিবাদ করলেও বঙ্কিমচন্দ্রের মতের সাক্ষাৎভাবে প্রতিবাদ করেন নি। কিন্তু 'প্রচার' ও 'নবজীবন'-এ বঙ্কিমের নব্য হিন্দুধর্ম-বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে রবীন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক হিসাবেই সেই মতামতের প্রতিবাদ আবশ্যিক কর্তব্য বলে মনে করলেন। বঙ্কিমচন্দ্র 'প্রচার'-এর প্রথম সংখ্যায় 'হিন্দুধর্ম' নামক প্রবন্ধে প্রকৃত হিন্দুধর্মের তাৎপর্য ব্যাখ্যার চেষ্টা করেন। সেখানে তিনি বলেন যে, যে হিন্দু শুধু পূজাপাঠ বারব্রত উপবাস প্রভৃতি স্মার্তকৃত্য করে, কিন্তু মানুষের মহৎ ধর্ম ত্যাগ করে নীচতার আশ্রয় নেয়, সে হিন্দুই নয়। কিন্তু আর একজন হিন্দুর প্রসঙ্গে তিনি বললেন—

"আর একটি হিন্দুর কথা বলি। তাঁহার অভক্ষ্য প্রায় কিছুই নাই। যাহা অস্বাস্থ্যকর, তাহা ভিন্ন সকলই খান।...যে কোন জাতির অন্ন

গ্রহণ করেন। যবন ও ম্লেচ্ছের সঙ্গে একত্র ভোজনে কোন আপত্তি করেন না। সন্ধ্যাআহ্নিক ক্রিয়াকর্ম কিছুই করেন না। কিন্তু কখন মিথ্যা কথা কহেন না। যদি মিথ্যা কথা কহেন, তবে মহাভারতীয় কৃষ্ণোক্তি স্মরণপূর্বক যেখানে লোকহিতার্থে মিথ্যা নিতান্ত প্রয়োজনীয় —অর্থাৎ যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়, সেইখানেই মিথ্যা কথা কহিয়া থাকেন।"—('প্রচার')

বলা বাহুল্য এই মত অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ও ঔদার্যব্যঞ্জক। এতে যথার্থতঃ আপত্তি হবার কথা নয়। বঙ্কিমচন্দ্র ঊনবিংশ শতাব্দীর যুগপুরুষ ; এখানে সেই যুগধর্মেরই জয় ঘোষিত হয়েছে। পুঁথির চেয়ে প্রাণ বড়, স্মার্তকৃত্যের চেয়ে মানবকৃত্য শ্রেষ্ঠ—এই কথাটাকে বঙ্কিম নতুন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করলেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রশংসার্হ। কিন্তু আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক তরুণবয়স্ক রবীন্দ্রনাথ এই মন্তব্যের মধ্যেও ত্রুটি আবিষ্কার করলেন। তিনি এর প্রতিবাদে 'একটি পুরাতন কথা' নামক প্রবন্ধে বলতে চাইলেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র এই অযৌক্তিক উক্তির দ্বারা সত্যকারের ধর্ম ও নীতির মূলে ছিদ্র খনন করতে ব্রতী হয়েছেন। অসত্য, অন্যায়, অসদাচরণ, পাপ—কোন অবস্থাতেই সহনীয় নয়, সদিচ্ছা থাকলেও নয়। তাঁর বাঁকা মন্তব্য লক্ষণীয়—"কোনখানেই মিথ্যা সত্য হয় না ; শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিমবাবু বলিলেও হয় না। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিলেও হয় না।" ('ভারতী', অগ্রহায়ণ, ১২৯১)। তাঁর এই অবিনয়ী উক্তির ফলে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর কিছুকাল মনকষাকষি চলেছিল। অবশ্য এই তর্ক-বিতর্কে প্রবীণ বঙ্কিমচন্দ্র যে স্নিগ্ধ ক্ষমাসুন্দর ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন, যুবক রবীন্দ্রনাথের তীব্র উক্তিতে সেরূপ ঔদার্য প্রকাশিত হয়নি। ধর্মকলহের উত্তাপ একদা রবীন্দ্রনাথকে অসতর্ক ও অসহিষ্ণু করে তুলেছিল। সেই অসহিষ্ণুতা তাঁর আক্রমণোদ্যত ভাষায় প্রকট হয়ে পড়ল—"আমাদের দেশের প্রধান লেখক প্রকাশ্য-ভাবে, অসঙ্কোচে, নির্ভয়ে, অসত্যকে সত্যের সহিত একাসনে বসাইয়াছেন, সত্যের পূর্ণ সত্যতা অস্বীকার করিয়াছেন, এবং দেশের

সমস্ত পাঠক নীরবে নিস্তব্ধভাবে শ্রবণ করিয়া গিয়াছেন।...একথা কেহ ভাবিতেছেন না যে, যে সমাজে প্রকাশ্যভাবে কেহ ধর্মের মূলে কুঠারাঘাত করিতে সাহস করে, সেখানে ধর্মের মূল না জানি কতখানি শিথিল হইয়া গিয়াছে। আমাদের শিরার মধ্যে মিথ্যাচরণ ও কাপুরুষতা যদি রক্তের সহিত সঞ্চালিত না হইত, তাহা হইলে কি অমাদের দেশের মুখ্য লেখক পথের মধ্যে দাঁড়াইয়া স্পর্ধাসহকারে সত্যের বিরুদ্ধে একটি কথা কহিতে সাহস করেন?'' ('ভারতী')। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এই উত্তপ্ত মন্তব্যে একটু ব্যথা পেলেও বিরূপ হন নি। তিনি রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ স্নেহ করতেন, রবীন্দ্রনাথের ওপর বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে তা তিনি জানতেন। তাই তিনি রবীন্দ্রনাথের উদ্ধত আক্রমণের জবাব দিতে গিয়ে বললেন, ''রবীন্দ্রবাবু প্রতিভাশালী সুশিক্ষিত সুলেখক মহৎস্বভাব এবং আমার বিশেষ প্রীতি, যত্ন এবং প্রশংসার পাত্র। বিশেষতঃ তিনি তরুণবয়স্ক। যদি তিনি দুই একটি কথা বেশি বলিয়া থাকেন, তাহা নীরবে শুনাই আমার কর্তব্য। তবে যে কয়পাতা লিখিলাম, তাহার কারণ এই রবির পিছনে একটা বড় ছায়া দেখিতেছি।'' ('প্রচার'—১২৯৯)। এই বড় ছায়াটি—আদি ব্রাহ্মসমাজ। উনিশ শতকের ধর্মকলহ রবীন্দ্রনাথের শান্তস্নিগ্ধ চিত্তকে কতটা উত্তেজিত করেছিল, এই প্রসঙ্গে তার সাক্ষাৎ মিলবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে বাঙলার রাষ্ট্র ও সমাজজীবনে দুর্যোগের মেঘ ঘনিয়ে আসছিল, বিংশ শতাব্দীর আরম্ভের আগেই বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা তৈরী হয়েছিল, হিন্দুমুসলমানের বিরোধের বীজও জলসিঞ্চিত হচ্ছিল। রবীন্দ্রনাথ সমকালীন রাজনৈতিক উত্তেজনার মাদকরসে যে কি পরিমাণে মেতে উঠেছিলেন, এই সময়কার গদ্যপ্রবন্ধে তার পরিচয় মিলবে। উনিশ শতকের সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্মান্দোলনের উচ্চকিত কোলাহলে তাঁর মত আত্মতন্ত্রী গীতিকবিও হাটের পথে নেমেছিলেন; দৈনন্দিন জীবনের ধূলিবালি স্পর্শ করে যুবক রবীন্দ্রনাথ গত শতাব্দীর নবজাগরণের

সমস্ত তরঙ্গাভিঘাতকে নিজের চিত্ততটে সহ্য করেছিলেন, স্বীকার করেছিলেন। কবিতায় তিনি বলেছেন—

"এবার ফিরাও মোরে, লয়ে যাও সংসারের তীরে
হে কল্পনে রঙ্গময়ী। দুলায়ো না সমীরে সমীরে
তরঙ্গে তরঙ্গে আর, ভুলায়ো না মোহিনী মায়ায়।
বিজন বিষাদঘন অন্তরের নিকুঞ্জচ্ছায়ায়
রেখো না বসায়ে আর।"

সত্যই তিনি উনিশ শতকের সংসারের তীরে উপনীত হয়েছেন, অন্তরের নিকুঞ্জচ্ছায়াকে ক্ষণকালের জন্য পরিত্যাগ করে মানব-যাত্রায় সাগ্রহে যোগ দিয়েছেন। তদানীন্তন ইতিহাসের মধ্যেই তাঁর শতাব্দী-চেতনার যথার্থ স্বরূপ অনেকটা স্পষ্ট হবে।

পঞ্চভূত

কাজী আবদুল ওদুদ

সাহিত্য ও সংস্কৃতির এক স্মরণীয় পরিবেশে রবীন্দ্রনাথ ছেলে-বেলা থেকে বেড়ে ওঠেন—'জীবনস্মৃতি'র পাঠকরা তা জানেন। সুপরিচিত 'রবীন্দ্র-জীবনী'তে উল্লিখিত হয়েছে, কবির গাজীপুর থেকে ফেরার পরে—গাজীপুরের সঙ্গে তাঁর 'মানসী' কাব্যরচনা বিশেষ ভাবে জড়িত—তাঁর মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ীতে সাহিত্যের মজলিস প্রায়ই বসতো, তার ফলে 'পারিবারিক স্মৃতি' নামক আলোচনার খাতায় সমাগত সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিকদের নানা ধরনের চিন্তা মন্তব্য বাদ-প্রতিবাদ জমে ওঠে। এই 'পারি-বারিক স্মৃতি' পরে রবীন্দ্রনাথের হাতে হয়ে ওঠে 'পঞ্চভূতের ডায়ারি' বা 'পঞ্চভূত'। 'পারিবারিক স্মৃতি'তে যাঁরা লিখেছিলেন তাঁদের মধ্যে 'রবীন্দ্র-জীবনী'তে উল্লিখিত হয়েছে এঁদের নামঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, হিতেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ, লোকেন পালিত, প্রমথ চৌধুরী ও যোগেন্দ্র চৌধুরী। 'রবীন্দ্র-জীবনী'তে আরো উল্লিখিত হয়েছে, শিলাইদহে, এবং একবার রাজসাহীতে, লোকেন পালিতের বাসায় এমন সাহিত্যিক মজলিস জমেছিল, তাতে বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছিলেন নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়—এঁর নামে পঞ্চভূত উৎসর্গ করা হয়—আর রাজসাহীর বিখ্যাত ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

কিন্তু এইসব সাহিত্য-মজলিসের মজলিসীদের মধ্যে পঞ্চভূতে পাওয়া যাচ্ছে মাত্র পাঁচজনকে বা পাঁচ 'ভূত'কে, কবি তাঁদের মধ্যে ষষ্ঠ ভূত বা ভূতনাথ। আর এই 'ভূত'দের মধ্যে আছেন দুইজন নারী। তাঁরা কে হতে পারেন সে সম্বন্ধে কেউ কিছু বলেছেন কিনা জানি না। অনুমান করা যেতে পারে এঁদের মধ্যে দীপ্তি হচ্ছেন

কাদম্বরী দেবী আর স্রোতস্বিনী হচ্ছেন ইন্দিরা দেবী। কাদম্বরী দেবী অবশ্য এর কয়েক বৎসর পূর্বে লোকান্তরিতা হন। কিন্তু রবীন্দ্র-মানসে তিনি ছিলেন অবিস্মরণীয়া। তাঁর যেটুকু পরিচয় পাওয়া গেছে তা থেকে বোঝা যায় তেজের অংশ তাঁর চরিত্রে বেশ ছিল। ইন্দিরা দেবীর বয়স অবশ্য এ সময়ে অল্প। তবে এই বয়সেই কবির সাহিত্যিক জীবনে তাঁর স্থান লাভ হয়েছিল। আর তাঁকে যাঁরা দেখেছেন তাঁরা জানেন কত মধুরস্বভাবা তিনি ছিলেন।

'পঞ্চভূত'-এর পাঁচভূতের মধ্যে শ্রীযুক্ত ব্যোম যে দ্বিজেন্দ্রনাথকে স্মরণ করিয়ে দেয় তা হয়ত অনেকেই স্বীকার করবেন। শ্রীযুক্ত সমীর খুব সম্ভব লোকেন পালিত। প্রমথ চৌধুরীর আদলও যে তাঁতে মাঝে মাঝে না দেখা যায় তা নয়, তবে এ সময়ে চৌধুরী মশায়ের বয়স ছিল অল্প। শ্রীযুক্ত ক্ষিতি যে কে, অর্থাৎ কার সঙ্গে তাঁর চরিত্র মেলে, তা অনুমান করা কঠিন। সত্যেন্দ্রনাথ বা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে নন তা সহজেই বোঝা যায়, কেন না, ক্ষিতি বাস্তববাদী কিছু বেশী—অবশ্য সেই সঙ্গে তীক্ষ্ণবুদ্ধিও। প্রিয়-নাথ সেন, নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়, ঐতিহাসিক অক্ষয়-কুমার মৈত্রেয়, এঁদের কেউ ক্ষিতির রূপ পেয়েছেন কিনা তা ভাবা যেতে পারে।

কিন্তু এই গোড়ার কথাটা ভুললে চলবে না যে পঞ্চভূতের কোনো 'ভূত'ই বাস্তব মানুষের প্রতিচ্ছবি নয়। এসম্বন্ধে কবির উক্তি স্পষ্ট—

> "পাঠকের এজলাসে লেখকের একটা ধর্মশপথ আছে যে, সত্য বলিব। কিন্তু সে সত্য বানাইয়া বলিব।...আমি তোমাদের মুখে কথা বানাইয়া দিব।"

অন্যভাবে বলা যায়, পঞ্চভূতের এক একটি 'ভূত' এক একটি দৃষ্টিভঙ্গির প্রতীক। আর সেইসব দৃষ্টিভঙ্গি কবির বন্ধু ও পরিচিতদের দৃষ্টিভঙ্গিই নয়, অশেষ বৈচিত্র্যে যাঁর সুগভীর আনন্দ সেই কবিরও সে-সবের প্রতি সহানুভূতি কম নয়।

পঞ্চভূত লেখা হয় 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা'র যুগে। এর নিবন্ধ-গুলোর সমসাময়িক হচ্ছে বিশ্বনৃত্য, ঝুলন, হৃদয়-যমুনা, বিদায়-অভিশাপ, বসুন্ধরা, এবার ফিরাও মোরে, অন্তর্যামী, সাধনা, রবীন্দ্র-নাথের এইসব বিখ্যাত কবিতা—যেগুলোতে তাঁর পরিণত কবি-প্রতিভার এক উজ্জ্বল পরিচয় রয়েছে। তাঁর এই পরিণত প্রতিভারই আর এক উজ্জ্বল পরিচয় বহন করছে তাঁর 'পঞ্চভূত'।

রবীন্দ্রনাথ কবি ও সংগীতকাররূপে বেশী আদৃত। তাঁর গদ্যও যে এক অসাধারণ সৃষ্টি, পাঠকরা সে সম্বন্ধে সাধারণত অমনোযোগী কিন্তু বাস্তবিকই রবীন্দ্রনাথ একজন শ্রেষ্ঠ গদ্যলেখক—বাংলা সাহিত্যে যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ গদ্যলেখক একটু অবধান করলেই তা বোঝা যায়। আর 'পঞ্চভূত' তার গদ্যরচনাগুলোর মধ্যে প্রথম সারের।

কবিতার প্রকৃত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> "কিছু-একটা বুঝাইবার জন্য কেহ তো কবিতা লেখে না। হৃদয়ের অনুভূতি কবিতার ভিতর দিয়া আকার ধারণ করিতে চেষ্টা করে।"

কাব্য সম্বন্ধে অনেকেই এই ধরনের কথা বলেছেন। কিন্তু গদ্যের প্রকৃতি কিছু স্বতন্ত্র। বলা যেতে পারে 'বুঝাইবার চেষ্টা' গদ্যের প্রাণ। অবশ্য সাহিত্যিক রচনার একটা প্রধান লক্ষণ এই যে তা হৃদয়গ্রাহী হয়—গদ্যসাহিত্যে একই সঙ্গে থাকা চাই হৃদয়গ্রাহিতা আর বিচারের শক্তি। হৃদয়গ্রাহিতার সঙ্গে বিচারের ক্ষমতার যত সুষ্ঠু যোগ ঘটে ততই গদ্যসাহিত্যের মর্যাদা বাড়ে। পঞ্চভূতে একই সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে অসাধারণ হৃদয়গ্রাহিতা আর অসাধারণ বিচারের শক্তি।

এই কালে Amiel's Journal কবি বিশেষ মনোযোগ দিয়ে পড়েন। Amiel গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন, সেই সঙ্গে প্রকাশসামর্থ্যও তাঁর অনন্যসাধারণ। হতে পারে চিন্তার ব্যাপকতা ও পরিচ্ছন্নতা-লাভের ক্ষেত্রে Amiel থেকে কবি বিশেষ সাহায্য পেয়েছিলেন। তবে, মোটের উপরে Amiel দার্শনিক ও মরমী আর রবীন্দ্রনাথ

তীক্ষ্ণচেতনাসম্পন্ন মানবদরদী সাহিত্যকার—চিত্তের সচেতনতার সঙ্গে প্রকাশের লালিত্য তাঁর রচনার, বিশেষ করে এই রচনাটির ভূষণ।

পঞ্চভূতে ষোলোটি নিবন্ধ স্থান পেয়েছে। এর সবগুলোই 'সাধনা'য় প্রকাশিত হয়—প্রথমটি ১২৯৯ সালের মাঘের সংখ্যায় আর শেষেরটি ১৩০২ সালের ভাদ্রের সংখ্যায়। মাঝে এক বৎসর এঁর কোনো লেখা 'সাধনা' বা অন্য কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। এই লেখাগুলো পরে পরে কিছু কিছু মাজা-ঘষা করা হয়েছিল—তা জানা যাচ্ছে। তবে মোটের উপরে সেই মাজা-ঘষা তেমন উল্লেখযোগ্য নয় বলেই মনে হয়।

আমরা বলেছি বিভিন্ন 'ভূতে'র অর্থাৎ চরিত্রের মুখে যে সব কথা বলা হয়েছে সে সব যত বিচিত্রই হোক কবির সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত নয়। এর পরিচয় রয়েছে এই রচনাটির সর্বত্র। এর ফলে চিন্তার বৈচিত্র্য, জীবনের বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্বন্ধে চেতনা, এসব এতে যেমন প্রকাশ পেয়েছে তেমনি প্রকাশ পেয়েছে বলার ভঙ্গির মাধুর্যও। রম্যরচনা বিচারের তীক্ষ্ণতা আর জীবনমুখিতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে কত রম্য হতে পারে 'পঞ্চভূত' আমাদের সাহিত্যে তার এক বড় নিদর্শন হয়ে আছে ও থাকবে।

এতে যে-সব চিন্তা বা চিন্তা-বীজ সহজেই চোখে পড়ে তার কিছু কিছু পরিচয় নিতে চেষ্টা ক'রে পাঠকদের সঙ্গে এটি উপভোগ করা যাক।

প্রথম লেখাটির নাম 'পরিচয়'। বিভিন্ন ভূতের চরিত্রের বা দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় এতে কবি দিয়েছেন। ক্ষিতির পরিচয় যা দিয়েছেন তা সংক্ষেপে এইঃ ক্ষিতি বাস্তববাদী ; যা প্রত্যক্ষ, যা কাজে লাগাতে পারেন, তাকেই তিনি সত্য বলে জানেন ; তার বাইরে সত্য যদি থাকে তবে তার প্রতি শ্রদ্ধা তাঁর নেই। কেন নেই সেই যুক্তি তিনি দেখিয়েছেন এই ভাবে—

"যে সকল জ্ঞান অত্যাবশ্যক তারই ভার বহন করা যথেষ্ট কঠিন। এই

বোঝা ভারি হয়েই চলেছে, কেননা শিক্ষা ক্রমেই দুঃসাধ্য হয়ে উঠছে। সেইজন্য বর্তমানে শৌখিন শিক্ষার প্রয়োজন নেই। আর এই কারণে সভ্যতা থেকে অলঙ্কার প্রতিদিনই খসে পড়ছে—উন্নতির অর্থ দাঁড়াচ্ছে আবশ্যকের সঞ্চয় আর অনাবশ্যকের পরিহার।”

ক্ষিতির যুক্তি যে উড়িয়ে দেবার মতো নয় তা সহজেই চোখে পড়ে। সভ্যতায় যে দিন দিন আবশ্যকের উপরে বেশী জোর দেওয়া হচ্ছে তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এই অনেকখানি গোড়াশক্ত যুক্তির সামনে শ্রীমতী স্রোতস্বিনী শুধু জানালেন তাঁর অন্তরের আপত্তি। তাঁর বক্তব্যের মর্ম এই—

“অনাবশ্যককে আমরা ভালবাসি, তাই অনাবশ্যকও আবশ্যক। অনাবশ্যকের দ্বারা আমাদের আর কোনো উপকার হয় না কেবল তা উদ্রেক করে আমাদের ভালবাসা আমাদের করুণা আমাদের স্বার্থবিসর্জনের স্পৃহা। এই ভালবাসা বাদ দিয়ে তো আমরা জীবনে চলতে পারি না।”

ক্ষিতির কাছে স্রোতস্বিনীর এই যুক্তি অগ্রাহ্য, তবু স্রোতস্বিনীর হৃদয়ের কথা তাঁকে স্পর্শ করলো। সমীর স্রোতস্বিনীর বক্তব্য আর একটু জোরালো করলেন এই যুক্তি দিয়ে—

“জড়ের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ গভীর কিন্তু মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধটা তার চাইতেও বড়। সেইজন্য বস্তুবিজ্ঞান শিক্ষা করলেই মানুষের চলে না, লোকব্যবহার বিশেষ করে মানুষকে শিখতে হয়। কিন্তু যেগুলি জীবনের অলঙ্কার, যা কমনীয়, যা কাব্য সেইগুলি মানুষের মধ্যে যথার্থ বন্ধন স্থাপন করে। পরস্পরের হৃদয়ের ক্ষত আরোগ্য করে, চোখের দৃষ্টি খুলে দেয়। সে সব বাদ দিয়ে মানুষের চলেই না।”

ব্যোম তাত্ত্বিক—জীবনের তত্ত্বের দিকটার অর্থই তাঁর কাছে বেশী। তিনি মন্তব্য করলেন—

“যা অনাবশ্যক তাই মানুষের পক্ষে সর্বাপেক্ষা আবশ্যক। অত্যাবশ্যককেই যদি মানব-সভ্যতার সিংহাসনে রাজা করে বসানো হয়, তার উপরে যদি

আর কোনো সম্রাটকে স্বীকার না করা হয় তবে সে সভ্যতাকে সর্বশ্রেষ্ঠ সভ্যতা বলা যায় না।"

এই সব দৃষ্টিভঙ্গির প্রত্যেকটির মধ্যেই যে মূল্যবান সম্পদ আছে তা বুঝতে বেগ পেতে হয় না। কবি এইসব দৃষ্টিভঙ্গির সামঞ্জস্য সাধন করলেন এই ভাবে—

"জড়ের থেকে পালিয়ে তপোবনে মনুষ্যত্বের মুক্তি সাধনের চেষ্টা না করে জড়কে ক্রীতদাস করতে পারলে মানুষের একটা বড় রকমের লাভ হয়। স্থায়ীরূপে জড়ের বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে আধ্যাত্মিক সভ্যতায় উপনীত হতে হলে মাঝখানে একটা দীর্ঘ বৈজ্ঞানিক সাধনা অতিবাহন করা নিতান্ত আবশ্যক।"

কবির এই সিদ্ধান্ত যে তাঁর 'ভূত'রা মেনে নিলেন তা নয়। তবে একটা ব্যাপারকে যে কত বিভিন্ন দিক থেকে দেখা যায়, এবং দেখা যায় সার্থক ভাবে—শুধু তার্কিকের ভঙ্গিতে নয়, তা বোঝা গেল।

এই আলোচনা করতে গিয়ে কবি আর একটি দিক সম্বন্ধেও সচেতন হয়েছেন। সেটিকে বলা যায় ডায়ারি রাখার দোষের দিক। মোটের উপর তা সাহিত্য-চর্চারই দোষের দিক। কবির বক্তব্য এই—

"আমাদের প্রতিদিনের জীবনে অনেক দুঃখ অনেক উত্তেজনা দেখা দেয়, কিন্তু কালে কালে সে সব আমাদের মন থেকে দূর হয়ে যায়, জীবনের বাড়াবাড়িগুলো চুকে গিয়ে জীবনের মোটামুটিটুকু টিকে যায়। সেইটিই স্বাভাবিক জীবন। কিন্তু সাহিত্যে আমাদের মনের অনেক অর্ধস্ফুট কথাকে অতিস্ফুট করে তোলা হয়। তাতে মনের সৌকুমার্য নষ্ট হয়ে যায়।"

একালের সাহিত্যের অতি-বিশ্লেষণী প্রবণতার দিকে কবি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। প্লেটো যে যে কারণে কবিকে তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রে স্থান দিতে চাননি সেই ধরনের ব্যাপারের দিকেও তিনি এখানে ইঙ্গিত করেছেন মনে হয়। কিন্তু সেই জটিল সমস্যার সমাধান কি সেই বিষয়টা কবি এই আলোচনাটিতে এড়িয়ে গেছেন। তবে

পঞ্চভূতের শেষের দিকে অন্য একটি লেখায় তার উল্লেখ করেছেন এই ভাবে—

"সাহিত্য-আলোচনায় আমরা কোনো স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হই না। নিউটন বলেছিলেন আমি জ্ঞান-সমুদ্রের কূলে কেবল নুড়ি কুড়িয়েছি, কিন্তু সাহিত্যিকরা তাও বলতে পারেন না, জ্ঞান-সমুদ্রের কূলে তাঁরা খেলা করেন মাত্র। তাতে তাঁদের কোনো রত্নলাভ না হলেও সমুদ্রের হাওয়া খাওয়ার ফলে খানিকটা স্বাস্থ্যলাভ হয়।" কবির ভাষায়—
"যতবার আমাদের সভা বসিয়াছে আমরা শূন্য হস্তে ফিরিয়া আসিলেও আমাদের সমস্ত মনের মধ্যে যে সবেগে রক্ত সঞ্চালন হইয়াছে এবং সে-জন্য আনন্দ ও আরোগ্য লাভ করিয়াছি তাহাতে সন্দেহ নাই।"

সাহিত্যিক আলোচনা সম্বন্ধে কবি এই যে দাবিটুকু করলেন তা দেখতে বা শুনতে খুব জমকালো নয় বলেই কম অর্থপূর্ণ নয়। এর চাইতে বেশী দাবি সাহিত্য-চেষ্টা সম্বন্ধে হয়ত করা যায় না।

'পঞ্চভূতে' বিচারের দিকটাই যে খুব লক্ষণীয় হয়েছে তা নয়, হৃদয়ের দিকটাও এতে মাঝে মাঝে অপূর্ব ভাষা পেয়েছে। এই কালে হৃদয়ের সঙ্গে কবির মস্তিষ্কের যোগ সহজভাবে জোরালো হতে পেরেছিল বলে প্রকাশ এমন চিত্তগ্রাহী হয়েছিল। এ সম্পর্কে আমরা দুটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করবো—একটি পল্লীগ্রামের মানুষদের সম্বন্ধে তিনি যা বলেছেন; অপরটি, আধুনিক সাহিত্যে নতুন সম্ভাবনা তিনি যা দেখেছেন। পল্লীর মানুষদের সম্বন্ধে তাঁর নিজের ভাষায় তাঁর বক্তব্য এই—

"আমি এখন বাংলাদেশের এক প্রান্তে যেখানে বাস করিতেছি এখানে কাছাকাছি কোথাও পুলিশের থানা, ম্যাজিস্ট্রেটের কাছারি নাই। রেলোয়ে ষ্টেশন অনেকটা দূরে।...এখানকার মানুষগুলি এমনি অনুরক্ত ভক্তস্বভাব এমনি সরল বিশ্বাসপরায়ণ যে মনে হয় আডাম ও ইভ জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইবার পূর্বেই ইহাদের বংশের আদি পুরুষকে জন্মদান করিয়াছিলেন।...এই সমস্ত স্নিগ্ধ হৃদয়াশ্রমে যখন বাস করিতেছি এমন সময়ে আমাদের পঞ্চভূত সভার কোনো একটি সভ্য

আমাকে কতকগুলি খবরের কাগজের টুকরা কাটিয়া পাঠাইয়া দিলেন। পৃথিবী যে ঘুরিতেছে, স্থির হইয়া নাই, তাহাই স্মরণ করাইয়া দেওয়া, তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি লন্ডন হইতে, প্যারিস হইতে গুটিকতক সংবাদের ঘূর্ণা বাতাস সংগ্রহ করিয়া ডাকযোগে এই জলনিমগ্ন শ্যাম-সুকোমল ধান্যক্ষেত্রের মধ্যে পাঠাইয়া দিয়াছেন। এক প্রকার ভালোই করিয়াছেন। কাগজগুলি পড়িয়া আমার অনেক কথা মনে উদয় হইল যাহা কলিকাতায় থাকিলে আমার ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম হইত না। আমি ভাবিতে লাগিলাম, এখানকার এই যে সমস্ত নিরক্ষর নির্বোধ চাষাভুষার দল—থিওরিতে আমি ইহাদিগকে অসভ্য বর্বর বলিয়া অবজ্ঞা করি, কিন্তু কাছে আসিয়া প্রকৃতপক্ষে আমি ইহাদিগকে আত্মীয়ের মতো ভালোবাসি। এবং ইহাও দেখিয়াছি আমার অন্তঃকরণ গোপনে ইহাদের প্রতি একটি শ্রদ্ধা প্রকাশ করে।...কেন আমি ইহাদিগকে শ্রদ্ধা করি তাই ভাবিয়া দেখিতেছিলাম। দেখিলাম ইহাদের মধ্যে যে একটি সরল বিশ্বাসের ভাব আছে তাহা অত্যন্ত বহুমূল্য। এমন কি তাহাই মনুষ্যত্বের চিরসাধনার ধন।...সরলতাই মনুষ্যপ্রকৃতির স্বাস্থ্য।"

কবি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন তার সবটাই যে সবাই স্বীকার করে নেবেন তা ভাবা যায় না, কেন না, অসন্তোষ, জটিলতা, এ সবের দিকে মানুষের একটা দুর্নিবার গতি রয়েছে। কবিও যে সে সম্বন্ধে সচেতন তা আমরা দেখবো। কিন্তু এখানে যে শ্রদ্ধার প্রশ্ন তুলেছেন সেটি এক মহামূল্য ব্যাপার। আমাদের দেশের অজ্ঞ মূর্খ জন-সাধারণকে তাদের অকৃত্রিম সরলতার জন্য কবি যে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতে পেরেছিলেন, সেই শ্রদ্ধাই তাঁর সাহিত্যিক জীবনে নতুন শক্তি ও শ্রী সঞ্চার করেছিল—তাঁর অপূর্ব 'গল্পগুচ্ছ'র মূলের সন্ধান আমরা এখানে পাচ্ছি। বাস্তবিক শ্রদ্ধা চিরদিনই বিশেষভাবে সৃষ্টিধর্মী হয়েছে। প্রাক্‌বিপ্লব রাশিয়ায় টলস্টয় ডস্টয়েভ্‌স্কি টুর্গেনিভ প্রমুখ সাহিত্যিকরা যে অমর সাহিত্য সৃষ্টি করতে পেরে-ছিলেন তার মূলেও ছিল রাশিয়ার মূর্খ ও দুঃস্থ জনসাধারণের প্রতি তাঁদের সীমাহীন শ্রদ্ধা।

কিন্তু এতখানি শ্রদ্ধা সত্ত্বেও আমাদের দেশের সর্বসাধারণের জীবনধারায় দুর্বলতা কোথায় সে সম্বন্ধে কবি চেতনা হারান নি। এই লেখাটির শেষের দিকে তিনি বলছেন—

"য়ুরোপে সম্প্রতি যে এক নব সভ্যতার যুগ আবির্ভূত হইয়াছে এ যুগে ক্রমাগতই নব নব বিজ্ঞান মতামত স্তূপাকার হইয়া উঠিয়াছে ; যন্ত্র-তন্ত্র উপকরণসামগ্রীতেও একেবারে স্থানাভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অবিশ্রাম চাঞ্চল্যে কিছুই পুরাতন হইতে পাইতেছে না।—কিন্তু দেখিতেছি এই সবের আয়োজনের মধ্যে মানব-হৃদয় কেবলই ক্রন্দন করিতেছে, য়ুরোপের সাহিত্য হইতে সহজ আনন্দ সরল শান্তির গান একেবারে নির্বাসিত হইয়া গিয়াছে।...তাহার কারণ মানব-হৃদয় যতক্ষণ এই বিপুল সভ্যতা-স্তূপের মধ্যে একটি সুন্দর ঐক্যস্থাপন করিতে না পারিবে ততক্ষণ কখনোই ইহার মধ্যে আরামে ঘরকন্না পাতিয়া প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না।...

"তাই বলিয়া আমি এমন অন্ধ নহি যে য়ুরোপীয় সভ্যতার মর্যাদা বুঝি না।...যাহারা মনুষ্য প্রকৃতিকে ক্ষুদ্র ঐক্য হইতে মুক্তি দিয়া বিপুল বিস্তারের দিকে লইয়া যায় তাহারা অনেক অশান্তি অনেক বিঘ্নবিপদ সহ্য করে, বিপ্লবের রণক্ষেত্রের মধ্যে তাহাদিগকে অশ্রান্ত সংগ্রাম করিতে হয়—কিন্তু তাহারাই পৃথিবীর মধ্যে বীর এবং তাহারা যুদ্ধে পতিত হইলেও অক্ষয় স্বর্গলাভ করে।...

"আমি এই পল্লীপ্রান্তে বসিয়া আমার সাদাসিধা তানপুরার চারটি তারের গুটিচারেক সুন্দর সুরসম্মিশ্রণের সহিত মিলাইয়া য়ুরোপীয় সভ্যতাকে বলিতেছি তোমার সুর এখনো ঠিক মিলিল না এবং তানপুরাটিকেও বলিতে হয়, তোমার ঐ গুটিকয়েক সুরের পুনঃপুনঃ ঝংকারকেও পরিপূর্ণ সংগীত জ্ঞান করিয়া সন্তুষ্ট হওয়া যায় না। বরঞ্চ আজিকার ঐ বিচিত্র বিশৃংখল স্বরসমষ্টি কাল প্রতিভার প্রভাবে মহাসংগীতে পরিণত হইয়া উঠিতে পারে, কিন্তু হায়, তোমার ঐ কয়েকটি তারের মধ্য হইতে মহৎ মূর্তিমান সংগীত বাহির করা প্রতিভার পক্ষেও দুঃসাধ্য।"

'মনুষ্য' নামক লেখাটিতে স্রোতস্বিনীর মুখে একালে সাহিত্যের নতুন দিক্-পরিবর্তনের সম্ভাবনা সম্বন্ধে যে কথা কবি বলেছেন তাতে একই সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর গভীর হৃদয়বত্তা আর মনের সচেতনতা। সেই উক্তির শেষ অংশটি আমরা উদ্ধৃত করছি—

> ..."যখন ভাবিয়া দেখি এমন অসংখ্য লোক আছে যাহাদের দুঃখকষ্ট যাহাদের মনুষ্যত্ব আমাদের কাছে যেন অনাবিষ্কৃত ; যাহাদিগকে আমরা কেবল ব্যবহারে লাগাই এবং বেতন দিই, স্নেহ দিই না, সান্ত্বনা দিই না, শ্রদ্ধা দিই না, তখন বাস্তবিকই মনে হয় পৃথিবীর অনেকখানি যেন নিবিড় অন্ধকারে আবৃত, আমাদের দৃষ্টির একেবারে অগোচর। কিন্তু এই অজ্ঞাতনামা দীপ্তিহীন দেশের লোকেরাও ভালবাসে এবং ভালবাসার যোগ্য। আমার মনে হয়, যাহাদের মহিমা নাই, যাহারা একটা অস্বচ্ছ আবরণের মধ্যে বদ্ধ হইয়া আপনাকে ভালরূপ ব্যক্ত করিতে পারে না, এমন কি, নিজেকেও ভালরূপ চেনে না, মূকমুগ্ধভাবে সুখদুঃখবেদনা সহ্য করে, তাহাদিগকে মানবরূপে প্রকাশ করা, তাহাদিগকে আমাদের আত্মীয়রূপে পরিচিত করাইয়া দেওয়া, তাহাদের উপরে কাব্যের আলো নিক্ষেপ করা আমাদের এখনকার কবিদের কর্তব্য।"

আশ্চর্য এই যে যিনি বহুদিন পূর্বে এইসব কথা লিখেছিলেন এবং তাঁর ছোটগল্পগুলোয় গভীর সহমর্মিতা দিয়ে পল্লীর জীবনের চিত্র এঁকেছিলেন, তাঁকে আমাদের বেশকিছু সংখ্যক সাহিত্যিক বলতে পেরেছিলেন যে, তাঁর রচনায় সমাজের উপরতলার মানুষের কথাই বলা হয়েছে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ উপরতলায় ও নীচেরতলায় সাজিয়ে মানুষকে দেখেন নি। তিনি সহজভাবেই দেখেছিলেন মানুষকে—সুখে-দুঃখে ভালয়-মন্দে মেশা যে মানুষকে সর্বত্র দেখা যায়।

আমরা 'পঞ্চভূত' থেকে যে সব অংশ উদ্ধৃত করলাম, তা থেকে বোঝা যাচ্ছে কবির হৃদয় ও মন হীরকের টুকরার মতো কত বিচিত্র দিকে আলো বিচ্ছুরিত করছে। হয়ত হীরকের সঙ্গে উপমা দেওয়া

ঠিক হলো না। হীরকের দ্যুতিতে তীক্ষ্ণতাই বড় গুণ। কিন্তু এখানে যে আলো দেখ্‌ছি তাতে তীক্ষ্ণতার সঙ্গে স্নিগ্ধতাও যথেষ্ট। সেই তীক্ষ্ণ ও স্নিগ্ধ আলো যার উপর পড়েছে তাকে শুধু প্রকাশ করেনি, মাধুর্যমণ্ডিতও করেছে।

পঞ্চভূতের তিনটি নিবন্ধের উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যান্য লেখা-গুলোর দিকেও তাকানো যাক।

দ্বিতীয় রচনাটির নাম 'সৌন্দর্যের সম্বন্ধ'। জমিদারের কাছারিতে পুণ্যাহের সানাই বাজছিল—সেইটি অবলম্বন ক'রে 'ভূত'রা প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে উৎসব-দিনের সম্পর্ক সম্বন্ধে নানা দিক থেকে আলোচনা করলেন। তা থেকে জড়প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের দেশের লোকেদের সম্পর্কের কথাও এসে পড়লো। সে সম্বন্ধে কবির মন্তব্যের একটি অংশ আমরা উদ্ধৃত করছি। মন্তব্যটি যেমন উপভোগ্য তেমনি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ—

> ..."প্রকৃতির সহিত আমাদের যেন ভাইবোনের সম্পর্ক এবং ইংরাজ ভাবুকের যেন স্ত্রীপুরুষের সম্পর্ক। আমরা জন্মাবধিই আত্মীয়, আমরা স্বভাবতই এক। আমরা তাহার মধ্যে নব নব বৈচিত্র্য, পরিসূক্ষ্ম ভাবচ্ছায়া দেখিতে পাই না, এক প্রকার অন্ধ অচেতন স্নেহে মাখামাখি করিয়া থাকি। আর ইংরাজ, প্রকৃতির বাহির হইতে অন্তরে প্রবেশ করিতেছে। সে আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছে বলিয়াই তাহার পরিচয় এমন অভিনব আনন্দময়, তাহার মিলন এমন প্রগাঢ়তর।... আত্মা অন্য আত্মার সংঘর্ষে তবেই আপনাকে সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিতে পারে, তবেই সে মিলনের আধ্যাত্মিকতা পরিপূর্ণ মাত্রায় মন্থিত হইয়া উঠে। একাকার হইয়া থাকা কিছু না থাকার ঠিক পরেই।... ঐক্য অপেক্ষা মিলনেই আধ্যাত্মিকতা অধিক।"

শেষের চিন্তাটি আমাদের দেশে সাধারণত অপরিচিত; যদিও এর প্রয়োজন আমাদের জন্য খুব বেশী।

তৃতীয় রচনাটির নাম 'নরনারী'। তাতে আমাদের দেশের নর-

নারীর প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার ও চরিত্রের মূল্যায়ন কবি করেছেন এইভাবে—

"আমাদের দেশে পুরুষেরা গৃহপালিত, মাতৃলালিত, পত্নীচালিত। কোনো বৃহৎ ভাব, বৃহৎ কার্য, বৃহৎ ক্ষেত্রের মধ্যে তাহাদের জীবনের বিকাশ হয় নাই; অথচ অধীনতার পীড়ন, দাসত্বের হীনতা-দুর্বলতার লাঞ্ছনা তাহাদিগকে নত শিরে সহ্য করিতে হইয়াছে। তাহাদিগকে পুরুষের কোনো কর্তব্য করিতে হয় নাই এবং কাপুরুষের সমস্ত অপমান বহন করিতে হইয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে স্ত্রীলোককে কখনো বাহিরে গিয়া কর্তব্য খুঁজিতে হয় না, তরুশাখায় ফলপুষ্পের মতো কর্তব্য তাহার হাতে আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়। সে যখনই ভালবাসিতে আরম্ভ করে, তখনই তাহার কর্তব্য আরম্ভ হয়; তখনই তাহার চিন্তা, বিবেচনা, যুক্তি, কার্য, তাহার সমস্ত চিত্তবৃত্তি সজাগ হইয়া উঠে, তাহার সমস্ত চরিত্র উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিতে থাকে। বাহিরের কোনো রাষ্ট্র-বিপ্লব তাহার কার্যের ব্যাঘাত করে না, তাহার গৌরবের হ্রাস করে না, জাতীয় অধীনতার মধ্যেও তাহার তেজ রক্ষিত হয়।"

গ্যেটের 'ভিল্‌হেল্‌ম্‌ মাইস্‌টারে' নারীজীবনের সার্থকতা সম্বন্ধে এই মর্মের কথা আছে।

নারীর এই স্তরে ক্ষিতি কিছু বেসুর যোজনা করলেন এই বলে (অবশ্য দীপ্তি ও স্রোতস্বিনীর অসাক্ষাতে)—

"মেয়েদের ছোট সংসারে সর্বত্রই অথবা প্রায় সর্বত্রই যে মেয়েরা লক্ষ্মীর আদর্শ একথা যদি বলি তবে লক্ষ্মীর প্রতি লাইবেল করা হইবে। তাহার কারণ, সহজ প্রবৃত্তি, যাহাকে ইংরেজিতে ইন্‌স্‌টিংক্‌ট্‌ বলে তাহার ভালো আছে মন্দও আছে। বুদ্ধির দুর্বলতার সংযোগে এই সমস্ত অন্ধ প্রবৃত্তি কত ঘরে কত অসহ্য দুঃখ কত দারুণ সর্বনাশ ঘটায় সেকথা কি দীপ্তি ও স্রোতস্বিনীর অসাক্ষাতেও বলা চলিবে না? দেশের বক্ষে মেয়েদের স্থান বটে, সেই বক্ষে তাহারা মূঢ়তার যে জগদ্দল পাথর চাপাইয়া রাখিয়াছে, সেটাকে সুদ্ধ দেশকে টানিয়া তুলিতে

পারিবে কি। তুমি বলিবে সেটার কারণ অশিক্ষা। শুধু অশিক্ষা নয়, অতি মাত্রায় হৃদয়ালুতা।"

এই অংশটি হয়ত পরবর্তী কালের যোজনা। নারীর হৃদয়ালুতা কাটিয়ে উঠবার প্রয়োজন সম্বন্ধে কবি পরবর্তী কালে কিছু বিস্তারিত আলোচনা করেন তাঁর 'কালান্তরে'র সুবিখ্যাত 'নারী' প্রবন্ধে।

চতুর্থ ও পঞ্চম নিবন্ধ যথাক্রমে 'পল্লীগ্রামে' আর 'মনুষ্য'। এই দুটি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ নিবন্ধ 'মন'। মনোবিহীন প্রাকৃত জীবনে যে উদ্বেগরাহিত্য চোখে পড়ে মানুষের জীবনে সেই সামঞ্জস্য নষ্ট হয়েছে মনের আবির্ভাবের ফলে। এই নিবন্ধে মানব-মনের 'স্বর্গীয় অসন্তোষে'র প্রতি বক্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করা হয়েছে।

সপ্তম নিবন্ধ 'অখণ্ডতা'। এতে মন-সম্পর্কিত আলোচনার জের টানা হয়েছে। এতে ব্যোম মন ও প্রতিভা সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব-কথার অবতারণা করেন। দীপ্তি সেসবের প্রতি শ্লেষবাণ নিক্ষেপ করেন।

অষ্টম নিবন্ধ 'গদ্য ও পদ্য'। এতে আলোচনার প্রধান বিষয়ঃ পদ্য ও গদ্যের মধ্যে সম্বন্ধ কি ধরনের, আর ভাবপ্রকাশের জন্য পদ্যের কোনো আবশ্যক আছে কি না। ব্যোম মন্তব্য করেনঃ পদ্য কৃত্রিম। তাতে সমীর মন্তব্য করেনঃ "কৃত্রিমতাই মানুষের সর্ব-প্রধান গৌরব...অকৃত্রিম ভাষা জলকল্লোলের, অকৃত্রিম ভাষা পল্লব-মর্মরের, কিন্তু মন যেখানে আছে সেখানে বহুযত্নরচিত কৃত্রিম ভাষা।" ছন্দ ও ভাষার যোগ সম্বন্ধে কবি মন্তব্য করলেন—

"ছন্দে এবং ধ্বনিতে যখন হৃদয় স্বতই বিচলিত হইয়া উঠে তখন ভাষার কার্য অনেক সহজ হইয়া আসে।"

নবম নিবন্ধ 'কাব্যের তাৎপর্য'। স্রোতস্বিনী মন্তব্য করেনঃ মানবজীবনের সাধারণ কথাই কবিতার কথা...অত্যন্ত সাধারণ কথা

থাকাতেই সর্বসাধারণে তার রসভোগ করে আসছে। কবি স্রোতস্বিনীর মত সমর্থন করে' বললেন—

"কাব্যের একটা গুণ এই যে, কবির সৃজনশক্তি পাঠকের সৃজনশক্তি উদ্রেক করিয়া দেয়; তখন স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে কেহ বা সৌন্দর্য, কেহ বা নীতি, কেহ বা তত্ত্ব সৃজন করিতে থাকেন।"

দশম নিবন্ধ 'প্রাঞ্জলতা'। দীপ্তি মন্তব্য করলেনঃ ভাল কবিতার ভালত্ব যদি অবহেলে বুঝতে না পারি তবে আমি তার সমালোচনা পড়া আবশ্যক বোধ করি না...অনেক সময় ভাবের দারিদ্র্যকে আচারের বর্বরতাকে সরলতা বলে ভ্রম হয়, অনেক সময় প্রকাশক্ষমতার অভাবকে ভাবাধিক্যের পরিচয় কল্পনা করা হয়। কবি মন্তব্য করলেন—

"কলাবিদ্যায় সরলতা উচ্চ অঙ্গের মানসিক উন্নতির সহচর। বর্বরতা সরলতা নহে। বর্বরতার আড়ম্বর-আয়োজন অত্যন্ত বেশী। সভ্যতা অপেক্ষাকৃত নিরলঙ্কার। অধিক অলঙ্কার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কিন্তু মনকে প্রতিহত করিয়া দেয়।...ভাল সাহিত্যের বিশেষ একটি আকৃতিপ্রকৃতি আছে...কিন্তু তাহার এমন একটি পরিমিত সুষমা যে, আকৃতিপ্রকৃতির বিশেষত্বটাই বিশেষ করিয়া চোখে পড়ে না। তাহার মধ্যে একটা ভাব থাকে, একটা গূঢ় প্রভাব থাকে, কিন্তু কোনো অপূর্ব ভঙ্গিমা থাকে না। তরঙ্গভঙ্গের অভাবে অনেক সময়ে পরিপূর্ণতাও লোকের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়, আবার পরিপূর্ণতার অভাবে অনেক সময়ে তরঙ্গভঙ্গও লোককে বিচলিত করে, কিন্তু তাই বলিয়া এ ভ্রম যেন কাহারও না হয় যে পরিপূর্ণতার প্রাঞ্জলতাই সহজ এবং অগভীরতার ভঙ্গিমাই দুরূহ।"

একাদশ নিবন্ধ 'কৌতুক হাস্য' আর দ্বাদশ নিবন্ধ 'কৌতুক হাস্যের মাত্রা'। ক্ষিতি প্রশ্ন তোলেনঃ কৌতুকে আমরা হাসি কেন, অথবা যে কারণেই হোক হাসি কেন, কেন না, তাঁর মতে, হাসিতে যে মুখভঙ্গি হয় মানুষের মতো ভদ্রজীবের পক্ষে তা একটা অসঙ্গত অসংযত ব্যাপার।

এই বিষয়টির উপরে নানা দিক থেকে আলোক ফেলবার চেষ্টা হয়েছে এই দুটি লেখায়। সিদ্ধান্ত দাঁড়ায়ঃ কৌতুকের মধ্যে নিয়মভঙ্গজনিত একটা পীড়া আছে; সেই পীড়াটা অধিক মাত্রায় না গেলে আমাদের মনে যে একটা সুখকর উত্তেজনার উদ্রেক করে, সেই আকস্মিক উত্তেজনার আঘাতে আমরা হেসে উঠি। এর প্রতিবাদ করে দীপ্তি বলেন—

"চলিতে চলিতে হঠাৎ অল্প হুঁচট খাইলে কিংবা রাস্তায় যাইতে অকস্মাৎ অল্প মাত্রায় দুর্গন্ধ নাকে আসিলে আমাদের হাসি পাওয়া, অন্তত, উত্তেজনা-জনিত সুখ অনুভব করা উচিত।"

তার উত্তরে কবি বলেন—

"জড় প্রকৃতির মধ্যে করুণরসও নাই হাস্যরসও নাই...সচেতন পদার্থ সম্বন্ধীয় খাপছাড়া ব্যাপার ব্যতীত শুদ্ধ জড় পদার্থে আমাদের হাসি আনিতে পারে না।"

ত্রয়োদশ নিবন্ধ 'সৌন্দর্য সম্বন্ধে সন্তোষ'। এতে আলোচনার বাস্তবকে উপেক্ষা করে abstract বিষয়—অর্থাৎ বিমূর্তের দিকে আমাদের যে সাধারণ প্রবণতা সেইটি। এর ফলে নারীসৌন্দর্য বর্ণনায় আমাদের দেশের কাব্যে অদ্ভুত উপমা ব্যবহার করা হয়েছে, অথচ সে অদ্ভুতত্ব সম্বন্ধে চেতনা আমাদের নেই। ব্যোম বললেন, তার কারণ আমরা অন্তরজগদ্বিহারী জাতি; তারও সুবিধার দিক আছে। কিন্তু ব্যোমের কথায় কর্ণপাত না করে সমীর ও ক্ষিতি দেশের লোকদের এই মনোভাবের নিন্দা করেই চললেন। ক্ষিতি বললেন—

"কাল্পনিক সৃষ্টি বিস্তার করিতে পারি বলিয়া অর্থলাভ, জ্ঞানলাভ এবং সৌন্দর্যভোগ সম্বন্ধে আমাদের একটা ঔদাসীন্যজড়িত সন্তোষের ভাব আছে। আমাদের বিশেষ কিছু আবশ্যক নাই। য়ুরোপীয়েরা তাঁহাদের বৈজ্ঞানিক অনুমানকে কঠিন প্রমাণের দ্বারা সহস্রবার পরীক্ষা করিয়া দেখেন তথাপি তাঁহাদের সন্দেহ মিটিতে চায় না—আমরা মনের মধ্যে যদি বেশ একটা সুসংগত এবং সুগঠিত মত খাড়া করিতে পারি

তবে তাহার সুসংগতি এবং সুষমাই আমাদের নিকট সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয়, তাহাকে বহির্জগতে পরীক্ষা করিয়া দেখা বাহুল্য বোধ করি।...এরূপ পরম সন্তোষের অবস্থাকে আমি সুবিধা মনে করি না। ইহাতে কেবল সমাজের দীনতা, শ্রীহীনতা এবং অবনতি ঘটিতে থাকে। বহির্জগৎটাকে উত্তরোত্তর বিলুপ্ত করিয়া দিয়া মনোজগৎকেই সর্বপ্রাধান্য দিতে গেলে যে ডালে বসিয়া আছি সেই ডালকেই কুঠারাঘাত করা হয়।"

চতুর্দশ নিবন্ধ 'ভদ্রতার আদর্শ'। বেশভূষা আচার ব্যবহার ইত্যাদি সম্বন্ধে বাঙালী সমাজের শৈথিল্য ও জড়ত্ব এতে আলোচনার বিষয় হয়েছে। সমীর মন্তব্য করেন—

"সর্বদেশে সর্বকালেই অল্পসংখ্যক মহাত্মা লোক সমাজের মধ্যে থাকিয়াও সমাজের বাহিরে থাকেন, নতুবা তাঁহারা কাজ করিতে পারেন না এবং সমাজও তাহাদের নিকট হইতে সামাজিকতার ক্ষুদ্র শুল্কগুলি আদায় করিতে নিরস্ত থাকে। কিন্তু...আমরা উত্তম মধ্যম অধম সকলেই খাটো ধুতি ও ময়লা চাদর পরিয়া নির্গুণ ব্রহ্মে লয় পাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছি।"

ব্যোম মন্তব্য করলেন—

"বৈরাগ্য ব্যতীত কোনো বৃহৎ কর্ম হইতেই পারে না।...কর্মীকে কর্মের কঠোর নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়, সেই জন্যই সে আপন কর্মের নিয়মপালন উপলক্ষ্যে সমাজের অনেক ছোটখাটো কর্তব্য উপেক্ষা করিতে পারে—কিন্তু অকর্মণ্যের সে অধিকার থাকিতে পারে না...যে বৈরাগ্যের সঙ্গে কোনো মহত্তর সচেষ্ট সাধনা সংযুক্ত নাই তাহা অসভ্যতার নামান্তর মাত্র।"

ব্যোমের মুখে এমন কথা শুনে স্রোতস্বিনী কিছু বিস্ময়বোধ করলেন। ক্ষিতি মন্তব্য করলেন—

"আমরা মনে করি আমরা স্বভাবের শিশু—অতএব অত্যন্ত সরল, ধুলায় কাদায় নগ্নতায় সর্বপ্রকার নিয়মহীনতায় আমাদের কোনো লজ্জা নাই—আমাদের সকলই অকৃত্রিম এবং সকলই আধ্যাত্মিক।"

পঞ্চদশ নিবন্ধ ‘অপূর্ব রামায়ণ’। এতে ব্যোম মন্তব্য করলেন—

“জগতের মধ্যে মৃত্যুই কেবল চিরস্থায়ী—সেইজন্য আমাদের সমস্ত চিরস্থায়ী আশা ও বাসনাকে সেই মৃত্যুর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। আমাদের স্বর্গ, আমাদের পুণ্য, আমাদের অমরতা সব সেইখানে।”

কিন্তু সমীর মন্তব্য করলেন—

“সাহিত্য সংগীত এবং সমস্ত ললিতকলা, মনুষ্যহৃদয়ের সমস্ত নিত্য পদার্থকে মৃত্যুর পরকালপ্রান্ত হইতে ইহজীবনের মাঝখানে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতেছে। বলিতেছে, পৃথিবীকে স্বর্গ, বাস্তবকে সুন্দর এবং এই ক্ষণিক জীবনকেই অমর করিতে হইবে।”

ক্ষিতি বললেন—

“রামায়ণের এক নতুন ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। যারা সীতাকে বনবাস দেবার জন্য রামকে মন্ত্রণা দিয়েছিল তারা ত্যাগ বৈরাগ্যধর্মী ; কিন্তু সীতার দুই পুত্রের রামায়ণ গান শুনে বিরহী রাজার চিত্ত চঞ্চল এবং তাঁর চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠেছে। এখনো উত্তর কাণ্ড সম্পূর্ণ শেষ হয়নি। এখনো দেখবার আছে জয় হয় ত্যাগপ্রচারক প্রবীণ বৈরাগ্য-ধর্মের, না, প্রেমমঙ্গলগায়ক দুটি অমর শিশুর।”

শেষ লেখাটির নাম ‘বৈজ্ঞানিক কৌতূহল’। এতে আলোচনার বিষয় বিজ্ঞানের আদিম উৎপত্তি এবং চরম লক্ষ্য। সিদ্ধান্ত দাঁড়ালোঃ মানুষের কৌতূহলবৃত্তি থেকেই বিজ্ঞানের উৎপত্তি যদিও সে-কৌতূহলের লক্ষ্য বিজ্ঞান ছিল না, যেমন, আলকেমির চর্চা করতে করতে মানুষ কেমিষ্ট্রির অর্থাৎ রসায়নশাস্ত্রের আবিষ্কার করলো। কিন্তু বিজ্ঞানের নিয়মতান্ত্রিকতা মানুষকে খুশী করতে পারে না। সে মনে মনে কামনা করে অদ্ভুতকে, অনিয়মকে, অর্থাৎ স্বাধীন ইচ্ছার কর্তৃত্বকে। সেইজন্য আমাদের ইচ্ছা একটা বিশ্ব-ইচ্ছার, আমাদের প্রেম একটা বিশ্বপ্রেমের নিগূঢ় অপেক্ষা না রেখে বাঁচতে পারে না। এই নিগূঢ় প্রয়োজন থেকেই মানুষের লাভ হয়েছে সৌন্দর্যবোধ প্রেম ও আনন্দ। বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা এসবের সন্ধান পাওয়া সম্ভবপর নয়।

এই সিদ্ধান্তটি যে মহামূল্য একালে তা নতুন করে বোঝা যাচ্ছে, কেন না, একালে চিন্তাশীলদের দৃষ্টি নতুন করে আকৃষ্ট হয়েছে আস্তিকতা প্রেম নৈতিক বোধ মানবজীবনে এই সবের সমূহ প্রয়োজনের দিকে।

পঞ্চভূতের যতটা পরিচয় আমরা পেলাম—এর অনেক মূল্যবান চিন্তার উল্লেখ সম্ভবপর হয়নি—তা থেকে বোঝা যাচ্ছে, পূর্ণ যৌবনে রবীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শন ও বিশ্ব-দর্শন কি অর্থপূর্ণ রূপ নিয়েছিল। এতে দুর্বল অংশ যে নেই তা নয়, যা বিকাশধর্মী দুর্বল অংশ তাতে থাকবেই, কিন্তু রবীন্দ্র-সাধনা বলতে যে সুবৃহৎ ও সুমহৎ ব্যাপার বোঝায় তার পত্তন ও গঠন যে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছিল তাঁর যৌবনেই তার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে এই ছোট বইখানি থেকে। এর বিশেষ মর্যাদা এই কারণে।

রবীন্দ্রনাথের অভিনয়

শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী

উপলব্ধিকে ঠিক যথাযথ ব্যাখ্যা করা যায় না, ভাষা হারিয়ে যায়। অভিনেতার কাছে ভাল অভিনয় ভাষার অতীত বাণীকে মনে পড়িয়ে দেয়, সে সেই ভাবে বিভোর হয়ে যায়, নীরবে তার বাণী রস সঞ্চয় করেন। এ যুগে যখন রবীন্দ্রনাথের অভিনয় সম্বন্ধে লোকেরা আমায় জিজ্ঞেস করে, আমি তার উত্তর দিতে পারি নে, কেননা তারা অভিনেতা নয়, অভিনেতারা এ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে না, আর আমিও তা ভাষায় ব্যক্ত করতে পারিনে।

অনেকদিন কেটে গেছে, এ সম্বন্ধে অনেক ভেবেছি, এবং যে-সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছি, সেকথাই যেটুকু পারি আমার নিজের ভাষায় বলতে চেষ্টা করবো।

১৯২৩ সালে, আমি তখন আর্ট থিয়েটারে যোগ দিয়ে অভিনয় করছি। সে সময়ে অগাষ্ট মাসের পঁচিশে সাতাশে আটাশে তারিখে অর্থাৎ শনি সোম মঙ্গলবার পুরাতন এম্পায়ার থিয়েটারে রবীন্দ্রনাথ 'বিসর্জন' নাটকে অভিনয় করেন, এই এম্পায়ার থিয়েটারই বর্তমানে রক্সি সিনেমা। এই অভিনয় দেখে নাট্যাচার্য অমৃতলাল ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ সংবাদপত্রে একটি দীর্ঘ প্রশস্তি লেখেন। রবীন্দ্রনাথের যে-সব অভিনয় এর আগে হয়েছে, তা সাধারণ লোক ভালভাবে হৃদয়ের সঙ্গে নিতে পারেনি এবং অনেকে তা দেখেও নি। তারা বলেছে ওটা জোড়াসাঁকোর সখের অভিনয় ও একটা স্বতন্ত্র ধারা, রবীন্দ্রনাথের মত নতুবা সেই বাড়ির লোকের মত সংস্কৃতিসম্পন্ন ও রুচিবান্ লোকেরাই এই অভিনয় দেখেন, সাধারণ লোকদের জন্য নয়। সাধারণের মনে এই ধারণাই তখন প্রবল ছিল। যখন অমৃতলালের এ প্রশস্তি বেরুল, তখন লোকে বিস্মিত হল। দীর্ঘকালের

দক্ষ অভিনেতা ও নাট্যাচার্য অমৃতলাল ও অভিনয়ে কি এমন দেখলেন যে এমন শতমুখে প্রশংসা করলেন। তাই সাধারণের মনে অভিনয় দেখবার একটা স্পৃহা জন্মাল। এমন কি শরৎচন্দ্র নিজে রবীন্দ্রনাথের অভিনয় দেখবার জন্যে উৎসুক হয়েছিলেন, এবং বলেছিলেন, এ অভিনয় না দেখে তিনি মরতে পর্যন্ত চান না। শ্রীঅমল হোমকে লিখিত পত্রে একথার নজির আছে।

আমাদেরও দেখবার আগ্রহ হলো, আমরাও নিমন্ত্রিত হয়েছিলুম। সোমবার দিন আমরা গিয়ে আমাদের নির্দিষ্ট বক্সে স্থান গ্রহণ করলুম। অভিনয় আরম্ভ হবার খানিক আগে, বক্সের দরজাটা খুলে এক ভদ্রলোক চুপিচুপি আমাদের কাছে এসে বললেন, দয়া করে হাততালি দেবেন না। আমি ঘাড় নেড়ে সায় দিলুম। কিন্তু অর্থ বুঝতে পারলুম না। দেখলুম যে সেই ভদ্রলোক অন্যান্য বক্সে গিয়েও সেইকথা বললেন।

পর্দা উঠল, কবি স্বয়ং অভিনয়ে জয়সিংহের ভূমিকায় অভিনয় করেন, রঘুপতি—দিনুবাবু, রাজা—রথীবাবু। বিসর্জনে বেশি গান ছিল না, কিন্তু কবি স্বয়ং বিসর্জনে কতগুলি গান সংযোগ করেন, শ্রীমতী সাহানা দেবী সেই গানগুলি করেন। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন বাষট্টি বছর। কিন্তু যে-ভাবে তিনি জয়সিংহের ভূমিকায় দাঁড়ালেন, চলাফেরা করলেন তাতে তাঁর এত বয়স হয়েছে বোঝা গেল না। দাড়িগুলি কালো করা, ছোট করে বাঁধা। অভিনয় চলতে লাগল, হাততালি কিন্তু কেউ দিলে না, চুপচাপ, মনে হতে লাগল, সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ ও মঞ্চ যেন ভাবে জমাট বেঁধে গেছে। অভিনয়ে দর্শক একেবারে মোহিত।

অভিনেতার একটা ব্যক্তিত্ব থাকা দরকার। এ ব্যক্তিত্ব ঠিক কি তা বোঝান যায় না। কিন্তু ব্যক্তিত্ব ছাড়া কোন বড় অভিনেতা হয় না। এই ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথও সচেতন ছিলেন, য়ুরোপযাত্রীর ডায়েরীতে ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে লিখছেন—

"আজ লাইসীয়ম নাট্যশালায় গিয়েছিলুম। স্কট রচিত ব্রাইট অফ

লামার মুর উপন্যাস নাট্যাকারে অভিনীত হয়েছিল। বিখ্যাত অভিনেতা আর্ভিং নায়ক সেজেছিলেন। তাঁর উচ্চারণ অস্পষ্ট এবং অঙ্গভঙ্গি অদ্ভুত। তৎসত্ত্বেও তিনি কি এক নাট্যকৌশলে ক্রমশ দর্শকদের হৃদয়ে সম্পূর্ণ আধিপত্য স্থাপন করতে পারেন।"

আর্ভিং সম্বন্ধে সে যুগের বড় বড় লোকেরাও আর্ভিংএর অভিনয়ে এই ব্যক্তিত্ব-প্রতিভায় বিস্মিত হয়েছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে একটা লোকশ্রুতিই হয়ে গিয়েছিল যে, আর্ভিংএর অভিনয় থেকে যদি ব্যক্তিত্বটুকু কেড়ে নেওয়া যায়, তাহলে তাঁর বাকি কি থাকে। অভিনয়শাস্ত্রে এটি একটি শাশ্বত সত্য।

রবীন্দ্রনাথের মত এমন ব্যক্তিত্ব কোথায় পাওয়া যাবে? প্রশস্ত ললাট, প্রদীপ্ত চক্ষু, দীর্ঘায়ত নাসা, অতি সুস্পষ্ট ও শুদ্ধ বাণী. মধুর কণ্ঠ, মানে, অভিনেতার যতগুলি গুণ থাকা দরকার, সবগুলিই তাঁর মধ্যে বর্তমান ছিল। তাঁর চোখের মধ্যে যেন ভাবের সমুদ্র খেলে যাচ্ছে, এ যাঁরা তাঁর ছবি দেখেছেন, তাঁরাও এটা প্রত্যক্ষ করেছেন। সেই ভাব-সমুদ্রের মধ্যে চক্ষুর তরঙ্গে যখন তাঁর অভিনয় চলছিল, মনে হচ্ছিল যেন মঞ্চে মুহুর্মুহুঃ বিদ্যুৎ চমকিত হচ্ছে। এগুলি তাঁর বিধিদত্ত জিনিস। আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করলুম এবং পরেও অনেক ভেবেছি, অভিনয়শাস্ত্রের মধ্যে নাটকীয় এফেক্ট বলে একটা নির্দেশ আছে, দর্শকচিত্তে একটা রেখা বা দাগ টানবার জন্যে অভিনেতার একটা চেষ্টা থাকে, যাকে বলে ড্রামাটিক এফেক্ট। পৃথিবীর সব দেশের অভিনেতাকেই এই এফেক্টের নির্দেশ মেনে চলতে হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অভিনয়ে দেখলুম, এখানে কোন চেষ্টা নেই, একটা চেষ্টাবিহীন অভিনয় তিনি করে যাচ্ছেন, কোন জায়গায় মনে হচ্ছে না যে তিনি জোর করে অভিনয়ে এফেক্ট আনবার চেষ্টা করছেন। এটা কি করে হয়, অথচ সমস্ত প্রেক্ষাগার মুগ্ধ হয়ে আছে, হাজারো লোক দেখছে, একেবারে নিশ্চুপ, এটা কি করে হলো।

অনেকদিন পরে পশ্চিমী নাট্যাচার্যদের সূত্র পড়ে বুঝেছিলুম যে আর্টিস্টিক ইকনমি বলে একটা কথা আছে। অলংকারের যেন

বাহুল্য না হয়, ভাবভঙ্গি (movement) প্রয়োজনের সীমা ছাড়িয়ে না যায়, অপ্রয়োজনে একটা চোখের পাতাও যেন না পড়ে। যখন একথাটি পড়লুম তখনি রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ল। রবীন্দ্রনাথের অভিনয়ে কোন অপ্রয়োজন বা অলংকরণের চেষ্টা কোথাও দেখিনি। আমার কিন্তু তখনি ধারণা হলো আর্টিস্টিক ইকনমি বলতে যদি কিছু বোঝায়, তাহলে রবীন্দ্রনাথের অভিনয়কেই বলব —a model book of artistic economy. আর মানসিক একাগ্রতা অভিনয়ের যেটা দরকার সেটা তো তাঁর ছিলই। কিন্তু কতখানি ছিল, তখন সেটা বুঝতে পারি নি। এটা বুঝেছিলুম ১৯২৬ সালে 'শোধবোধের' অভিনয় যখন প্রস্তুত হচ্ছে।

শোধবোধের শেষ দৃশ্যে সতীশ আপিসের টাকা ভেঙে নিয়ে বাড়িতে এসে বন্দুক দিয়ে আত্মহত্যা করবার চেষ্টা করছে, তার আগে হাতে বেত নিয়ে বাগানের ফুলগাছগুলিকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেলছে। এই দৃশ্যটা নাটকের অন্যান্য দৃশ্যের চেয়ে অন্যরকমের। আমরা অভিনয় করলে অতিনাটকীয় ভাব ধারণ করবার সম্ভাবনা ছিল। সেইজন্যে, ঐ সময় আমি যখন তাঁর কাছে যেতুম, তখন তাঁকে শেষ দৃশ্যটা পড়ে দিতে অনুরোধ করেছিলুম অর্থাৎ রিডিং দিতে। আমার ধারণা রিডিং অনুযায়ী তার ড্রামাটিক এ্যাক্‌শন হবে, এতে বেশিও হবে না, কমও হবে না। রিডিং পড়ে দিতে কখনো তিনি বিরক্ত হতেন না। তাঁর নাটকে অভিনয় করবার জন্যে যেটুকু পড়ে দেবার দরকার সেটুকু তিনি পড়ে পড়ে দিতেন।

বসে আছেন, বইখানা হাতে দিলুম, পড়তে আরম্ভ করলেন। এক লাইন পড়বার পরই এমন গভীর ভাবে আকৃষ্ট হলেন, সেইভাবে এমন বিভোর হলেন যে, বাইরের আর কোন ঘটনা বা দৃশ্যের ছায়াপাত তাঁর মনে এলো না। সতীশের সেই মনোভাব বাস্তবে রূপায়িত হয়ে উঠল, চোখের উপর তখন সমস্ত দৃশ্যটি ভেসে উঠল। শেষ হবার পর আমার মনে হল, এমনি ভাবে যদি আমি কথাগুলি আবৃত্তি করতে পারি, তাহলে সেই দৃশ্য কিছুতেই অতিনাটকীয় হতে পারে

না। কেননা কথা বলার ফলে যে নাটকীয় এ্যাক্‌শন হয়, সেটা কথা বলার ঢং অনুযায়ী ক্রিয়াই ব্যক্ত করবে, এর ক্রিয়া কমও হয় না বেশিও হয় না। আমাদের কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করতে হলে কত চেষ্টাই না করতে হয়। কিন্তু তাঁর মত এমন সাধা মনঃসংযোগ কোথাও আর আমি দেখি নি। এটিও বড় অভিনেতা হবার একটি বিশেষ গুণ, এক কথায় জগৎসংসার ভুলে গিয়ে অভিনেয় চরিত্র ও তার বাণীর মধ্যে একেবারে ডুবে গেলেন।

আর সকলের ওপর হচ্ছে তাঁর অভিনয়ের বিশিষ্ট গুণ, চার্ম। যাদুকরের মায়াসৃষ্টির মতই এই চার্ম। সহজে দর্শকের মনকে মুগ্ধ করে দিলে। সুরে সুরে শব্দব্যঞ্জনায় গতিভঙ্গিতে ভাবময়তায় মায়া মুগ্ধকরী অভিনয়ের একত্র সমাবেশ তাঁর মধ্যে সংহত হয়েছিল।

অভিনেতার গুণ সম্বন্ধে রাশিয়ান প্রযোজক Nemirovitch Danchenko এক প্রবন্ধে বলেছেন যে বড় অভিনেতা হতে গেলে ব্যক্তিত্ব, সরলতা, আন্তরিকতা, দক্ষতা এবং সবার ওপরে এই চার্ম বা মায়ামুগ্ধতা থাকতে হবে, তিনি তার পরে লিখেছেন—

> "An actor may display imagination, intelligence and taste but his influence on audience-perception will stop at some point, whereas the actor with charm takes hold of the spectator completely, authoritatively. Can charm be implanted? Can charm be acquainted through training?"

দক্ষতা ছাড়া আর সবই অভিনয়ে নৈর্ব্যক্তিক, সেটা শিক্ষা বা সংগ্রহ করে হয় না, তিনি আরো বলেছেন,

> "It would seem that the perception of charm is much too subjective. You cannot make of this quality an object of scientific research. Still the audience, almost in its entirety, feels the presence or absence of charm."

আমার মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন রসের অভিনেতা, কোন বিশেষ ভাব বা বিশেষ পরিস্থিতির অভিনেতা নন। কোন সাধারণ অভিনেতার মধ্যে কখনো ইমোশনাল, কখনো পরিস্থিতির অভিনয় হচ্ছে দেখা যায়। কিন্তু রস তো শুধু ভাব নয়, ভাব, বিভাব ও

অনুভাবের দ্বারা যে মায়া সৃষ্টি করে সেটিই হচ্ছে রস। রসের অভিনয় করতে হলে বিচিত্র ভাব অর্থাৎ স্থায়ী সঞ্চারী সাত্ত্বিক ভাব ও বিভাব আয়ত্ত না হলে কোন ব্যক্তি রসের অভিনয় করতে পারেন না। অনেকে মনে করেন, চেষ্টা ও অভ্যাস করলেই বড় অভিনেতা হওয়া যায়। কিন্তু সেকথা ভুল, দৈব বিভূতি না থাকলে অভিনয়েও শ্রেষ্ঠতা অর্জন করা যায় না। রসের অভিনেতার সেই গুণটিরই প্রয়োজন, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তা পূর্ণমাত্রায় ছিল।

ছিন্নপত্র রবীন্দ্রদর্শন

শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী

রবীন্দ্রনাথ ডায়েরী লেখার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি মনে করতেন কবির ব্যক্তিগত দৈনন্দিন জীবনের ঘটনা ও বৃত্তান্ত-বিবরণে সাধারণের কোনো প্রয়োজন নেই। সকল কাব্যই কবির প্রকৃত জীবনী। কাব্যের ভিতর দিয়ে কবির অন্তর্জীবন যেমন ভাবে প্রকাশিত, ভবিষ্যৎকালের জন্য সেইটুকুই যথেষ্ট। সোনার তরীতে ফসলেরই স্থান আছে, ব্যক্তির নেই। তথাপি পরবর্তীকালের মানুষ নৈর্ব্যক্তিক কবিত্বরসটুকু নিয়েই সন্তুষ্ট হয় না। মানুষ মানুষকে চায়—তার মধ্যে কিছু অংশ কৌতূহল ও গল্পের লোভ হলেও কিছুটা সত্যানু-সন্ধান। বর্তমানে রবীন্দ্র-জীবন নিয়ে এই কৌতূহল মাঝে মাঝে সত্যের সীমা লঙ্ঘন করছে এবং কৌতূহলীর আপন বুদ্ধিবৃত্তি ও মনোবৃত্তির ছাঁচে ঢালা বিবিধ রবীন্দ্র-জীবনীর উপকরণ তৈরী হচ্ছে। কিন্তু কল্পনার ঘোড়দৌড় না করেও রবীন্দ্র-জীবনীর উপকরণ সুলভ ও পর্যাপ্ত হয়ে আছে রবীন্দ্রনাথের পত্রসাহিত্যে। তার মধ্যে 'ছিন্নপত্র' প্রধান।

পরবর্তী দীর্ঘজীবনে রবীন্দ্রনাথ যত বিচিত্র কর্মে চিন্তায় মননে পূর্ণ হয়ে উঠেছিলেন, তার সম্পূর্ণ এবং সুগঠিত রূপ প্রতি-ফলিত হয়েছে এই চিঠিগুলিতে—মনে হয় এই সময়ে তিনি যে পূর্ণতালাভ করেছিলেন তাকে আর অতিক্রম করতে হয় নি। এই সময়কার কোনো চিন্তাই পরবর্তীকালে পরিত্যাগ করেন নি, শুধু পূর্ণতর করেছেন মাত্র।

রবীন্দ্র-সাহিত্য ও জীবনের বিচিত্র এবং বহুমুখী দিক, তাঁর কর্মেরও বহুমুখী গতি; তবু এই বৈচিত্র্যময় কর্মপ্রবাহের মধ্যে চিন্তার যে অন্তঃসলিলা সামঞ্জস্য আছে তার ফলে প্রত্যেকটি কর্ম

আর একটির দ্বারা পরিপূরিত হয়ে সম্পূর্ণ হয়েছে। বস্তুত বিভিন্ন বিপরীতগতি ভাবের সমন্বয় সাধনে, আদর্শ মানবের উদ্বোধনেই রবীন্দ্র-সাধনা নিয়োজিত। রবীন্দ্রনাথ কবি। যদিও তিনি গায়ক, সুরকার, শিল্পী, বক্তা, নাট্যকার, অভিনেতা, সমাজ-সংস্কারক, শিক্ষক ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর প্রধান পরিচয় তিনি কবি। তিনি নিজেও বারে বারেই বলেছেন তিনি সাধক নন, গুরু নন, তপস্বী নন, তিনি মানুষের কবি।

"আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি আমার গানের সুরে
সাড়া তার জাগিবে তখনি।"

সেই পৃথিবীর কবির কবিত্বের পটভূমিকা কি? কোন্‌খান থেকে সে পেয়েছে প্রেরণা, কোন্‌ আনন্দে তার উৎসারণ? কোন্‌ লোকে তার ব্যাপ্তি? স্বর্গ না মর্ত্য? জ্ঞানময় চিৎলোক না সূর্যালোকিত সাবিত্রী পৃথিবী? এ নিয়ে তর্ক আছে—অভিযোগও আছে যে তিনি বাস্তববাদী নন—বস্তুজগতের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত, প্রাত্যহিক সংসার ও সমাজের দ্বন্দ্ব থেকে বিমুখ—কল্পলোকের রঙগীন পাখা তুলে স্বরচিত মনোলোকে তাঁর ভ্রমণ। তিনি নিজে কিন্তু সে কথা স্বীকার করেন না। পরিহাস করে বলেন, ''কাব্য পড়ে যেমন ভাবো কবি তেমন নয় গো, চাঁদের পানে চক্ষু তুলে রয় না পড়ে নদীর কূলে''...

কিন্তু একথাও অস্বীকার করবার উপায় নেই যে ঐ নদীকূলেই কবির জীবনের সবচেয়ে বড় অধ্যায়টি রচিত হয়েছিল। চারপাশের সুখদুঃখ জীবনসংঘাত থেকে বিচ্ছিন্ন, চাঁদের পানে চক্ষু তুলে রাখা নয়; নদীর কলধ্বনি মেশান ছোট ছোট মানুষের জীবনের কল-গানই কবির জীবনের সেই বৃহৎ অধ্যায়ের ভূমিকা।

পদ্মাতীরের জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ তাঁর চিঠিপত্রে আছে। নানা জনের কাছে ঐ সময়ে তিনি নানা প্রসঙ্গে চিঠি লিখেছেন, তার মধ্যে ছিন্নপত্রে আমরা সেই পদ্মাতীরের সীমাহীন সৌন্দর্যের আলোকসুধা পান করে কবির অন্তরের গভীর অনু-

ভবের সঙ্গে আজো যুক্ত হই। প্রথম আটখানি ছাড়া ছিন্নপত্রের আর সমস্ত চিঠিই ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীকে লেখা। এই চিঠিপত্র-গুলির রচনাকাল আট নয় বৎসরব্যাপী। কবির বয়স তখন পঁচিশ থেকে তেত্রিশের মধ্যে এবং ইন্দিরা দেবীর বয়সও বার থেকে যথাক্রমে তদূর্ধ্বে। উন্মুক্ত প্রকৃতির মাঝখানে থেকে শহরবাসিনীকে লেখা এই চিঠিগুলির মধ্যে কবির নিগূঢ় স্বরূপ যেমন অভিব্যক্ত, এমনটি বোধ হয় আর কোথাও হয় নি। বিশেষত ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখ কাব্যে ব্যক্তিগত ভাবেই প্রকাশ করা তাঁর স্বভাব ছিল না, যখন জীবনভোগের মন্থনোদ্ভূত রস সকলের হয়ে উঠত তখনই তা কাব্যের যোগ্য বলে সাহিত্যে স্থান পেত। তাঁর জীবনটি স্পষ্ট ভাবে তাই কাব্যে পাই না। তিনি জানতেন তাঁর সুখ-দুঃখ তাঁরই কিন্তু সেই সুখ-দুঃখ ভেদ করে যে ভাব উঠছে তা সকলের। সেজন্য কাব্যের মধ্যে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনকে খুঁজতে যাওয়া কঠিন, তাতে পদে পদে ভুলের সম্ভাবনা। কিন্তু তাঁর জীবন কী করে কাব্য হয়ে উঠছিল, সৃষ্টির সেই আশ্চর্য অভিব্যক্তির একটি স্পষ্ট ছবি একমাত্র "ছিন্নপত্রেই" আমরা দেখতে পাই। পদ্মার ঘাটে ঘাটে, তার অগাধ বিস্তৃত চরের নিঃশব্দ নিসঙ্গ সৌন্দর্যের উৎসারণের মধ্যে বসে, কখনো বা জমিদারীর কুঠি বাড়িতে সরল সহজ গ্রাম্য মানুষদের আত্মীয়তায়, বিচিত্র মানুষের সান্নিধ্যে থেকে এই চিঠিগুলিতে কবি তাঁর প্রতিদিনের ভাবনা চিন্তা সুখ দুঃখ রহস্য কৌতুকের জাল বুনেছেন। প্রকৃতির সঙ্গে এখন আত্মিক যোগের সহজ সরল প্রকাশ চিঠি ছাড়া যেন আর কোথাও হতে পারত না। কবিতায় কবিত্বের মধ্যে যদি বা কিছু ছদ্মবেশ থাকে সুখদুঃখের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সকাল-সন্ধ্যার মাধুরী, কি আশ্চর্য ভালোবাসায় প্লাবিত করে তিনি দেখছেন এই বসুমতী বসুন্ধরার নানা রূপ। কবি নিজেই এই চিঠি লিখতে লিখতে লিখছেন—

> "আমাকে একবার তোর চিঠিগুলি দিস আমি কেবল ওর থেকে আমার আনন্দ সম্ভোগগুলি টুকে নেব। কেননা যদি দীর্ঘকাল বাঁচি তাহলে

এক সময় নিশ্চয় বুড়ো হয়ে যাব, তখন এই সমস্ত দিনগুলি স্মরণের এবং সান্ত্বনার সামগ্রী হয়ে থাকবে, তখন পূর্বজীবনের সমস্ত সঞ্চিত সুন্দর দিনগুলির মধ্যে তখনকার সন্ধ্যার আলোকে ধীরে ধীরে বেড়াতে ইচ্ছে করবে।"

এখানে কবির বক্তব্যের মধ্যে তাঁর ভবিষ্যৎ বাণীটি অবশ্য সত্য হয়নি, অর্থাৎ যদিচ তিনি দীর্ঘদিন বেঁচেছিলেন তবু বুড়ো হননি। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর চিত্ত ছিল নবীন—প্রকৃতির সৌন্দর্য-লীলার রসসম্ভোগে চির অতৃপ্ত। কবির অনুরোধ অনুসারে শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চিঠিগুলি থেকে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয় বাদ দিয়ে তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন। তা থেকেও কবি কতকগুলি সম্পূর্ণই বর্জন করেন, কতকগুলি থেকে বাছাই করে কিছু কিছু অংশ 'ছিন্নপত্র' নামে প্রকাশিত হয়। পত্রগুলি সম্পূর্ণ নয় বলেই 'ছিন্নপত্র' নাম। সম্প্রতি কবি কর্তৃক পরিত্যক্ত সেই অংশ-গুলি ও চিঠিগুলি ছাপা হওয়ায় পত্রসাহিত্যের মধ্যেই যে রবীন্দ্র-জীবনদর্শনের গভীরতম সত্যগুলি প্রত্যক্ষবৎ প্রকাশিত হয়ে রয়েছে তা নিঃসংশয়ে জানা গেছে। এই পত্রগুলির মধ্যে কবির পারিবারিক ও গার্হস্থ্য জীবনের যে ছবি আমরা পেয়েছি এমন আর কোথাও নেই। স্বজনবৎসল গৃহী, কর্তব্যপরায়ণ সেই স্নেহনিমগ্ন পিতৃ-হৃদয়কে না দেখলে তাঁকে সম্পূর্ণ চেনা হয় না। বিশ্ব এবং ঘর, আকাশ ও নীড়, ভবের সঙ্গে ভাবের মিলনে দেখি তাঁর মানবিক পূর্ণতা।

নানা দিক-প্রসারী ভাব ও বিপুল কর্মোদ্যমের সঙ্গে তিনি সংসারী এবং গৃহস্থ এ কথাটি শুনতে সামান্য হলেও একেবারেই সামান্য নয়। জগতের ইতিহাস আলোচনা করলে রবীন্দ্রনাথের সমতুল্য প্রতিভার সংখ্যা বেশী নয়, তাঁর কাছাকাছি আসতে পারে এমন সংখ্যাও কম, তবু মোটামুটি আমরা যা জানি—এরকম প্রতিভা-দীপ্ত কবি, শিল্পী, বা সুরকার প্রায় কেউই তাঁদের আত্মীয়-পরিজনকে, সংসারকে, গৃহকে, শান্তি স্নেহ ও কর্তব্যের এমন পূর্ণ

আনুগত্য দিতে পারেন নি। এমন সহৃদয় ভালোবাসায় আত্মীয়-পরিজনের কাছে সত্য হয়ে উঠতে পারেন নি। অধিকাংশ প্রতিভার জীবনই প্রতিভার দীপ্তিকে জ্বালাবার উপযুক্ত তেল সংগ্রহ করে আনেনি বা আধারটি উপযুক্ত নয়—তাই জ্বলতে সুরু করেই তার দাবদাহে চতুর্দিক জ্বালিয়ে দিয়েছে, চারপাশে বিক্ষোভের তরঙ্গ তুলেছে, কখনো নিজেও ডুবে মরেছে—কেন এমন হয়? কারণ, "অলৌকিক আনন্দের ভার বিধাতা যাহারে দেয়, তার বক্ষে আনন্দ অপার, তার নিত্য জাগরণ।" সেই আনন্দের অসহ ব্যথায় ব্যাকুল হয়ে তাঁরা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ওঠেন—তখন তাঁদের অবস্থা—"পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি আপন গন্ধে মম"—সেই সুগন্ধের সংবাদ, সেই অলৌকিক আনন্দের দুঃসহতার খবর তাঁদের সঙ্গীরা জানে না, জানে না তাদের ভাই বন্ধু, পিতা মাতা, স্বামী স্ত্রী, তাই কেউ তাদের সঙ্গে সাম্য রাখতে পারে না; তখন তারা উড়িয়ে দেয় পুড়িয়ে দেয় সংসার ছারখার করে এবং সেই মত্ততার দাবানলে তারা নিজেদের শক্তির প্রবলতাকে, প্রাণের বেগকে অনুভব করে। তাই অধিকাংশ শিল্পীর জীবনই সাধারণ মানুষের জীবনের মত, সুস্থ স্বাভাবিক বা নিস্তরঙ্গ হতে পারে না। কারণ তাঁদের যে—

"নিমেষ তরে ইচ্ছা করে বিকট উল্লাসে।
সকল টুটে যাইতে ছুটে জীবন-উচ্ছ্বাসে"—

এই ভাব রবীন্দ্রনাথের জীবনেও অবশ্যই বহু মুহূর্তে প্রবলভাবে এসেছে. যখন ক্ষুদ্র গৃহকোণ তাঁকে ধরে রাখতে পারে নি—যখন তিনি তীব্র ভাবে অনুভব করেছেন—"থাকিতে নারি ক্ষুদ্র কোণে আম্রবনছায়ে।"

"সুপ্ত হয়ে লুপ্ত হয়ে গুপ্ত গৃহবাসে"—যখন তাঁর চিত্ত প্রাত্যহিকতার নাগপাশ ছিঁড়ে ছুটে যেতে চেয়েছে—কিন্তু নদী যেমন কখনো কখনো উচ্ছ্বসিত হলেও তীরের বাধার মধ্যে নিজেকে সংহত করে দেশদেশান্তরে কল্যাণ বহন করে নিয়ে যায় তেমনি তাঁর বহু-

মুখী প্রতিভার দীপ্ত তীব্র বেগ গভীর সাধনায় ও চারপাশের মানব-জীবনের প্রতি মমত্ব ও সমবেদনায় সংহত হয়ে কল্যাণ ও শান্তি বহন করে দীর্ঘ দিন দীর্ঘ পথ চলেছে। প্রাণের উচ্ছ্বাসের সঙ্গে অপ্রমত্ততা, অনুভবের তীব্রতার সঙ্গে সামঞ্জস্যবোধের আশ্চর্য সমন্বয় ছিন্নপত্রের পত্রে পত্রে প্রকাশিত। এই অল্পবয়সের নদীতীরের জীবন থেকেই আমরা দেখি কেমন করে সাধক দেবেন্দ্রনাথের পুত্র কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবল জীবনোচ্ছ্বাসকে নানা মনের সম্বন্ধের ও কর্মের সীমা-রেখার মধ্য দিয়ে সাবধানে সংহত করে প্রবাহিত করেছেন—সেই কাজ এই জীবনশিল্পীর সব চেয়ে বড় রচনা যে তিনি মহত্তম ও বৃহত্তম কবি হয়েও, বিশ্বের মানুষ হয়েও, আদর্শ পুত্র আদর্শ স্বামী আদর্শ পিতা হয়েছিলেন। যখন তিনি বিশ্বকে ঘরের মধ্যে আহ্বান করেছিলেন, ঘরকে প্রসারিত করেই করেছিলেন; সেজন্য ঘরকে ভেঙে চুরমার করেন নি। এ কথাটি সামান্য, কিন্তু জগতের অন্যান্য শিল্পীর জীবন আলোচনা করলে আমরা জানি, এ সামান্য নয়—এবং এই জীবনসাধনাই তাঁর দীর্ঘদিনব্যাপী সকল কাব্য-সৃষ্টির উৎস। রবীন্দ্র-জীবনীর পাঠক জানেন অতি অল্প বয়সে অর্থাৎ ত্রিশ বৎসর মাত্র বয়সে পিতার আদেশে তিনি জমিদারীর কাজের ভার নিয়ে তাঁর সেই সদ্য-উদ্ভিন্ন অপূর্ব-যৌবনে পূর্ব-বঙ্গের গ্রামের নিঃসঙ্গ জীবনে প্রবেশ করেন। 'রবীন্দ্র-জীবন-প্রবাহে' আছে—"এইবার সাহিত্যজীবনের বিচিত্র মাধুর্যের মধ্যে হঠাৎ আসিয়া পড়িল বিপুল জমিদারীর হিসাবপত্র, দলিল, দাখিলা, নথিপত্র ও হাতচিঠা...কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্যভাবে এই নূতন কর্তব্যকে জীবনের সঙ্গে মানাইয়া লইলেন, শুধু মানাইলেন না নিপুণভাবে সম্পন্ন করিতে লাগিলেন।" রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কাব্যের উপর এই নূতন কাজের প্রভাব ব্যাপক ও গভীর। জীবনের নানা দিক্‌কে মানিয়ে নেবার ক্ষমতা ও কর্তব্য নিপুণভাবে সম্পন্ন করবার জন্য যে দৃঢ়তা ও নিষ্ঠার প্রয়োজন তার মধ্যেই আমরা তাঁর উত্তরজীবনের বিপুল সফলতার কারণ দেখতে পাই।

প্রথম যৌবনের নিবিড় রসানুভূতিতে মগ্ন এই পত্রসাহিত্য—কিন্তু কবির মনোজগতের আনন্দলীলার এরকম অভিব্যক্তি সাধারণত ঐ বয়সের শিল্পীর কাছে প্রত্যাশা করা যায় না। কোথাও ব্যগ্র উন্মাদনা বা জ'লো উচ্ছ্বাস তাঁর সুচিন্তিত অথচ রসস্নিগ্ধ ভাবময় চিত্তসমুদ্রকে তোলপাড় করে তুলছে না। ভবিষ্যৎকালে তাঁর মধ্যে যে ঋষি-মনীষীর আবির্ভাব হয়েছিল তারই সাধনার আসন সেদিন পাতা হচ্ছিল বাংলাদেশের নদীবাহিত উপলসংকুল চরে, সোনার ফসলভরা প্রান্তরে।

ছিন্নপত্রের মধ্যে তিনটি বিশেষ ধারা আমরা পাই. একটি বাংলাদেশের গ্রামের মানুষের ঘনিষ্ঠ ঘরোয়া ছবি আর একটি বাংলাদেশের সৌন্দর্যময়ী প্রকৃতি। তৃতীয়—এই দুই-এর সংগমে উদ্ভূত কবির মনন ও তত্ত্ববাণী। এই তিন ভাব একেবারে ওতপ্রোত হয়েছিল তখনকার জীবনে ও পরবর্তীকালের কবির জীবন-সাধনার ও কর্মসাধনারও ভূমিকা রচিত হয়েছিল এই ভাবধারার মধ্যে। সেজন্য রবীন্দ্র-সাহিত্যের মধ্যে জীবন ও জীবনের মধ্যে সাহিত্যবোধ কেমন করে প্রবেশ করেছে এইখানেই তা পরিষ্কার জানা যায়—এমন কি বহু কবিতার ভাব. গূঢ় অর্থ. বিশেষ ব্যঞ্জনা এবং কোন্ অভিজ্ঞতা থেকে তাদের জন্ম তাও এখানে জানা যায়। কলকাতায় অভিজাত ঠাকুর পরিবারের শিক্ষা সংস্কৃতিতে লালিত হয়ে গ্রামের জীবনের সংগে অপরিচিত থাকলেও তাঁর কাব্যজীবন হয়ত প্রতিভার আপন বেগে প্রকাশ পেতই. কিন্তু তাঁর কর্মজীবন—যে কর্মের যোগে জ্ঞানের পূর্ণতা. তা এমন করে প্রকাশিত হয়ে উঠত কিনা সন্দেহ।

বাংলাদেশের খড়ে-ছাওয়া মাটির ঘরের বড় কাছাকাছি এসেছিলেন কবি। পদ্মার জলে ভাসছে তাঁর নৌকা. তিনি দেখছেন দুপাশের জীবনলীলা—কখনো বা কল্পনায় একেবারে তাদের সুখ-দুঃখ ভোগ করছেন। কোন মেয়ে শ্বশুরবাড়ি যেতে জলভরা চোখে নৌকায় উঠল. তার ভবিষ্যৎ কল্পনা গল্পের বীজ বুনছে। কোথাও

বা শীতকালের ভোরে ক্রন্দনরত শিশুকে ঠাণ্ডা জলে স্নান করাতে চড়-চাপড় মারছে ধৈর্যহীনা জননী, শীতার্ত শিশুর সেই আর্তস্বর আর্ত করে তুলেছে তার সুন্দর সকাল—"একে এই ভোরের শীতে কনকনে জলে চান তার পরে আবার রাক্ষসীর হাতের মার।" চিঠিগুলি পড়তে পড়তে গ্রামের দৈনন্দিন জীবনের আলো-ছায়া আজও স্পষ্ট হয়ে ওঠে—কি আশ্চর্য সহৃদয় দৃষ্টিপাতে কবি দেখছেন সুখ-দুঃখমাখা, হাসিকান্নাভরা মানুষের বড় ভালোবাসার জীবন। আর দেখছেন নদী খাল বিল তাল নারিকেলকুঞ্জ, অবারিত প্রান্তরে সূর্যোদয়ের ও অস্তের সমারোহ, মাথার উপরে স্তব্ধ নীলাকাশের জ্যোতির্বিকীর্ণ মহোৎসব—মানুষ ও প্রকৃতি দুই মিলেছে এক আনন্দসঙ্গমে, সেই আনন্দে মগ্নচৈতন্য কবির জীবনভোগ—ইয়োরোপীয় কবি ও শিল্পীদের চেয়ে কত পৃথক। অধিকাংশ সময়েই সম্পূর্ণ একাকী—কোনোরকম পার্থিব ভোগবিলাসশূন্য, দু'একখানি বই মাত্র সঙ্গী। গ্রামের ঘাটে বাঁধা বোটে মাঠের ধারে ক্ষেতের পাশে, জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাত্রে চলেছে কবির জীবনভোগের রসোৎসব। তিনি লিখেছেন—"এই সুন্দর শরৎ প্রভাতের সঙ্গে, এই জ্যোতির্ময় শূন্যের সঙ্গে আমার এই যে চিরকালের নিগূঢ় সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধেরই প্রত্যক্ষ ভাষা এই সব বর্ণ গন্ধ গীত।" এই সব চিঠি থেকে আমরা বুঝতে পারি কেন বৈরাগ্যসাধনে মুক্তির পথ তাঁর নয়—স্পষ্ট হয়ে ওঠে সেই অতি প্রসিদ্ধ পঙ্‌ক্তি দুটির অর্থ—যা কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে, তোমার আনন্দ রবে তারি মাঝখানে।"

মানুষ ও প্রকৃতির বিচিত্র লীলার দর্শক কবির অন্তর্লোকে চলেছে গভীর রসনিমগ্ন মনন—চোখে যা দেখছেন বাইরে যা ঘটছে তাকে ছাড়িয়ে দেখছেন তার অন্তরতর সত্য। গভীর চিন্তার পথ বেয়ে উত্তীর্ণ হচ্ছেন নিগূঢ় জ্ঞানলোকে। কিন্তু তার ফলে তাঁর দেখাটা স্পষ্টও হচ্ছে না, বাস্তবতাভ্রষ্ট হয়ে কল্পনার বিষয়ে পরিণতও হচ্ছে না। দার্শনিকের উদাসীন দৃষ্টিভঙ্গীও তাঁর নয়।

সুখদুঃখকাতর মানুষের প্রতি স্নেহে প্রেমে সমবেদনায় পূর্ণ সে দৃষ্টিপাত। এক জায়গায় লিখছেন—

"আমার কাছে এই সব সরল বিশ্বাসপরায়ণ অনুরক্ত প্রজাদের মুখে বড়ো একটি কোমল মাধুর্য আছে। বাস্তবিক এরা যেন আমার দেশজোড়া এক বৃহৎ পরিবারের লোক। এই সমস্ত নিঃসহায় নিরুপায় নিতান্ত নির্ভরপর সরল চাষাভুষোদের আপন লোক মনে করতে একটা সুখ আছে—এরা অনেক দুঃখ অনেক ধৈর্য সহকারে সয়েছে তবু এদের ভালোবাসা কিছুতে ম্লান হয়নি। এদের উপর যে আমার কতখানি শ্রদ্ধা হয়, আপনার চেয়ে যে এদের কতখানি ভালো মনে হয় তা এরা জানে না।"

কখনো বা দেখি গভীর মানবমূল্যে সকল মানুষের সঙ্গে একাত্ম ভাব এনেছে, কবি দেখছেন মানুষে মানুষে ভেদটা বাইরের। কোনো অহমিকা তাঁর দৃষ্টির ও ধারণার স্বচ্ছতাকে ম্লান করতে পারেনি। তিনি বলছেন—

"প্রজারা যখন সম্ভ্রমকাতরভাবে দরবার করে এবং আমলারা বিনীত করযোড়ে দাঁড়িয়ে থাকে", তখন কিন্তু চারিদিকের মানুষের উপর ক্ষমতা-প্রকাশের সুযোগে তাঁর ঔদ্ধত্য হয় না, অহমিকা বাড়ে না। তিনি বলেন—"তখন আমার মনে হয় এদের চেয়ে আমি এমনই কি মস্ত লোক... অন্তরের মধ্যে আমিও যে এদের মত দরিদ্র সুখদুঃখকাতর মানুষ, পৃথিবীতে আমারও কত ছোট ছোট বিষয়ে দরবার, কত সামান্য কারণে মর্মান্তিক কান্না, কত লোকের প্রসন্নতার উপর জীবনের নির্ভর—এই রকম ছেলেপিলে গরু লাঙ্গল ঘরকন্নাওলা সরলহৃদয় চাষাভুষোরা আমাকে কি ভুলই জানে, আমাকে এদের সমজাতির মানুষ বলেই জানে না—সেই ভুলটি রক্ষা করবার জন্য কত সরঞ্জাম রাখতে আড়ম্বর করতে হয়।"

বাংলাদেশের মাটির মানুষ যারা হাল লাঙ্গল গরু গোয়াল চাষ খামার নিয়ে ব্যস্ত—যারা শিক্ষিত নয়, সুসভ্য নয়, ধনী নয়, মার্জিত নয়, অক্ষম অসহায় মাটির মানুষ, তাদের মূঢ় মূক হৃদয়ের ভাষা

পেঁছেচে কবির অন্তরে, কবি তাদের সরল হৃদয়ের মধ্যে দেখছেন স্নেহের অমৃত, শ্রদ্ধা ও ভক্তির সৌন্দর্য। তাঁর আপন হৃদয়ও বিগলিত হয়ে পেঁছচ্ছে তাদের হৃদয়ের দরজায়। এক একটি ঘটনা এমন প্রভাব রেখেছে যে মৃত্যু পর্যন্ত সেগুলি স্মরণ করেছেন—

"এখানকার প্রজাদের উপর বাস্তবিক মনের স্নেহ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, এদের সরল ছেলেমানুষের মত আব্দার শুনলে মনটা আর্দ্র হয়ে ওঠে, যখন তুমি বলতে তুই বলে, যখন আমাকে ধমকায় ভারি মিষ্টি লাগে।"

মানুষের প্রেম তিনি কেমন করে অন্তরে গ্রহণ করেছেন এই ছিন্নপত্রের মাধ্যমেই আমরা তা যথার্থরূপে বুঝতে পারি। যাদের কথা ভেবে তাঁর চিত্ত স্নেহে ও শ্রদ্ধায় পূর্ণ হয়েছে, মনে গভীর সাম্য-বোধের জন্ম হয়েছে, সেই চাষী মজুরদের কাছে সে কথা পেঁছতে পারেনি, কেবলমাত্র পত্রসাহিত্যেই ধরা আছে সেই আশ্চর্য ইতিহাস আর আছে তাঁর পরবর্তী জীবনের কর্মসাধনায়। তিনি যে মানুষের কবি, সকল উপাধিহীন মানুষের কবি—শুধু শিক্ষিতের নয়, অভিজাতের নয়। তাঁর সে কাব্য যদিও সব মানুষের কাছে পেঁছতে পারল না, তবু একথা সত্য করে তুলল তারাই যারা নিরক্ষর দরিদ্র- ''যারা কেহ নয়, যারা কিছু নয় পৃথিবীর ইতিহাসে।''

কবি গিয়েছেন জমিদারীর তত্ত্বাবধান করতে, সে জমিদারী তাঁর একলার নয়, তাঁর যা ইচ্ছা তা করতে পারেন না—তাই চিঠিতে তাঁর মনের সাধটি লিখছেন—''আমি যদি এদের একলা জমিদার হতাম তবে এদের খুব সুখে রাখতাম।'' মানুষকে সুখে রাখবার এই ইচ্ছাটি যে কত সত্য কত আন্তরিক তা প্রমাণ হল পরবর্তী-কালের সুদীর্ঘ নিরলস কর্মজীবনে—কিন্তু এই ইচ্ছার জন্ম হল পদ্মার ঘাটে—উত্তর ও পূর্ববঙ্গের প্রান্তরে খ'ড়ো ঘরের দুঃখ-দারিদ্র্যের স্পর্শে। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের নানা ঘটনার সংঘাতে কবির হৃদয় উত্তীর্ণ হচ্ছে অনুভবের নূতন নূতন স্বর্গে, লাভ করছেন অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময় মুক্তির স্বাদ, তা কেবল মাত্র কবিতায় পড়লে বোঝা সহজ হত না ; কারণ, সত্য কথা বলতে কি,

অধিকাংশ মানুষ কবিতাকে বিশ্বাস করে না, মনে করে তা একটা ভাবের বুদ্বুদমাত্র—সে ভাব জীবনপ্রবাহের সঙ্গে সংযুক্ত মিশ্রিত নয়। মোটের ওপর, কবিতা জীবন থেকে বিযুক্ত একটা মুখের কথা। কিন্তু পদ্মাতীরের জীবনে যে ভাব তাঁর মধ্যে প্রবেশ করেছিল তা যে কত সত্য কত দৃঢ়মূল তা প্রমাণ করলেন সারা জীবন সেই গ্রামের কাজেই উৎসর্গ করে। তিনি ভালোবাসলেন দেশকে, দেখলেন কোথায় যথার্থ কাজ, কোথায় ত্যাগের প্রয়োজন। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে একজনকে তাই লিখেছেন—"পাড়াগাঁয়ের মধ্যে পড়ে হীন শ্রেণীর উন্নতির জন্য পথে থাকায় কেউ সুখ পায় না ; কারণ, দেশকে সত্যভাবে কেউ ভালবাসে না, কেউ সেবা করে না, প্রভুত্ব করতেই চায়।" দীর্ঘদিন পূর্বে লেখা হলেও এ অভিযোগের কারণ আজও বর্তমান আছে। শুধু কাজ করার ইচ্ছা নয়, কি করতে হবে সে সম্বন্ধেও তাঁর ধারণা অস্পষ্ট নয়। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে সে সম্বন্ধে তাঁর যে পরিকল্পনা আজও তার চেয়ে বেশী কিছু হয়নি। তিনি লিখছেন—"চাষাদের সঙ্গে Cooperation-এ চাষ করা, ব্যাঙ্ক করা, ওদের স্বাস্থ্যকর স্থানে বাসস্থান স্থাপন করা, বৃদ্ধ বয়সের সংস্থান করে দেওয়া, রাস্তা করা, বাঁধ বেঁধে দেওয়া, জলকষ্ট দূর করা, পরস্পরকে পরস্পরের সহায়তা-সূত্রে আবদ্ধ করা এমন কত কাজ আছে তার সীমা নেই।" পদ্মাতীরের জীবন তাঁকে টেনে নিয়ে গেল পরাধীন দেশের দারিদ্র্যপূর্ণ তামসিক জড়জীবনের দুঃখের মধ্যে—সে দুঃখের ছবি শুধু তাঁর কবিতার প্রেরণা যুগিয়েই থেমে গেল না, কঠিন বাস্তব কর্মক্ষেত্রে তিনি নেমে এলেন। ভেবেছিলেন দেশের এই সত্য সেবায় দেশের মঙ্গলকে মূল থেকে তৈরি করে গড়ে তুলবার কাজে সাহায্য করবেন দেশের যুবকবৃন্দ। নানা বিদ্যা শিখতে বিদেশে পাঠালেন দু'একজনকে। কৃষিবিদ্যা শিখতে পাঠালেন জামাতাকে। এখানে সেই সময়ে তাঁর জামাতাকে লেখা চিঠিখানি থেকে খানিকটা উদ্ধৃত করব। এই আশ্চর্য চিঠিখানি থেকে বোঝা যায়, পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্বে যখন সর্বত্র জমিদাররা

নিজ নিজ জমিদারীতে এক একটি সম্রাট ছিলেন, তখন প্রজাদের প্রতি কি তাঁর মনের ভাব ছিল। কি পরিণত মনের মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ ছিল তাঁর প্রত্যহের ভাবনা—১৯০৮ সালে তিনি insect pest সম্বন্ধে, জল সেচন সম্বন্ধে শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে লিখছেন—

> "তোমরাও দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজার অন্নগ্রাসের অংশ নিয়ে বিদেশে কৃষি শিখতে গেছ, ফিরে এসে এই হতভাগ্যদের অন্নগ্রাস কিছু পরিমাণেও যদি বাড়িয়ে দিতে পার তাহলে এই ক্ষতিপূরণ হয়ে মনে সান্ত্বনা পাব। মনে রেখ টাকা চাষীর টাকা, এই চাষীরাই তোমাদের শিক্ষার ব্যয়ভার নিজেরা আধপেটা খেয়ে এবং না খেয়ে বহন করছে—এদের এই ঋণ সম্পূর্ণ শোধ করবার দায় তোমাদের উপর রইল।"

নূতন যুগের মর্মবাণী অতি স্বচ্ছভাবে এই সামান্য ক'টি কথার মধ্যে প্রকাশিত। মতবাদের কোলাহল না তুলে, পলিটিক্যাল তর্ক না করে সুস্থ বুদ্ধিবিবেকের এই সত্যদৃষ্টি আজও কি দেশে শুনতে পেয়েছেন দেশের প্রমুখরা?—যাঁদের হাতে অগণিত দরিদ্র নরনারীর ভাগ্য ভাঙগাগড়া হচ্ছে।

জীবনের শেষ পর্ব পর্যন্ত তাঁর গভীরতম চিন্তা মনন ও অনুভবের বিচিত্র দিকের মধ্যে প্রধান একটি দিক ছিল সাধারণ মানুষের কল্যাণকামনা, সর্বাঙ্গীণ কুশলসাধন। মানুষ যে মৃন্ময় এবং চিন্ময় দুইই, তার মাটির পাত্রেই যে অমৃত আছে সে কথা যিনি জানেন, তিনি মাটিকে অশ্রদ্ধা করেন না। তারই সূত্রে শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের বিবিধ কর্মের আরম্ভ। মানুষকে সুখে রাখবার সেই যে ইচ্ছাটি ছিন্নপত্রে পঁচিশ বৎসর বয়সে জেগেছিল, দীর্ঘকাল ধরে নানা দুর্লঙ্ঘ্য বাধা অতিক্রম করে সেই ইচ্ছা বলবতী নদীর মত ক্রমেই নানা শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত হয়ে প্রবাহিত হল। জগতের ইতিহাসে কোনো কবির জীবন এমন কর্ম-ময় উদ্যমে পূর্ণ হতে দেখা যায় না।

আজীবন কবির একটি প্রধান দিক ছিল কৌতুকপ্রিয়তা,

কোনো অবস্থাতেই তা রুদ্ধ হত না—ছিন্নপত্রের মধ্যে সেই উজ্জ্বল ঝলমলে কৌতুক প্রতিদিনের ঘটনাকে রসে জমিয়ে তুলেছে। সামান্য উপলক্ষে অসমান অবস্থায়, অসমান পদে স্থিত লোকের সঙ্গে জমিয়ে তুলতেন মজা।

ছিন্নপত্রে আমরা দেখি, চারিদিকের পরিদৃশ্যমান প্রকৃতির সৌন্দর্যমগ্ন কবির মন নানা গভীর উপলব্ধির মধ্যে প্রবেশ করছে কিন্তু তা সত্ত্বেও অর্ধশিক্ষিত গ্রাম্য পোস্টমাস্টারের সঙ্গে বসে তার বাজে গল্প শুনতে তিনি আমোদ পান—আরো কত ছোটখাটো ঘটনা, মেমসাহেবের উৎপাত। স্কুলের ছেলেদের বিনয় সম্বন্ধে বক্তৃতা, স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উপদেশ—সবই চিরকালের মানুষকে হাসিয়ে মারবে। মহামূল্যবান হীরার উপর আলো যেমন ঝকমক করে, তেমনি তাঁর মহিমান্বিত গভীরতার উপর চিরকাল ঝলমল করেছে কৌতুক—তাঁর জীবনের একটা বড় অংশ অকারণ আনন্দ-হাস্যে উদ্ভাসিত। বস্তুত জীবনভোগের সমস্ত উপকরণ তিনি সঙ্গে নিয়েই জন্মেছিলেন, বাইরের সরঞ্জামের বিশেষ প্রয়োজন ছিল না।

"না চাহিতে মোরে যা করেছ দান, আকাশ আলোক তনু মন প্রাণ"—জীবনের রসোৎসবে সেই ছিল যথেষ্ট।

কিছুদিন থেকে বঙ্গসাহিত্যে, বঙ্গসাহিত্যে বললে ভুল হবে, কারণ যা কিছু ছাপা হয় তাই সাহিত্য নয়, যাই হোক লেখক সম্প্রদায়ের কয়েকজনের মধ্যে, একটা অসুস্থ মনোবৃত্তি দেখা যাচ্ছে। তাঁরা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও জীবন মিলিয়ে জীবন-রচনার চেষ্টায় কল্পনার ঘোড়দৌড় করিয়ে নানা বিকৃত কাহিনী গড়ে তুলছেন। আপন আপন সঙ্কীর্ণ মাপে, পঙ্গু চিন্তায় তাঁরা রবীন্দ্র-সাহিত্যের পূর্ণ বিচারে চেষ্টিত হয়েছেন। তাঁদের আমরা অনুরোধ করি, একবার ছিন্নপত্রের মধ্যে সেই আশ্চর্য জীবনপ্রবাহকে দেখতে। জগতের কোন্ কবি তাঁর প্রথম উদ্বেল যৌবনে, পাড়াগাঁয়ের গেঁয়ো মানুষের সঙ্গে সম্পূর্ণ উপকরণ-বিহীন হয়ে এমন মধুর এমন আনন্দময় জীবন বছরের পর বছর যাপন করেছেন? কোথায় ছিল

তাঁর আনন্দের উৎস, কোথা থেকে উৎসারিত কবিতা? কি করে জাগল এই মানবপ্রেম, যা নিয়ে গেল সর্বসাধারণের মধ্যে তাঁর করুণা। কোমর বেঁধে দেশহিতব্রতের সে সংকল্প নয়, সে স্বতঃ-নির্ঝরিত ভালবাসা। সুখী হবার উপকরণ, প্রাণমনকে অনুভব করবার উপকরণ ছিল তাঁর আপন অন্তরে, পদ্মাতীরের নিঃসঙ্গ দিনগুলি তাই কোন বিশ্বাতীত আনন্দসংগীতে ভরে উঠত। প্রকৃতির সঙ্গে এই গভীর আনন্দসংগম একটি ভাববিলাস নয়, এ তাঁর জীবনের প্রবলতম সত্য। পঁচিশ ত্রিশ বৎসরের অভিজাত ধনী যুবক কবি যাঁর জীবন সুখসঙ্গে সরস হয়ে নানা ভোগে পূর্ণ থাকবে, সেই শক্তিমান পুরুষ দিনের পর দিন গ্রামের পথে পথে যেখানে শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যটুকুও বজায় রাখা কঠিন, চা কোকো পর্যন্ত দুর্লভ বস্তু—হঠাৎ ম্যাজিস্ট্রেট অতিথি এসে পড়ায় যে সব বস্তুর অভাবে বিপদেই পড়তে হয়, সেখানে উপকরণবিমুখ কবি নিরবচ্ছিন্ন একাকী আনন্দসাগরে মগ্ন হয়ে রয়েছেন। ছিন্নপত্রের প্রতি ছত্রে সে সংবাদ আছে। ঝড় উঠছে, বজ্র বিদ্যুতে নৌকা দুলছে, জ্যোৎস্না বিগলিত হচ্ছে, সর্বোপরি আকাশ-ভ্রমণকারী ত্রিবিক্রম সূর্যের মহিমা—কখনো উদয়লীলা, কখনো অস্তের সমারোহ, শুধু নিত্য নূতন রসে চলেছে পৃথিবীর রবির "পূরবে পশ্চিমে বন্ধু-সংগম।" এরকম অবস্থা দু'চার দিন পরেই বহু মানুষের কাছেই একঘেয়ে নির্বাসন-দুঃখে পরিণত হ'ত। কিন্তু সেই একই রকম প্রাকৃতিক দৃশ্যে সাজান একই রকম দিনগুলি প্রত্যহ নূতন হয়ে এসেছে তাঁর কাছে না-পড়া চিঠির মত, প্রতি প্রত্যূষে গ্রহণ করেছেন এক একটি স্বর্ণরেখাঙ্কিত পরম রহস্যময় সূর্যসনাথ দিন। বস্তুত ছিন্নপত্রের কোনো ব্যাখ্যা নেই—ছিন্নপত্রের মধ্যেই কবির জীবন-দর্শন কাব্য ও সাহিত্যের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়—এবং জানা যায় যে কোনো মহৎ মানুষের জীবনকে যদি আমরা 'হওয়া' এবং 'করা' এই দুই পর্যায়ে ভাগ করি, তবে রবীন্দ্রনাথের এই ছিন্নপত্রের যুগ তাঁর হওয়ার যুগ, যখন সৃষ্ট হয়ে উঠল রবীন্দ্রনাথের অন্তরতর মানবধর্ম, যা পরে বিভিন্ন পর্যায় বহুবিধ কর্মের মধ্যে সত্য হল।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প

শ্রীশান্তা দেবী

রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে স্বল্প পরিসরে যে কোন সূত্র ধরেই লেখা যাক্, নূতন কথা বলা বড় শক্ত। সুতরাং তাঁর ছোটগল্প বিষয়ে আমি যা দু' চারটি কথা বলব তা হয়ত আর পাঁচজনেও বলেছেন; ইতরবিশেষ অল্প একটু থাকবে, এই যা। অবশ্য আমি বেশী কারুর লেখা পড়িনি।

বাংলা দেশে ছোটগল্পের আগে রোমান্টিক এবং অল্প দু' চারটি সামাজিক উপন্যাস রচিত হয়। সেটা রবীন্দ্রনাথের আগে একথা সকলেই জানেন। কিন্তু প্রথম ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র ছোটগল্প লেখেন নি। ছোটগল্প রচনার প্রবর্তন করেন রবীন্দ্রনাথ। ১৩০০ সালেরও আগের কথা সে। রবীন্দ্রনাথের দিদি স্বর্ণকুমারীও কিছু ছোটগল্প লেখেন একই সময়ে এবং নগেন্দ্রনাথ গুপ্তও কিছু লিখেছিলেন। শেষোক্ত দুইজনের গল্পের কথা আজকালকার পাঠকরা বিশেষ জানেন না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প এখনও বাঙালী পাঠকের কাছে পুরানো বা ইতিহাসের মশলা হয়ে যায়নি। ছোটগল্পপ্লাবিত আজকের বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প এখনও নিজের অনবদ্য সৌন্দর্য ও বিশিষ্টতা নিয়ে মাথা উঁচু করে আছে। বাংলায় রবীন্দ্রনাথ প্রথম ছোটগল্প আমদানি করলেন এটা তো বড় কথা বটেই। তার চেয়েও বড় কথা এই যে, রোমান্টিক উপন্যাস যখন বাংলার মনকে আচ্ছন্ন করে আছে, সেই সময় তিনি বাংলার অতি সাধারণ মানুষের একেবারে ঘরোয়া জীবনের ছোটবড় সুখদুঃখ ও আশানিরাশার লীলাগুলির উপর আপন হৃদয়ের মমতারঞ্জিত মায়াতুলিকা বুলিয়ে, ছোটগল্পের এমন পুষ্পপেলব চিত্রগুলি পাঠকের চোখের উপর তুলে ধরেছিলেন। সমালোচকের

কলম দিয়ে তাকে আঘাত করতে গেলে যেন সেই চিত্রগুলির গায়ে ছড় লেগে যাবে। ষাট-সত্তর বৎসর আগে শিক্ষিত বাঙালীরা পুশ্‌কিন্‌ টুরগেনিভ বা মোপাসাঁর গল্প অনেকে পড়তেন ; কেউ কেউ অনুবাদও করতেন। সে সব গল্পের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের গল্পে খুঁজতে যাবার চেষ্টা করার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ 'গল্পগুচ্ছ'র গল্পগুলি নিছক বাংলাদেশের পটভূমিকায় বাংলা মনের ছবি। শুধু ছবি বললে অবশ্য সম্পূর্ণ বলা হয় না, গল্প-গুলি যেন বাংলার বাহিরের ছবি ও অন্তরের গানকে লেখনীর সুকুমার সূত্র দিয়ে অটুট গ্রন্থিতে গেঁথে তোলা। বিজ্ঞতার বোঝা নিয়ে তার পরখ করতে গেলে ওজন সইবে না।

আমরা সেদিক দিয়ে যাব না। আমরা দেখব আমাদের সেই বাংলা দেশকে যা নিতান্তই সাধারণ সাদাসিধে বাংলা দেশ। যেখানে শহরে—

"নিবারণ প্রাতঃকালে উঠিয়া গলির ধারে গৃহদ্বারে খোলা গায়ে বসিয়া অত্যন্ত নিরুদ্বিগ্ন ভাবে হুঁকাটি লইয়া তামাক খাইতে থাকে। পথ দিয়া লোকজন যাতায়াত করে, গাড়ী ঘোড়া চলে, বৈষ্ণব ভিখারী গান গাহে, পুরাতন বোতল সংগ্রহকারী হাঁকিয়া চলিয়া যায় ; এই সমস্ত চঞ্চল দৃশ্য মনকে লঘুভাবে ব্যাপৃত রাখে এবং যেদিন কাঁচা আম বা তপসি মাছওয়ালা আসে, সেদিন আমের দরদাম করিয়া কিঞ্চিৎ বিশেষ-রূপ রন্ধনের আয়োজন হয়। তাহার পর যথাসময়ে তেল মাখিয়া স্নান করিয়া আহারান্তে দড়িতে ঝুলান চাপকানটি পরিয়া, এক ছিলিম তামাক পানের সহিত নিঃশেষপূর্বক আর একটি পান মুখে পুরিয়া আপিসে যাত্রা করে।"

যেখানে বাগান বলতে—

"শুষ্কডালের মাচার উপর কুষ্মাণ্ডলতা উঠিয়াছে ; বৃদ্ধ কুলগাছের তলায় বিষম জঙ্গল ; রান্নাঘরের পাশে প্রাচীর ভাঙিয়া কতকগুলো ইঁট জড় হইয়া আছে এবং তাহারই সহিত দগ্ধাবশিষ্ট পাথুরে কয়লা এবং ছাই দিনদিন রাশীকৃত হইয়া উঠিতেছে।"

পল্লী-অঞ্চলে—

"পূর্ণবর্ষায় এই বাংলাদেশের চারিদিকেই ছোটবড় আঁকাবাঁকা সহস্র জলময় জাল বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। সরল শ্যামল বঙ্গভূমির শিরা-উপশিরাগুলি পরিপূর্ণ হইয়া তরুলতা তৃণগুল্ম ঝোপঝাড় ধান পাট ইক্ষুতে দশদিকে উন্মত্ত যৌবনের প্রাচুর্য যেন একেবারে উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছে।"

এখানে বৃষ্টির সময়—

"চাষীরা টোকা মাথায় দিয়া বাহির হইয়াছে, স্ত্রীলোকেরা ভিজিতে বাদলার শীতল বায়ুতে সঙ্কুচিত হইয়া কুটির হইতে কুটিরান্তরে গৃহকার্যে যাতায়াত করিতেছে ও পিছল ঘাটে অত্যন্ত সাবধানে পা ফেলিয়া সিক্তবস্ত্রে জল তুলিতেছে, এবং গৃহস্থ পুরুষেরা দাওয়ায় বসিয়া তামাক খাইতেছে, নিতান্ত কাজের দায় থাকিলে কোমরে চাদর জড়াইয়া জুতা হস্তে ছাতি মাথায় বাহির হইতেছে। অবলা রমণীর মস্তকে ছাতি এই রৌদ্রদগ্ধ বর্ষাপ্লাবিত বঙ্গদেশের সনাতন পবিত্র প্রথার মধ্যে নাই।"

রবীন্দ্রনাথ বাংলা দেশেই জন্মেছিলেন, বাংলা দেশেই জীবন যাপন করেছেন। তবে তিনি কলিকাতা শহরের ধনী ও অভিজাত বংশে উচ্চাঙ্গের সাংস্কৃতিক আবহাওয়ায় অধিকাংশ দিন কাটিয়েছেন। এই আবহাওয়ায় তাঁর ছোটগল্প রচনার সূচনা হয়নি। যে সময় তিনি ছোটগল্প রচনা শুরু করেন এবং সেই রসে মশগুল হয়েছিলেন, সেই সময়টা বহুদিনই তাঁর কেটেছিল পূর্ববাংলার নদীর ধারে বা নদীর উপর নৌকায় শিলাইদহে ও সাজাদপুরে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এই বাংলার নরনারী তাঁর দৃষ্টিকে নূতন ক্ষেত্রে প্রসারিত করে দেয়, এবং মনে নূতন সুর বাজিয়ে তোলে। তাই, যদিও রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের ছোটগল্পে শহরের মানুষ ও শহরের জীবনের দুর্ভিক্ষ নেই, তবু এই নদীমাতৃক পল্লীবাংলা ও গ্রামবাসী নরনারীর ভিড়ই সেখানে বেশী। কলিকাতার ধনীর ঘরের অভিজাত বংশের নানা সংস্কৃতিসম্পন্ন ও

কৃত্রিম সভ্যতাগর্বিত মানুষের চেয়ে প্রকৃতির কোলে অযত্নে বর্ধিত সহজ মানুষরাই কবিকে সে যুগে বেশী আকর্ষণ করেছে। তিনি কবি, তাই গল্পরচনার ক্ষেত্রেও তাঁর কবিধর্ম জয়ী হয়েছে।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলিকে নানা দিক দিয়ে দেখা যায়, নানাভাবে নানা পর্যায়ে ভাগ করাও যায়। প্লটের গঠন-পারিপাট্য, চরিত্র-চিত্রণ, জীবন-মরণ-রহস্যের দোলা, এইরূপ এক একটি বিশেষত্ব এক এক শ্রেণীর গল্পে বড় করে দেখতে পাই। কিন্তু ছোট কয়েকটি পাতার মধ্যে এত বিচিত্র সৌন্দর্যের পরিচয় দেওয়া বা নেওয়া চলে না। তাই বাংলার পল্লী ও গ্রামবাসী যে নরনারীরা রবীন্দ্রনাথের গল্পরচনার প্রেরণা জাগিয়েছিল তাদের অতি সহজ রূপের কথাই প্রধানতঃ বলব। যারা প্রকৃতির পাঠশালার উপরে আর কোনো উচ্চতর ক্ষেত্রে পাঠ নেয়নি সেই যশোরের ভৃত্য রাইচরণ, গ্রাম্য জিমন্যাষ্টিক দলের পলাতক বালক তারাপদ, নির্জন বনভূমির কোলে পালিতা বোবা মেয়ে সুভা, স্টেশন মাস্টারের দস্যি মেয়ে মৃন্ময়ী, মাতৃস্নেহবঞ্চিত পিতৃহীন দুরন্ত বালক ফটিক, অনাথ শিশু নীলমণির দিদি শশী, 'খাতা'র অধিকারিণী বালিকা-বধূ উমা, রাধানাথ জীউর সেবিকা বিধবা জয়কালী, উলাপুরের পোস্ট মাস্টারের পোষ্যা বালিকা রতন, জমিদারী নায়েবের বালিকা-কন্যা গিরিবালা, তরুণী কুলীনকন্যা মহামায়া এরা কবির মনোবীণার তন্ত্রগুলিকে তেমনি ভাবেই সুরে ঝঙ্কৃত করে তুলেছে যেমন করে কবির মনে ঝঙ্কার তোলে বর্ষার ঝরঝর জলধারার শব্দ, নদীর ছল-ছল চলচল গতি, গ্রাম বনানীর শোভা, জ্যোৎস্নারাত্রির গভীর মৌনতা, ঝড়ের গর্জন, দামিনীর চমক—কি মূক পশুর ক্রন্দন। জননী বসুন্ধরার এরা কোলের সন্তান, এখনও মাতৃ-অঞ্চল এরা ছাড়েনি। তারা অনেকাংশে প্রকৃতির মতই অকৃত্রিম আবেগে ও অনুভূতিতে উদ্বেল। প্রকৃতির মূক সন্তানদের চেয়ে তাদের ভাষা ও চিন্তার বহিঃপ্রকাশ খুব বেশী নয়। তাই তাদের অবলম্বন করে তাঁর এই গদ্য গাথাগুলি অপূর্ব সৌন্দর্যে বিকশিত হয়ে উঠেছে। কবি-

মাত্রেরই সাধারণ মানুষের চেয়ে প্রকৃতির সঙ্গে যোগ নিবিড়তর। রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে অন্যান্য কবিকেও ছাড়িয়ে গিয়েছেন। তিনি প্রকৃতিরই চারণ। তাই প্রকৃতির এই কোলের সন্তানগুলিকে তার থেকে অভিন্ন করে তিনি দেখেন নি এবং সেইজন্যেই মানুষগুলির সুখদুঃখের অন্তস্তলে তিনি তাঁর সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে অনায়াসে প্রবেশ করতে পেরেছেন। বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতির স্পর্শ তিনি এখানে পেয়েছেন তাঁর হৃদয় দিয়ে; রচনালীলায় মস্তিষ্কের কলাকৌশলকে আগ-বাড়িয়ে তত ডাক দেননি। বিধাতা তাঁকে কলাকুশল করেই গড়েছিলেন, কাজেই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে কলার প্রকাশ তাঁর রচনায় আপনি ফুটে উঠেছে। তবু আরো দুই এক-জনের মত আমিও বলি—কবির প্রথম দিকের গল্পগুলি বেশীরভাগই গীতধর্মী এবং সেই গীতরসাধিক্যের সঙ্গেই গল্পরচনার নানা টেকনিক রচনালীলার আনন্দে তাঁর লেখনী থেকে বারে বারে প্রসূত হয়েছে। লিরিক কবিতার মত শুধু একটিমাত্র আনন্দ বা বেদনার খেলাকে মূর্তি দিয়েই শেষ হয়েছে এমন গল্প আছে অবশ্য। কিন্তু ঐটুকুতেই পর্যবসিত নয় অধিকাংশ গল্প।

'অতিথি' গল্পটি কবি ও কথকের রচনালীলার একটি আশ্চর্য দৃষ্টান্ত। মনে হয়, পূর্ববঙ্গে নদীপথে ভ্রমণকালে নিশ্চয়ই তারা-পদর মত এমনি একটি উদাসীন প্রিয়দর্শন ভবঘুরে বালক রবীন্দ্র-নাথের দৃষ্টিপথে পড়েছিল। কবি তার মনের যে ছবি লেখনীতে ফুটিয়ে তুলেছেন বালকের মর্মস্থলে সেকথা ছিল, কিন্তু নিজের সজ্ঞান মানসে কখনও হয়ত বালক সেকথা ভেবে উঠতে পারেনি। কবির নিজের মনের 'সুদূরের পিয়াসা' নিয়ে তিনি যেন এই বালকের অন্তঃকরণে প্রবেশ করে তার চক্ষু ও তার মন দিয়ে বিশ্ব-পৃথিবীকে দেখেছিলেন। বালক তারাপদ সম্পর্কে আছে—

> "সে যখনিই দেখিত নদী দিয়া বিদেশী নৌকা গুণ টানিয়া চলিয়াছে, গ্রামের বৃহৎ অশ্বত্থগাছের তলে কোন্ দূরদেশ হইতে এক সন্ন্যাসী আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে, অথবা বেদেরা নদীর তীরের পতিত মাঠে

ছোট ছোট চাটাই বাঁধিয়া, বাখারি ছুলিয়া চাঙারি নির্মাণ করিতে আসিয়াছে, তখন অজ্ঞাত বহিঃপৃথিবীর স্নেহহীন স্বাধীনতার জন্য তাহার চিত্ত অশান্ত হইয়া উঠিত।"

মনে হয়, কবির তরুণ বয়সের মনের ছবি কতকটা এই রকম। তারাপদ ও তার প্রকৃতিমাতার মধ্যে যে ভেদরেখা কবির চক্ষে তা খুবই সূক্ষ্ম। তারাপদ "নিত্যসচলা প্রকৃতির মত সর্বদাই নিশ্চিন্ত উদাসীন, অথচ সর্বদাই ক্রিয়াসক্ত। মানুষমাত্রেরই নিজের একটি স্বতন্ত্র অধিষ্ঠানভূমি আছে ; কিন্তু তারাপদ এই অনন্ত নীলাম্বর-বাহী বিশ্বপ্রবাহের একটি আনন্দোজ্জ্বল তরঙ্গ—ভূত-ভবিষ্যতের সহিত তাহার কোনো সম্বন্ধ নাই—সম্মুখাভিমুখে চলিয়া যাওয়াই তাহার একমাত্র কার্য।" নদীর জলের মতই সে দুইতীরে আনন্দ বিতরণ করে, আবার নদীর জলের মতই দূর থেকে দূরান্তরে চলে যায়। তারাপদর এই লেখনী চিত্রটি যেন একটি ভাবময়ী কবিতা।

তার চরিত্রের অন্যান্য বিশিষ্টতাও এই কাব্যধর্মী চিত্রণের ভিতর দিয়েই সুস্পষ্টরূপে ফুটে উঠেছে। সে শুধু ভবঘুরেই নয়, কবি তার অন্তরের ছবিটি নানা দিকে ঘুরিয়ে দেখেছেন। "তারাপদ হরিণশিশুর মত বন্ধনভীরু, আবার হরিণেরই মত সংগীতমুগ্ধ।" সে নানা যাত্রা থিয়েটারে ঘুরেছে কিন্তু সেসব দলের আবিলতা তার অন্তরের শুচিতাকে ভেদ করতে পারেনি। "সে এই সংসারে পঙ্কিল জলের উপর দিয়া শুভ্রপক্ষ রাজহংসের মত সাঁতার দিয়া বেড়াইত। কৌতূহলবশত যতবারই ডুব দিত তাহার পাখা সিক্ত বা মলিন হইতে পারিত না।"

মনে হতে পারে 'অতিথি' গল্পটি বুঝি কেবলি এই সদাচঞ্চল বালকের চরিত্রচিত্রণ—অতি দক্ষ উপমা ও পদলালিত্যের সহযোগে বর্ণিত। কিন্তু তা নয়, 'অতিথি' সত্যই একটি ছোটগল্পের গল্প-রসেও ভরপুর। বালিকা চারুর মনের আকর্ষণ ও বিকর্ষণের খেলা এই তারাপদকে ঘিরে কত পথে কিভাবে এইটুকু গন্ডীর মধ্যে ধরা দিয়ে গল্পের দানা বেঁধে তুলেছে তা উদ্ধৃতি দ্বারা বোঝান যায়

না। চারুকে অবলম্বন করেই গল্পটি তার পরিণতির দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। চারু ও তার পিতামাতার স্নেহপ্রেম, বন্ধুত্ব যখন তারাপদকে শতবাহুতে ঘিরে ধরে ঘূর্ণির মাঝখানের স্থির বিন্দুটিতে প্রায় বেঁধে ফেলেছে, ঠিক তখনই আবার জননী বিশ্ব-পৃথিবী তাকে 'বাহির পানে' ডাক দিলেন। এইরূপে রসোত্তীর্ণ ছোটগল্পের নিষ্ঠুর আঘাতে পাঠকের বুক ঠেলে দীর্ঘনিঃশ্বাস দিগন্তে মিলিয়ে গেল।

ঘরছাড়া বন্ধনহীন কিশোর বালকদের প্রতি কবির মনের একটা টান অন্যান্য গল্পেও দেখা যায়। এরা ঘরছাড়া, কিন্তু সকলেই একরকম নয়। 'আপদ' গল্পের নীলকান্তও যাত্রার দলের ছেলে; কিন্তু সে তারাপদর মত নয়। তারাপদ অযাচিত স্নেহ পেয়েও ঘরে-বাইরে বারে বারে আপন হাতে মমতার বন্ধন কেটে বেরিয়ে যায়; কিন্তু নীলকান্ত স্নেহভিক্ষু। জীবনে স্নেহ সে বেশী পায়নি। যখন পেল, তখন সে তার হৃদয়ের পাওনায় প্রতিদ্বন্দ্বীকে সহ্য করতে পারল না। এতদিন জীবনের সঙ্গে তার যা পরিচয় ছিল তাতে "নীলকান্তের দৃঢ় ধারণা ছিল যে, পৃথিবীর জলস্থল-বিভাগের ন্যায় মানবজন্মটা আহার এবং প্রহারে বিভক্ত; প্রহারের অংশটাই অধিক।" তার বয়ঃসন্ধিক্ষণে যে "লক্ষ্মী এই লক্ষ্মীছাড়াকে আশ্রয় দিয়েছিলেন," নীলকান্ত যখন গান গাইত তখন ক্ষণে ক্ষণে গানের সুরের মায়ামন্ত্রবলে "তাহার কল্যাণমণ্ডিত বলয়বেষ্টিত বাহু দুইখানি এবং দুর্লভ সুন্দর পুষ্পদলকোমল রক্তিম চরণযুগল কী-এক মায়ামন্ত্রবলে রাগিণীর মধ্যে রূপান্তরিত হইয়া যাইত।" কিন্তু এই মায়াজাল পরমুহূর্তেই টুটে যেত। যাত্রার দলের নীলকান্ত তার "বালক ভক্তমণ্ডলীর অধিনায়ক হইয়া জলে স্থলে এবং তরুশাখাগ্রে নব নব উপদ্রব সৃজন করিতে বাহির হইত।" একদিকে কিরণের স্নেহ আর একদিকে গ্রাম্য বালকদের অধিনায়কত্ব নিয়ে নীলকান্তর দিন সুখেই কাটছিল। অকস্মাৎ সতীশের রূপ ধরে দোসরের আগমনে তার সুখস্বপ্ন ভেঙে গেল।

"তার মন তীব্র তিক্তরসে পরিপূর্ণ হইয়া গেল।" এই দিক দিয়ে দেখতে গেলে 'অতিথি'র তারাপদর চেয়ে 'আপদ'-এর নীলকান্তই ভবঘুরে গ্রাম্য-বালকের আরও পরিচিত ছবি। তারাপদ একের বেশী পাওয়া শক্ত, নীলকান্ত বহু মিলতে পারে। নীলকান্তর মনের এই তিক্তরসের বহিঃপ্রকাশেই গল্পটি দানা বেঁধে উঠেছে। সতীশকে জব্দ করার জন্য বালকটির ঈর্ষা ও প্রতিহিংসা তাকে যে পথে নিয়ে গেল, তার ফলে নীলকান্ত তার আরাধ্যা লক্ষ্মীরূপিণীর কাছে চোর প্রতিপন্ন হল। এই অপমানই কিশোর বালকের জীবনের ট্রাজেডি। কেন যে নীলকান্ত চোর প্রতিপন্ন হল সে দুঃখের কথা কিরণকে বলা তার পক্ষে অসম্ভব, কিরণই বা কেন নীলকান্তর বাক্স খুলেছিল তাও নীলকান্তকে বলা গেল না। নীলকান্ত কিরণের শেষ স্নেহস্পর্শটুকুর পরিচয় কোনোদিনই পাবার সুযোগ পেল না, ভ্রান্ত ধারণা নিয়েই তাকে চলে যেতে হল। কিন্তু লক্ষ্মীরূপিণী কিরণ বালকের মনের আসল কথাটি স্নেহের অন্তর্দৃষ্টিতে দেখে তার ব্যথার অংশটি নিজের হৃদয়ের অর্ঘ্যরূপে গ্রহণ করে তাকে ক্ষমা করলে। প্লটের এই সূক্ষ্ম কারুকার্যটি অতি নিপুণ হাতের স্পর্শে আঁকা। তারাপদও গল্পের শেষে আবার পথে বার হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সে বন্ধনভীরু উদাসীন, সংসারের প্রেম বা অপ্রেম কোনটাই গায়ে মাখে না। নীলকান্ত স্নেহসক্ত বন্ধনভিক্ষু; সে ভালবাসতেও চায়, ভালবাসা পেতেও উন্মুখ; তার পথে যে দাঁড়ায় তাকে আঘাত করতেও সে উদ্যতহস্ত। মনটা তার আদিম মানবের চেয়ে বেশী অগ্রসর হয়নি। সেইজন্য কাব্যরস 'আপদ' গল্পের চেয়ে 'অতিথি'তে আমরা বেশী পাই।

'ছুটি'ও একটি স্নেহহারা কিশোর বালকের গল্প। বাপ-মরা দুরন্ত গ্রাম্য বালক। তেরো চোদ্দ বছর বয়স। এই বয়সের "ছেলের মত পৃথিবীতে এমন বালাই আর নাই।...শৈশব এবং যৌবনের অনেক দোষ মাপ করা যায়, কিন্তু এই সময়ের কোনো স্বাভাবিক অনিবার্য ত্রুটিও যেন অসহ্য বোধ হয়।...সে সর্বদা মনে-মনে

বুঝিতে পারে, পৃথিবীর কোথাও সে ঠিক খাপ খাইতেছে না...অথচ, এই বয়সেই স্নেহের জন্য কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত কাতরতা মনে জন্মায়।''

দুরন্ত বালক ফটিক মায়ের চোখেও উচ্ছৃঙ্খল অবাধ্য, মা তাকে মামাবাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে বাঁচলেন। বেচারী বালক মামীর নিকটও অন্যাবশ্যক দুর্গ্রহের মত প্রতিপন্ন হল; স্কুলেও আদর নেই, নির্বোধ বলে সে মার খায়। অথচ ফটিকের মন ''মাতৃহীন বৎসের মত'' কেবলি মনে মনে মা-মা করিয়া ব্যাকুল—এককণা স্নেহের জন্য সে কাঙাল।

ফটিকের যখন শক্ত পীড়া হল, তখন নির্দয়া অত্যাচারিণী হলেও তার আপন মায়ের কাছেই যাবার জন্য সে ব্যাকুল। ''জন্তুর মত একপ্রকার অবুঝ ভালবাসা—কেবল একটা কাছে যাইবার অন্ধ ইচ্ছা'' তাকে পেয়ে বসল। অন্ধ ইচ্ছার আকর্ষণে পীড়িত বালক মার কোলেই গেল, সেই মা যিনি চিরদিন চিরনিদ্রায় কোলে ধরে রাখেন, কোনো অত্যাচার করেন না। প্লটের গঠননৈপুণ্যের চেয়ে নারীস্নেহ-বঞ্চিত তৃষিত বালকের অন্তরের করুণ চিত্রটিই এই গল্পের বিশেষত্ব। কাব্যে উপেক্ষিতার মত সংসারনাট্যে ও সাহিত্যের পটে সর্বত্রই এই ফটিকজাতীয় বালকেরাও উপেক্ষিত। সেই উপেক্ষাই কবির মনের বেদনার রাগিণীকে ঝঙ্কৃত করে তুলেছে।

'সুভা' ও 'শুভদৃষ্টি' দুটি বোবা মেয়ের গল্প। এই গল্প-গুলিতেও রবীন্দ্রনাথ একাধারে কবি ও কথক। শুধু তাই নয়, আমরা বারে বারে যেমন দেখছি, এখানেও তেমনি দেখি তিনি মানুষকে নদী প্রান্তর অরণ্যানীর মতই বিশ্বপ্রকৃতির আর একটি অঙ্গরূপে তাঁর ছোটগল্পে দেখেছেন। তাঁর এই দেখা আরো পরিপূর্ণরূপে ফুটেছে যেখানে মানুষও মূক, সেইখানে। 'শুভদৃষ্টি' গল্পটির সুধা প্রথম দেখা দিল ''দুই হাতে দুইটি তরুণ হাঁস বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া'' নদীর ঘাটে। কান্তিচন্দ্র ''এমন জায়গায় এমন মুখ দেখিবেন বলিয়া কখনো আশা করেন নাই।...সেদিন শরতের শিশিরে এবং প্রভাতের রৌদ্রে নদীতীরের বিকশিত কাশ-

বনটি ঝলমল করিতেছিল, তাহারই মধ্যে সেই সরল নবীন মুখখানি কান্তিচন্দ্রের মুগ্ধ চক্ষে আশ্বিনের আসন্ন আগমনীর একটি আনন্দ-চ্ছবি আঁকিয়া দিল। মন্দাকিনীতীরে তরুণ পার্বতী কখনো কখনো এমন হংসশিশু বক্ষে লইয়া আসিতেন, কালিদাস সে কথা লিখিতে ভুলিয়াছেন।''

বনমধ্যে হংসশিশু ক্রোড়ে সুধার ছবি ও গৃহপ্রাঙ্গণে গোয়াল-ঘরে আহত ঘুঘু ও মার্জারশিশুর সান্নিধ্যে সুধার ছবি একই দেবীর ভিন্ন রূপ। ''প্রভাতে নদীতীরে বনের মধ্যে যাহাকে বনশ্রীর মত দেখিতে হইয়াছিল, আজ মধ্যাহ্নে'' তাহাকেই গ্রামলক্ষ্মীর মত দেখিতে হইল। সে যেন মানুষ নয়, বিশ্বপ্রকৃতিরই ছায়া।

এই গল্পটির প্লটের বাঁধনও সুন্দর। গল্পের শেষপ্রান্তে এসে পাঠককে প্লট যে চমক দেয়, মনে তার দোলাটি নিখুঁত রাখবার জন্য বালিকাকে অকস্মাৎ 'পাগলী' বলে আবিষ্কার করা হল। প্লটটির সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণই রইল, কিন্তু বেচারী বালিকা তরুণ পার্বতীর পদ থেকে অনেকখানি নীচে নেমে গেল। তার বনদেবীর উজ্জ্বল শ্রীতে কে যেন কালি লেপে দিল। মূক বালিকার প্রতি কবির সহানুভূতিও এখানে বিশেষ দেখা যায় না, তাই কাব্যরসে একটু ঘাটতি পড়ে।

কিন্তু 'সুভা' গল্পটিতে বোবা পৃথিবীর বোবা মেয়ে কবির পূর্ণ সহানুভূতিই পেয়েছে, অবশ্য কাব্যরসও কানায় কানায় পরি-পূর্ণ। যদিও গল্পের টেকনিক দেখতে গেলে 'শুভদৃষ্টি'র চেয়ে 'সুভা'তে লোকে কবিকে একটু কম নম্বর দেবে।

এই বোবা মেয়ে ''সুভার কথা ছিল না, কিন্তু তাহার সুদীর্ঘ-পল্লববিশিষ্ট বড়ো বড়ো দুটি কালো চোখ ছিল—এবং তাহার ওষ্ঠাধর ভাবের আভাসমাত্রে কচি কিশলয়ের মত কাঁপিয়া উঠিত।...কালো চোখকে কিছু তর্জমা করিতে হয় না—মন আপনি তাহার উপরে ছায়া ফেলে।'' কথাগুলি কতকটা তর্জমার মত। ''মুখের ভাব বৈ আজন্মকাল যাহার অন্য ভাষা নাই তাহার চোখের ভাষা অসীম উদার

এবং অতলস্পর্শ গভীর—অনেকটা স্বচ্ছ আকাশের মত, উদয়াস্ত এবং ছায়ালোকের নিস্তব্ধ রঙ্গভূমি।"

সুভা কথা কয় না, কিন্তু—"প্রকৃতি যেন তাহার ভাষার অভাব পূরণ করিয়া দেয়।...প্রকৃতির এই বিবিধ শব্দ এবং বিচিত্র গতি ইহাও বোবার ভাষা—বড়ো বড়ো চক্ষুপল্লববিশিষ্ট সুভার যে ভাষা তাহারই একটা বিশ্বব্যাপী বিস্তার ; ঝিল্লীরবপূর্ণ তৃণভূমি হইতে শব্দাতীত নক্ষত্রলোক পর্যন্ত কেবল ইঙ্গিত, ভঙ্গী, সংগীত, ক্রন্দন এবং দীর্ঘনিশ্বাস।"

গাভী, বিড়াল, ছাগল, নদীর জলস্রোত, পূর্ণিমারাত্রির আলো, এরাই ছিল সুভার বন্ধু। সুভা এই শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশে মূক ধরণীর মূক কন্যারূপে কবির পূর্ণ স্নেহস্পর্শ শেষ পর্যন্ত পেয়ে এসেছে। মূক বালিকাকে পরের হাতে সমর্পণ করে মা বাপ জাতকুল রক্ষা করলেন, কিন্তু বোবা বধূ ধরা পড়ে গেল। "যাহারা বোবার ভাষা বুঝিত সেই আজন্মপরিচিত মুখগুলি সে দেখিতে পায় না—বালিকার চিরনীরব হৃদয়ের মধ্যে একটা অসীম অব্যক্ত ক্রন্দন বাজিতে লাগিল—অন্তর্যামী ছাড়া আর-কেহ তাহা শুনিতে পাইল না।" কিন্তু মনে হয় কবি অন্তর দিয়ে শুনেছিলেন। 'শুভদৃষ্টি'র কান্তিচন্দ্রের যখন সবাক বধূ লাভ হল, তখন কবির আশীর্বাদ কান্তিচন্দ্রের উপরই পড়েছিল। কিন্তু 'সুভা'র স্বামী যখন "চক্ষু এবং কর্ণেন্দ্রিয়ের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া এক ভাষাবিশিষ্ট কন্যা বিবাহ করিয়া আনিল," তখন কবির অন্তরে সুভার অব্যক্ত ক্রন্দনই ধ্বনিত হতে শুনি। বুদ্ধিমান স্বামীর প্রতি কোনো সহানুভূতি এখানে কবির নেই।

'সমাপ্তি' গল্পের মৃন্ময়ীও এমনি প্রকৃতির ক্রোড়ে অযত্নবর্ধিত একটি বনলতা। শিক্ষাদীক্ষা কোনো কৃত্রিমতা তার মধ্যে আনেনি। মৃন্ময়ীর মুখের "গুণটি বোধকরি স্বচ্ছতা। অধিকাংশ মুখের মধ্যেই মনুষ্যপ্রকৃতিটি আপনাকে পরিস্ফুটরূপে প্রকাশ করিতে পারে না ; যে মুখে সেই অন্তরগুহাবাসী রহস্যময় লোকটি অবাধে

বাহির হইয়া দেখা দেয় সে মুখ সহস্রের মধ্যে চোখে পড়ে এবং এক পলকে মনে মুদ্রিত হইয়া যায়। এই বালিকার মুখে চোখে একটি দুরন্ত অবাধ্য নারীপ্রকৃতি উন্মুক্ত বেগবান অরণ্যমৃগের মত সর্বদা দেখা দেয়, খেলা করে; সেইজন্য এই জীবনচঞ্চল মুখখানি একবার দেখিলে আর সহজে ভোলা যায় না।"

"গ্রামের যত ছেলেদের সহিতই ইহার খেলা ;...শিশুরাজ্যে এই মেয়েটি একটি ছোটোখাটো বর্গির উপদ্রব বলিলেই হয়।" মেয়েটির কৌতুকপ্রিয়তারও অন্ত নেই। অপূর্ব যখন নদীতীরে ব্যাগসমেত কাদায় পড়ে গেল, "অমনি কোথা হইতে এক সুমিষ্ট উচ্চকণ্ঠে তরল হাস্যলহরী উচ্ছ্বসিত হইয়া নিকটবর্তী অশ্বথ গাছের পাখিগুলিকে সচকিত করিয়া দিল।"

এই হাস্যলহরী মৃন্ময়ীর। আবার অপূর্ব যখন কনে দেখে ফিরছিল তখন মৃন্ময়ীই তার জুতা নিয়ে পলায়ন করল।

"সুসজ্জিত অপূর্ব কর্দমাক্ত গ্রাম্যপথে" পরের পুরানো চটি পরিয়া "অত্যন্ত সাবধানে চলিতে লাগিল।"

তখনি "পুষ্করিণীর ধারে নির্জন পথপ্রান্তে আবার হঠাৎ সেই উচ্চকণ্ঠের অজস্র হাস্যকলোচ্ছ্বাস। যেন তরুপল্লবের মধ্য হইতে কৌতুকপ্রিয়া বনদেবী অপূর্বর ওই অসংগত চটিজুতাজোড়ার দিকে চাহিয়া হঠাৎ আর হাসি ধারণ করিয়া রাখিতে পারিল না।"

অপূর্ব যখন মৃন্ময়ীকে গ্রেপ্তার করিল তখন "রৌদ্রোজ্জ্বল নির্মল চঞ্চল নির্ঝরিণীর দিকে অবনত হইয়া কৌতূহলী পথিক যেমন নিবিষ্ট দৃষ্টিতে তাহার তলদেশ দেখিতে থাকে, অপূর্ব তেমন করিয়া গভীর গম্ভীর নেত্রে মৃন্ময়ীর ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত মুখের উপর, তড়িত্তরল দুটি চক্ষুর মধ্যে চাহিয়া দেখিল।" এখানেও সেই প্রকৃতিরূপিণীর ছবি। অপূর্বর মনে "নৃত্যময়ী প্রকৃতির নূপুর-নিক্বণের ন্যায় চঞ্চল হাস্যধ্বনিটি সমস্ত আকাশ ব্যাপিয়া বাজিতে লাগিল।" অপদস্থ অপূর্বর এই কৌতুকময়ী প্রকৃতিরূপিণীকেই

পছন্দ হয়ে গেল। সকলে এই পছন্দর নামকরণ করল 'অপূর্ব পছন্দ'।

গল্পটির প্লটের গঠনপারিপাট্য সোজাসুজি, কিন্তু সুন্দর। পাঠককে চমকিত করে দেবার জন্য কোনো কিছুর আকস্মিক আবির্ভাব নেই। শুধু যৌবন-সন্ধিক্ষণে বালিকা মৃন্ময়ীর উচ্ছ্বসিত হাস্যলহরী কি করে অশ্রুজলধারায় রূপান্তরিত হল তারই ইতিহাস। চমকিত হল অপূর্ব, পাঠকপাঠিকা নয়।

এমনি সব সাধারণ মানুষের গল্পের মধ্যে 'খোকাবাবুর প্রত্যা-বর্তন' গল্পটিও একটি। তার গ্রাম্যভৃত্য রাইচরণ একেবারেই সাধা-রণ লোক। তার শিক্ষাদীক্ষায় আধুনিকতার কোনো বালাই নেই। খোকাবাবু যখন পদ্মা-রাক্ষসীর গর্ভে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তখন প্রভুপত্নী রাইচরণকে সন্দেহ করেছিলেন। রাইচরণ মনের বেদনায় হতবাক্ হয়ে নিজের কপালে করাঘাত করেছিল মাত্র, আর কিছুই বলেনি। তারপর তার নিজ নবজাত পুত্রকে প্রভুপুত্র বলে বিশ্বাস করতে সে এতটুকুও দ্বিধা করেনি। বরং বলেছিল, "আহা, মায়ের মন জানিতে পারিয়াছিল তাহার ছেলেকে কে চুরি করিয়াছে।... পদ্মাও নয়, আর কেহও নয়, কৃতঘ্ন অধম এই আমি—"

এই গল্পগুলিতে প্রকৃতি শুধু পটভূমিকা নয়, প্রকৃতি যেন নাট্যলীলায়ও অংশ গ্রহণ করেছে।

'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পে যখন পদ্মা শিশুকে গ্রাস করল, তখন মানুষ ও প্রকৃতি পরস্পরের সঙ্গে খুব মাখামাখি হয়ে আছে। খোকাবাবুকে রাইচরণ যখন "জলের ধারে যাইতে নিষেধ করিয়া গেল, তাহাতে শিশুর মন...সেই মুহূর্তেই জলের দিকে ধাবিত হইল। দেখিল, জল খল্‌খল্ ছল্‌ছল্ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে; যেন দুষ্টামি করিয়া কোন্ এক বৃহৎ রাইচরণের হাত এড়াইয়া এক লক্ষ শিশু-প্রবাহ সহাস্য কলস্বরে নিষিদ্ধ স্থানাভিমুখে দ্রুত বেগে পলায়ন করিতেছে।...তাহাদের সেই অসাধু ' ন্তে মানবশিশুর

চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল।...দুরন্ত জলরাশি অস্ফুট কলভাষায় শিশুকে বার বার আপনাদের খেলাঘরে আহ্বান করিল।''

অদৃষ্টবাদী রাইচরণ ও পদ্মা নদী দুই যেন বিশ্বপ্রকৃতির কোলের সন্তান। একজন অপরাধভীরু স্নেহমুগ্ধ মানুষ, আর একটি ক্ষুধিত নদী।

প্রকৃতিতে, বিশেষ করে নদীর প্রতিই, কবির আকর্ষণ বেশী। তাই 'অতিথি'র তারাপদ ''বিশ্বপ্রবাহের একটি আনন্দোজ্জ্বল তরঙ্গ'', তাই পদ্মার ''দুরন্ত জলরাশি অস্ফুট কলভাষায় শিশুকে বার বার আপনাদের খেলাঘরে আহ্বান করিল।''

কাব্যে ও গদ্যসাহিত্যে সর্ব্বত্রই, মানুষের জীবনপ্রবাহ কি কাল-প্রবাহ, কবিকে বিরাট নদীপ্রবাহের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। নদীর তরঙ্গলীলায় তার ছল্‌ছল্‌ খল্‌খল্‌ হাস্যধ্বনি, তার স্বচ্ছতা, তার আবিলতা, তার প্রাণদায়িনী রূপ, তার রাক্ষসী মূর্ত্তি—নানারূপই কবির মানসনেত্রের সম্মুখে ভেসে ওঠে। তিনি শিশুদের জন্য একদিন লিখেছিলেন—

"ওরে তোরা কি জানিস কেউ
জলে উঠে কেন, এত ঢেউ।"

আবার শেষ বয়সে 'বলাকা'য় ভাবগম্ভীররূপে স্মরণ করেছিলেন নদীকে—

"হে বিরাট নদী, অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল
অবিচ্ছিন্ন অবিরল"...

কাব্যের নদীর কথা ভাবতে গেলে আমাদের নূতন পথে চলে যেতে হয়। সে চেষ্টা আজ করা চলে না, শুধু এইটুকু মনে রাখলেই যথেষ্ট যে, গদ্যে ও পদ্যে নদী সর্বদাই তাঁর মন জুড়ে আছে। তাই 'গল্পগুচ্ছ'র যুগের গল্পে নদী অধিকাংশ মানুষের দোসর হয়ে দেখা দিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলিকে নানাদিক দিয়ে দেখা যায় এবং নানা-ভাগে ভাগ করা যায় সেকথা আগেই বলেছি। এই ছোট লেখাটুকুর

মধ্যে সে চেষ্টা করা যাবে না। সুতরাং তাঁর প্রথম যুগের গীত-ধর্মী গল্পগুলির একাংশের মাত্র সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে আজ থামতে চাই। নিতান্ত সাধারণ কয়েকটি মানুষের হৃদয়ের অকৃত্রিম কান্নাহাসির দোলায় যে গান কবির হৃদয়ে ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল, গদ্য গল্পের ভিতর দিয়ে তারই গভীর ও মর্মস্পর্শী সুর তিনি এখানে আমাদের শুনিয়ে গিয়েছেন। যে গল্পগুলি অন্য পর্যায়ে পড়ে, সে আলোচনার স্থান এখানে সংকীর্ণ।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে বর্ষা

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

সাহিত্যের বিবর্তনে এ যুগে এসে আমাদের সবচেয়ে যেটা বেশী করে চোখে পড়েছে তা এর প্রকৃতি-বিমুখতা। আজকের সাহিত্য বাস্তবধর্মী, সুতরাং খানিকটা এরকম হতে বাধ্য এবং খানিকটা এ-ধর্মের অনুসরণ ক'রে এইভাবে এগিয়ে গেলে সাহিত্য যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে বলাও যায় না। মানুষের মন আজ অতিরিক্ত (analytical) অর্থাৎ বিশ্লেষণ-প্রবণ; প্রতিটি বস্তুর একেবারে মূলতত্ত্বে গিয়ে পেঁছতে হবে, তাকে তার বস্তুতত্ত্ব রূপেই গ্রহণ করতে হবে, এই হয়ে উঠেছে তার প্রতিজ্ঞা। চাঁদ যখন সুধা-পিণ্ড নয়, মাত্র এক অঙ্গার-পিণ্ড, তখন তাকে নিয়ে আর মাতামাতি করবার অবসর কোথায়? বর্তমান যুগের প্রশ্নটা হচ্ছে মোটামুটি এই।

মাতামাতি, অর্থাৎ কল্পনা-বিলাস, যা সাহিত্যের, বিশেষ ক'রে কাব্য-সাহিত্যের, এখন পর্যন্ত এক হিসাবে মূল-ধর্ম হয়ে এসেছে।

প্রশ্নটা যে মোটের উপর যুক্তিযুক্ত, একথা অস্বীকার করা যায় না। তবে সেই সঙ্গে এটাও ঠিক যে, ও প্রশ্নটার উত্তরও একটি কথাতেই শেষ করা যায় না। অঙ্গার-পিন্ড হিসাবে চাঁদকে অপাঙ্‌ক্তেয় করে দিয়েও তার মধ্যে এমন কিছু থাকে, যার জন্যে গয়ায় পিণ্ড দিয়ে তাকে সাহিত্য-জগৎ থেকে একেবারে 'উদ্ধার' করে দেওয়া যায় না। এই জিনিসটিকে একটি নাম দিয়ে বোঝানো শক্ত, তবু যদি দিতেই হয় তো চাঁদের 'ভাব-রূপ' বললে অনেকটা কাছা-কাছি আসা যায়। এই ভাব-রূপটির সঙ্গে অনাদিকাল থেকে মানুষের অন্তরের একটা যোগসূত্র থেকে এসেছে এবং ধ'রে নেওয়া যায় অনন্তকাল ধ'রে থাকবে। দিগন্ত বিস্তৃত আকাশের গায়ে

শান্ত-জ্যোতি-চন্দ্র, বঙ্কিম রেখামাত্র থেকে পূর্ণবৃত্ত পর্যন্ত সব অবস্থাতেই মানুষের মনে বিষাদ-ঔদাসীন্য-আনন্দ-উল্লাস প্রভৃতি নানাভাবের সৃষ্টি করে, কিংবা মন কোন কারণে কোন একটি ভাবে আবিষ্ট থাকলে সেই ভাবটিকে পরিপুষ্ট করে। এর সঙ্গে চাঁদের বস্তুরূপ বা তার সুধা-পিন্ড হওয়া বা না-হওয়ার কোন সম্বন্ধ নেই। এটা হয় তার বাহ্যিক রূপ আর অবস্থান বা বিন্যাসের জন্যে। তবে বাহ্যিক রূপ বা বিন্যাসই শেষ কথা নয়, তাই থেকেই আরও একটা কিছু এসে যায় যা অনির্বচনীয়—রস-জগতের চরম। এই সঙ্গে এ কথাও বলে রাখা ভালো, এই 'চরম' যে-হেতু রস-বস্তু, একে উপলব্ধি করাও রসিক-মানসের তারতম্যের উপর নির্ভর করে। 'উদভ্রান্ত প্রেম'-এর রচয়িতা-নায়ক চাঁদ দেখে দয়িতা-বিরহে আত্মহারা হয়ে পড়বেন বলে আমার ভৃত্য সাধুচরণও সেই রকম অভিভূত হয়ে পড়বে এমন আশা করা অন্যায়।

রবীন্দ্রনাথে এসে দেখি তাঁর কবি-মানস যেমন গভীরভাবে সংবেদনশীল তেমনি তার দশদিক খোলা, তাই তাঁর এই ভাব-রূপের উপলব্ধি যেমন গভীর তেমনি বৈচিত্র্যময়।

চাঁদ সম্বন্ধে যা বলা হোল, প্রাকৃতিক আর সব বিষয়েও এইসব কথা কম বেশী ক'রে খাটে বিষয়ের প্রকার-ভেদে, যা-সব মানুষের মনকে বিভিন্ন ভাবে প্রভাবিত ক'রে এসেছে। এরমধ্যে সবচেয়ে বিশিষ্ট, বোধহয় ঋতু-আবর্তন। আমাদের দেশে ঋতু হোল ছয়টি। সুতরাং আবর্তনের এমন পূর্ণ রূপটি আর কোথাও পাবার নয়। এই জন্যেই ঋতু-বৈচিত্র্য নিয়ে আমাদের সাহিত্যে, সংস্কৃত থেকে সর্বত্রই, এত সৃষ্টি-বৈচিত্র্য। বিশেষ ক'রে কাব্য-জগতে।

এই ছয়টি ঋতুর মধ্যেও ইতর-বিশেষ আছে, সবগুলিরই রসিক-চিত্তকে একভাবে প্রভাবিত করবার ক্ষমতা নেই। বসন্ত হোল ঋতুরাজ, আনুষ্ঠানিকভাবে ধরতে গেলে আর সব তার পরে। তবে তার অব্যবহিত পরেই যে বর্ষার স্থান এতে কোন সন্দেহ নেই।

আবার তার সঙ্গে আরও একটা প্রশ্ন আসে। বসন্ত সাধারণতঃ

রাজাসন দখল করে থাকলেও সবার চিত্তের রাজাসন কি দখল করে? আমার মনে হয় অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে এ প্রশ্নটা যেন এসেই পড়ে। রবীন্দ্রনাথ বসন্তের কবি হিসাবেও জগতের শ্রেষ্ঠ কবি, বর্ষার কবি হিসাবেও তাই। কিন্তু নিজের সঙ্গে নিজের তুলনায় তিনি কোন্‌টি আগে—এ প্রশ্ন থেকেই যায়। আমার নিজের মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ আগে বর্ষার কবি, তারপর বসন্তের বা অন্য-কিছুর।

বসন্ত ঋতু-রাজ, কিন্তু তার স্বপক্ষে একটি কথাই বলা যায়, তাতে আমরা পাই এক শুধু সৌন্দর্যেরই চূড়ান্ত রূপ। পুষ্প কিশলয়ের বর্ণসম্ভারে তার সত্যই সে এক রাজরূপ! কিন্তু তার মহিমা ঐখানেই শেষ। অন্যদিকে বর্ষার মহিমা হোল তার অসীম বৈচিত্র্যে। জলে-স্থলে-আকাশে এত বৈচিত্র্য নিয়ে আর কোন ঋতুরই আবির্ভাব হয় না; মনের এত বিচিত্র ভাবকে জাগিয়ে তুলতে পারে না। বসন্তকে যদি রাজাই বলতে হয়, তবে বর্ষাকে বলতে হয় কবি। সৃষ্টি-বৈচিত্র্যে যিনি জগতের শ্রেষ্ঠ কবি তাঁর আত্মীয়তা যে বর্ষার সঙ্গেই হবে বেশি নিগূঢ়, এইটেই কি স্বাভাবিক নয়?

অজস্র কবিতায়, সংগীতে, গল্প-উপন্যাসের পরিবেশ-সৃষ্টিতে বহুস্থানে বর্ষাকে কতরূপে যে চিত্রিত করে গেছেন কবি, তার হিসাব নেই। কোথাও বর্ষাকে দেখি শুধু তার বাহ্যিকরূপেই—উদ্দামতা-ময়, প্লাবনময়—

> "ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
> জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভ-রভসে
> ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা
> শ্যামগম্ভীর সরসা।
> গুরুগর্জনে নীপমঞ্জরী শিহরে,
> শিখীদম্পতি কেকাকল্লোলে বিহরে
> দিগ্‌বধূচিত-হরষা
> ঘনগৌরবে আসে উন্মদ বরষা॥"

কিংবা—

"আষাঢ়, কোথা হতে আজ পেলি ছাড়া।
মাঠের শেষে শ্যামল বেশে ক্ষণেক দাঁড়া॥
জয়ধ্বজা ওই-যে তোমার গগন জুড়ে
পূব হতে কোন্ পশ্চিমেতে যায়রে উড়ে,
গুরু গুরু ভেরী কারে দেয় যে সাড়া॥
নাচের নেশা লাগল তালের পাতায় পাতায়,
হাওয়ার দোলায় দোলায় শালের বনকে মাতায়।
আকাশ হতে আকাশে কার ছুটোছুটি—
বনে বনে মেঘের ছায়ায় লুটোপুটি—
ভরা নদীর ঢেউয়ে ঢেউয়ে কে দেয় নাড়া॥"

বা—

"আহ্বান আসিল মহোৎসবে
অম্বরে গম্ভীর ভেরীরবে॥
পূর্ববায়ু চলে ডেকে শ্যামলের অভিষেকে—
অরণ্যে অরণ্যে নৃত্য হবে॥
নির্ঝরকল্লোলকলকলে
ধরণীর আনন্দ উচ্ছলে।
শ্রাবণের বীণাপাণি মিলালো বর্ষণবাণী
কদম্বের পল্লবে পল্লবে॥"

কোথাও আর এক অভিনব রূপ। তার নৃত্যের ছন্দে—

হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে ময়ূরের মতো নাচেরে, হৃদয় নাচেরে।
শত বরনের ভাব-উচ্ছ্বাস কলাপের মতো করেছে বিকাশ,
আকুল পরান আকাশে চাহিয়া উল্লাসে কারে যাচেরে॥"

কখনও আবার দেখি সে উদ্দামতাময় নৃত্যচপল রূপ অন্তর্হিত। বর্ষার মেঘ নীল গগনে দুটি কাজল চোখ জাগিয়ে তুলেছে মনের পটে, বিদায় বেদনায় আতুর, অশ্রু ছলছল; সে অশ্রু ঝরে পড়ছে একটি শান্ত অবিচ্ছিন্ন ধারাপাতে। সেই "অতি ভৈরব...নবযৌবন

উন্মদ বরষা''র আর কোন সাদৃশ্যই নেই এর সঙ্গে।—একটি শান্ত অবিরল ছন্দ-স্রোত বেরিয়ে এসেছে কবির ব্যথাতুর চিত্ত থেকে—

"হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে
সজল কাজল আঁখি পড়িল মনে।
অধর করুণামাখা মিনতি-বেদনা আঁকা
নীরবে চাহিয়া থাকা বিদায়-খনে।"

এইরকম একটি স্নিগ্ধ অচপল ভাব ফুটে উঠেছে তাঁর আর একটি কবিতায়; অবশ্য একেবারে অন্য ধরনের আবেদন নিয়ে। বাইরে প্রবল বর্ষণ, এই সময় বাইরের বিপদ থাকা ছাড়াও, গৃহের কোণে গুটিয়ে বসার একটি নিজস্ব আনন্দ আছে। রবীন্দ্রনাথের বর্ষার কবিতা বা সংগীতে অভিসারের সুরটাই প্রবল ব'লে এই কবিতার ভাবটি যেন আরও বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে—

"ওগো, আজ তোরা যাস্ নে গো, তোরা যাস্ নে ঘরের বাহিরে।
আকাশ আঁধার, বেলা বেশি আর নাহিরে।
ঝরঝর ধারে ভিজিবে নিচোল,
ঘাটে যেতে পথ হয়েছে পিছল,
ঐ বেণুবন দুলে ঘন ঘন পথপাশে দেখ্ চাহিরে।
ওগো, আজ তোরা যাস্ নে ঘরের বাহিরে॥"

অবশ্য এখানে ঘরের বাহির হওয়ার বিপদের কথাই বলেছেন কবি, কিন্তু ব্যঞ্জনায় বাইরের তুলনায় ঘরের নিরাপদ কোণ্‌টুকুই যেন বেশি করে ফুটে ওঠে। যেন নিরাপদ আশ্রয়ে গুটিয়ে বসে বর্ষণ-মুখর আকাশের দিকে চেয়ে থাকার একটি চিত্র। ভয় দেখিয়ে ভরসার কথা বলা, 'ঘরের বাহিরের' কথা তুলে ঘরের ভিতরটিকে পরিস্ফুট করে তোলা, শোভনীয় করে তোলা। এখানে ছন্দ, শব্দ-চয়নও যেন ঐ সুরেরই দ্যোতক। সেই বর্ষাই তো—সেই অশান্ত ধারাপাত, সেই পথের দুর্গমতা, সেই তরুশাখার আলোড়ন; কিন্তু সব সত্ত্বেও কেমন যেন একটা নিরবচ্ছিন্ন, শান্ত বর্ষণচ্ছবি।

এইভাবে দেখা যায়, কবি বর্ষা নিয়ে এত যে কবিতা আর সংগীত রচনা করেছেন, তার প্রত্যেকটিতেই একটা যেন নূতন সুরের আমেজ, সম-ভাবের কবিতা বা সংগীতের চেয়ে বেশি পৃথক না হয়েও একটি সূক্ষ্ম সীমারেখায় বিশিষ্ট।

বর্ষা যা সবচেয়ে বেশি করে প্রবুদ্ধ করেছে কবির মনে তা হোল অভিসারের ভাবাবেগ। এটি তিনি উত্তরাধিকার-সূত্রে (একজন ভারতীয় কবি হিসাবে) বৈষ্ণবপদকর্তাদের কাছ থেকে যে পেয়েছেন এটা ঠিক। কিন্তু এখানেও তাঁর একটি বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে, একটু অবান্তর হলেও সে কথাটা বলে রাখা ভালো।—

অভিসার, রবীন্দ্র-কবিতা-গানে, সর্বত্র না হলেও, বেশি ক্ষেত্রেই উল্টা রীতিতে চলেছে। বৈষ্ণব-সাহিত্যে সাধারণত দেখা যায়, অভিসার নায়িকার দিক থেকেই। রবীন্দ্রনাথে বিপরীত। বৈষ্ণব-সাহিত্যের রাধা-কৃষ্ণের লীলা নিয়ে কিছু কবিতা লিখলেও, তাতে অভিসারের কথা থাকলেও, স্বীয় ধর্মের (ব্রাহ্মধর্মের) প্রভাবে ওটা জীবাত্মা-পরমাত্মার সম্বন্ধের আধারেই ঢেলে নিয়েছেন কবি। প্রাকৃত নায়িকার অভিসার একেবারে যে নেই এমন নয়—

"শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা, নিশীথ যামিনীরে,
কুঞ্জপথে সখি, কৈসে যাওব অবলা কামিনীরে।
উন্মদ পবনে যমুনা তর্জিত, ঘন ঘন গর্জিত মেহ,
সৈকত বিদ্যুৎ, পথতরু লুণ্ঠিত, থরথর কম্পিত দেহ।"

তবে এই ধরনের কবিতা খুবই বিরল, কবি ঐ জীবাত্মা-পরমাত্মার ব্যাপার নিয়েই লিখে গেছেন। আর ঐ—কি বলা যায়, বিপরীতমুখী অভিসার? এইটেই যেন স্বাভাবিক। একদিক দিয়ে দেখতে গেলে তাই সত্য নয় কি? সীমার তো সবই সীমিত, তার সাধ্য কি অসীমের দিকে হাত বাড়ায়? অসীমই তো আসবেন নেমে সীমার মাঝে আপন সুরটি পূর্ণ করে দিতে। সীমার তো শুধু অসহায় আকুতি—বাতায়ন পথে চেয়ে থাকা—"রাজার দুলাল কখন্ পথ দিয়ে গেল চলে।"

'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র কুড়িটি কবিতার মধ্যে মাত্র একটি বর্ষার অভিসারের কবিতা—

"বাদর-বরখন, নীরদ-গরজন, বিজুলী-চমকন ঘোর,
উপেখই কৈছে আও তু কুঞ্জে নিতি নিতি মাধব মোর।
ঘন ঘন চপলা চমকয় যব পহু, বজর-পাত যব হোয়,
তুঁহুক বাত তব সমরয়ি প্রিয়তম, ডর অতি লাগত মোয়।"

সেই "বিপরীত" অভিসারের কবিতাই। শুদ্ধ বৃন্দাবন লীলার কবিতা হয়েও মনে করিয়ে দেয় না?—

"কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না শুকনো ধুলো যত।
কে জানিত আসবে তুমি গো অনাহূতের মতো।"

এই সুরটি আরও উদ্বেল হয়ে উঠেছে বর্ষার আবহসংগীতের পরিপ্রেক্ষিতে—

"মেঘের পরে মেঘ জমেছে আঁধার করে আসে,"

* * *

এখন—

তুমি যদি না দেখা দাও, কর আমায় হেলা,
কেমন করে কাটে আমার এমন বাদল-বেলা।"

অথবা—

"ভেবেছিলেম আসবে ফিরে,
তাই ফাগুনশেষে দিলেম বিদায়।
তুমি গেলে ভাসি নয়ননীরে
এখন শ্রাবণদিনে মরি দ্বিধায়॥
এখন বাদল-সাঁঝের অন্ধকারে আপনি কাঁদাই আপনারে,
এখন ঝরোঝরো বারিধারে ভাবি কী ডাকে ফিরাব তোমায়॥"

কখনও এই সুরই ফুটে ওঠে ব্যর্থতার বেদনায়—

"গহন রাতে শ্রাবণধারা পড়িছে ঝরে,
কেন গো মিছে জাগাবে ওরে॥

এখনো দুটি আঁখির কোণে যায় যে দেখা
জলের রেখা,
না-বলা বাণী রয়েছে যেন অধর ভরে॥"

এর চেয়েও আরও নিবিড় হয়ে ফুটে উঠেছে অন্য একটি গানে। বর্ষা-সংশ্লিষ্ট না হলেও দয়িতের অভিসারের গান বলেই দুটি লাইন উদ্ধৃত ক'রে দিলাম—

"সে যে পাশে এসে বসেছিল, তবু জাগিনি।
কী ঘুম তোরে পেয়েছিল হতভাগিনী॥"

কখনও আবার এসেও না আসা—

"এসেছিলে তবু আস নাই জানায়ে গেলে
সমুখের পথ দিয়ে পলাতকা ছায়া ফেলে॥
... ...
তুমি চলে গেছ ধীরে ধীরে সিক্ত সমীরে
পিছনে নীপবীথিকায় রৌদ্রছায়া যায় খেলে॥"

তবু আমি জানি তুমি আসবেই। এই ঝঞ্জক্ষুব্ধ রাত্রির যে বিরহ-ব্যথা তা কি শুধু আমার একলারই? আমি জানি এমন একটি রজনী তুমি হতে দেবে না ব্যর্থ। আমি জানি—

"আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরাণসখা বন্ধু হে আমার॥
আকাশ কাঁদে হতাশ-সম, নাই যে ঘুম নয়নে মম—
দুয়ার খুলি হে প্রিয়তম, চাই যে বারে বার॥
বাহিরে কিছু দেখিতে নাহি পাই,
তোমার পথ কোথায় ভাবি তাই।
সুদূর কোন্ নদীর পারে গহন কোন্ বনের ধারে
গভীর কোন্ অন্ধকারে হতেছ তুমি পার॥"

সফল হয়েছে আমার ব্যাকুল প্রতীক্ষা, তুমি এসেছ—

"আজি শ্রাবণঘন-গহন মোহে গোপনে তব চরণ ফেলে
নিশার মত নীরব ওহে, সবার দিঠি এড়ায়ে এলে॥"

এবার কথা—

"আমারে যদি জাগালে আজি নাথ,
ফিরোনা তবে ফিরোনা, করো করুণ আঁখিপাত॥

* * *

এই হোল কবির বর্ষা। এত বিচিত্ররূপে আর কে বর্ষাকে ধরতে পেরেছে তা আমার জানা নেই। ভৈরব, শান্ত, তারপর ভৈরব থেকে শান্ত পর্যন্ত বর্ষার যত রূপ আছে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রভেদ নিয়ে কোনটিই যেন বাদ যায়নি। এ দিক দিয়ে তিনি জগতের কাব্য-লোকে অনন্য।

তারপর ঐ ব্রহ্ম-মুখিনতা। অন্তত এর জন্য যে তিনি জগৎ কবি-সভায় অনন্য, এতে আর সন্দেহ থাকতে পারে না। তার একটা কারণ, এ জিনিসটি ঠিক এ ভাবে রূপ নেওয়া এক ভারতের মাটিতে ছাড়া সম্ভবই নয়। এর জন্য প্রয়োজন ছিল জীবাত্মা-পরমাত্মা নিয়ে ভারতীয় ধর্মের ভাব-ঐতিহ্য, বিশেষ করে বৈষ্ণব-ধর্মের মহাজনেরা একে যে রস-রূপের মধ্যে মূর্ত করে তুলেছেন।

বর্ষা রবীন্দ্রনাথের কবি-সত্তার যেন মূল-বস্তু। যেখানে তিনি প্রকৃতির কবি, সেখানে বহিঃপ্রকৃতির কোন অভিব্যক্তিই তাঁর মনকে এত করে নাড়া দিতে পারেনি। তাঁর গদ্য-রচনাতেও দেখা যায়, লিখতে লিখতে যদি বর্ষা-বাদলের কথায় এসে পড়লেন তো কবি যেন বর্তে গেছেন—লেখনী যেন হঠাৎ বাঁশিতে রূপান্তরিত হয়ে উঠেছে। 'জীবনস্মৃতি'তে দেখি ছেলেবেলায় সেই যে বৃষ্টির ছড়ার সুর তাঁর মধ্যে প্রবেশ করেছিল—"বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদেয় এল বান"—সে সুর তাঁর মনে অনুরণিত হয়ে সারাজীবন-ভোর বিচিত্র রাগিণীর সৃষ্টি করে গেছে।

একটি লক্ষণীয় বিষয়—কবি এই বর্ষায়, ভরা শ্রাবণে মহাপ্রয়াণ করেছিলেন। মনে হয় না কি যে, কবির অতি-পরিচিত মেঘদূতের হাতেই কবির দয়িত তাঁর জন্যে নিমন্ত্রণ-লিপি দিয়েছিলেন পাঠিয়ে?

রবীন্দ্র-সাহিত্যের একটি মূল সুর

শ্রীসোমনাথ মৈত্র

রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে যে কথা সর্বপ্রথমেই মনে হয় তা হোলো এর অশেষ বৈচিত্র্য। সাহিত্যালোচনায় প্রায়ই বিভিন্ন লেখকের জীবনদর্শনের কথা ওঠে। কোন্ লেখক কী চোখে জগৎকে দেখেছেন, তাঁর প্রধান বক্তব্য কী, কোন্ কাব্যের মূল সুর কী—এর নির্দেশের চেষ্টা সমালোচকের বাঁধা কাজের মধ্যে গণ্য। যে লেখকের দান মুষ্টিমেয়, যে কবি শুধু গানের একতারা বাজিয়ে গেছেন, তাঁর মূলসুর ধরা সহজ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ন্যায় যাঁর সৃষ্টির ঐশ্বর্য ও বৈচিত্র্যের অন্ত নেই, যাঁর সুদীর্ঘ জীবনের সাহিত্যসাধনা কাব্যে, গানে, নাটকে, উপন্যাসে, ছোটোগল্পে, প্রবন্ধে পত্রাবলীতে পরিব্যাপ্ত, তাঁর সকল লেখার মূলসুর অর্থাৎ তাঁর জীবন-দর্শন কী, তা নির্দেশ করা সহজ নয়, যেহেতু তাঁর দানের পরিমাপ দুঃসাধ্য এবং তাঁর ঐকতানিক সমগ্রতার উপলব্ধি সুকঠিন। তাই রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র-মুখী প্রতিভার সৃষ্টির অজস্রত্বে আমরা মাঝে-মাঝে দিশাহারা হয়ে যাই, তার একের সঙ্গে অন্যের যোগের সূত্র হারিয়ে ফেলি।

অথচ একথাও সত্য যে, প্রত্যেক বড়ো শিল্পীর সৃষ্ট জগতে তার বহুরূপী বিচিত্রতা সত্ত্বেও একটা সুসমঞ্জস পূর্ণতা থাকে, আপাতদৃষ্টিতে যা খাপছাড়া বা অসংলগ্ন মনে হয়, ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে তার অন্যের সঙ্গে যোগ ধরা পড়ে। সে জগতে কিছুকাল বাস করলে তার বিশেষ রূপ যেমন চোখে পড়ে, তেমনি বোঝা যায় যে সে রাজ্যের ঐশ্বর্য-সম্ভার অসম্বন্ধভাবে ইতস্ততঃ ছড়ানো নয়, একটা বৃহৎ শৃঙ্খলার মধ্যে সে সবই বিধৃত, সৃষ্টিছাড়া খামখেয়াল সেখানে আধিপত্য করে না। তাই সে বৈচিত্র্য প্রথমে বিস্ময়ে বিমূঢ় করে দেয়, ধীরে ধীরে তার মধ্যে একটা ঐক্যের সূত্র দেখতে পাওয়া যায়। রবীন্দ্র-রচনার বিশাল ক্ষেত্রে এই ঐক্যসূত্রটি ধরা কঠিন হলেও যখন তা একবার চোখে পড়ে তখন দেখা যায় যে তাঁর বিভিন্ন

বয়সের বিবিধ রচনার মধ্যে একটা গভীর যোগ আছে, তাঁর নানা বয়সের নানা অবস্থার বিচিত্র প্রকাশ একটি আন্তরিক সামঞ্জস্যে গ্রথিত।

এই ঐক্যবন্ধনীটি কিসের, কবির সৃষ্টির বিপুল জগতে কোন্ সংগীত ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত? এ প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যে আপাততঃ সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্য আলোচনার প্রয়োজন নেই—তা ছাড়া সে এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। আমার মনে হয়, তাঁর যে কোনো একটি প্রধান রচনায় যদি আমরা মনোনিবেশ করি, তাহলে তার মধ্যে সেই সংগীত শুনতে পাব ; এবং কয়েকটি বিশিষ্ট সৃষ্টির মধ্যে যদি সেই সুরই শুনি, সেই দৃষ্টিভঙ্গিই লক্ষ্য করি অন্যান্য নানা প্রভেদ সত্ত্বেও, তাহলে কবির জীবন-দর্শনের মোটামুটি একটা ধারণা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে।

একটি বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের আলোচনা দিয়ে শুরু করা যাক্ রবীন্দ্র-সাহিত্যের মর্মকথার এই সন্ধান। কবি যখন 'ক্ষণিকা' গ্রন্থটি প্রকাশ করেন তখন তিনি যৌবনের প্রান্তে এসে পেঁাছেছেন। যৌবনের উদ্দাম বাসনা শান্ত হয়ে আসছে, জগৎটাকে একটা বৃহৎ ভোগপাত্র মনে করে নিঃশেষে তার সকল সুধা পান করার ইচ্ছা তখন অন্তর্হিতপ্রায়। জীবনের একটা পর্ব শেষ হয়ে আসছে, দীর্ঘপথের অন্ত ঠিক দেখতে পাচ্ছেন না, তবে পথ বেঁকেছে তা বোঝা যাচ্ছে। এতদিনের সাধা যন্ত্রের একটি তার বেসুর বাজছে কেন, তা জানেন না, জানেন শুধু এই যে, মনের মধ্যে যেটা শুনছেন হাতে সেটা আসছে না। বাইরের জগৎ এবং মানুষের মন এত ভালো চিনেছেন যে সবেরই সত্যরূপটি দেখতে পাচ্ছেন, তাদের নানান্ অলীক মায়ায় ঘিরে আত্মবঞ্চনা আর তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। শেষ-বসন্তের শূন্য হাওয়া শস্যশূন্য মাঠে হাহা করে উঠেছে ; জীবনের বসন্তকেও বিদায় দেবার ক্ষণ এসেছে। চারিদিকের কোনো সৌন্দর্য কবির চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে না, তাদের আহরণের বাসনা যেদিন ছেড়েছেন, আপনি এসে সেদিন তারা ধরা দিলো। এ-পাওয়াতে তাঁর লোভ বা আসক্তি

ফিরে এলো না, কিন্তু সকলের সঙ্গে তাঁর আনন্দের যোগ তিনি অনুভব করলেন। কিন্তু এর মধ্যেও তিনি তৃপ্তির সম্পূর্ণতা পেলেন না। জীবন-প্রভাতে যে অজানার উদ্দেশে তিনি সকল রসারসি কেটে মাতাল হয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন, মধ্যাহ্নে শ্রান্ত হয়ে তার অন্বেষণে বিরত হলেন, এবং শান্ত মনে ক্ষণিকের মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজলেন। কিন্তু অচঞ্চল কোনো আশ্রয় এখানে তিনি পেলেন না, তাই জীবন-অপরাহ্ণে দুর্গম বন্ধুর পথে চিরন্তনের সন্ধানে তাঁর বেরিয়ে পড়ার এবং পথশেষে সেই পরমাশ্রয়-লাভের আভাস পাই 'ক্ষণিকা'র সর্বশেষ কবিতায়—

"কখন যে পথ আপনি ফুরালো,
সন্ধ্যা হল যে কবে!
পিছনে চাহিয়া দেখিনু, কখন
চলিয়া গিয়াছে সবে।
তোমার নীরব নিভৃত ভবনে
জানি না কখন পশিনু কেমনে।
অবাক রহিনু আপন প্রাণের
নূতন গানের রবে।

* * *

চিহ্ন কি আছে শ্রান্ত নয়নে
অশ্রুজলের রেখা?
বিপুল পথের বিবিধ কাহিনী
আছে কি ললাটে লেখা?
রুধিয়া দিয়াছ তব বাতায়ন,
বিছানো রয়েছে শীতল শয়ন,
তোমার সন্ধ্যাপ্রদীপ-আলোকে
তুমি আর আমি একা।"

'ক্ষণিকার' শেষাংশে শান্তি ও আরাম ছেড়ে পরম লক্ষ্যের আহ্বানে দুর্গম পথে বাহির হওয়ার যে ইঙ্গিত আছে, কবির প্রথম

পত্রসংগ্রহ 'ছিন্নপত্রে'ও তা পাই। এ পত্রসংগ্রহের প্রথমাংশে একটি অবিচ্ছিন্ন রাগিণীর মত বেজে চলেছে সমস্ত বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে কবির আনন্দপূর্ণ যোগের কথা। কিন্তু শেষাংশে ভিন্ন সুর কানে বাজে। সেই শান্তিময় জীবন, যেখানে দ্বন্দ্ববিরোধ নেই, ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার সংঘর্ষ নেই, তা দেখি ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে চলেছে। শেষের দিকে একটা চিঠিতে লিখছেন, তাঁর জীবনের গভীরে ক্রমশঃই যেন নূতন সত্যের উন্মেষ হচ্ছে। সেই নূতন সত্যের সন্ধানে পূর্ব-জীবনের সঙ্গে আসন্ন জীবনের একটা বিচ্ছেদের সম্ভাবনা ঘনিয়ে উঠছে। তিনি লিখছেন—

> "কে আমাকে গভীর গম্ভীর ভাবে সমস্ত জিনিস দেখতে বলছে, কে আমাকে অভিনিবিষ্ট স্থির কর্ণে সমস্ত বিশ্বাতীত সংগীত শুনতে প্রবৃত্ত করছে?"

'ক্ষণিকার' 'তুমি', 'ছিন্নপত্র'র এই 'কে' বারে বারে ঘুরে ফিরে নানারূপে কবিকে দেখা দিয়েছে, তাঁর সারা জীবনকে নিয়ন্ত্রিত ও চালিত করেছে; যখনই কবি আরাম চেয়েছেন তাঁকে দিয়েছে লজ্জা; যখনই তিনি চলার পথে পিছিয়ে পড়েছেন তাঁকে নিয়ে চলেছে এগিয়ে। তাঁর সকল কাজে তাঁকে সে উৎসাহিত করেছে, সকল খেলায় সেও খেলেছে। চিরদিন সে তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই আছে তাঁর ভুবন ঘিরে, অথচ তাঁর সঙ্গে নিয়তই তার লুকোচুরি খেলা। মুহূর্তের জন্য তাঁকে সে নিশ্চেষ্ট থাকতে দেয়নি, দেয়নি থাকতে "ভাবের ললিত ক্রোড়ে নিলীন"। তারই আহ্বানে তিনি বেরিয়ে পড়েছেন বিশ্বমানবের ক্ষেত্রে তাঁর বড়ো-আমির সঙ্গে মিলিত হতে। সে কে? যার লাগি মানবাত্মার অভিসার দুঃখের পথে, দ্বন্দ্বের পথে। এ প্রশ্নের উত্তরের আভাস পাওয়া যায় 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায়—

> "কে সে? জানিনা কে। চিনি নাই তারে—
> শুধু এইটুকু জানি—তারি লাগি রাত্রি-অন্ধকারে
> চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর পানে

ঝড়ঝঞ্ঝা-বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর-প্রদীপখানি।"

বিরাটের যে স্পর্শলাভ, সে স্পর্শে যে বেদনা, তারই আহ্বানে স্বেচ্ছায় যে দুঃখবরণ, এবং 'অশান্তির অন্তরে' যে সুমহান শান্তি-লাভ এই কবিতায় অপূর্ব প্রকাশ পেয়েছে ; কবির প্রায় প্রত্যেক প্রধান রচনায় তারই সুর কোথাও না কোথাও লেগেছে। এই অতীন্দ্রিয় সুরটিকে রবীন্দ্র-সাহিত্যের একটি মূলসুর বলা যেতে পারে। এইখানে রবীন্দ্রনাথ জগতের সকল মরমী মহাকবির সগোত্র। ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি' যখন প্রকাশিত হয় তখন তার অতীন্দ্রিয় সুরটিই য়ুরোপের পাঠকদের মুগ্ধ করে, এবং পাশ্চাত্য কাব্য-রসিকগণ রবীন্দ্রনাথকে জগতের শ্রেষ্ঠ মরমী কবিদের পর্যায়-ভুক্ত করে অভিনন্দন জানান। Evelyn Underhill 'গীতাঞ্জলি'র সঙ্গে জালালুদ্দীন রুমী, St. John of the Cross, Eckhart প্রভৃতির রচনার তুলনা করে বলেন যে, যে-পরম পুরুষকে এই গানের অঞ্জলি দেওয়া হয়েছে, একদিকে তিনি যেমন অসীম ও অনাত্মীয়, অন্য দিকে তেমনি প্রত্যেকের তিনি বন্ধু ও প্রিয়তম ঃ একাধারে তিনিই আকাশ তিনি নীড়।

Evelyn Underhill ও অন্যান্য য়ুরোপীয় সমালোচক রবীন্দ্র-নাথের লেখায় মিস্টিসিজমের পরিচিত লক্ষণগুলিই দেখেছেন। কিন্তু এ ছাড়া রবীন্দ্র-সাহিত্যে কবির mysticism-এর একটা বিশেষ রূপ চোখে পড়ে সেই রচনাগুলিতে যাতে কবি তাঁর জীবন-দেবতা-তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন। এ-বিষয়ে বিশদ আলোচনা এখানে সম্ভব নয়, তাই এ-সম্বন্ধে শুধু দু'চার কথাই বলব। কবির এই জীবন-দেবতা-তত্ত্বে বহু ধারা এসে মিশেছে। ভারতীয় জন্মান্তর-বাদ, মনোবিজ্ঞানের নবতম আবিষ্কার, চৈতন্যের প্রথম স্ফুরণের আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ইতিবৃত্ত—এ সবের সঙ্গে কবির ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকায় এ সকল চিন্তাধারা কবির সত্তায় তাঁর আত্মিক অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে মিশে গিয়ে ধীরে ধীরে তাঁর

জীবনের এই পরম সত্যকে—তাঁর জীবন-দেবতাকে—গড়ে তুলেছে। 'সন্ধ্যাসংগীতে' তিনি আপন হৃদয়ে এই সুর শুনেছেন যা তাঁর নিজের নয়, অন্য কারুর, যদিও তাঁর মনে হয় এ সুর চেনা। 'প্রভাত-সংগীতে' 'প্রতিধ্বনি' কবিতায় জীবন-দেবতার যে ছায়া পড়েছে, 'সোনার তরী'তে ধীরে ধীরে তা কায়া পরিগ্রহ করেছে, এবং 'চিত্রা'য় পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে। ব্যক্তিজীবন এবং বিশ্বজীবনের মধ্যে যিনি যোগসাধন করেন; ব্যক্তিজীবনের সকল অসম্পূর্ণতা, ভুল ও স্খলন যিনি পূরণ ক'রে, সংশোধন ক'রে সার্থক ক'রে তুলছেন, কবি তাঁর সহজবোধে তাঁর সেই অন্তরতম পুরুষকে তাঁর জীবন-দেবতা বলে জেনেছেন। শুধু তাঁর এ জন্মে নয়, কোন্ আদিকাল থেকে জন্মজন্মান্তরে কবির কত রূপে রূপান্তরে তাঁর জীবন-দেবতা তাঁর জীবনখানি রচনা করে চলেছেন। এমন কি, কবি অনুভব করেন যে, যখন তিনি মানবজন্ম লাভ করেননি, তখনও তাঁর মধ্যে এই পরমাশক্তি সক্রিয় ছিলেন—বিশ্বের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত কবির বিচিত্র অস্তিত্বধারাকে তিনিই চালিত করেছেন, সকলের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। তাই তাঁকে অবলম্বন করে কোন্ সুদূর অতীতের বৃহৎ স্মৃতি কবির অগোচরে তাঁর মধ্যে থেকে গিয়েছে, এবং সেই কারণে জগতের তরুলতা পশুপক্ষীর সঙ্গে একটা পুরাতন ঐক্য তিনি অনুভব করেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের লেখায় অতীন্দ্রিয় সুর একটি মূল সুর, এবং তার দুটি রূপ—একটি সাধারণ, একটি বিশেষ। বিশ্বের সকল প্রকাশের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ একটি ঐক্যবন্ধনী দেখেছেন; বাহিরের জগৎ এবং মানুষের মনের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য ও একাত্মতা লক্ষ্য করেছেন; অতীত, বর্তমান এবং অনাগত তাঁর কাছে পরস্পর-বিচ্ছিন্ন নয়; সুখদুঃখ, জীবনমৃত্যু কোনোটাই একান্ত বা পরস্পর-বিরোধী নয়। এটা হ'ল শ্রেষ্ঠ মরমী কবিদের দৃষ্টিভঙ্গি। এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথের রচনায় মিস্টিসিজ্‌ম্ যে বিশেষ রূপ নিয়েছে, সে-রূপ তাঁর জীবন-দেবতা-তত্ত্বেও প্রকাশিত।

অস্তগামী রবি

শ্রীক্ষিতীশ রায়

রবীন্দ্রনাথের জীবন যেন এক মহানদী। ধ্যানমগ্ন হিমাচলের বুকে সুপ্ত ছিল এর সূচনা। একদিন সেই নির্ঝরের স্বপ্ন ভেঙে গেল, বেরিয়ে এলো বরষা-গলা নদী, কখনো ফেনিলোচ্ছল, কখনো প্রশান্ত, কখনো প্রমত্ত, কখনো গভীর। কত ধারা এসে মিললো তার সঙ্গে। তীরে তীরে গড়ে উঠল জনপদ। পরিব্যাপ্ত উভয়তটে প্রচুর ঐশ্বর্য বিছিয়ে মহানদী চলতে থাকে আপনার পূর্ণতার গৌরবে ক্রমেই গভীর হয়ে, যাত্রা তার শেষ হবে সমুদ্রে। মোহনার কাছে এসে আর যেন বিলম্ব সয় না, মহাসমুদ্রের ডাক ঐ শোনা যায়। ছোট ছোট শাখা-প্রশাখায় নিজেকে বহুধা করে নদী আরো যেন দ্রুত চঞ্চল গতিতে ছুটে চলে। অবশেষে সমস্ত বৈচিত্র্য শমিত হয়, মিলে যায় এক অদ্বৈত একের পারাবারে।

রবীন্দ্রনাথের জীবনে সেই বহুবিচিত্রের প্রকাশ দেখতে পাই। উনিশ শতকের শেষ চল্লিশ বছর থেকে বিশ শতকের প্রথম চল্লিশ বছর অবধি তাঁর জীবন প্রসারিত। ভারতের প্রাক্-পৌরাণিক উপনিষদের যুগ থেকে আরম্ভ করে অনাগত ভবিষ্যৎ অবধি তাঁর চিন্তা ও চেতনার বিস্তার। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে তিনি ছিলেন বিশ্বমানবিক সৌহার্দ্যের অগ্রদূত। সুদূরপ্রসারিত তাঁর কল্পনার জগৎ। কাব্যে, নাটকে, গল্পে, উপন্যাসে, ছবিতে, গানে তাঁর অজস্র সৃষ্টির পরিচয়। জ্ঞানের দিক থেকে দেখা যায়, মানব-জীবনের হেন প্রসঙ্গ ছিল না, যা নিয়ে কোনো না কোনো সময়ে তিনি চিন্তা না করেছেন। ভাবে, রূপে, গানে, ছন্দে, রঙে, রেখায়, জ্ঞানে, কর্মে তিনি কতভাবে যে নিজেকে প্রকাশ করেছেন, ভাবতে বিস্ময় লাগে।

কেবল তাঁর দৈনন্দিন জীবনের ঘটানবলীর মধ্যে তাঁর সম্পূর্ণ

পরিচয়লাভের চেষ্টা ব্যর্থ হবেই। ভাবী চরিতকারের উদ্দেশে তিনি সাবধানবাণী বলে গেছেন—

"বাহির হইতে দেখোনা এমন করে
আমায় দেখোনা বাহিরে
কবিরে খুঁজিছ যেথায়
সেথা সে নাহিরে।"

স্রষ্টা তাঁর রচনার মধ্যে নিজের পরিচয় রেখে যান। সুতরাং রবীন্দ্রনাথকে জানার প্রকৃষ্ট উপায় হ'ল তাঁর রচনাবলীর পরিচয়লাভ করা।

অল্প পরিসরে তাঁর বিবিধ রচনার সম্যক্ পরিচয় উপস্থিত করা কখনোই সম্ভবপর নয়। কেবল যদি তাঁর পরিণত জীবনের শেষ বিশ বৎসরের (১৯২২-৪১) প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করা যায়, তাহলেও দেখা যায় কি অভাবনীয় তাঁর সৃষ্টি-বৈচিত্র্য।

এই কয় বৎসরে নব-প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীতে জ্ঞান ও কর্মের নানা উদ্যোগকে তিনি রূপ দিয়েছেন। ঘুরে এসেছেন দক্ষিণ ভারতে (১৯২২), পশ্চিম ভারতে (১৯২৩), চীন, জাপান ও দক্ষিণ আমেরিকায় (১৯২৪), য়ুরোপে (১৯২৬), দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় (১৯২৭), ক্যানাডা, জাপান ও ইন্দোচীনে (১৯২৯), ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, জার্মানী, ডেনমার্ক, রাশিয়া এবং মার্কিণমুলুকে (১৯৩০), ইরানে, ইরাকে (১৯৩২), সিংহলে (১৯৩৪), উত্তর ভারতে (১৯৩৬); কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে এতো শত কর্মচাঞ্চল্য সত্ত্বেও দেখি তাঁর সৃষ্টির কাজ অব্যাহত চলেছে। দেশ-বিদেশ থেকে তিনি যেন নব নব আনন্দ উদ্দীপনা আহরণ করে এনেছেন। এই বিশ বৎসরে তাঁর যে সব বই ছাপা হয়ে বেরুল, তার সংখ্যা হবে প্রায় পঁচাত্তর। নূতন নূতন সুরে কত যে গান বাঁধলেন তার ঠিক নেই। কেবল যে বিভিন্ন ধরনের নাটক লিখলেন তা নয়, নিজে প্রযোজনা করলেন, অভিনয়ে নামলেন। তাঁর শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে নৃত্যকে পরিণত মনের রসে অভিষিক্ত ক'রে, আত্মপ্রকাশের বিশিষ্ট বাহ্যরূপে মর্যাদা

দিলেন। নাচ, গান ও অভিনয়ের সমাবেশে সৃষ্টি করলেন নৃত্য-নাট্য, কবিতায় আনলেন মুক্ত ছন্দ। অনুভূতি ও কল্পনার দিগ্‌দেশ অতিক্রম করে তাঁর কাব্য গিয়ে পৌঁছুলো এক অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির জগতে। নিরলংকার ভাষা মন্ত্রের মতো সংহৃত হয়ে এলো।

আর এলো ছবি, ঝাঁকে ঝাঁকে নানা-রঙা পাখীর মতো উড়ে এলো অবচেতনার গভীর থেকে। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় না কোনো সার্থক কবি পরিণত বয়সে তাঁর অভ্যস্ত ধারার বাইরে এমন অজস্র রচনায় মেতেছেন। রবীন্দ্রনাথের ছবি আঁকা সার্থক-ভাবে শুরু হয়, বলতে গেলে, বিদেশেই। ১৯২৪ অব্দে তিনি যখন দক্ষিণ আমেরিকায়, শারীরিক অসুস্থতার জন্য তাঁকে আশ্রয় নিতে হয় বুয়োনেস্ এয়ার্স্-এর উপকণ্ঠে এক নিভৃত পল্লীতে। সদ্য অসুখ থেকে সেরে উঠে তিনি 'পূরবী'র কবিতাগুলি লিখে চলেছেন। দেখা যায়, সেই পাণ্ডুলিপির পাতায় পাতায় কাটাকুটির অংশগুলি অলস অবসরে ভর্তি করতে গিয়ে কবি হয়েছেন শব্দকার।

লেখা-লেখা খেলার অবসরে অর্ধমনস্কভাবে কালি বুলনের ছন্দে ছন্দে বেরিয়ে এল মনের অজানিতে অভাবিত রূপ। কথা নিয়ে সুর নিয়ে অনেক খেলাই খেলেছেন। ষষ্টিবর্ষোত্তীর্ণ শিশু ভোলানাথ এবার রেখায় রঙে রূপসৃষ্টির খোশখেয়ালে আবিষ্ট হলেন শেষ বয়সে। ১৯৩০ অব্দে যখন তিনি শেষবার পশ্চিমে যান তখন তাঁর ছবির প্রদর্শনী হয় ফ্রান্স, ইংলণ্ড, জার্মানী, ডেন-মার্ক, রাশিয়া এবং মার্কিন দেশে। তাঁর কবিতার ভাষা এক রকম, ছবির ভাষা অন্য। এ দেশের লোক দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজে না পেয়ে দিশাহারা হয়েছিল। পাশ্চাত্য দেশের সমঝদারেরা তাঁদের অনাবিল দৃষ্টি দিয়ে এই নূতন সৃষ্টির মর্মগ্রহণ করতে চেষ্টা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, ছবি আঁকার রীতি-পদ্ধতি, করণ-কারণ কবির জানা না থাকলে কি হয়, অন্তর্নিহিত প্রবর্তনা থেকে এই যে প্রকাশ উচ্ছ্বসিত হয়েছে, একে স্বীকার না করে উপায় নেই, কারণ, কবির ছবিতে সেই নবীনকে পাওয়া যাচ্ছে, যা নাকি চিরপুরাতন।

দেশ-কাল-পাত্র ভেদে মানুষের রুচি বদলায়, সেই সঙ্গে তার প্রকাশ-ভঙ্গীও। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পশ্চিমের সাহিত্য-জগতে এ রকম একটা হাওয়া-বদল লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এ সময়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর আশ্চর্য উপন্যাস লিখলেন 'শেষের কবিতা'—ভাষায়, ভাবে, ভঙ্গীতে আনকোরা আধুনিকতার ঝলক। আশ্চর্য এই যে, চিরদিনের রবীন্দ্র-মানস এতৎসত্ত্বেও এই রচনায় সার্থকভাবে পরিস্ফুট। সবচেয়ে বিস্ময়কর এই যে, 'যোগাযোগ' ও 'শেষের কবিতা'—দুটি উপন্যাস প্রায় একই সময়ের রচনা—অথচ আঙ্গিকের দিক থেকে উভয়ের মধ্যে কত তফাত। একেবারে শেষ বয়সের গল্প 'ল্যাবরেটরির' সঙ্গে 'গল্পগুচ্ছ'র যে-কোনো গল্পের এই একই রকম জাতিভেদ। শেষের এই লেখাগুলি পড়লে মনে হয়, আধুনিক কালের সঙ্গে তিনি কেবল যে কদম মিলিয়ে চলেছেন এমন নয়, পদে পদে তাকে পথ দেখিয়েছেন আর অতিক্রম করে অনাগতের দিকে এগিয়ে চলে গেছেন।

চিঠিপত্রে ও ডায়েরিতে, জাপানে, জাভায়, রাশিয়ায়, পারস্যে তাঁর ভ্রমণলব্ধ অভিজ্ঞতার কথা তিনি বিশদভাবে লিখলেন। এ সব লেখা পড়ে সহজেই বোঝা যায় তাঁর দেশ দেখা কেবল চোখের দেখা নয়, সমস্ত মন দিয়ে মানুষকে দেখা।

শিক্ষায় সুরে ছন্দে ভাষায় সাহিত্যে সমাজব্যবস্থায় রাষ্ট্রনীতি ধর্মনীতিতে মানুষের বহুমুখী বিকাশ তিনি গভীর অভিনিবেশে অনুধাবন করে দেখেছেন তাঁর এই সময়কার প্রবন্ধ-সাহিত্যে।

ওরই মধ্যে থেকে আদি-নির্ঝরের একটা ধারা এসে মহানদীর বুকে একটুখানি ঢেউ তুলে যায়। মনে পড়ে যায় সেই ছেলেবেলার কথা—আত্মকথার গল্পে, ছড়ায় কবিতায়, পুরানো দিনের স্মৃতিটুকু মধুর হয়ে প্রকাশ পায়। সেই কবে বক্রোটা শিখরের বাঙালা-বাড়িতে বাবার কাছে শুনেছিলেন গ্রহনক্ষত্রের কথা ; মহর্ষির আদেশে এই তারার কথা নিয়ে কাঁচা হাতে প্রথম রচনা লিখেছিলেন। জীবনের প্রান্তসীমায় প'চাত্তর বছর বয়সেও বিশ্বের সৃষ্টিরহস্য

নিয়ে তাঁর শিশুর মত বিস্ময়। সেই ছেলেবেলার রচনা চিরকাল-কার গ্রহনক্ষত্র নিয়ে লিখলেন পাকা হাতের লেখা—'বিশ্বপরিচয়'।

'বিশ্বপরিচয়'-এর উপসংহারে বললেন—

"সৃষ্টির ইতিহাসে সবচেয়ে আশ্চর্য ঘটনা প্রাণ ও মনের আবির্ভাব।"

প্রাকৃত বিজ্ঞানের আধুনিকতম তত্ত্বের ভিত্তিতে বললেন—

"জড় বিশ্বের সঙ্গে মনোবিশ্বের ঐক্য সম্পাদন করছে এক সর্বব্যাপী মহাজ্যোতি। কি এই মহাজ্যোতি? এ কি সেই উপনিষদোক্ত আবিঃ—বিশ্বের প্রকাশশক্তি?"

'মানুষের ধর্ম' বিষয়ে বক্তৃতা দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বললেন—

"আলোকেরই মতো মানুষের চৈতন্য মহাবিকিরণের দিকে চলেছে জ্ঞানে কর্মে ভাবে। সেই প্রসারণের দিকে দেখি তার মহৎকে, দেখি মহা-মানবকে।"

ভোরের পাখি

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন

ইতিহাসের সাক্ষ্য থেকে বার বার প্রমাণ হয়েছে যে, অনাগত দুর্যোগের ছায়াপাত ঘটে তার আবির্ভাবের পূর্বেই; তেমনি অভ্যুদয়ের পূর্বেই ঘটে অনাগত মহিমার আলোক-সম্পাত। আর, সেই অনাগতের পূর্বাভাস প্রথমেই ধরা দেয় কবিচিত্তের সূক্ষ্ম অনুভূতির স্বচ্ছ পর্দায়। বস্তুতঃ বায়ুচাপমান যন্ত্রের মতোই কবিচিত্তেও আসন্ন ঝটিকা বা প্রসন্ন অভ্যুদয়ের পূর্বাভাস সূচিত হয়। এই সত্যও কবিকণ্ঠেই ধ্বনিত হয়েছে নিঃসংশয় ভাষায়—

"ভোরের পাখি ডাকে কোথায়
ভোরের পাখি ডাকে,
ভোর না হতে ভোরের খবর
কেমন করে রাখে!"—**রবীন্দ্রনাথ**

"চোখ আছে যার দেখছে সে জন,
অন্ধজনে দেখবে কি?
উষার আগে আলোর আভাস
সকল চোখে ঠেকবে কি?"—**সত্যেন্দ্রনাথ**

রবীন্দ্রনাথ কবি বিহারীলালকে 'ভোরের পাখি' আখ্যা দিয়েছিলেন। বস্তুতঃ সব যথার্থ কবিরাই ভোরের পাখি। উষার আগেই আলোর আভাস এসে তাঁদের চোখেরই নিদ্রা হরণ করে সকলের আগে এবং তাঁদের কণ্ঠেই জাগিয়ে তোলে আসন্ন দিবসের কলকাকলি।

আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ এই ভোরের পাখিদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য কলকণ্ঠ পাপিয়া। তাঁর কণ্ঠে অনাগতের আগমনী ধ্বনিত হয়েছে বারে বারেই। এ স্থলে তার বিস্তৃত পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত

হব না। শুধু তাঁর প্রথম-প্রকাশিত কবিতাটিরই একটু বিশদ পরিচয় দিতে চেষ্টা করব। তাতেই দেখা যাবে, এই প্রথম কবিতাটির ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের অনাগত বৃহৎ জীবন প্রতিবিম্বিত হয়েছে কিরূপ সংহত ও আশ্চর্যরূপে—'গোষ্পদে বিম্বিত যথা অনন্ত আকাশ'।

১

রবীন্দ্র-সাহিত্যসন্ধিৎসুরা নিরূপণ করেছেন যে, 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার ১৭৯৬ শকের অগ্রহায়ণ (১৮৪৭ নভেম্বর-ডিসেম্বর) সংখ্যায় প্রকাশিত 'অভিলাষ'-নামক একটি দীর্ঘ কবিতাই 'কবির প্রথম মুদ্রিত কবিতা'। সুতরাং বলা যেতে পারে, 'অভিলাষ' কবিতাটিই ভোরের পাখির প্রথম সংগীত।

এই কবিতাটি সম্বন্ধে গবেষকের বক্তব্য এই—

> "কবিতাটিতে লেখকের নাম দেওয়া নাই, শুধু উহা 'দ্বাদশবর্ষীয় বালকের রচিত' বলা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের নিকট উপস্থাপিত করিলে তিনি উহা নিঃসংশয়ে আপনার রচনা বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন।"—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, **রবীন্দ্রগ্রন্থপরিচয়** (২য় সং), পৃঃ ৬৬।

অতএব কবিতাটির রচয়িতা যে রবীন্দ্রনাথ তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশই থাকতে পারে না। অতঃপর তিনি মন্তব্য করেছেন—

> "কবিতাটি মুদ্রণকালে কবির বয়স তেরো বৎসর সাত মাস, [সুতরাং] ইহা আরও এক বৎসর পূর্বের রচনা।"—ঐ, পৃঃ ৬৬।

এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমারের অভিমতও স্মরণীয়। তিনিও উক্ত অভিমতই সমর্থন করেন—

> "এই সময়ে 'অভিলাষ' নামে দীর্ঘ কবিতাটি 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় (১২৮১ অগ্রহায়ণ) 'দ্বাদশবর্ষীয় বালকের রচনা' রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল।...তখন রবীন্দ্রের বয়স ১৩ বৎসর। তবে খুব সম্ভব উহা

১২৮০ শীতকালে রচিত হয়।"—**রবীন্দ্র-জীবনী**, প্রথম খণ্ড (১৩৬৭), পৃঃ ৪৩ এবং পাদটীকা ২।

'অভিলাষ' কবিতাটি রচনাকালে কবির মনে কোন্ প্রেরণা কাজ করছিল, ব্রজেন্দ্রনাথ তা নিরূপণের প্রয়াস করেন নি। প্রভাতকুমার সে বিষয়েও প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁর অনুমান এই—

"বিদ্যালয়ের গণ্ডির মধ্যে মন টেঁকে না, মনে জাগে নানা আশা বহু আকাঙ্ক্ষা বিচিত্র সাধ। বোধ হয় সেই সময়ে 'অভিলাষ' নামে এক দীর্ঘ কবিতা লেখেন।...ইহাতে কি বালক কবির মনের অভিলাষই বালকোচিত ভাষায় ও ছন্দে প্রকাশ পাইয়াছিল?"—রবীন্দ্র-জীবনী, প্রথম খণ্ড (১৩৬৭), পৃঃ ৪২-৪৩।

মনে হয় এই দুই ক্ষেত্রেই, অর্থাৎ 'অভিলাষ' কবিতাটির প্রেরণাস্থল ও রচনাকাল, এই দুই বিষয়েই সংশয়ের কিছু অবকাশ আছে। এই দুই বিষয়ে আরও অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমার বিশ্বাস।

সে প্রসঙ্গ উত্থাপনের পূর্বে কবিতাটির ভাষা ও ছন্দ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা সংগত মনে করি।—প্রভাতকুমার এর ভাষা ও ছন্দ সম্বন্ধে শুধু 'বালকোচিত' এই সংক্ষিপ্ত বিশেষণটি প্রয়োগ করেই নিরস্ত হয়েছেন। ভাষাপ্রসঙ্গে শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, তৎকালীন কবিদের ভাষার সঙ্গে তুলনা করলে এই কবিতাটির ভাষাকে নেহাতই 'বালকোচিত' বলে উপেক্ষা করা যায় না। বস্তুতঃ এর ভাষা তৎকালীন প্রবীণ কবিদের ভাষার ছাঁদেই গড়া। তবু এর মধ্যেও যে মাঝে মাঝে পরিণত রবীন্দ্রনাথের ভাষার মুকুলিত রূপের সন্ধান পাওয়া যায়, সেটাই লক্ষণীয়। একটি দৃষ্টান্ত দিই—

"তোমার কুটিল আর বন্ধুর পথেতে
সন্তোষ নাহিক পারে পাতিতে আসন।"১০

এরকম কল্পনা ও ভাষা পরিণত রাবীন্দ্রিক বৈশিষ্ট্যেরই পূর্বাভাস। উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তি দুটি পরবর্তী কালের 'গানের সুরের আসনখানি পাতি পথের ধারে'—এই লাইনটি অনিবার্যরূপেই স্মরণ করিয়ে

দেয়। 'জনমনোমুগ্ধকর' কবিতাটির এই প্রথম শব্দটাও কি পরবর্তী কালের 'জনগণমন-অধিনায়ক' শব্দটির কথা মনে করিয়ে দেয় না? দৃষ্টান্ত বাড়ানো নিষ্প্রয়োজন।

ছন্দের প্রসঙ্গ অধিকতর আলোচনাসাপেক্ষ। কেননা, কিশোর রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম-প্রকাশিত রচনাটির মধ্যে প্রাচীন ও নবীন নানা ছন্দপ্রবণতার একত্র সমাবেশ ঘটেছে। কবিতাটি আগাগোড়াই পয়ার বন্ধে লেখা, অর্থাৎ এটির প্রতিপঙ্‌ক্তিতেই আছে চৌদ্দ মাত্রা। কিন্তু কয়েকটি জায়গায় আট-ছয়ের যতিবিভাগ রক্ষিত হয় নি। যেমন—

"রণক্ষেত্রে মৃত্যুর বিকট মূর্তি মাঝে।"৫
"সুখ কি তাহারে করিবেক আলিঙ্গন?"২৭
"কাড়িয়া লইলে দশরথের জীবন।"৩৩

এরকম প্রয়োগ আধুনিক কবিদের তুলনায় প্রাচীন কবিদের রচনায় অনেক বেশি দেখা যায়। ভারতচন্দ্রের রচনায় এরকম বহু দৃষ্টান্ত আছে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের কবিরাও আট-ছয়ের বিভাগকে অবশ্যরক্ষণীয় মনে করতেন না। যেমন—

"প্রথমতঃ কামিনী চলিলা মৃদুগতি।
যথা বসেছিলা কুন্তলের অধিপতি॥
ভাট প্রতি আদেশ করিলা মহীপতি।
একে ভাট তাহে ভূপতির অনুমতি।"—**মদনমোহন,**
'বাসবদত্তা' (১৮৩৬)

ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় আছে—

"আছে বটে অমৃত অমরাবতী-পুরে।
স্নান করি উত্তরবাহিনী গঙ্গাজলে।
পদ্মবন-যৌবন জীবন-সরোবরে।

এমন কি, মধুসূদনেরও এরকম রচনায় দ্বিধা ছিল না। যেমন—

"ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী-তরুবরে?"

আর দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই। সূক্ষ্মতর বিশ্লেষণও নিষ্প্রয়োজন। শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, পয়ারে সাত-সাত মাত্রার বিভাগই অবাঞ্ছনীয়: চার-দশ বা ছয়-আট মাত্রার বিভাগ সে-রকম নয়। এ দিক্ থেকে বিচার করলে বলতে হবে 'অভিলাষ' কবিতাটির ছন্দ নির্দোষ। উত্তরকালেও রবীন্দ্র-রচনায় আট-ছয় বিভাগের ব্যতিক্রম দেখা যায়। যেমন—

"নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি', পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে কর জাগরিত।"

এর প্রথম পঙ্‌ক্তির সঙ্গে—

"রণক্ষেত্রে মৃত্যুর বিকট মূর্তি মাঝে"

এই পঙ্‌ক্তিটির সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। উভয়ত্রই চার-দশের মাত্রাবিভাগ। বস্তুতঃ 'অভিলাষ' রচনার সময়েও বালক রবীন্দ্রনাথের স্বাভাবিক ছন্দোবোধ যে নেহাত কাঁচা ছিল না, তা স্পষ্টই বোঝা যায়। আর-এক রকম দৃষ্টান্ত দিই—

"বরং শ্রেয়ঃ ঘোরতর নরকে পতন।
তথাপি লয়ো না গর্বী জ্ঞাতির শরণ॥—**রঙ্গলাল,**
নীতিকুসুমাঞ্জলি।

এই পয়ারপঙ্‌ক্তি-দুটিতে চোদ্দটি করে 'অক্ষর' আছে। আর, অক্ষর গণনা করা হয়েছে চোখের নিরিখে, কানের নিরিখে নয়। তাই 'বরং' শব্দে ধরা হয়েছে দুই অক্ষর। 'অভিলাষ' কবিতায় আছে—

"ঐ দেখ ছুটিয়াছে মানবের দল।"১৪
"এবং তোমার সঙ্গী আশা উত্তেজনে
পাপের সাগরে ডুবে মুক্তার আশয়ে।"১৬

চোখের হিসাবে প্রথম দুই পঙ্‌ক্তিতে আছে তেরো 'অক্ষর', কিন্তু কানের হিসাবে আছে চৌদ্দ 'মাত্রা'। রঙ্গলালের 'বরং' ও রবীন্দ্র-নাথের 'এবং', এই দুই শব্দের ছন্দোগত প্রয়োগের পার্থক্যের প্রতি লক্ষ্য রাখলেই বোঝা যাবে বালক-বয়সেই রবীন্দ্রনাথের ছন্দের কান

কত প্রখর ছিল। অক্ষর-হিসাবে 'এবং' দুই অক্ষর, কিন্তু মাত্রা-হিসাবে তিন। তেমনি অক্ষরগণনায় 'ঐ' এক, কিন্তু মাত্রাগণনায় দুই। অক্ষরগণনা হয় চোখের মাপে, আর মাত্রাগণনা কানের মাপে। 'অভিলাষ' রচনার সময়েই রবীন্দ্রনাথ যে চক্ষুকর্ণের বিবাদে কর্ণের পক্ষেই রায় দিয়েছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। কেন না, ছন্দ হচ্ছে শ্রৌত শাস্ত্রের বিষয়, দর্শনশাস্ত্রের নয়।

যা হোক, 'অভিলাষ' কবিতায় প্রাচীনের প্রভাব-প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। এই কবিতাটির কয়েকটি লাইন এই—

"নাহি জানে তারা ইহা নাহি জানে তারা।"৮
"মুহূর্তেক পরে তার মুহূর্তেক পরে।"২২
"সুখের আশয়ে বৃথা সুখের আশয়ে।"২৬
"কখনই নয় তাহা কখনই নয়।"২৯
"ভাঙ্গিল হঠাৎ তাহা ভাঙ্গিল হঠাৎ।"৩৪

এরকম একই বাক্যে বক্তব্যের দ্বিরুক্তি ঈশ্বর গুপ্ত প্রমুখ কবিদের রচনায় যথেষ্ট দেখা যায়। যেমন—

"লাঠালাঠি কাটাকাটি কিসে তুমি কম,
বাবা কিসে তুমি কম?
বিপক্ষের ভয় গেল বিপক্ষের ভয়।
না হয় নির্বাণ আর না হয় নির্বাণ।
পুরাতন নয় যেন পুরাতন নয়।"—**ঈশ্বর গুপ্ত**

এ প্রসঙ্গে রঙ্গলালের 'পদ্মিনী-উপাখ্যানে'র (১৮৫৮)—

"স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায়?"

এই বিখ্যাত লাইনটিও স্মরণীয়।

'অভিলাষ' কবিতাটির আর-একটি লাইন এই—

"শমনের দ্বারসম কামানের মুখে।"৫

এই লাইনটিতে যে মুনশীয়ানা প্রকাশ পেয়েছে, তাও কান এড়িয়ে

যাবার মতো নয়। কিন্তু এর ভঙ্গিটা ঈশ্বর গুপ্তের ভঙ্গির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়—

"কাঙ্গালীর দুঃখদাতা বাঙ্গালীর যম।
রোদনের ধ্বনি হল বোধনের দিনে।
পিটে-পুলি পেটে যেন ছিটে-গুলি ফোটে।"

দেখা গেল, 'অভিলাষ' কবিতার ছন্দে এবং ভঙ্গিতে প্রাচীনের প্রভাব নিষ্ক্রিয় ছিল না। কিন্তু বোধ করি নূতনের প্রভাবই ছিল অধিকতর সক্রিয়।

এখন এই নূতনের প্রভাবের কথাই একটু ভেবে দেখা যাক। প্রথমেই দেখা যায়, এর ছন্দ আগাগোড়াই অমিল, অথচ মধুসূদন-প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর রীতির প্রবহমানতা কোথাও নেই। দ্বিতীয়তঃ, কবিতাটি ঊনচল্লিশটি শ্লোকবন্ধে বিভক্ত এবং প্রত্যেকটি শ্লোক চারটি পঙ্‌ক্তি নিয়ে গঠিত। স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে, বালককবি কবিতা-রচনার এই আদর্শ পেলেন কোথায়? এ কথা অবশ্য স্বীকার করতেই হবে যে, মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর-রীতি বাংলা ছন্দে মিল রক্ষার অত্যাবশ্যকতাবোধকে শিথিল করে এনেছিল। অর্থাৎ মিল বর্জন করে ছন্দ রচনার মানসিক বাধা কেটে গিয়েছিল। ফলে, সংস্কৃত আদর্শে মিলহীন চতুষ্পদী শ্লোকবন্ধ রচনার পথ খোলাই ছিল।

২

'অভিলাষ' রচনার কাছাকাছি সময়েই রবীন্দ্রনাথ 'কুমারসম্ভব' কাব্যের তৃতীয় সর্গের কিছু অংশ বাংলা ছন্দে অনুবাদ করেছিলেন, এ কথা মনে করবার হেতু আছে। সে বিষয়ে কিছুকাল পূর্বে অন্যত্র আলোচনা করেছি। কিন্তু ইদানীং এ বিষয়ে কারও কারও মনে সংশয় দেখা দিয়েছে। রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমারও উক্ত গ্রন্থের শেষ সংস্করণে এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তথাপি এ বিষয়ে আরও অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে বলেই মনে করি।

কারণ সন্দেহ সন্দেহমাত্র, প্রতিকূল সিদ্ধান্ত নয়। যে অনুবাদটা রবীন্দ্রকৃত বলে অনুমিত হয়েছিল, সেটা যে সত্যই রবীন্দ্রকৃত নয়, অন্যের কৃত, এই সিদ্ধান্তের পক্ষেও কোনো প্রমাণ উপস্থাপিত হয় নি। উপস্থাপিত হয়েছে শুধু সন্দেহ, আর সে সন্দেহের প্রধান কারণ ওই অনুবাদ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নীরবতা। নীরবতা যে প্রমাণ বলে গ্রাহ্য নয়, সে কথা সর্বস্বীকৃত। 'অভিলাষ' এবং আরও অনেক রচনার কথাই রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেন নি। কিন্তু তথাপি সেগুলি রবীন্দ্রনাথের বলেই সপ্রমাণ হয়েছে রচয়িতার স্বীকৃতি অথবা অন্যবিধ নির্ভরযোগ্য প্রমাণের জোরে। এখন 'কুমারসম্ভবের' অনুবাদ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের স্বীকৃতি-অস্বীকৃতির প্রশ্ন নেই। সুতরাং পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের পক্ষে বা বিপক্ষে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ চাই। তার জন্য অধিকতর অনুসন্ধান ও সূক্ষ্মতর বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

বিশ্বভারতী-রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত একখানি জীর্ণ পাণ্ডুলিপিতে রবীন্দ্রনাথের প্রাচীনতম রচনাগুলির অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। তাতে 'কুমারসম্ভব' কাব্যের তৃতীয় সর্গের কতকগুলি শ্লোকের (২৫-২৮, ৩১, ৩৫-৭২) পদ্যানুবাদ পাওয়া গিয়েছে। বিশেষভাবে লক্ষণীয় এই যে, উক্ত পাণ্ডুলিপিতে এই শ্লোকগুলির একটি নয়, দুটি অনুবাদ আছে—দুটিই খসড়া, দুটিতেই অনেক কাটাকুটি আছে। তার মধ্যে একটি যে প্রাথমিক ও অপরটি যে তারই পরিশোধিত রূপ, তাতে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। এই অংশটুকুরই আরও একটি উন্নততর রূপের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে 'ভারতী' পত্রিকার প্রথম বর্ষের (১২৮৪) মাঘ সংখ্যায় (পৃঃ ৩২৯-৩১)। এই তৃতীয় রূপটি যে পূর্বোক্ত দ্বিতীয় রূপেরই উন্নততর সংস্করণ, তাতেও সন্দেহ করা চলে না। কিন্তু এই তৃতীয় অর্থাৎ মুদ্রিত রূপটির পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নি। যা হোক, 'কুমারসম্ভব' কাব্যের এই অংশটুকুর পদ্যানুবাদ মূলতঃ রবীন্দ্রনাথেরই কৃত কিনা সে সম্বন্ধে সংশয়াতীত ও সর্বস্বীকার্য সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন পাণ্ডুলিপির ওই দুই

অংশের অবিকল প্রতিলিপি প্রকাশ করা। বর্তমান প্রবন্ধে তা সম্ভবপর নয়। এ স্থলে ওই অংশটুকুর শেষ চারটি শ্লোকের মূল সংস্কৃত পাঠ ও তিনটি অনূদিত পাঠ উদ্‌ধৃত করলেই আমাদের উদ্দেশ্য অনেকাংশে সিদ্ধ হবে—

"অথেন্দ্রিয়ক্ষোভময়ুগ্মনেত্রঃ
পুনর্বশিত্বাদ্ বলবন্ নিগৃহ্য।
হেতুংস্বচেতোবিকৃতের্দিদৃক্ষুর্
দিশামুপান্তেষু সসর্জ দৃষ্টিম্॥

স দক্ষিণাপাঙ্গ-নিবিষ্টমুষ্টিং
নতাংসমাকুঞ্চিত-সব্যপাদম্।
দদর্শ চক্রীকৃত-চারুচাপং
প্রহর্তুমভ্যুদ্যত মাত্মযোনিম্॥

তপঃপরামর্শ-বিবৃদ্ধমন্যোর্
ভ্রূভঙ্গদুষ্প্রেক্ষ্যমুখস্য তস্য।
স্ফুরন্নুদর্চিঃ সহসা তৃতীয়াদ্
অক্ষ্ণঃ কৃশানুঃ কিল নিষ্পপাত॥

ক্রোধং প্রভো সংহর সংহরেতি
যাবৎ গিরঃ খে মরুতাং চরন্তি।
তাবৎ স বহ্নির্ভবনেত্রজন্মা
ভস্মাবশেষং মদনং চকার॥"—**কুমারসম্ভব**, ৩।৬৯-৭২

পাণ্ডুলিপিতে এর অনুবাদের প্রাথমিক রূপ এই—

"মুহূর্তে ইন্দ্রিয়ক্ষোভ করিয়া দমন
বিকৃতির হেতু কোথা দেখিবার তরে,
দিশে দিশে করিলেন ত্রিনয়ন পাত॥৬৯

"দেখিলা জ্যাবদ্ধমুষ্টি সশর মদন
তাঁর লক্ষ্য নিজ করেছে নিবেশ॥৭০

"তপস্যার বিঘ্ন হেরি ক্রুদ্ধ অতিশয়
ভ্রূভঙ্গ-দুষ্প্রেক্ষ্য মুখ মহা-তপস্বীর
তৃতীয় নয়ন হতে ছুটিল অনল॥৭১

"ক্রোধ সম্বরহ প্রভু ক্রোধ সম্বরহ
স্বর্গ হতে দেবতারা কহিতে কহিতে
হইল মদনতনু ভস্ম-অবশেষ॥"৭২

এই রচনাটুকুতে কাঁচা হাতের ছাপ সুস্পষ্ট। অনুবাদ অনেকাংশেই মূলানুগ হয় নি, অথচ পয়ারের বাঁধা রীতি সযত্নে রক্ষিত হয়েছে। পাণ্ডুলিপিতে কাটাকুটি করে এই প্রাথমিক পাঠেরই কিছু উন্নতি-বিধান করা হয়েছে। তার একটু পরিচয় দিচ্ছি। প্রথম শ্লোকের (৬৯) তৃতীয় লাইনের সংশোধিত রূপ—'দিগন্তে করিল দেব ত্রিনয়ন পাত'। চতুর্থ শ্লোকের (৭২) প্রথম লাইনের সংশোধিত রূপ এই—'ক্রোধ প্রভু সংহর সংহর এই বাণী'। 'যাবদ্ গিরঃ খে মরুতাং চরন্তি', এই অংশটুকুর অনুবাদকে মূলানুগ করবার অভিপ্রায়ে 'স্বর্গ হতে দেবতারা কহিতে কহিতে' লাইনটিকে কেটে নানাভাবে চেষ্টা করে অবশেষে হাল ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

পাণ্ডুলিপিতে উক্ত চারটি শ্লোকের দ্বিতীয় ও উন্নত অনুবাদ-রূপ এই—

"মহাবলী মহাদেব অন্য কেহ নয়
মুহূর্তে ইন্দ্রিয়ক্ষোভ নিগ্রহ করিয়া
বিকৃতির কারণ কি জানিবার তরে
দিগন্তে নয়নপাত করিলা মহেশ॥৬৯

"মদনেরে দেখিলেন দক্ষিণ অপাঙ্গে
মুষ্টি রহিয়াছে লগ্ন ধনুগুণধারী
বামপদ কুঞ্চিত কাঁধের দিক্ নত
চক্রাকার করিয়া সুন্দর ধনুখানি
টানিয়াছে গুণ মারে আর কি বাণ॥৭০

"বাড়িল শিবের ক্রোধ তপস্যার ভঙ্গে
এমনি ভ্রূভঙ্গ যে, তাকায় মুখপানে
সাধ্য নাই কাহারো, তৃতীয় নেত্র হতে
নিকশিল অনল কিরণ উগারিয়া॥৭১

"ক্রোধ প্রভু সংহর সংহর এই বাণী
দেবতা সবার হোতা চরুক বাতাসে
হেতায় মদনতনু ভস্ম-অবশেষ॥৭২

পাণ্ডুলিপিতে এই অনুবাদকেও কেটেকুটে আরও উন্নত করা হয়েছে। এই মার্জিত রূপেরও একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। প্রথম শ্লোকের (৬৯) শেষ লাইনটিকে কেটে করা হয়েছে—'করিলা নয়নপাত দিগ্‌দিগন্তরে'। তৃতীয় শ্লোকের (৭১) শেষ লাইনটিকে কেটে প্রথমে করা হয়েছে—'বাহিরিয়া পড়িল উদর্চি হুতাশন'। তারপরে আবার কেটে করা হয়েছে—'বাহিরিল সহসা জ্বলন্ত হুতাশন'।

প্রথম অনুবাদের সহিত দ্বিতীয় অনুবাদের পার্থক্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই অনুবাদে পাকা হাতের স্পর্শের পরিচয় সুস্পষ্ট। প্রথমটি দুর্বল, দ্বিতীয়টি বলিষ্ঠ। তা ছাড়া, এই দ্বিতীয় অনুবাদটি প্রায় সর্বতোভাবেই মূলানুগ; কিন্তু পয়ারের বাঁধা রীতিকে বিনা দ্বিধায় লঙ্ঘন করা হয়েছে অনেক স্থানেই। ছন্দের ত্রুটি স্বীকার করেও অনুবাদকে মূলানুসারী করার এই প্রয়াস বালক রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রত্যাশিত নয়। আমার বিশ্বাস অনুবাদটি সংশোধিত ও পরিমার্জিত করে দ্বিতীয় রূপে দাঁড় করানোর ব্যাপারে বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের হাত কাজ করেছে বহুল পরিমাণে। দ্বিজেন্দ্রনাথের ভাষা ও ছন্দের সঙ্গে যাঁদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে, আশা করি তাঁরা এই ধারণাকে উপেক্ষণীয় মনে করবেন না।

'ভারতী'তে (১২৮৪ মাঘ, পৃঃ ৩২৯-৩১) প্রকাশিত অনুবাদ এই দ্বিতীয় অনুবাদেরই আরও পরিমার্জিত রূপ। পাণ্ডুলিপিতে কমা প্রভৃতি চিহ্ন প্রায় নেই, 'ভারতী'তে ও-সব চিহ্ন যথোচিতভাবে প্রযুক্ত হয়েছে। আর, স্থানে স্থানে অনুবাদের উন্নতিবিধানও করা হয়েছে। প্রথম দুটি শ্লোকে কোনো পরিবর্তন করা হয় নি। তৃতীয় শ্লোকের (৭১) শেষ লাইনটিকে বদলে করা হয়েছে—

"স্ফুরন্ত-উর্দার্চি বহ্নি ছুটিল সহসা।"

চতুর্থ শ্লোকের (৭২) 'তাবদ্‌ স বহ্নির্ভবনেত্রজন্মা', এই অংশটুকু পাণ্ডুলিপির উভয় অনুবাদেই বাদ গিয়েছিল। ভারতীতে রক্ষিত হয়েছে। ভারতীতে প্রকাশিত এই শ্লোকটির পূর্ণরূপ এই—

"ক্রোধ প্রভু সংহর সংহর'—এই বাণী
দেবতা-সবার হোথা চরিছে বাতাসে,
হেথায় সে হুতাশন ভবনেত্রজাত
করিল মদনতনু ভস্ম-অবশেষ।"

এ প্রসঙ্গে আরও একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, পাণ্ডুলিপিতে প্রথম অনুবাদটুকুর কোনো শিরোনাম নেই, দ্বিতীয় অর্থাৎ পরিমার্জিত রূপটির শিরোনাম আছে 'কুমারসম্ভব', আর 'ভারতী'তে প্রকাশিত দ্বিতীয় রূপটিরই উন্নত সংস্করণে শিরোনাম দেওয়া হয়েছে 'মদনভস্ম'।

যা হোক, এই অনুবাদটুকুর তিনটি রূপের পারস্পরিক তুলনা করলে স্বতই মনে হয় যে, প্রথম রূপটি বালক রবীন্দ্রনাথের কৃত এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় রূপ-দুটি কোনো পাকা হাতের পরিমার্জনার ফল—আমার ধারণা সে পাকা হাত দ্বিজেন্দ্রনাথের। এ-কথাও মনে রাখতে হবে যে, এটুকু 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয় 'সম্পাদকের বৈঠক' বিভাগে এবং সে সময়ে 'ভারতী'র সম্পাদক ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ। 'ভারতী' প্রকাশের সময় রবীন্দ্রনাথের বয়স ষোলো। কিন্তু তিনি 'সম্পাদক-চক্রের বাহিরে' ছিলেন না, একথা

জানা যায় 'জীবনস্মৃতি' থেকেই। সুতরাং সম্পাদকের বৈঠকে প্রকাশিত লেখায় রবীন্দ্রনাথের হাত থাকা বিচিত্র নয়।

এবার এই অনুবাদটি সম্বন্ধে সন্দেহের অন্য কারণগুলির কথাও বিবেচনা করা যাক। 'জীবনস্মৃতি'তে আছে, জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য রবীন্দ্রনাথকে 'কুমারসম্ভব' ও 'ম্যাকবেথ' পড়াতেন একই পদ্ধতিতে, অর্থাৎ বাংলায় মানে বলে দিয়ে। আরও আছে যে, শিক্ষকের তাড়নায় বাধ্য হয়ে তিনি 'ম্যাকবেথের' খানিকটা করে বাংলা ছন্দে অনুবাদ করতেন এবং এভাবে সমস্ত বইটারই অনুবাদ শেষ হয়ে গিয়েছিল। 'কুমারসম্ভব' অনুবাদের কোনো উল্লেখ নেই। তাতে এইমাত্র মনে হয় যে, রবীন্দ্রনাথ শিক্ষকের চাপে 'কুমার-সম্ভবের' অনুবাদ করেন নি এবং করে থাকলেও তৎকালে অধীত তিন সর্গের অনুবাদ করেন নি, মাত্র খানিকটা অংশেরই করেছিলেন। সম্ভবতঃ তাও করেছিলেন নিজের মনের প্রেরণাতেই, শিক্ষকের তাড়নায় নয়। 'জীবনস্মৃতি'তে এর পরেই বলা হয়েছে যে, রাম-সর্বস্ব পণ্ডিত রবীন্দ্রনাথকে 'শকুন্তলা' পড়াতেন, কিন্তু ওই একই প্রণালীতে, অর্থাৎ বাংলায় মানে বলে দিয়ে। এই রামসর্বস্ব পণ্ডিতই একদিন রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে গিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে 'ম্যাকবেথের' অনুবাদ শোনাবার জন্যে ; সেখানে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় উপদেশ দেন যে, ডাকিনীর উক্তিগুলির ভাষা ও ছন্দ অন্যান্য অংশ থেকে কিছু স্বতন্ত্র হওয়া উচিত। বিদ্যা-সাগরকে 'কুমারসম্ভব'-অনুবাদ শোনাবার কোনো প্রসঙ্গ নেই 'জীবনস্মৃতি'তে।

রবীন্দ্র-জীবনীকার বলেন—'সেইজন্যই ইহার [কুমারসম্ভবের] যে-অনুবাদ ১২৮৪ সালে 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয় তাহার অনু-বাদক কে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না'। এ সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে, সমগ্র 'ম্যাকবেথ' অনুবাদে যে কৃতিত্ব আছে, 'কুমার-সম্ভবের' অংশবিশেষ অনুবাদে সে কৃতিত্ব নেই বলেই হয়তো রাম-সর্বস্ব পণ্ডিত বিদ্যাসাগরকে ওই অংশটুকুর অনুবাদ শোনাতে

উৎসাহ বোধ করেন নি। তা ছাড়া, ওই অনুবাদটুকুর মধ্যে যে দুর্বলতা ছিল তাও তিনি খুব ভালোই জানতেন। 'ভারতী'তে ওটুকুর যে পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল, তার পুরো কৃতিত্ব রবীন্দ্রনাথের প্রাপ্য নয় বলেই মনে করি। রবীন্দ্রনাথ যে 'জীবনস্মৃতি'তে এ বিষয়ে নীরব, এটাও তার একটা কারণ হতে পারে। 'ম্যাকবেথের' ডাকিনী-অংশের যে অনুবাদটি 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়েছে তার ছন্দ দেখেই বোঝা যায়, সমগ্র 'ম্যাকবেথ' ওই ছন্দে অনূদিত হয় নি। অর্থাৎ এ ছন্দ অন্যান্য অংশের ছন্দ থেকে পৃথক্। সুতরাং এ অনুমান করা অসংগত নয় যে, রবীন্দ্রনাথ ওই অংশটুকুকে নূতন করে নূতন ছন্দে অনুবাদ করেছিলেন। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই এটুকু 'ভারতী'তে স্থান পেয়েছিল এবং রবীন্দ্র-নাথও 'জীবনস্মৃতি'র পাণ্ডুলিপিতে উল্লেখযোগ্য মনে করেছিলেন। বাকি অংশগুলি সম্ভবতঃ 'কুমারসম্ভব'-অনুবাদের মতোই অমিল পয়ার ছন্দে রচিত হয়েছিল ও সমভাবেই দুর্বল ছিল; তাই 'ভারতী'তে বা অন্যত্র স্থান পায় নি। 'কুমারসম্ভব'-অনুবাদও পেত না, যদি না তা কোনো পাকা হাতের দ্বারা পরিমার্জিত হত। ডাকিনী-অংশের উন্নতিবিধানের কৃতিত্ব রবীন্দ্রনাথেরই, তাই তা উল্লেখযোগ্য বিবেচিত হয়েছিল; কিন্তু 'কুমারসম্ভবের' উন্নতি-বিধানের কৃতিত্ব তাঁর নয়, তাই সকলেই এ বিষয়ে নীরব। এ অনুমান আশা করি যুক্তিহীন বলে গণ্য হবে না।

পুনরুক্তির অপরাধ মেনে নিয়েও আবার বলি নীরবতার যুক্তি যুক্তিই নয়,—তার দ্বারা কোনো কিছুই অপ্রমাণ হয় না। ডাকিনী-অংশটুকুর উল্লেখ 'জীবনস্মৃতি'র পাণ্ডুলিপিতেই আছে, মুদ্রিত গ্রন্থে স্থান পাবার যোগ্য বিবেচিত হয় নি। যদি পাণ্ডু-লিপিতেও উল্লেখযোগ্য বিবেচিত না হত, তাহলে ওটুকুর কি দশা হত? রবীন্দ্র-জীবনীর বিরাট্ আয়তনের এক কোণেও তার স্থান হত না। 'কুমারসম্ভব'-অনুবাদের সেই দশা হবারই উপক্রম হয়েছে। তবে ভাগ্যক্রমে একখানি জীর্ণ পাণ্ডুলিপিতে ওই অনু-

বাদের প্রাথমিক খসড়াটুকু থেকে যাওয়াতে রবীন্দ্রনাথের এই কৈশোর রচনাটুকু সন্দেহের অবকাশে বিস্মৃতি বা অস্বীকৃতির চরম দণ্ড থেকে রক্ষা পেয়ে গেছে।

উক্ত জীর্ণ পাণ্ডুলিপিটি রবীন্দ্র-সাহিত্যের ইতিহাসে 'মালতী-পুঁথি' নামে খ্যাত হয়েছে। এই পুঁথিটির পূর্ণাঙ্গ পরিচয় প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম, এটিকে নিয়ে গবেষণা করার অবকাশও প্রচুর। বর্তমান প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে আরও দু-একটি কথা বলা প্রয়োজন। ১২৮৪ সালের মাঘ সংখ্যা 'ভারতী'র 'সম্পাদকের বৈঠক' বিভাগে 'কুমারসম্ভব'-অনুবাদের সঙ্গেই মুরের আইরিশ মেলোডিজ থেকে দুটি কবিতা এবং বার্নস, বাইরন ও মিসেস ওপীর কবিতার অনুবাদও প্রকাশিত হয়। এই সবকয়টিই 'মালতী-পুঁথিতে' 'কুমারসম্ভব'-অনুবাদের পাশেই রয়েছে। রবীন্দ্র-জীবনী-কারও লিখেছেন—

> "মুরের কবিতা ছাড়া বার্নস, বাইরন, শেক্স্পীয়র, মিসেস আমেলিয়া ওপী...প্রভৃতি কবিদের 'লিরিক' এবং কালিদাসের 'শকুন্তলা' ও 'কুমারসম্ভব' হইতে দুইটি কবিতা তর্জমা করিতে দেখি।"—রবীন্দ্র-জীবনী, ১ম খণ্ড (১৩৬৭), পৃঃ ৭৭ পাদটীকা ১।

শুধু তাই নয়, 'মালতী-পুঁথি'তে প্রাপ্ত এবং 'ভারতী'তে প্রকাশিত মুরের একটি কবিতার অনুবাদ রবীন্দ্র-জীবনীতে উদ্ধৃতিযোগ্য বলে গণ্য হয়েছে। 'কুমারসম্ভবের' অনুবাদ ও মুরের কবিতার অনুবাদ 'মালতী-পুঁথি'তে প্রায় পাশাপাশি অবস্থিত এবং দুটি (শুধু দুটি নয়, আরও অনেকগুলি) সম্বন্ধেই 'জীবনস্মৃতি' সমভাবে নীরব। অথচ দুটিরই রবীন্দ্রকৃতি সমভাবে স্বীকার্য বলে গণ্য হল না, রবীন্দ্রনাথ 'কুমারসম্ভবের' অনুবাদ করেছিলেন কি না সে সম্বন্ধেই সন্দেহ করা হল, এটা একটু বিচিত্র বলেই মনে হয় নাকি ?

এ বিষয়টা নিয়ে এত তর্ক করার উদ্দেশ্য এই যে—রবীন্দ্রনাথ 'কুমারসম্ভবের' তৃতীয় সর্গের খানিকটা অংশের পদ্যানুবাদ করে-

ছিলেন এবং 'মালতী-পুঁথি'তে প্রাপ্ত ওই অনুবাদের প্রাথমিক খসড়াটা রবীন্দ্রনাথেরই করা, এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করা আমার কাছে সমীচীন বলে বোধ হয় না।

৩

এবার মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। 'কুমারসম্ভব' কাব্যের পূর্বোক্ত অংশটুকুর পদ্যানুবাদ করা হয়েছে অমিল পয়ার বন্ধে। অনুবাদের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়, তিন রূপেই একই প্রণালী অনুসৃত হয়েছে। এই তিন রূপের কোনোটিতেই অমিত্রাক্ষরের অনুসরণে প্রবহমানতা স্বীকৃত হয় নি। তবে প্রথম খসড়াটিতে আট-ছয়ের বিভাগের বাঁধা রীতি যথাসম্ভব রক্ষিত হয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় রূপে এই বিভাগ অনেক স্থলেই উপেক্ষিত হয়েছে, অনেক স্থানে সাত-সাতের বিভাগও স্বীকৃত হয়েছে। 'অভিলাষ' কবিতায় বা রবীন্দ্রনাথের অন্য কোনো রচনাতেই সাতের বিভাগ স্বীকৃতি পায় নি—বস্তুতঃ পয়ার বন্ধে সাতের বিভাগ কখনও রবীন্দ্রনাথের কানের প্রসন্ন অনুমোদন পায় নি। 'কুমারসম্ভবের' অনুবাদের পরবর্তী দুটি রূপ যে রবীন্দ্রনাথের নয়, একথা মনে করবার এটাও একটা কারণ।

যা হোক, বিবেচ্য বিষয় এই যে, 'কুমারসম্ভব' অনুবাদের প্রথম খসড়া এবং 'অভিলাষ' কবিতার ছন্দ একই ছাঁচে গড়া, দুটিই অমিল অপ্রবহমান পয়ার বন্ধে রচিত। যতি বিধানেও একই রীতি অনুসৃত। দুটিই শ্লোকে শ্লোকে ভাগ করা। তবে 'কুমারসম্ভবের' অনুবাদে প্রতিশ্লোকে চার পঙ্‌ক্তি রাখা সম্ভব হয় নি, অনুবাদের প্রয়োজনে কোথাও চারের চেয়ে বেশি কোথাও কম হয়েছে। 'অভিলাষ' স্বাধীন রচনা, তাই প্রতিশ্লোকে চার লাইন রাখা কঠিন হয় নি। মোট কথা, মধুসূদন মিল বর্জনের যে পথ রচনা করলেন, বালক রবীন্দ্রনাথ সে পথেই অগ্রসর হলেন বটে, কিন্তু মধুসূদনের আদর্শকে অনুসরণ করলেন না, অনুসরণ করলেন সংস্কৃত শ্লোক-

বন্ধের রীতিকে। তাই অভিলাষের ছন্দে মিল নেই এবং প্রতি-শ্লোকে চার পঙ্‌ক্তি ও পয়ারের যতিবিধান রক্ষিত হয়েছে। আর, সংস্কৃত পদ্ধতিতেই শ্লোকগুলি সংখ্যাযুক্ত হয়েছে। 'কুমার-সম্ভবের' 'ক্রোধ সম্বরহ প্রভু ক্রোধ সম্বরহ' লাইনটার সঙ্গে 'অভিলাষ' কবিতার 'নাহি জানে তারা ইহা নাহি জানে তারা' প্রভৃতি লাইনের সাদৃশ্যটুকুও এ প্রসঙ্গে উপেক্ষণীয় নয়।

বস্তুতঃ রচনাকালের দিক্ থেকেই হোক কিংবা ছন্দোগঠনের দিক্ থেকেই হোক, 'অভিলাষ'কে 'কুমারসম্ভব' অনুবাদ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা সমীচীন নয়।

'অভিলাষের' ছন্দ-প্রসঙ্গে আরও দুটি বিষয় এস্থলে উল্লেখ-যোগ্য। 'ভারতী'র প্রথম বর্ষেই রবীন্দ্রনাথ 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের একটি ধারাবাহিক সমালোচনা লেখেন (১২৮৪ শ্রাবণ-কার্তিক, পৌষ ও ফাল্গুন এই ছয় সংখ্যায়)। এই সমালোচনায় তিনি এই কাব্যটির অংশবিশেষের প্রশংসা করলেও প্রধানতঃ নিন্দাই করেছেন। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, তিনি ওই কাব্যের ছন্দ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব রইলেন, তার পক্ষে বা বিপক্ষে কোনো কথাই বললেন না। পাঁচ বৎসর পরে 'ভারতী'তে তিনি মেঘনাদ বধের আরও একটি সমালোচনা লেখেন (১২৮৯ ভাদ্র)। এ সমালোচনাটিও তীব্রভাবেই প্রতিকূল। কিন্তু এই দ্বিতীয় বারেও তিনি ওই ছন্দ সম্বন্ধে নীরব। এই নীরবতার হেতু নির্ণয় করা সহজ নয়। মনে হয়, প্রথমে তাঁর মনোভাব অমিত্রাক্ষরের প্রবহমানতার প্রতি প্রসন্ন ছিল না, অথচ তার শক্তিকে অস্বীকারও করতে পারছিলেন না। তাই দেখি রবীন্দ্রনাথ 'অভিলাষ' কবিতায় তদানীন্তন মিত্রাক্ষর রীতিরও অনুসরণ করেন নি, মধুসূদন-প্রবর্তিত প্রবহমানতাকেও স্বীকার্য মনে করেন নি। তৎকাল-প্রচলিত এই দুই রীতিকেই পরিত্যাগ করে তিনি সংস্কৃত রীতিরই অনুবর্তী হলেন।

শুধু যে রবীন্দ্রনাথই এভাবে দোলায়মান হয়েছিলেন তা নয়। 'অভিলাষ' প্রকাশের পরের বৎসরই প্রকাশিত হয় হেমচন্দ্রের 'বৃত্র-

সংহার' কাব্যের প্রথম খণ্ড (১৮৭৫)। এই কাব্যের 'বিজ্ঞাপনে' হেমচন্দ্র মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্বন্ধে লেখেন—

> "আমি তৎপ্রদর্শিত পথ যথাযথ অবলম্বন করি নাই। তদীয় অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ মিলটন প্রভৃতি ইংরাজ কবিগণের প্রণালী-অনুসারে বিরচিত হইয়াছে। কিন্তু ইংরাজি ভাষাপেক্ষা সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালা ভাষার সমধিক নৈকট-সম্বন্ধ বলিয়া যে প্রণালীতে সংস্কৃত শ্লোক রচনা হইয়া থাকে, আমি কিয়ৎ পরিমাণে তাহারই অনুসরণ করিতে চেষ্টিত হইয়াছি।...সচরাচর সংস্কৃত শ্লোকের চারি চরণে যেরূপ পদ সম্পূর্ণ হয়। তদ্রূপ চতুর্দশ অক্ষর-বিশিষ্ট পঙ্‌ক্তির চারি পঙ্‌ক্তিতে পদ সম্পূর্ণ করিতে যত্নশীল হইয়াছি। পয়ারের যতিস্থাপনের যেরূপ প্রথা আছে তাহার অন্যথা করি নাই।"—**বৃত্রসংহার**, প্রথম খণ্ড (১৮৭৫), বিজ্ঞাপন।

এই কথাগুলি 'অভিলাষ' কবিতার ছন্দ সম্বন্ধেও সর্বতো-ভাবেই প্রযোজ্য। দেখা যাচ্ছে, তৎকালের শ্রেষ্ঠ কবি যে মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন, 'অভিলাষ' কবিতায় তারই পূর্বাভাস পাই। এটা বালক-কবির পক্ষে কম গৌরবের কথা নয়। মনে রাখতে হবে, 'অভিলাষ' প্রকাশিত হয় 'বৃত্রসংহার' ও 'পলাশীর যুদ্ধের' আগের বৎসরে।

সুতরাং 'অভিলাষ' কবিতার ছন্দকে 'বালকোচিত' বললে বালক-কবির প্রতি সুবিচার করা হয় না।

সংস্কৃত ছন্দোরীতির প্রতি আকৃষ্ট হলেও বালক রবীন্দ্রনাথ মধুসূদনের রীতির প্রতি উদাসীনও থাকতে পারেন নি। তার প্রমাণ এই যে, 'ভারতী'তে যখন 'মেঘনাদ বধের' ধারাবাহিক প্রতি-কূল সমালোচনা প্রকাশিত হচ্ছিল, ঠিক সে সময়েই রবীন্দ্রনাথের 'কবিকাহিনী' কাব্যও ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল ওই 'ভারতী' পত্রিকাতেই। আর ওই কাব্যের সূত্রপাতেই অমিত্রাক্ষর ছন্দের সাক্ষাৎ পাই—

"বিজন কুলায়ে বসি গাহিত বিহঙ্গ,
হেথা হোথা উঁকি মারি দেখিত বালক
কোথায় গাইছে পাখী।"—**কবিকাহিনী**, ১ম সর্গ (ভারতী,
১২৮৪ পৌষ)

'অভিলাষ' রচনার সময়ে কবির মনোভাব যাই হোক. 'মেঘনাদ বধের' সমালোচনার সময়ে সে মনোভাব যে অমিত্রাক্ষরের প্রতিকূল ছিল না. তাতে সন্দেহ নেই। বোধ করি সেজন্যই তিনি ওই কাব্যের সমালোচনাকালে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন নি। 'মেঘনাদ বধের' ত্রুটি দেখাবার জন্যই তিনি সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, গুণ দেখানো তাঁর অভিপ্রায়গত ছিল না। গুণগুলি তো সুবিদিতই ছিল। 'মেঘনাদ বধের' ছন্দে তার গুণাবলীরই অন্তর্গত।

৪

এবার 'অভিলাষ' কবিতার প্রেরণা-উৎস সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। রবীন্দ্র-জীবনীকার অনুমান করেন বালক-কবির মনের তৎকালীন 'নানা আশা নানা স্বপ্ন', 'বহু আকাঙ্ক্ষা' ও 'বিচিত্র সাধ'ই হয়তো অভিলাষ কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু কবিতাটি একটু মন দিয়ে পড়লেই বোঝা যাবে, এ অনুমান একেবারেই ভিত্তিহীন। তিনি শুধু 'অভিলাষ' নামটাকে সম্বল করে নিছক কল্পনার জোরেই ওই অনুমানে উপনীত হয়েছেন। কবিতাটির মর্মগত অভিপ্রায়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে একবার পড়লেই কোনো সন্দেহ থাকবে না যে, কবিতাটিতে কবিচিত্তের কোনো অভিলাষই প্রকাশ পায় নি, প্রকাশ পেয়েছে মানবচিত্তের অভিলাষ-বৃত্তির প্রতি কবির ধিক্কারবাণী। 'জনমনোমুগ্ধকর উচ্চ অভিলাষ'-কে কবি কখনও বলছেন 'দুরভিলাষ', কখনও বলছেন 'দুষ্ট অভিলাষ' বা 'দুরাকাঙ্ক্ষা'। কবির মূল বক্তব্য এই যে, মানুষ সুখের আশায় উচ্চাভিলাষ পোষণ করে, কিন্তু অভিলাষের

পথে সুখের সন্ধান পাওয়া যায় না; অভিলাষ মানুষকে চালিত করে শুধু অধর্ম ও বিনাশের দিকে—

"কোথায় তোমার অন্ত রে দুরভিলাষ
স্বর্ণ অট্টালিকা মাঝে? তা নয় তা নয়।
সুবর্ণ খনির মাঝে অন্ত কি তোমার
তা নয় যমের দ্বারে অন্ত আছে তব।৭
"সন্দেহ ভাবনা চিন্তা আশঙ্কা ও পাপ
এরাই তোমার পথে ছড়ান কেবল।"১২

বস্তুতঃ অভিলাষের প্রেরণায় চালিত মানব শুধু হত্যা অনুতাপ শোক' ও 'প্রতারণা প্রবঞ্চনা অত্যাচারের' পথেই অগ্রসর হয়। অভিলাষের তাড়নায় মানবসমাজ শুধু যুদ্ধবিগ্রহ ও অশান্তিতেই বিক্ষুব্ধ হয়। এই হচ্ছে অভিলাষ কবিতার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। এ কথা প্রতিপন্ন করতে গিয়ে বালক কবি, কি ভাবে কৈকেয়ীর দুষ্ট অভিলাষ দশরথের জীবন কেড়ে নিল, রাবণের অভিলাষ কি ভাবে রামসীতার সুখময় সংসারের শান্তিভঙ্গ করল এবং দুর্যোধনের দুরাকাঙ্ক্ষা 'পান্ডবদিগের হৃদে' ক্রোধ জেবলে দিল ও ফলে ভারতবর্ষকেই ছারখার করল, তাও সবিস্তারে বর্ণনা করতে ছাড়েন নি—

"কুরুক্ষেত্র রক্তময় করে দিলে তুমি
কাঁপাইলে ভারতের সমস্ত প্রদেশ
পান্ডবে ফিরায়ে দিলে শূন্য সিংহাসন।"

বালক কবি অবশ্য অভিলাষের ভাল দিক্‌টাও দেখেছেন কবিতার একেবারে শেষের তিনটি শ্লোকে—

"বলিনা হে অভিলাষ তোমার ও পথ
পাপেতেই পরিপূর্ণ পাপেই নির্মিত।"৩৭

তিনি স্বীকার করেছেন কোনো কোনো অভিলাষ 'উপকারী'ও হয়। তা ছাড়া, সকলেই যদি 'নিজ নিজ অবস্থায়' 'নিজ বিদ্যাবুদ্ধিতেই' সন্তুষ্ট থাকত, তাহলে জগতের উন্নতিও হতে পারত না—

"উচ্চ অভিলাষ! তুমি যদি নাহি কভু
বিস্তারিতে নিজ পথ পৃথিবীমণ্ডলে
তাহা হলে উন্নতি কি আপনার জ্যোতি
বিস্তার করিত এই ধরাতল মাঝে?"৩৮

কবি এ ভাবে তিনটি শেলাকে অভিলাষের প্রতি সুবিচারে করলেও বাকি ছত্রিশটি শেলাকে উচ্চাভিলাষকে ধিক্‌কারই দিয়েছেন।

এখন প্রশ্ন, কবি উচ্চাভিলাষকে এমন করে ধিক্‌কার দিতে উদ্যত হলেন কেন? আমার মনে হয়, এ ক্ষেত্রে একাধিক কারণই মিলিত হয়ে কবিচিত্তের ধারারূপে প্রবাহিত হয়েছে অভিলাষ কবিতার পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে। এই কারণগুলির মধ্যে মুখ্যতম হচ্ছে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাঙ্গালির বাহুবল'-নামক প্রবন্ধটি। এই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র উচ্চাভিলাষকে খুব উচ্চ স্থান দিয়ে বাঙালিকে খুব জোরের সঙ্গেই ওদিকে প্রবর্তনা দিয়েছিলেন—

"বেগবৎ অভিলাষ হৃদয়মধ্যে থাকিলে উদ্যম জন্মে।...এরূপ বেগযুক্ত কোন অভিলাষ বাঙ্গালির হৃদয়ে স্থান পাইলে, উদ্যম জন্মিবে।...

"যখন বাঙালির হৃদয়ে সেই এক অভিলাষ জাগরিত হইতে থাকিবে, যখন বাঙ্গালিমাত্রেরই হৃদয়ে সেই অভিলাষের বেগ এরূপ গুরুতর হইবে যে, সকল বাঙ্গালিই তজ্জন্য আলস্য সুখ তুচ্ছ বোধ করিবে, তখন উদ্যমের সঙ্গে ঐক্য মিলিত হইবে।

"সাহসের জন্য আর একটু চাই। চাই যে, সেই জাতীয় সুখের অভিলাষ আরও প্রবলতর হইবে।...যদি এই বেগবৎ অভিলাষ কিছুকাল স্থায়ী হয়, তবে অধ্যবসায় জন্মিবে।

"অতএব যদি কখন (১) বাঙ্গালির কোনো জাতীয় সুখের অভিলাষ হয়, (২) যদি বাঙ্গালিমাত্রেরই হৃদয়ে সেই অভিলাষ প্রবল হয়, (৩) যদি সেই প্রবলতা এরূপ হয় যে, তদর্থে লোকে প্রাণপণ করিতে প্রস্তুত হয়, (৪) যদি সেই অভিলাষের বল স্থায়ী হয়, তবে

বাঙ্গালির অবশ্য বাহুবল হইবে।"—বাঙ্গালির বাহুবল, বঙ্গদর্শন—১২৮১ শ্রাবণ।

এই প্রবন্ধ প্রকাশের তিন মাস পরে 'অভিলাষ' প্রকাশিত হয় (১২৮১ অগ্রহায়ণ)। আমি মনে করি 'অভিলাষ' কবিতা বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রবন্ধেরই প্রতিবাদ। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধে আছে জাতীয় সুখের অভিলাষের প্রবর্তনা, বালক কবির মতে সুখের অভিলাষ মানুষকে টেনে নেয় পাপ ও বিনাশের মধ্যে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধে ধর্মের প্রবর্তনার লেশমাত্রও নেই। এটাই বালক কবির চিত্তকে পীড়া দিয়েছে সব চেয়ে বেশি। কেননা, সুখের অভিলাষ মানুষকে নিয়ে যায় পাপের পথে, আর 'পাপের কি ফল কভু সুখ হতে পারে'? যথার্থ সুখের নাম সন্তোষ এবং 'পবিত্র ধর্মের দ্বারে সন্তোষ-আসন'। সন্তোষেই চিরস্থায়ী সুখ এবং 'পবিত্র ধর্মের দ্বারে চিরস্থায়ী সুখ পাতিয়াছে আপনার পবিত্র আসন'।

যে সময়ে 'বাঙ্গালির বাহুবল' প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়. তখন বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মভাবের ভাবুক ছিলেন না। পক্ষান্তরে ঠাকুরবাড়িতে ধর্মের প্রবর্তনাই ছিল সকলের চেয়ে বড় প্রবর্তনা। তাই এই কবিতাটিতে যে সুখাভিলাষকে ধিক্‌কৃত করে ধর্মেরই জয় ঘোষিত হল. তা অপ্রত্যাশিত নয়। আর এই কবিতাটি যে ধর্মচিন্তার বাহক 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকাতেই প্রকাশিত হল, তাও তাৎপর্যহীন নয়।

'মেঘনাদ বধ' কাব্যের সমালোচনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ 'জীবন-স্মৃতি'তে বলেছেন—

> "আমি অল্প বয়সের স্পর্ধার বেগে 'মেঘনাদ বধের' একটি তীব্র সমালোচনা লিখিয়াছিলাম।...অন্য ক্ষমতা যখন কম থাকে খোঁচা দিবার ক্ষমতাটা খুব তীক্ষ্ম হইয়া উঠে।...এই দাম্ভিক সমালোচনাটা দিয়া আমি 'ভারতী'তে প্রথম লেখা আরম্ভ করিলাম।"—**জীবনস্মৃতি,** ভারতী।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-জীবনীকারের অভিমতটাও স্মরণীয়। তিনি বলেন—

> "জ্ঞানাঙ্কুরে তাঁহার গদ্য রচনা শুরু হয় সাহিত্য সমালোচনা দিয়া ; ভারতীতে 'মেঘনাদ বধ' কাব্যর আলোচনা দিয়া রচনা আরম্ভ করিলেন। চিরদিনই দেখা যায়, সাহিত্যক্ষেত্রে নবীন লেখকগণ তাঁহাদের আবির্ভাবকে প্রবীণের সমালোচনা ও সনাতনীদের নিন্দার দ্বারা বিঘোষিত করেন।"—**রবীন্দ্র-জীবনী**, প্রথম খণ্ড (১৩৬৭), পৃঃ ৬৬।

দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের অল্প বয়সের এই যে প্রতিবাদ-প্রবণতা, 'অভিলাষ' কবিতা তারই প্রথম নিদর্শন। গদ্য রচনা যেমন শুরু হয় সমালোচনা দিয়ে, পদ্য রচনারও সূত্রপাত তেমনি প্রতিবাদের দ্বারাই। 'ভারতী'তে 'মেঘনাদ বধ' সমালোচনা প্রকাশের তারিখ ১৮৭৭, 'জ্ঞানাঙ্কুর' ও 'প্রতিবিম্ব' পত্রিকায় ভুবনমোহিনী-প্রতিভা প্রভৃতি তিনখানি গ্রন্থের সমালোচনা প্রকাশিত হয় তার আগের বৎসর অর্থাৎ ১৮৭৬ সালে (১২৮৩ কার্তিক) ; আর 'তত্ত্ববোধিনী'তে 'অভিলাষ' প্রকাশিত হয় তারও দুই বৎসর আগে ১৮৭৪ সালে (১২৮১ অগ্রহায়ণ)। প্রবীণের প্রতিবাদের মধ্যেই নবীনের আবির্ভাব বিঘোষিত হয়, রবীন্দ্র-জীবনীকারের এই উক্তির সত্যতা (অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথের পক্ষে) নূতন করে সপ্রমাণ হল 'অভিলাষ' কবিতার দ্বারা। এ ক্ষেত্রে প্রবীণ স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র এবং নবীন সাড়ে তেরো বৎসরের বালক রবীন্দ্রনাথ। উভয় নামই তখন অপ্রকাশিত ছিল। কিন্তু আজ আমরা বুঝতে পারছি, তেরো-চৌদ্দ বৎসর বয়সেই বালক রবীন্দ্রনাথের 'স্পর্ধার বেগ' তথা আত্মশক্তিতে বিশ্বাস কতখানি বলিষ্ঠ ছিল।

এই হল বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি বালক রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদের প্রথম তীর নিক্ষেপ, কিন্তু প্রচ্ছন্নতার আড়াল থাকে। সাহিত্যের ইতিহাসজ্ঞরা সকলেই জানেন যে, 'অভিলাষ' প্রকাশের ঠিক দশ বৎসর পরে তরুণ রবীন্দ্রনাথ প্রবীণ বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যেই লেখনী ধারণ করতে কুণ্ঠিত হননি। 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত

(১২৯১ অগ্রহায়ণ) 'একটি পুরাতন কথা'-নামক প্রবন্ধটি তার নিদর্শন। বঙ্কিম-রবীন্দ্রের এই মসীযুদ্ধের ইতিহাস বর্ণনা বর্তমান প্রবন্ধের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক। প্রাসঙ্গিক শুধু এটুকু যে, উভয় ক্ষেত্রেই বিরোধের মূলে ছিল ধর্মগত মতভেদ। 'অভিলাষ' প্রকাশের সময়েও (১২৮১ অগ্রহায়ণ) যে বঙ্কিমচন্দ্র 'তত্ত্ববোধিনী'-সম্প্রদায়ের উপরে প্রসন্ন ছিলেন না, তা সুবিদিত। 'অভিলাষ' তারই প্রতিক্রিয়া। 'অভিলাষ' কবিতায় আক্রমণের বেগ কম ছিল না। কিন্তু বালক কবির যথাসাধ্য আক্রমণও বঙ্কিমচন্দ্রের বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বকে স্পর্শ করতে পারেনি এবং দেশের মনেও কোনো তরঙ্গ জাগাতে পারেনি। কিন্তু তার দশ বৎসর পরেই তরুণ রবীন্দ্রের আক্রমণে বঙ্কিমচন্দ্রের বলিষ্ঠ চিত্তও বিচলিত হয়েছিল এবং সমগ্র সমাজও আলোড়িত হয়েছিল। এ ক্ষেত্রেও বিরোধের হেতু ধর্মাদর্শগত মতভেদ। সুতরাং অভিলাষ কবিতাটি অনাগত বঙ্কিম-রবীন্দ্র বিরোধের ক্ষীণ পূর্বাভাস বলে স্বীকৃতিলাভের যোগ্য, একথা বলা অযৌক্তিক নয়।

৫

এবার 'অভিলাষ' কবিতার রচনাকাল সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা প্রয়োজন। এই কবিতার মূলতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাঙ্গালির বাহুবল' প্রবন্ধের প্রতিবাদরূপেই রচিত একথা যদি স্বীকার করা হয় তাহলে মানতেই হবে যে, কবিতাটি ১২৮১ সালের শ্রাবণ থেকে অগ্রহায়ণের মধ্যে কোনো সময়ে রচিত। আর তাহলে একথাও মানতে হবে যে, কবিতাটি বস্তুতঃ 'দ্বাদশবর্ষীয় বালকের রচিত' নয়। বাৎসল্যবশতঃই অনেক সময় প্রতিভাশালী বালক-বালিকার বয়স প্রকৃতের চেয়ে কম বলে বিশ্বাস করার প্রবণতা দেখা দেয়। এটা অস্বাভাবিকও নয়। রবীন্দ্রনাথের জীবনেই এরকম ঘটতে আরও দেখা গেছে। ১৮৭৫ সালের মে মাসে 'প্রকৃতির খেদ'-নামক কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ আবৃত্তি করেন বিদ্বজ্জন-সমাগমের এক অধিবেশনে। সে সময় রবীন্দ্রনাথের বয়স পূর্ণ চৌদ্দ বৎসর।

কিন্তু তৎকালে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর বয়স ১২।১৩ বৎসর বলে। সুতরাং 'অভিলাষ' প্রকাশকালে রবীন্দ্রনাথের বয়স বারো বৎসর বলে বর্ণিত হওয়া সত্ত্বেও তা মেনে নেওয়া কিংবা কবিতাটিকেই আরও এক বা দেড় বৎসর পূর্বের রচনা বলে ধরে নেওয়া আবশ্যক বলে মনে করি না।

'অভিলাষ' কবিতা যে ১৮৭৪ সালের শেষার্ধের রচনা, একথা মনে করবার পক্ষে অন্য প্রমাণও আছে। বহুকাল পূর্বে আমি একটি প্রবন্ধে (বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৫০ বৈশাখ) দেখিয়েছি যে, রবীন্দ্রনাথের 'ম্যাকবেথ' ও 'কুমারসম্ভব' কাব্য পাঠ তথা তর্জমা ১৮৭৪ সালের ঘটনা। আর 'অভিলাষ' কবিতা যে 'ম্যাকবেথ' ও 'কুমারসম্ভব' কাব্য পাঠের পরবর্তী রচনা তার স্পষ্ট পরিচয় রয়েছে এই কবিতাটির মধ্যেই—

"ঐ দেখ ছুটিয়াছে তোমার ও পথে
রক্তমাখা হাতে এক মানবের দল
সিংহাসন রাজদন্ড ঐশ্বর্য মুকুট
প্রভুত্ব রাজত্ব আর গৌরবের তরে।২৪

"ঐ দেখ গুপ্তহত্যা করিয়া বহন
চলিতেছে অঙ্গুলির পরে ভর দিয়া
চুপি চুপি ধীরে ধীরে অলক্ষিত ভাবে
তরবার হাতে করি চলিয়াছে দেখ।২৫

"হত্যা করিতেছে দেখ নিদ্রিত মানবে
সুখের আশয়ে বৃথা সুখের আশয়ে
ঐ দেখ ঐ দেখ রক্তমাখা হাতে
ধরিয়াছে রাজদন্ড সিংহাসনে বসি।"২৬

এই লাইনগুলি, বিশেষতঃ 'হত্যা করিতেছে দেখ নিদ্রিত মানবে' লাইনটি, যে 'ম্যাকবেথ' পাঠেরই ফল, তাতে বোধ করি সন্দেহ করা চলে না। 'ম্যাকবেথ'-দম্পতীর বিবেকহীন নৃশংস রাজ্যলোভই

বোধ করি কোমল বালকচিত্তকে উচ্চাভিলাষের প্রতি এমন কঠিনভাবে বিমুখ করে তুলেছিল। তাই বঙ্কিমচন্দ্রকে বাঙালির মনে উচ্চাভিলাষ উদ্দীপ্ত করে তুলতে দেখে তিনি প্রতিবাদ না করে থাকতে পারেন নি।

রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্যের কাছে 'কুমারসম্ভব' এবং রামসর্বস্ব পণ্ডিতের কাছে 'শকুন্তলা' পড়তেন। তারও কিছু কিছু ছাপ দেখা যায় 'অভিলাষ' কবিতায়—

"নিরজন তপোবনে বিরাজে সন্তোষ।
পবিত্র ধর্মের দ্বারে সন্তোষ-আসন।"৯

এই যে তপোবন তথা ধর্মের প্রতি কবিচিত্তের অনুরক্তি, এটা 'কুমারসম্ভব' ও 'শকুন্তলা' পাঠেরই ফল বলে মনে করি। অন্ততঃ কবি নিজে তাই মনে করতেন পরিণত বয়সে। 'ম্যাকবেথে' আছে মানবচিত্তে দুরাকাঙ্ক্ষার প্রচণ্ড বিক্ষোভ ও বিনাশের কথা। আর 'কুমারসম্ভব-শকুন্তলায়' আছে শান্ত প্রসন্ন চিত্তের অক্ষুব্ধতা ও ধর্মনিষ্ঠার পরিবেশ। একটির প্রতি বিমুখতা ও অপরটির প্রতি অনুরাগ রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তে চিরকালের জন্য মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল তাঁর অল্প বয়সেই। তার সুস্পষ্ট পরিচয় পাই 'অভিলাষ' কবিতাটিতেই।

পরিণত বয়সে তপোবন-আদর্শের প্রতি রবীন্দ্রনাথের ঐকান্তিক অনুরাগের কথা সুবিদিত। বিশেষভাবে লক্ষণীয় এই যে, ওই তপোবন-অনুরক্তির প্রথম পূর্বাভাস দেখা দেয় এই 'অভিলাষ' কবিতাটিতেই। যে কবির কণ্ঠে পরিণত বয়সে ধ্বনিত হয়েছিল—

"প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে
প্রথম সামরব তব তপোবনে"

কিংবা—

"যে জীবন ছিল তব তপোবনে...
মুক্ত দীপ্ত সে মহাজীবনে
চিত্ত ভরিয়া লব।"

এই উদাত্ত সংগীত, সে কবিরই বালক কণ্ঠে প্রথম নির্গত হয়েছিল— 'নিরজন তপোবনে বিরাজে সন্তোষ' এই অনতিস্ফুট কলধ্বনি।

বস্তুতঃ লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, যে জীবনসূত্রে রবীন্দ্রনাথের পরিণত কালের সমস্ত কীর্তিমালা গ্রথিত ও বিধৃত হয়েছে, তারই প্রথম পূর্বাভাস প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর এই প্রথম কবিতাটিতেই। তাই বলছিলাম, এই 'অভিলাষ' কবিতাটিই হচ্ছে রবীন্দ্র-জীবনে ভোরের পাখির প্রথম কাকলি, আর এই প্রথম কাকলিতেই ঘোষিত হয়েছে অনাগত অভ্যুদয়ের উদাত্ত বিজয়ধ্বনি—

"তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়,
তোমারি হউক জয়॥"

রবীন্দ্রনাথের অতিপ্রাকৃত বা ভৌতিক গল্প

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

'কঙ্কাল', 'নিশীথে', 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'মণিহারা'—এই কয়েকটি গল্প রবীন্দ্র-সাহিত্যে এক স্বতন্ত্র শ্রেণীর গল্প। এ পর্যন্ত বাংলা-সাহিত্যে এদের জুড়ি মেলে নি। যাঁদের আমরা পৃথিবীর দু'জন শ্রেষ্ঠ গল্পলেখক বলি—সেই মোপাসাঁ ও চেকভের বহু ছোটগল্পের মধ্যে ঠিক এই জাতীয় গল্প চোখে পড়ে না। সুদূরপ্রসারী ও অন্তর্ভেদী কল্পনার বিচিত্র লীলায়, মনস্তত্ত্বের নিগূঢ় বিশ্লেষণ ও স্বরূপপ্রকাশে, একটা অতিপ্রাকৃত অনুভূতির উৎকণ্ঠিত, শিহরনময় পরিবেশ-রচনায়, অনুভূতি ও কল্পনার এক নবতর জগৎসৃষ্টিতে, প্রকাশের সার্থক ও কলামণ্ডিত অজস্রতায় এমন গল্প বিশ্ব-সাহিত্যে আছে কিনা জানি না। একজন প্রথম শ্রেণীর কবি ও মানবচিত্তের গভীরে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন এক উচ্চাঙ্গের শিল্পীর সংযুক্ত লেখনী থেকে এই গল্প কয়েকটির উদ্ভব হয়েছে।

এই গল্পগুলিকে সাধারণভাবে অতিপ্রাকৃত, অলৌকিক বা ভৌতিক আখ্যা দিলে এর যথার্থ স্বরূপ নির্ণয় করা হয় না। এগুলি কি প্রকারের অতিপ্রাকৃত তাই দেখতে হবে। সাহিত্যে অতিপ্রাকৃতের প্রকাশ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য লেখকেরা তিনটি স্তরের উল্লেখ করেছেন—(১) গল্প, উপন্যাস বা নাটকে অতিপ্রাকৃতের প্রত্যক্ষ আবির্ভাব ও ক্রিয়াকলাপ। ইউরোপের মধ্যযুগে যখন অতিপ্রাকৃতের বিশ্বাস অত্যন্ত প্রবল ছিল, তখন Mystery ও Morality Plays-এর মধ্যে এর অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায়। এরই কলাসম্মত প্রকাশ দেখা যায় শেক্সপীয়রের মধ্যে। Hamlet নাটকে Hamlet-এর পিতার প্রেতাত্মা তার হত্যাকারীকে তা জানিয়ে

দিয়ে তার হত্যার প্রতিশোধ নিতে বলল। Macbeth-এর witch-রাও রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়ে Macbeth-এর জীবনের ঘটনা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছে। Banquo-র প্রেতাত্মারও শূন্য চেয়ারে বসবার কথা আছে। Tempest-এর মধ্যে Ariel-এর আবির্ভাব ও তার অলৌকিক কার্যাবলীর উল্লেখ আছে। ক্রমেই কালের অগ্রগতিতে পাশ্চাত্য-সাহিত্যের আসরে এই সব অতিপ্রাকৃত প্রাণীর শারীরিক যাতায়াত কমে গিয়েছে।

ভারতবর্ষে নানা কারণে অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস এখনও বদ্ধমূল। এর প্রধান কারণ—তার ধর্ম ও দর্শন মৃত্যুর পরে আত্মার অস্তিত্ব, পুনর্জন্মবাদ ও কর্মবাদ স্বীকার করেছে। মৃত্যুর পর আত্মা সূক্ষ্মদেহ ধারণ করে, এই সূক্ষ্ম ছায়া-দেহতেই মানুষের কামনা-বাসনা, সুখ-দুঃখ বর্তমান থাকে। যদি সংসারের উপর আসক্তি প্রবল হয়, যদি কামনা-বাসনা অচরিতার্থ থাকে, তবে সে নানাভাবে সংসারের কাছে ঘুরতে থাকে। থিয়সফিষ্ট সম্প্রদায় ভারতীয় অধ্যাত্ম-দর্শনকেই মূল ভিত্তি করে মৃত্যুর পর আত্মার নানা অবস্থা কল্পনা করেছে এবং তাদের বিভিন্ন কার্যকলাপেরও বর্ণনা করেছে নানা গ্রন্থে। এই সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে অনেক ইউরোপীয় ও আমেরিকান আছেন। তাঁরা প্রেতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন এবং প্রেতের সঙ্গে জীবিত মানুষের যে ভাব-প্রকাশ সম্ভব, তাও বিশ্বাস করেন। তাঁদের গ্রন্থসমূহে বহু ভূতের গল্প বা ভৌতিক কার্যাবলীর বিবরণ আছে। তাঁরা Planchette Medium প্রভৃতির সাহায্যে আত্মার সঙ্গে সংযোগসাধন করেন। ভারতীয় জনসাধারণের বৃহত্তর অংশ এখনও ভূতে বিশ্বাস করে এবং পল্লীবাসীদের মধ্যে অনেকেই ভূতের অস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধভাবেই মেনে নেয়। আধুনিক শিক্ষাদীক্ষা-প্রাপ্ত শহরবাসীদের মধ্যে এই বিশ্বাস-প্রবণতার বিশেষ হ্রাস হয়েছে বলেও মনে হয় না, কারণ জনরুচির সন্তুষ্টির জন্য কোন কোন বাংলা সংবাদপত্রকে দেখা যায় মাসের পর মাস 'বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না', 'বিশ্বাস করুন আর নাই করুন' প্রভৃতি শিরোনামায়

অতিপ্রাকৃত ও অলৌকিক গল্প পরিবেষণ করছে। (২) অতি-প্রকৃত ও ভৌতিক সত্তাকে দৃষ্টিগোচর না করিয়ে, তারা ক্রিয়াকে প্রত্যক্ষগোচর করানো, একটি অতিপ্রাকৃত জগৎ রচনা করে একটা বিস্ময়, অজানিত ভয় ও রোমাঞ্চকর অনুভূতি-সৃষ্টির মধ্যেই এর সাহিত্যিক সাথর্কতা। ইংরেজী সাহিত্যে এই প্রকার অনুভূতি সৃষ্টি প্রসঙ্গে কোলরিজের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। তাঁর Ancient Mariner ও Christabel এইরূপ অতিপ্রাকৃত রসশিল্পের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। Ancient Mariner-এ প্রথম থেকেই কবি একটা অতি-প্রাকৃত রাজ্য সৃষ্টি করে নিয়েছেন। অদ্ভুতদর্শন নাবিকের মুখে এক অদ্ভুত বিবরণ। তার জাহাজটি ছাড়ার পর সেটা ঝড়ের বেগে তুষারাচ্ছন্ন দক্ষিণ-মেরুতে চলে গেল—সেখানে জনপ্রাণী নেই, কেবল স্তূপীকৃত শব্দায়মান বরফ—কোথা থেকে এক Albatross পাখী জাহাজের সঙ্গে চলল—খেয়ালের বশে নাবিক তাকে গুলি করে মারল—তারপর আরম্ভ হল অলৌকিক দৃশ্য ও ক্রিয়ার সমারোহ—বাতাস বন্ধ হল, জলে জ্বলন্ত লাগলো বিচিত্র রকমের আগুন—তার পর কঙ্কাল জাহাজের আগমন—তার উপর অদ্ভুতদর্শন সব মূর্তি—কত Spirit ও Angel-এর আনাগোনা—শেষে বহু অলৌকিক অবস্থার মধ্যে দিয়ে নাবিক এসে পেঁছিল অরণ্যের এক সন্ন্যাসীর কাছে—সেখানে তার জাহাজটি ডুবে গেল—সে একটা লাইফ-বোটে উদ্ধার পেয়ে দেশে দেশে ভ্রমণ করে তার অভিজ্ঞতার বর্ণনা ও সর্ব-ভূতের দয়ার মহিমাকীর্তন করে বেড়াতে লাগল। নাবিকের এই বিচিত্র অভিজ্ঞতা এক স্বতন্ত্র জগতের; স্বাভাবিক ও সাধারণ জগতের সঙ্গে এর বিশেষ সম্বন্ধ নেই।Christabel-এও মধ্যযুগের এক দুর্গের মধ্যে এক অলৌকিক জগৎ সৃষ্টি করা হয়েছে। (৩) দ্রষ্টা ও বক্তার উত্তেজিত ভাবনা ও কল্পনার বহিঃপ্রকাশ দ্বারা একটা অতিপ্রাকৃত বা ভৌতিক অনুভূতির সৃষ্টি। এই অলৌকিক ঘটনা বা অবস্থান কোন স্বতন্ত্র জগতে বা আবেষ্টনে নেই—এসব দ্রষ্টারই একটা hallucination মাত্র। দ্রষ্টার মনের অন্তস্তলে যে

চিন্তা, দুঃখ, ক্ষোভ, অনুশোচনা, বিবেক-দংশন, কামনা-বাসনার গূঢ় স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে, তারই সম্মিলিত ফলস্বরূপ একটা বিশিষ্ট অনুভূতির রঙে সে পারিপার্শ্বিককে দেখছে। সে যা দেখছে বা শুনছে বলে মনে করেছে, তার অস্তিত্ব তার মন ছাড়া বাইরে আর কোথাও নেই—তার মস্তিষ্কই এর স্রষ্টা।

রবীন্দ্রনাথের অতিপ্রাকৃত গল্পগুলির প্রায় সবই এই জাতীয়। কেবল 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর মধ্যে একটু ব্যতিক্রম দেখা যায়। যথাস্থানে সে আলোচনা করা যাবে।

মোট কথা, এই প্রকার গল্পের উদ্দেশ্য পাঠকের মনে একটা রহস্যময় রোমাঞ্চকর অনুভূতিসৃষ্টি। রসের দিক দিয়ে একে বলা যায় বিস্ময়রস। এই বিস্ময়রসের উদ্বোধনে—এই অতিপ্রাকৃত ভৌতিক অনুভূতি-সঞ্চারের সাফল্যের মধ্যে এই শ্রেণীর গল্পের সার্থকতা নির্ভর করে। সে দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথের এই গল্পগুলিতে এই আর্টের চরম নিদর্শন দেখানো হয়েছে। এই গল্পগুলির মধ্যে এমন মাত্রাজ্ঞান—এমন পরিমিত-বোধ আছে যে, পাঠকের মনে বিস্ময়রস চরমভাবে সৃষ্টি করবার পর-মুহূর্তেই লেখক লেখা শেষ করেছেন। এই অতিপ্রাকৃত অনুভূতির গণ্ডী—এই ভৌতিক মায়াজাল আর বেশীদূর প্রসারিত হয় নি। তারপর পাঠক আপনার বিচার-বুদ্ধি অনুসারে, যেমন ইচ্ছা এর প্রভাব অনুভব করতে পারেন।

'কঙ্কাল' গল্পটিতে একটি কঙ্কালের মুখে তার জীবিত-কালের আত্মকথার বর্ণনা দেওয়া হলেও, এর মধ্যে কোন অতি-প্রাকৃত আবহাওয়া সৃষ্টির প্রয়াস নেই। শ্রোতা কাহিনীটিকে নিজের নিদ্রাহীন উষ্ণ-মস্তিষ্কের কল্পনা মনে করে স্বাভাবিকভাবে 'চির-পরিচিতের মতো' বিদেহিনী রমণীর সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের জীবনে একটি বাস্তব অনুভূতি থেকেই যে গল্পটির উদ্ভব হয়েছিল, তিনি সে সম্বন্ধে নিজেই বলেছেন সুলেখিকা শ্রীমতী সীতা দেবীকে—

"ছেলেবেলা আমরা যে ঘরে শ্যুতুম, তাতে একটা মেয়ের skeleton ঝুলানো ছিল। আমাদের কিন্তু ভয়-টয় করত না! তারপর অনেক দিন কেটে গিয়েছে, আমার বিয়ে-টিয়ে হয়ে গিয়েছে, আমি তখন ভিতর-বাড়িতে শুই। একদিন কয়েকজন আত্মীয় এসেছেন, তাঁরা আমার ঘরে শোবেন, আমার উপর হুকুম হয়েছে বাইরে শোবার। অনেকদিন পরে আমি আবার সেই ঘরে এসে শুয়েছি। শুয়ে চেয়ে দেখলুম, সেজের আলোটা ক্রমে কাঁপতে কাঁপতে নিবে গেল। আমার মাথায় বোধহয় তখন রক্ত বোঁ বোঁ করে ঘুরছিল, আমার মনে হতে লাগলো কে যেন চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বলছে, 'আমার কঙ্কালটা কোথায় গেল, আমার কঙ্কালটা কোথায় গেল?' ক্রমে মনে হতে লাগল সে দেয়াল হাতড়ে বন্ বন্ করে ঘুরতে আরম্ভ করেছে। এই আমার মাথায় গল্প এসে গেল আর কি।"—(**পুণ্যস্মৃতি**, সীতা দেবী—পৃঃ ৪০০-১)।

'কঙ্কাল' একটি চমৎকার ব্যর্থ প্রেমের গল্প। রূপযৌবনমদমত্তা এক অপূর্বসুন্দরী বিধবা যুবতীর এক ডাক্তার যুবকের প্রতি প্রেমসঞ্চার এবং সেই প্রেমের প্রতিদানের সম্ভাবনাহীনতায় দলিতা নাগিনীর মতো প্রতিহিংসায় প্রেমাস্পদকে বিষপ্রয়োগ এবং নিজে বিষপানে আত্মহত্যা এই গল্পের বিষয়বস্তু। নারীর জীবনে প্রেমের প্রতিক্রিয়া এবং ডাক্তারের সঙ্গে তার সম্বন্ধ ধীরে ধীরে একটা গূঢ় শ্লেষের সঙ্গে বর্ণিত হয়ে শেষ পর্যন্ত নিদারুণ পরিণামে এসে পৌঁচেছে। প্রেম-মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের সঙ্গে কাব্যরস মিশ্রিত হয়ে গল্পটিকে পরম উপাদেয় করেছে। অবশ্য রবীন্দ্র-নাথের প্রেমের গল্পের রমণীয়তার প্রধান কারণই এই দুয়ের মিশ্রণ।

'নিশীথে' রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত অতিপ্রাকৃত বা ভৌতিক অনুভূতির গল্প। রবীন্দ্রনাথের অতিপ্রাকৃত গল্পের স্বরূপ সম্বন্ধে পূর্বে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর অতি-প্রাকৃত গল্পের ভিত্তি নিগূঢ় মনস্তত্ত্বের প্রক্রিয়ার মধ্যে নিহিত। মনের অস্বাভাবিক অবস্থা বা মনোবিকারজনিত একটা দৃষ্টি-বিভ্রম বা বাস্তব-প্রতীতি এই প্রকার অলৌকিক অনুভূতির জন্ম

দিয়েছে। এই ভৌতিক অনুভূতির উৎস বক্তারই মন—একটি মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার এ বহির্বিকাশ।

জমিদার দক্ষিণাচরণবাবুর সমস্ত মনকে বিশ্লেষণ করলে এর রহস্য বোঝা যাবে। দক্ষিণাবাবুর সহজাত চিত্তধর্মের প্রধান লক্ষণ —ক্ষণিক উচ্ছ্বাসপ্রবণতা ও আবেগের অগভীরতা—তাই পত্নীর প্রতি প্রেম তার চিত্ততলে স্থায়ী আসন গড়তে পারে নি। তাঁর প্রেমে নিষ্ঠার অভাব তাঁর স্ত্রী অনুমান করতে পেরেছিল। তাই তাঁর মুখে প্রেমের উচ্চভাষণ শুনলে তাঁর স্ত্রী অবিশ্বাস ও পরিহাসের হাসি হাসত। কিন্তু দক্ষিণাবাবু তাঁর এই প্রকৃতিগত দুর্বলতাকে সর্বদা সযত্নে স্ত্রীর কাছ থেকে গোপন করতে চেষ্টা করতেন।

স্ত্রীর দীর্ঘ দুরারোগ্য রোগে দক্ষিণাবাবুর হৃদয়বন্ধন শিথিল হয়ে গেল। কিন্তু তিনি প্রাণপণে সেটাকে ঢেকে রাখতে চেষ্টা করলেন। তারপর বায়ুপরিবর্তনের জন্য এলাহাবাদে গিয়ে হারান ডাক্তারের মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় রুগ্না স্ত্রীর সাহচর্য তাঁর কাছে অসহ্য হয়ে উঠল। স্ত্রী মরে গেলে তিনি নিষ্কৃতি পান এমন একটা ভাবও তাঁর মনে জাগতে পারে। স্ত্রী এটা বুঝতে পেরেছিল এবং তাড়াতাড়ি জীবন শেষ করার জন্যে আত্মহত্যা করল।

দক্ষিণাবাবুর মনে দোষী বিবেকের (guilty conscience) বোধ জন্মাল। তিনি পতিগতপ্রাণা স্ত্রীর উপর অবিচার করেছেন, তাকে প্রতারণা করেছেন, তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন ; তাঁর স্বার্থপরতা তাঁর স্ত্রীর কাছে ধরা পড়েছে—এই আত্মগ্লানি তাঁর অন্তরের অন্তস্তলে সঞ্চিত হল। তিনি নানাভাবে—বুদ্ধি ও যুক্তির প্রয়োগ দ্বারা কর্মের মধ্যে নিজেকে ব্যাপৃত রেখে, পারিপার্শ্বিকের পরিবর্তনে—সর্বসময়ে এটাকে ভুলতে চেষ্টা করতে লাগলেন। এই দোষী বিবেকচেতনা প্রত্যক্ষ অনুভূতির ক্ষেত্র থেকে সরে গিয়ে নির্জ্ঞান বা অবচেতন মনে আশ্রয় গ্রহণ করল।

গল্পের ভাববস্তু ও রসবিশ্লেষণ এই দোষ-চেতনার দুটো তীক্ষ্ন

শূল হল—তাঁর স্ত্রীর কাছে ধরা পড়বার দুটো বিশেষ ঘটনা। একটি,—বরানগরের বাগানে দক্ষিণাচরণ জ্যোৎস্নালোকে তাঁর স্ত্রীকে বলেছিলেন—'তোমার ভালোবাসা আমি কোনকালে ভুলিব না'। তার উত্তরে তাঁর স্ত্রী পরিহাস-তীব্র সুতীক্ষ্ন হাসি হেসেছিলেন। অপরটি,—এলাহাবাদে মনোরমাকে প্রথম দেখে তাঁর স্ত্রী চমকিত হয়ে দক্ষিণাবাবুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'ও কে! ও কে গো'! বিবাহিত জীবনে দক্ষিণাবাবু মনোরমার সঙ্গে নানা প্রেমালাপে তার হৃদয় অধিকার করতে চেষ্টা করতেন, কিন্তু মনোরমা 'হাসিত না, গম্ভীর হইয়া থাকিত'। 'তাহার মনের কোন্‌খানে কি খটকা লাগিয়া গিয়াছিল' দক্ষিণাবাবু তা বুঝতেন না।

সেই বরানগরের বাগানে এক সন্ধ্যায় জ্যোৎস্নালোকে সেই শুভ্র পাথরের বেদীর উপর শয়ানা মনোরমাকে দক্ষিণাবাবু যখন বললেন, 'মনোরমা, তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না, কিন্তু তোমাকে আমি ভালবাসি। তোমাকে আমি কোনকালে ভুলিতে পারিব না'। ভাবানুষঙ্গে হঠাৎ স্মৃতির দ্বার ভেঙে অবচেতনমনলগ্ন প্রথমা পত্নীর পরিহাসপূর্ণ সেই হাসি সমস্ত আকাশ-বাতাসে ধ্বনিত হয়ে যেন তাঁকে মর্মান্তিক ব্যঙ্গ করতে লাগল। তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। বাড়ির আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিক পরিবর্তনের জন্যে তিনি মনোরমাকে নিয়ে বোটে জলপথে বেড়াতে বেরুলেন। তারপর পদ্মার চরে চন্দ্রালোকে দু'জনে বেড়াবার সময় যখন মনোরমার জ্যোৎস্নাবিকশিত মুখখানি তুলে চুম্বন করলেন, তখন চরবিহারী জলচর পাখীর ডাকে মগ্নচৈতন্যলীন তাঁর প্রথমা স্ত্রীর বিস্ময়-বেদনার্ত জিজ্ঞাসা, 'ও কে, ও কে গো', যেন জনমানবশূন্য বালুকাময় চরের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

যদিও বুঝতে পারলেন এ পাখীর ডাক, তবুও ভীত ও চকিত হয়ে বোটে ফিরে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লেন। শ্রান্তশরীরে মনোরমা অবিলম্বে ঘুমিয়ে পড়ল। তখন দক্ষিণাবাবু অনুভব করতে লাগলেন—

"অন্ধকারে কে একজন আমার মশারির কাছে দাঁড়াইয়া সুষুপ্ত মনোরমার দিকে একটি মাত্র দীর্ঘ শীর্ণ অস্থিসার অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া যেন আমার কানে কানে অত্যন্ত চুপি চুপি অস্ফুটকণ্ঠে কেবলই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, 'ও কে? ও কে? ও কে গো'?"

তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেশলাই জ্বালাইয়া বাতি ধরাইলাম। সেই মুহূর্তেই ছায়ামূর্তি মিলাইয়া গিয়া, আমার মশারি কাঁপাইয়া, বোট দুলাইয়া, আমার সমস্ত ঘর্মাক্ত শরীরের রক্ত হিম করিয়া দিয়া হাহা—হাহা—হাহা করিয়া একটি হাসি অন্ধকার রাত্রের ভিতর দিয়া বহিয়া চলিয়া গেল। পদ্মা পার হইল, পদ্মার চর পার হইল, তাহার পরবর্তী সমস্ত সুপ্ত দেশ, গ্রাম, নগর পার হইয়া গেল—যেন তাহা চিরকাল ধরিয়া দেশদেশান্তর লোকলোকান্তর পার হইয়া ক্রমশ ক্ষীণ ক্ষীণতর ক্ষীণতম হইয়া অসীম সুদূরে চলিয়া যাইতেছে; ক্রমে যেন তাহা জন্মমৃত্যুর দেশ ছাড়াইয়া গেল, ক্রমে তাহা যেন সূচীর অগ্রভাগের ন্যায় ক্ষীণতম হইয়া আসিল; এত ক্ষীণ শব্দ কখনো শুনি নাই, কল্পনা করি নাই; আমার মাথার মধ্যে যেন অনন্ত আকাশ রহিয়াছে এবং সেই শব্দ যতই দূরে যাইতেছে কিছুতেই আমার মস্তিষ্কের সীমা ছড়াইতে পারিতেছে না, অবশেষে যখন একান্ত অসহ্য হইয়া আসিল তখন ভাবিলাম, আলো নিবাইয়া না দিলে ঘুমাইতে পারিব না। যেমন আলো নিবাইয়া শুইলাম অমনি আমার মশারির পাশে, আমার কানের কাছে, অন্ধকারে আবার সেই অবরুদ্ধ স্বর বলিয়া উঠিল, 'ও কে, ও কে, ও কে গো'।

বুকের রক্তের ঠিক সমান তালে ক্রমাগতই ধ্বনিত হইতে লাগিল, 'ও কে, ও কে, ও কে গো'! 'ও কে, ও কে, ও কে গো'! সেই গভীর রাত্রে নিস্তব্ধ বোটের মধ্যে আমার গোলাকার ঘড়িটাও সজীব হইয়া উঠিয়া তাহার ঘণ্টার কাঁটা মনোরমার দিকে প্রসারিত করিয়া শেল্‌ফের উপর হইতে তালে তালে বলিতে লাগিল, 'ও কে, ও কে, ও কে গো'! 'ও কে, ও কে, ও কে গো'!

এই দুটি ব্যাপারেই দক্ষিণাবাবুর অন্তগূঢ় অবদমিত ভাবটি বাইরে আত্মপ্রকাশ করে, বুদ্ধিকে অভিভূত করে, তাঁর মনে বিভ্রান্তি উৎপাদন করেছে; তাঁর সমস্ত স্বাভাবিক ইন্দিয়ানুভূতি একটা অলৌকিক অনুভূতিতে পরিণত করেছে। এই মনস্তাত্ত্বিক রহস্যের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের অতিপ্রাকৃত গল্পের ভিত্তি প্রোথিত।

এই প্রসঙ্গে আর একটি মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া লক্ষ্য করবার বিষয়। এই ভ্রান্তি, এই বিভ্রম, অতিপ্রাকৃত অনুভূতির সৃষ্টি হয় একটি বিশেষ পরিবেশ ও আবহাওয়ার প্রভাবে। রাত্রির অন্ধকার, জ্যোৎস্নার আলোছায়া প্রভৃতিই এর প্রধান উত্তেজক কারণ। দিনের বেলায় উজ্জ্বল দিবালোকে, নানা কর্মনিমগ্নতার মধ্যে বুদ্ধির ক্রিয়া বিশেষ-ভাবে সংঘটিত হয়। যুক্তি ও বিচার সতেজ ও ক্রিয়াশীল থাকে; রাত্রিতেই এই মোহ, এই বিভ্রম, এই অলৌকিক চেতনা তার প্রভাব বিস্তার করে। এই অনুভূতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখা যায় সে দিনের বেলায় প্রকৃতিস্থ থাকে, কিন্তু রাত্রি হলেই তার ভাবান্তর উপস্থিত হয়, নিজের উপর ভৌতিক ক্রিয়ার প্রভাব অনুভব করে। 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'মণিহারা', 'নিশীথে', 'কঙ্কাল' প্রভৃতি সব গল্পেই ঘটনা রাত্রের ঘটনা, দিনের বেলায় এর প্রভাব থাকে না। এমন কি অভিভূত ব্যক্তি তার রাত্রির অভিজ্ঞতায় বিশেষ লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হয়।

'ক্ষুধিত পাষাণ' রবীন্দ্রনাথের বহু-কথিত ও বহু-প্রশংসিত গল্প। রবীন্দ্র-গল্পসাহিত্যে এর একটি স্বতন্ত্র স্থান আছে। এই গল্পে কবি রবীন্দ্রনাথ, ভাষাশিল্পী রবীন্দ্রনাথ ও মনস্তাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব সম্মেলন হয়েছে। এতে কাহিনীর অংশ কম কিন্তু বর্ণনার গৌরবে ও উপস্থাপনের কলাকৌশলে ক্ষীণ কাঠামোর উপর এক অপরূপ সৌধ রচনা করা হয়েছে। কল্পনার এমন অত্যাশ্চর্য ঐশ্বর্য, ভাষার সংগীত, ইঙ্গিত, ব্যঞ্জনা ও সাংকেতিকতায় সমৃদ্ধ এমন ইন্দ্রজালসৃষ্টি বিশ্বসাহিত্যে দুর্লভ। একজন প্রথম শ্রেণীর কবি ও উৎকৃষ্ট ভাষাশিল্পী ব্যতীত এমন স্বপ্নমায়ামণ্ডিত গল্প রচনা সম্ভব নয়। বাংলা ভাষার এমন অদ্ভুত প্রকাশ-ক্ষমতা,

এমন সূক্ষ্ম-কারুকার্যখচিত রাজবেশ আর কোথাও দেখা যায় না। এ যেন ভাষার তাজমহল।

রবীন্দ্রনাথের অতিপ্রাকৃত গল্পের মূল ভিত্তি যে মনস্তাত্ত্বিক সে কথা পূর্বপ্রসঙ্গে বলেছি। 'অল্পবয়স্ক', তুলার-মাশুল-কালেক্টরের মনকে এই ভাবে বিশ্লেষণ করা যায়—(ক) ব্যক্তিটি কল্পনাপ্রবণ (খ) আড়াই শত বৎসর পূর্বে দ্বিতীয় শা-মামুদের ভোগবিলাসের জন্যে নির্মিত এই মর্মর প্রাসাদে তরুণী পারসীক রমণীদের স্নানলীলা ও সংগীতালাপ সম্বন্ধে পূর্বে থেকেই অবিশ্বাস বা কিম্বদন্তী তার সূত্রে একটা ধারণা ছিল। (গ) জুনাগড়, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি মুস্‌লিম রাজ্যে কাজ করায় বাদশাহসুলভ রূপ-তৃষ্ণার অস্তিত্ব ও ঐ প্রকার প্রেমানুভূতি-আস্বাদনের জন্য আকাঙ্ক্ষা তার মগ্নচৈতন্যে বর্তমান ছিল। উত্তেজক কারণের মধ্যে (ঘ) নির্জন প্রদেশে প্রাসাদের অবস্থান (ঙ) নিঃসঙ্গতা (চ) রাত্রি-কাল (ছ) করিম-খাঁর নিষেধে একটা রহস্যময়তা—একটা অজানিত রোমাঞ্চকর আশংকা। এই প্রকার চিত্তবৃত্তি, এই প্রকার আবহাওয়ায় তার নিগূঢ় চরিতার্থতার পথ খুঁজেছে, এবং স্নেহ-প্রচেষ্টা অর্ধ-জাগ্রত অর্ধস্বপ্নাবস্থার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।

রবীন্দ্রনাথ 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পে এই প্রকার দৃষ্টি-বিভ্রমের আরও একটি কারণ নির্দেশ করেছেন। করিম-খাঁর জবানিতে কবি বলছেন—

> "এক-সময়ে ওই প্রাসাদে অনেক অতৃপ্ত বাসনা, অনেক উন্মত্ত সম্ভোগের শিখা আলোড়িত হইত—সেই-সকল চিত্তদাহে, সেই-সকল নিষ্ফল কামনার অভিশাপে এই প্রাসাদের প্রত্যেক প্রস্তরখন্ড ক্ষুধার্ত তৃষার্ত হইয়া আছে, সজীব মানুষ পাইলে তাহাকে লালায়িত পিশাচীর মতো খাইয়া ফেলিতে চায়।"

এই অবদমিত, অতৃপ্ত কামনা-বাসনা কেবল মানুষের নিভৃত চিত্তগুহাতেই বাসা বাঁধে, তা নয়, এমন কি পাষাণ-গৃহের প্রতি-

কক্ষের প্রস্তরে অদৃশ্য অনপনেয় অক্ষরে আপনাকে মুদ্রিত করে রাখতে পারে। সেই গৃহে যে-সব জীবন্ত মানুষ বাস করতে আসে, এই অচরিতার্থ নিষ্ফল কামনা তাদের অন্তরে সংক্রামিত হয়ে তাদের অনুভূতি ও কল্পনাকে প্রভাবান্বিত করে। যক্ষ্মা-বীজাণু-সংক্রামিত গৃহের সর্বত্র যেমন যক্ষ্মার-বীজাণু অদৃশ্যভাবে বর্তমান থাকে, সুস্থ ব্যক্তি বাস করতে গেলেই তাকে সংক্রামিত করে, এ যেন অনেকটা সেইরূপ।

বাদশাহের প্রমোদ-ভবনে নানা দেশের সুন্দরী যুবতী-সমাবেশ, নৃত্য, গীত, বিলাস-বিভ্রম ও মদিরার সাহচর্যে যেমন রূপ ও সৌন্দর্য-সম্ভোগের উদ্দাম স্রোত বয়ে যায়, তেমনি তার সঙ্গে প্রবাহিত হয় অবিশ্বাস, ষড়যন্ত্র, বঞ্চনা, হতাশা, বিষের জ্বালা, বুকফাটা কান্না, নিষ্ঠুর হত্যার আর একটি ধারা। একদিকে এ ভোগের স্বর্গ, অন্যদিকে বেদনার অনন্ত-নরক। কালের শাসনে ভোগের দাবাগ্নি নিবে গিয়ে স্তব্ধ অতীতের মধ্যে মিশে গেলেও প্রতিকারহীন অন্তর্গূঢ় বেদনা নিষ্ফল কামনা ও অতৃপ্ত উগ্র লালসার ভস্মরেণু সূক্ষ্ম অদৃশ্য আকারে এই প্রাসাদ-কক্ষের আবহাওয়ায় যেন ভেসে বেড়াচ্ছে। নবাগত ব্যক্তির গৃহপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই এদের সম্মোহিনী শক্তি তার উপর নিক্ষিপ্ত হয় এবং সে বুদ্ধি-বিবেচনা হারিয়ে ফেলে অভিভূত হয়ে পড়ে।

একটি বাদশাহী আমলের বাড়িকে কেন্দ্র করেই রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পের প্রেরণা এসেছিল। রবীন্দ্রনাথের মেজ-দাদা সত্যেন্দ্রনাথের কর্মস্থল ছিল আমেদাবাদে। সেখানে শাহীবাগে বাদশাহী আমলের এক পুরানো বাড়িতে ছিল তাঁর বাসা। এই বাড়িই 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর বাড়ি। এই বাড়ি ও গল্পের প্রেরণা সম্বন্ধে কবি উল্লেখ করেছেন তাঁর 'ছেলেবেলা' গ্রন্থে—

> "আমেদাবাদে একটা পুরানো ইতিহাসের ছবির মধ্যে আমার মন উড়ে বেড়াতে লাগলো। জজের বাসা ছিল শাহিবাগে, বাদশাহি আমলের রাজবাড়িতে। দিনের বেলায় মেজদাদা চলে যেতেন কাজে। বড় বড়

ফাঁকা ঘর হাঁ-হাঁ করছে, সমস্ত দিন ভূতে-পাওয়ার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি। সামনে প্রকাণ্ড চাতাল; সেখান থেকে দেখা যেত সাবরমতী নদী হাঁটু-জল লুটিয়ে নিয়ে এঁকে-বেঁকে চলছে বালির মধ্যে। চাতালটার কোথাও কোথাও চৌবাচ্ছার পাথরের গাঁথনিতে যেন খবর জমা হয়ে আছে বেগমদের আমিরিআনার।...আমেদাবাদে এসে এই প্রথম দেখলুম, চলতি ইতিহাস থেমে গিয়েছে, দেখা যাচ্ছে তার পেছন-ফেরা বড়ো-ঘরোআনা। তার সাবেক দিনগুলো যেন যক্ষের ধনের মতো মাটির নীচে পোঁতা। আমার মনের মধ্যে প্রথম আভাস দিয়েছিল 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর গল্পের।"

"সে আজ কত শত বৎসরের কথা। নহবৎখানায় বাজছে রোশনচৌকি দিনরাত্রে অষ্টপ্রহরের রাগিণীতে; রাস্তায় তালে তালে ঘোড়ার খুরের শব্দ উঠছে; ঘোড়সওয়ার তুর্কি-ফৌজের চলছে কুচকাওয়াজ, তাদের বর্শার ফলায় রোদ উঠছে ঝক্‌ঝকিয়ে। বাদশাহি দরবারের চারদিকে চলছে সর্বনেশে কানাকানি—ফুসফাস। অন্দরমহলে খোলা তলোয়ার হাতে হাবসি খোজারা পাহারা দিচ্ছে। বেগমদের হামামে ছুটছে গোলাব-জলের ফোয়ারা, উঠছে বাজুবন্ধ-কাঁকনের ঝন্‌ঝনি। আজ স্থির দাঁড়িয়ে শাহিবাগ, ভুলে-যাওয়া গল্পের মতো; তার চার দিকে কোথাও নেই সেই রঙ, নেই সেই সব ধ্বনি—শুকনো দিন, রস-ফুরিয়ে-যাওয়া রাত্রি।"

'মণিহারা' গল্পের অতি-প্রাকৃত অনুভূতি এই শ্রেণীর অন্যান্য গল্পের অনুভূতি থেকে স্বতন্ত্র। অন্যান্য গল্পের মানস-বিভ্রান্তি এসেছে সচেতন ও জাগ্রত অবস্থায়, কিন্তু এই গল্পের অনুভূতি স্বপ্নাবস্থার ব্যাপার। ফণিভূষণের নিজের মনের রহস্য স্বপ্নের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে এবং শেষে ঘুমন্ত অবস্থাতেই তাকে টেনে নিয়ে গিয়েছে নদীর ঘাটে। Somrambulism বা স্বপ্ন-চারিতার ক্রিয়া বলে সন্দেহ হওয়া অস্বাভাবিক নয়। সুতরাং জাগ্রত অবস্থায় ভ্রান্তি যে-অতিপ্রাকৃত রসের মূল, সেই সম্পূর্ণ রসটি এর মধ্যে পাওয়া যায় না।

রুদ্ধ অবদমিত কামনা-বাসনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বপ্নে আত্ম-প্রকাশ করে। স্বপ্নকে অবচেতন মনের দর্পণরূপে ধরা যায়। এই দর্পণে ফণিভূষণের যে-চিত্ত প্রতিবিম্বিত হয়েছে, তাকে বিশ্লেষণ করলেই এই প্রকার স্বপ্নানুভূতির স্বরূপ নির্দেশ করা যায়। (১) ফণিভূষণ তার স্ত্রীর রূপে মুগ্ধ ছিল এবং তাকে অত্যন্ত ভালবাসত। কিন্তু সে ভালবাসা ছিল যেমন কাব্যের নায়ক নায়িকাকে ভালবাসে—বাস্তবস্পর্শ প্রতিদিনের দান-প্রতিদানের ঊর্ধ্বে, হৃদয়ের নিভৃততলশায়ী। সেখানে ভালবাসাই একমাত্র অধিকার, পুরুষোচিত বর্বরতার লেশমাত্র নেই, নিজের সর্বনাশ হয়ে গেলেও মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না। আধুনিক শিক্ষা ও সভ্যতা-দুর্বল হৃদয়ের ভালবাসা। কিন্তু তার স্ত্রী মণিমালিকা ছিল প্রেমহীনা। এই সন্তানহীনা নারী স্বামীর অস্তিত্ব তার অন্তরের মধ্যে অনুভব করত না, কেবল স্বামীপ্রদত্ত গহনাকে একমাত্র সম্পদ মনে করে অতি যত্নে রক্ষা করত। ফণিভূষণের বঞ্চিত বুভুক্ষিত চিত্তের মধ্যে প্রবল প্রেমাকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত অবস্থায় ছিল। (২) স্ত্রীর নিরুদ্দেশের সংবাদে তার মনে প্রচণ্ড আঘাত লাগল। মনে হল ভালবাসা ব্যর্থ, ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থহীন, কেবল শূন্য সংসার-খাঁচাটা পড়ে আছে, পাখী উড়ে চলে গেছে। সে প্রতিক্ষণ স্ত্রীর আগমন তীব্রভাবে কামনা করতে লাগল। (৩) স্ত্রী যখন আর ফিরল না এবং তার কোন সংবাদও পাওয়া গেল না, তখন তার বিশ্বাস হল—কেউ গয়নার লোভে নৌকা আক্রমণ করে তাকে হত্যা করেছে। অলংকারপ্রিয় মণিমালিকা সর্বাঙ্গে অলংকার পরেই তার বাপের বাড়ি নিশ্চয় গিয়েছিল। (৪) মণিমালিকার পরিত্যক্ত শয়নঘরে শুতে গিয়ে ফণিভূষণ তার গামছা তোয়ালে শাড়ি সাবানের বাক্স, এমন কি ডিবায় তার স্বহস্তরচিত শুষ্ক পান দেখে মনে মনে বলল—"এসো মণিমালিকা এস, তোমার দীপটি তুমি জ্বালাও, তোমার ঘরটি তুমি আলো কর, আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তোমার যত্নকুঞ্চিত শাড়িটি তুমি পর, তোমার জিনিসগুলি তোমার জন্যে

অপেক্ষা করছে,” প্রবল আগ্রহ, তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায় সে ব্যগ্র চঞ্চল হয়ে উঠল। (৫) অন্ধতামসী রাত্রিতে মুষলধারে বৃষ্টি ও যাত্রাগানের সুরের মধ্যে তার নিদ্রাকর্ষণ হওয়ার সে ঘাট থেকে উঠে আসা ঠক্‌ঠক্‌ শব্দের সঙ্গে গয়নার ঝম্‌ঝম্‌ শব্দ শুনতে পেল। ভাবল, মণি আসছে, তাকে অভ্যর্থনা করার জন্য গেট পর্যন্ত ছুটে গেল, কিন্তু স্বপ্ন ভেঙে গেলে আর কোন শব্দ শুনল না। (৬) পরদিন রাত্রে গেট খুলে রেখে মণির অপেক্ষায় রইল। সেদিনও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, ভেক ও ঝিল্লীর অশ্রান্ত কলরবে চারদিক মুখরিত। দুপুর রাত্রে পূর্ব-দিনের মত শব্দ নদীর ঘাট থেকে উঠে এসে মুক্ত দ্বার দিয়ে অন্দর মহলের গোল সিঁড়ি ঘুরে শয়নকক্ষের দ্বারে এসে থামল। ফণি-ভূষণ রুদ্ধ আবেগে ‘মণি’! বলে চিৎকার করতেই তার ঘুম ভেঙে গেল। (৭) পরদিন প্রতীক্ষা ও উৎকণ্ঠা চরমে উঠল। ফণি ব্যাকুলচিত্তে ধারণা করল, আজ মণি নিশ্চয়ই আসবে। সে নিমীলিত নেত্রে ধ্যানাসনে বসে তার অপেক্ষা করতে লাগল। ক্রমে শব্দ দেউড়ির পাশ দিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। ফণিভূষণ চোখ মেলে দেখল চৌকির সামনে এক কঙ্কাল। তার সর্বাঙ্গে আভরণ সোনায় হীরায় ঝকঝক করছে। চোখের দৃষ্টিতে তাকে মণি বলে চিনতে পারল। কঙ্কাল স্তম্ভিত ফণিভূষণকে ডান হাত তুলে নীরবে সংকেত করল, ফণি মূঢ়ের মতো যন্ত্রচালিতের মতো, তার পিছনে পিছনে চলল। কঙ্কাল নীচে নেমে দেউড়ি পার হয়ে একেবারে ঘাটে এসে উপস্থিত হল। তারপর ধাপ বেয়ে নদীতে নামল, ফণিভূষণও তাকে অনুসরণ করে জলে পা দিল। জল স্পর্শ করবামাত্র তার তন্দ্রা টুটে গেল। “আপাদমস্তক বারম্বার শিহরিয়া শিহরিয়া স্খলিতপদে ফণিভূষণ স্রোতের মধ্যে পড়িয়া গেল। যদিও সাঁতার জানিত, কিন্তু স্নায়ু তাহার বশ মানিল না, স্বপ্নের মধ্য হইতে কেবল মুহূর্তমাত্র জাগরণের প্রান্তে আসিয়া পরক্ষণে অতলস্পর্শ সুপ্তির মধ্যে নিমগ্ন হইয়া গেল।”

ফণিভূষণের অতিপ্রাকৃত অনুভূতির স্বরূপ ও ক্রমবিবর্তন উল্লেখ করা গেল। স্বপ্নানুভূতির আবরণ থাকায় এতে 'নিশীথে' বা 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পের চমৎকারিত্ব ও সৌন্দর্য বিকশিত হতে পারেনি।

এই গল্পটির উৎপত্তি সম্বন্ধে অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত উল্লেখ করেছেন—

> "রবিবাবু বলিলেন...কুচবিহারের মহারাণী ভূতের গল্প শুনিতে বড় ভালবাসিতেন। আমায় বলিতেন—আপনি নিশ্চয়ই ভূত দেখিয়াছেন, একটি ভূতের গল্প বলুন। আমি যতই বলিতাম যে, আমি ভূত দেখি নাই, তিনি ততই মাথা নাড়িতেন, বলিতেন—না, কখনই না, নিশ্চয়ই আপনি ভূত দেখিয়াছেন। অগত্যা আমাকে একটি ভূতের গল্পের অবতারণা করিতে হইল। ভাঙ্গা পোড়া বাড়ি, কঙ্কালের খট্‌খট্‌ শব্দ, এই সমস্ত অবলম্বন করিয়া আমি 'মণিমালিকা' [মণিহারা] গল্পটি তাঁহাকে শুনাইলাম। গল্পটি তাঁহার বড় ভালো লাগিয়াছিল।"
>
> —('রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ', **মানসী ও মর্মবাণী, ফাল্গুন** ১৩২৩)।

রবীন্দ্রনাথ ও সাহিত্য-ইন্দ্রিয়

শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র

১৩২১-এর আষাঢ় সংখ্যার সবুজপত্রে 'বর্ষার কথা' প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী জানিয়েছিলেন, 'বর্ষার রূপগুণ সম্বন্ধে যা কিছু বক্তব্য ছিল, তা কালিদাস সবই বলে গেছেন—বাকী যা ছিল, তা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন। এ বিষয়ে একটি নূতন উপমা কিংবা নূতন অনুপ্রাস খুঁজে পাওয়া ভার।' বর্ষা সম্বন্ধে সেকালে বাঙালী কবিদের নতুন কিছু করবার ছিল না বলেই তিনি বিশ্বাস করতেন। তাঁর সুপরিচিত কৌতুকের রীতিতেই তিনি বলেছিলেন, 'বর্ষার রূপ কালো, রস জোলো, গন্ধ পঙ্কজের নয়—পঙ্কের, স্পর্শ ভিজে এবং শব্দ বেজায়। সুতরাং যে বর্ষা আমাদের ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত, তার যথাযথ বর্ণনাতে বস্তুতন্ত্রতা থাকতে পারে, কিন্তু কবিত্ব থাকবে কিনা তা বলা কঠিন।' তবু সেই মাসেই সত্যেন দত্ত সেই 'সবুজপত্রে'ই তাঁর 'আষাঢ়ের গান' কবিতাটি লিখেছিলেন। তাতে তিনি জানিয়েছিলেন—

> "ঘরে আর নয় রে থাকা,
> নয় রে থাকা, নয় রে কভু
> পোড়ে তো পুড়বে পাখা।
> উড়বে চাতক উড়বে তবু
> বাইরে কদম ফুটে
> নূতনের পরশ লুটে
> হরষের তুফান উঠে
> প্রাণ-সায়রে।"

তারই পরের সংখ্যায় 'সবুজপত্রে'র প্রথম কবিতা ছিল রবীন্দ্রনাথের 'সর্বনেশে'। তিনি লিখেছিলেন—

"এবার যে ঐ এল সর্বনেশে গো!
বেদনার যে বান ডেকেছে
রোদনে যায় ভেসে গো।"

তাঁর এই কবিতারই অন্য এক ছত্রে তিনি বলেছিলেন—

"পথটাকে আজ আপন করে নিয়ো রে।"

১৩২১ সালের সেই 'বর্ষার কথা' প্রবন্ধের মধ্যেই প্রমথ চৌধুরী সুকৌশলে কবিতার বিশেষ কাজ বা লক্ষ্যের কথা জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন—"ব্যক্তদ্বারা ইন্দ্রিয় এবং অব্যক্তদ্বারা কল্পনাকে অভিভূত না করতে পারলে, দেহ ও মনের সমষ্টিকে সম্পূর্ণ মোহিত করা যায় না।"

সাহিত্য যে একটি স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয়,—এবং তার সাহায্যে জগৎকে নতুন ভাবে দেখানোই যে সাহিত্যিকের কাজ, সে-কথা রবীন্দ্রনাথ নিজেও বলে গেছেন।

কল্পনাকে অভিভূত করবার জন্যে সাহিত্যে আয়োজনের যেন আর অন্তই নেই! এদেশে, বিদেশে—সব কালে, সব দেশে শিল্পাঙ্গিকের বার-বার পরিবর্তন ঘটছে এই কারণেই। সংকেত, ব্যঞ্জনা, রেশ, রূপক, প্রতীক, সাদৃশ্য-চিন্তার অন্ত নেই। এই সূত্রে একালের তথাকথিত নানা-রকম ইঙ্গিতবাদী সাহিত্যের কথা মনে পড়ে। এডগার অ্যালান পো কবিতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছিলেন যে, কোনো একটি আইডিয়া বা ভাবের সঙ্গে সংগীতধর্ম জড়িত হয়ে অনির্দেশ্য যে-সব অনুভূতি সৃষ্টি করে, কাব্য তারই সঙ্গে জড়িত অবস্থায় দেখা দেয়! পো'র এই ধারণাটি ফরাসী সাহিত্যে বদ্‌লেয়ার-গোষ্ঠীর মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। কবিতার প্রকৃতি সম্বন্ধে পো'র এই ধারণা যখন ফরাসী সাহিত্যের মধ্য দিয়ে অ্যামেরিকায় গিয়ে পৌঁছোয়, তখন কিন্তু পো'র দেওয়া আদি-

ধারণাটি এই সব আদান-প্রদানের মধ্য দিয়েই অনেক বদলে গেছে। পো যা বলেছিলেন, সে তো সব দেশের, সব কালের, সব রুচির কবিতা সম্বন্ধে সর্বস্বীকার্য মন্তব্য,—অর্থাৎ তাকে বলা যায়, কবিতার সনাতন সংজ্ঞা। ফরাসী সাহিত্যে 'ইম্‌প্রেশনিষ্ট' কবিরা কিন্তু কবিতার অনির্দেশ্য অনুভূতির ওপরেই বিশেষ জোর দিয়ে একটা বিশেষ আঙ্গিক বা কাব্যপ্রযুক্তি প্রবর্তনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কোনো একটি কবিতা লেখবার সময়ে কবির মানসিক অবস্থাটি ঠিক যে রকম হয়, সেই কবিতা পড়বার সময়ে পাঠকের মনের মধ্যে ঠিক সেই অবস্থার হুবহু প্রতিচ্ছবি ঘটিয়ে তোলার লক্ষ্যেই তাঁরা নিষ্ঠা দেখাতে চেয়েছিলেন। যথার্থ 'ইম্‌প্রেশনিষ্ট' কবিতা অনির্দিষ্ট 'রূপময়'—অর্থাৎ তাতে কবিতার 'রূপ' বা ফর্মের নির্দিষ্ট বাঁধন নেই। কবিতার বিষয়বস্তুর সঙ্গে সেই বিষয়-বস্তুজনিত অনুভূতির অন্বয় থেকে পাওয়া বাচনিক অভিব্যক্তিকে তাঁরা একরকম সামগ্রিক প্রকাশ বলে ধরে নিলেন। তাকেই বলা হোলো 'ইম্‌প্রেশনিষ্ট' প্রকাশ। কবির বিশেষ বিষয়বস্তু আর সেই বিষয়বস্তুজনিত অনির্দেশ্য অনুভূতির মিশ্রণের জন্যেই যে এ-ধরনের প্রকাশকে অনির্দেশ্য ভাবসঞ্চারী বলা যাবে, তা নয়, সব মিলিয়ে অন্বয়টাই হোলো 'ইম্‌প্রেশনিষ্ট'। পিটার কুইনেল তাঁর বদলেয়ার ও প্রতীকধর্মী লেখক-সম্প্রদায়ের বিষয়ে আলোচনার মধ্যে অবিশ্যি এডগার অ্যালান পো'র এই প্রভাবের কথাতে কোনো-রকম গুরুত্ব দেখাননি। ক্যাথলিক খ্রীষ্টীয় মতবাদের প্রভাবও তিনি অগ্রাহ্য করেছেন। কিন্তু এখানে সে-প্রসঙ্গের বিস্তার অনাবশ্যক। রবীন্দ্রনাথের রচনা-রীতি এবং তাঁর সংকেত-ভাষণের কথাতেই ফেরা যাক্।

সাহিত্যের ধারায় রবীন্দ্রনাথ কোনো নব্য-সংকেতবাদের প্রবর্তন করেন নি বটে,—কিন্তু 'মানে', 'ইশারা', 'বোঝা', 'বাজা' ইত্যাদি শব্দ তাঁর কলমে বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে। সাহিত্যের ইঙ্গিতধর্ম সম্বন্ধে তিনি নানা জায়গায় মনে রাখবার মতন নানা কথা বলেছেন।

তাঁর প্রত্যেকটি গানই জীবনের আনন্দের ইশারা,—তাঁর প্রত্যেকটি রচনাতেই পরমার্থের গভীর সংকেত। তাঁর 'ফাল্গুনী' নাটকের কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে উপমায়-রূপকে-সমাসোক্তিতে তাঁর গভীর অনুরাগ। তিনি যে কত বিচিত্র সাদৃশ্য-চিন্তার ঐশ্বর্য দেখিয়ে গেছেন, সে কি গুনে শেষ করা যায়? মনে পড়ে তাঁর ১৩০১ সালের প্রবন্ধ 'ছেলেভুলানো ছড়া'র শেষ দিকে তিনি লিখে-ছিলেন—"আমি ছড়াকে মেঘের সহিত তুলনা করিয়াছি। উভয়েই পরিবর্তনশীল, বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত, বায়ুস্রোতে যদৃচ্ছাভাসমান। দেখিয়া মনে হয় নিরর্থক। ছড়াও কলাবিচারশাস্ত্রের বাহির. মেঘবিজ্ঞানও শাস্ত্রনিয়মের মধ্যে ভালো করিয়া ধরা দেয় নাই। অথচ জড়জগতে এবং মানবজগতে এই দুই উচ্ছৃংখল অদ্ভুত পদার্থ চিরকাল মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিয়া আসিতেছে। মেঘ বারিধারায় নামিয়া আসিয়া শিশু-শস্যকে প্রাণদান করিতেছে এবং ছড়াগুলিও স্নেহরসে বিগলিত হইয়া কল্পনাবৃষ্টিতে শিশু-হৃদয়কে উর্বর করিয়া তুলিতেছে। লঘুকায় বন্ধনহীন মেঘ আপন লঘুত্ব এবং বন্ধনহীনতা-গুণেই জগদ্‌ব্যাপী হিতসাধনে স্বভাবতই উপযোগী হইয়া উঠিয়াছে, এবং ছড়াগুলিও ভারহীনতা অর্থবন্ধনশূন্যতা এবং চিত্রবৈচিত্র্য-বশতই চিরকাল ধরিয়া শিশুদের মনোরঞ্জন করিয়া আসিতেছে—শিশুমনোবিজ্ঞানের কোনো সূত্র সম্মুখে ধরিয়া রচিত হয় নাই।" সাহিত্যসৃষ্টিতে. শিল্পীর পক্ষে বুদ্ধির তুলনায় তাঁর বোধের নিয়ন্ত্রণ মেনে চলাই যে বেশি আবশ্যিক এবং বেশি অনিবার্য, সে-কথাও তিনি তাঁর নানা রচনায় বলে গেছেন,—এই 'ছেলেভুলানো ছড়া' প্রবন্ধেও তাঁর সে-মন্তব্য অনুক্ত থাকেনি। তিনি বলেছেন—"স্ত্রীলোকদের মধ্যে যে বহুল পরিমাণে যুক্তি-হীনতা দেখা যায়, তাহা বুদ্ধিহীনতার পরিচায়ক নহে। তাঁহারা যে জগতে থাকেন, সেখানে ভালোবাসারই একাধিপত্য। ভালোবাসা স্বর্গের মানুষ। সে বলে, আমার অপেক্ষা আর-কিছু কেন প্রধান হইবে?" তাঁর এই 'ভালোবাসা' কথাটির মধ্য দিয়েই কবি-মনের

বিশেষত্ব সম্বন্ধে তাঁর নিজের ধারণাটি ব্যক্ত হয়েছে। এই 'ভালো-বাসার' রহস্য সম্বন্ধে তাঁর এ মন্তব্যও প্রণিধানযোগ্য—"ভালোবাসা একদিকে যেমন প্রভেদসীমা লোপ করিয়া চাঁদে ফুলে খোকায় পাখিতে এক মুহূর্তে একাকার করিয়া দিতে পারে, তেমনি আবার আর-এক দিকে যেখানে সীমা নাই সেখানে সীমা টানিয়া দেয়, যেখানে আকার নাই, সেখানে আকার গড়িয়া বসে।" অর্থাৎ তিনি নিজে যাকে 'নির্বস্তুক' ভাবনা বলে গেছেন, কবিরা সেই নির্বস্তুক বা অ্যাব্‌স্ট্র্যাক্‌ট্‌ বিষয়কেও যে রূপময় করে তোলেন,—এবং গ্রাম্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সে কৃতিত্ব যে বিরল নয়, তারই দৃষ্টান্ত এবং বিশ্লেষণ দেওয়া হয়েছিল তাঁর এই 'ছেলেভুলানো ছড়া'তে। বিশ্লেষণের কথা এতক্ষণ বলা হোলো, এইবার তাঁর নিজের দেওয়া দৃষ্টান্তের কথা—

"হাটের ঘুম, ঘাটের ঘুম, পথে পথে ফেরে।
চার কড়া দিয়ে কিন্‌লেম ঘুম, মণির চোখে আয় রে॥"

এই উদাহরণে তাঁর গভীর আন্তরিকতা ব্যক্ত হয়েছিল। এটিকে তাঁর কৌতুক-প্রবণতার নিদর্শনমাত্র মনে করা ঠিক নয়। এই কথা থেকেই তিনি মধুসূদনের কাব্যে ব্যবহৃত ঘুমের মানবী-মূর্তির কথা তুলে লিখেছিলেন—

"শুনা যায় গ্রীক কবিগণ এবং মাইকেল মধুসূদন দত্তও ঘুমকে স্বতন্ত্র মানবীরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু নৃত্যকে একটা নির্দিষ্ট বস্তুরূপে গণ্য করা কেবল আমাদের ছড়ার মধ্যেই দেখা যায়।

থেনা নাচন থেনা। বট পাকুড়ের ফেনা॥
বলদে খালো চিনা, ছাগলে খালো ধান।
সোনার জাদুর জন্যে যায়ে নাচ্‌না কিনে আন্‌॥

কেবল তাহাই নহে। খোকার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে এই নৃত্যকে স্বতন্ত্র সীমাবদ্ধ করিয়া দেখা সেও বিজ্ঞানের দূরবীক্ষণ বা অণু-বীক্ষণের দ্বারা সাধ্য নহে, স্নেহবীক্ষণের দ্বারাই সম্ভব।"

তিনি যাকে সহৃদয় মানুষের 'সাহিত্য-ইন্দ্রিয়' বলে গেছেন, সাহিত্যের সেই নিগূঢ়, স্বল্পদৃষ্ট দিকটি নতুন কোনো দিক নয় বটে, কিন্তু তাকে সাহিত্যের চিরকালের সত্য বলতে আপত্তি হবে কেন? পুরাকালে আমাদের দেশে সাহিত্য-চিন্তাশীল মনীষীরা সহৃদয়হৃদয়সংবেদ্যতার কথা বলেছিলেন তাঁরা সমবেদনার কথা বলে গেছেন [illegible] থ ভালোবাসা, স্নেহবীক্ষণ ইত্যাদি শব্দের সাহায্যে সেই একই কথা বলে গেছেন বা এসব শব্দ তিনি সেই একই অভিপ্রায়ে ব্যবহার করেছেন।

'ফাল্গুনী' নাটকে কবিশেখরকে রাজা বলেছিলেন—"ওহে কবি-শেখর আমাকে কিছুমাত্র সময় দিয়ো না—প্রাণটাকে জাগিয়ে রাখো—একটা যা হয় কিছু করো—যেমন এই ফাল্গুনের হাওয়াটা যা-খুশি তাই করছে তেমনিতরো।"

সেই ফরমাশের জবাবে কবিশেখর একেবারে তাঁর তৈরী-রচনা নিয়েই তখুনি সাড়া দিয়েছিলেন, তিনি বলেছিলেন—"তৈরী আছে—কিন্তু সেটা নাটক, কি প্রকরণ, কি রূপক, কি ভান তা ঠিক বলতে পারব না।"

তখন রাজা জিজ্ঞেস করেছিলেন—"তার অর্থ কি কিছু গ্রহণ করতে পারবে?"

রাজার মুখে সে-প্রশ্ন শুনে কবিশেখর অসঙ্কোচে আবার জবাব দিয়েছিলেন—"না মহারাজ, রচনা তো অর্থগ্রহণ করবার জন্যে নয়।"

রচনামাত্রেরই মানে থাকা চাই,—আর মানেটা তখনই সুস্পষ্ট-ভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে, যখন আমাদের শব্দজ্ঞান, অর্থজ্ঞান, বস্তুজ্ঞান ইত্যাদি সর্বপ্রকার প্রাসঙ্গিক জ্ঞানের দ্বারাই তা সমর্থিত বা অনুমোদিত হয়।

কিন্তু কবিশেখর বলেছিলেন—"আমার এ-সব জিনিস বাঁশির মতো, বোঝবার জন্যে নয়, বাজবার জন্যে।"

কবিশেখরের এই কাব্যতত্ত্বের প্রধান কথা বা মূল কথাটাই

হোলো অহংতত্ত্ব। তাঁর নিজের কথায়—''ও বলছে, আমি আছি। শিশু জন্মাবামাত্র চেঁচিয়ে ওঠে, সেই কান্নার মানে জানেন মহারাজ? শিশু হঠাৎ শুনতে পায় জল-স্থল-আকাশ তাকে চারদিক থেকে বলে উঠেছে,—'আমি আছি'—তারই উত্তরে ওই প্রাণটুকু সাড়া পেয়ে বলে ওঠে—'আমি আছি'। আমার রচনা সেই সদ্যোজাত শিশুর কান্না, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ডাকের উত্তরে প্রাণের সাড়া।''

দ্বিতীয় কথা, কাব্য-রচনায় অতিরিক্ত সচেতন শিল্প-কর্ম কখনোই কাম্য হতে পারে না। কবিশেখরের নিজের কথায়—''আমি অপ্রস্তুত হয়েই কাজ করতে চাই। বেশি বানাতে গেলেই সত্য ছাই-চাপা পড়ে।''

রবীন্দ্রনাথের নিজের মুখের ভাষা যে তাঁরই নিজস্ব রীতির নমুনা, সে-কথা তাঁর খুবই কাছের প্রতিবেশী ছিলেন যাঁরা, সেই-রকম একজনের কাছ থেকে শোনা গেছে। 'বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথ' বইখানিতে মৈত্রেয়ী দেবী লিখেছেন—

> "যে ভাষায় রবীন্দ্রনাথ সাধারণ দৈনন্দিন কথাবার্তা বলতেন, সে-ভাষায় আজ পর্যন্ত সাহিত্যিক ও জ্ঞানী-গুণী কাউকেই কথা বলতে শুনিনি। অথচ সে বাংলা ভাষাই, ঘরোয়া ভাষাই, বিচিত্র ব্যঞ্জনায় সুন্দর, সুকণ্ঠে মধুর। সূক্ষ্ম অনুভূতি আলো-ঝলমল কৌতুকোজ্জ্বল ভাষার দ্যুতিতে চারিদিক উল্লসিত করে তুলত। কারো সাধ্য নেই তার যথাযথ অনুলিখন বা স্মৃতিলেখন করে।"

শুধু তাই নয়,—কেবলমাত্র তাঁর উপস্থিতিই কী কম বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল? মৈত্রেয়ী দেবীই পুনরপি জানিয়েছেন—

> "তিনি কি করেছেন, কি লিখেছেন, তাঁর মতামত যুক্তিসহ কি নয়, গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য, ভালো কি মন্দ, কিছুই জানা না থাকলেও শুধু তাঁর উপস্থিতিই যে জ্যোতি বিকীর্ণ করত অতি প্রত্যক্ষ ছিল তার অনুভব। বস্তুতঃ আমরা অনেকেই যখন তাঁকে দেখে অভিভূত বোধ করেছি তখন তাঁর কাব্য পড়ে পারদর্শী হইনি। আলো যেমন সকল প্রশ্নের

অতীতরূপে নিঃসংশয়ে চক্ষুষ্মানের চোখের সামনে উদ্‌ভাসিত, তেমনি তাঁর প্রতিভার ইন্দ্রিয়ানুভব সহজ ও নিঃসংশয় ছিল।”

সাহিত্যশিল্পের বাহনে, অনাতিসচেতন এক-একরকম ভঙ্গী অবলম্বন করে গভীর বোধের সত্যই ব্যক্ত হয়ে থাকে, এই ছিল রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস। এই বিশেষ কথাই তিনি বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রচনায় বলে গেছেন। 'আকাশ-প্রদীপের' একটি কবিতায় তাঁকে বলতে শোনা গেছে—“যুক্তি নয়, বুদ্ধি নয়, শুধু সেথা কত কী যে হয়।” সেই দুর্নিরীক্ষ্য অন্তর্লোকের কথা তার শেষ পর্বের কত কবিতাতেই না বলা হয়েছে! সেই অন্তরিন্দ্রিয় দিয়ে তিনি যখন বিশ্বজগৎকে দেখেছেন, তখন সমস্ত প্রকৃতির সঙ্গে,—সারা বিশ্বের সঙ্গেই তিনি তাঁর একাত্মতা অনুভব করেছেন। এ-কথা তাঁর 'প্রভাত সংগীতেও' আছে, 'ছিন্নপত্রেও' আছে,—আবার, তাঁর শেষ পর্বের বই 'বীথিকার' অন্তর্ভুক্ত 'আদিতম' নামে একটি কবিতায় সেই একই কথা তাঁকে বলতে শোনা গেছে—

“প্রাণের প্রথমতম কম্পন
অশথের মজ্জায় করিতেছে বিচরণ,
তারি সেই ঝংকার ধ্বনিহীন—
আকাশের বক্ষেতে কেঁপে ওঠে নিশিদিন ;
মোর শিরাতন্তুতে বাজে তাই ;
সুগভীর চেতনার মাঝে তাই
নর্তন জেগে ওঠে অদৃশ্য ভঙ্গীতে
অরণ্যমর্মর-সংগীতে।”

এবং ১৩৪১ সালের সেই কবিতাটিরই শেষ ক'লাইনে তাঁর সারা-জীবনের সত্যবোধই তিনি আর-এক ভাবে, আর একবার ব্যক্ত করেছিলেন—

“ধরণীর ধূলি হতে তারার সীমার কাছে
কথাহারা যে ভুবন ব্যাপিয়াছে

তার মাঝে নিই স্থান,
চেয়ে-থাকা দুই চোখে বাজে ধ্বনিহীন গান।"

এ উপলব্ধিও তাঁর সেই বিশেষ ইন্দ্রিয়ের দান। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সম্পর্কিত নানান আলোচনা থেকে তাঁর এই ধরনের আত্মাবিষ্কারের অসংখ্য নমুনা তুলে দেখানো যেতে পারে। কিন্তু সামান্য একটি চামচে দিয়ে সমুদ্রের জল তুলে তুলে লাভ নেই। তার চেয়ে বরং অবগাহনই ভাল!

"প্রচ্ছন্ন দাক্ষিণ্যভারে"

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

"লগ্ন যদি হয় অনুকূল মৌন মধুর সাঁঝে,
নয়ন তোমার মগ্ন যখন ম্লান আলোর মাঝে,
দেব তোমায় শান্ত সুরের সান্ত্বনা—"

অনেক দিন আগে কয়েকটি বিদেশী ছবির প্রতিলিপি চোখে পড়েছিল কোনো বিলিতী পত্রিকায়। পত্রিকার কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন খ্যাতিমান শিল্পীর কাছে তাঁদের আইডিয়াল নায়িকা কী জানতে চেয়েছিলেন এবং তারই জবাবে ছবিগুলো এঁকে পাঠিয়েছিলেন শিল্পীরা। ভাগ্যক্রমে তাঁরা কেউ কিউবিষ্ট কিংবা একস্‌প্রেসনিস্ট পদ্ধতি অবলম্বন করেন নি, তাই ছবিগুলো মাত্র জ্যামিতিক রেখা-চক্রে পর্যবসিত হয়নি—বেশ পরিচ্ছন্ন রক্ত-মাংসের আদল পাওয়া গিয়েছিল।

যতদূর মনে পড়ছে খান আষ্টেক ছবি ছিল এবং প্রত্যেক শিল্পীর রুচির মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য ধরা পড়েছিল। কারো নায়িকা সুতনুকা, কারো বা কিছুটা পীনাঙ্গী ; কারো কটা চোখের তারা বিদ্যুৎঝলসিত, কারো নীল-নেত্রে নিবিড় আকাশ ; কারো উনিশ শতাব্দীর মতো রক্তিম কেশগুচ্ছ বুকের ওপর নেমে এসেছে, কারো বা পুরুষের মতো ছাঁটা-ছাঁটা চুল—নির্ভুল বিংশ শতকিনী-কারো পাতলা ঠোঁটে প্রগল্‌ভতার আভাস, কারো বা পুরু ঠোঁট দুটি একটু চাপা—স্বল্পভাষী দাম্ভিকতা সংকেতিত।

এ তো গেল প্রত্যক্ষ। পরোক্ষভাবে প্রত্যেক শিল্পীই কোথাও না কোথাও তাঁর নায়িকাকে এঁকে গেছেন—তা বতিচেল্লির ভেনাস হোক, র‍্যাফেলের ম্যাডানো-ডেল-গ্রাণ্ডুকা হোক, দা-ভিঞ্চির রহস্য-ময়ী মোনালিসা হোক বা গয়ার দুঃসাহসিক মাজা দেস্নুদাই হোক।

লরা-বিয়াত্রিচে-ফ্রেডারিকা-টেরেসা কবিদের সৃষ্টিতে ঘুরে-ফিরে দেখা দিয়েছে বার বার, তাঁদের কাব্য-মানসীর রূপ পাঠকের চোখে আর গোপন থাকেনি।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য থেকে এই রকম একটা নায়িকাকে প্রত্যক্ষ করা যায় কি?

'মহুয়া'তে যে 'নাম্নী' কবিতাগুচ্ছ আছে, তাদের ভেতরে শ্যামলী, কাজলী, খেয়ালী, পিয়ালী, ঝামরী, মালিনী, করুণী, প্রতিমা কিংবা উষসীর মধ্যে যে সাধারণ লক্ষণগুলি আছে—তা দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। আরো লক্ষ্য করবার মতো নাগরী প্রায় একতমা সাগরী অন্তরে স্থির, স্তব্ধ। এই নায়িকারা 'অপরাজিতার ফুলে, প্রভাতে নীরবে নিবেদন, স্তব করে একমনে'; কখনো 'কালো চক্ষুপল্লবের কাছে থমকিয়া আছে...সুগম্ভীর স্নিগ্ধ অশ্রুবারি'; কারো বা 'এলোচুল বুকে পড়ে খসি, গ্রন্থ নিয়ে হাতে উদাস হয়েছে মন সে যে কোন্ কবি কল্পনাতে'; কেউ 'নাও যদি কয় কথা, মনে যেন ভরি দেয় সুস্নিগ্ধ মমতা'; কেউ বা 'মুখ ফুটে বলিতে না পারে, অলক্ষ্য কী আচ্ছাদনে কেন সে আবৃতা'; কেউ 'শ্যামল উদার, সেবা যত্ন সরল শান্তিতে, ঘনচ্ছায়া বিস্তারিয়া আছে চারিভিতে'; কেউ 'সংসার জনতা মাঝে আপনাতে আপনি বিরাজে'; আর সর্বশেষ নারীটি—

"চিত্ত তার আপনার গভীর অন্তরে
নিঃশব্দে প্রতীক্ষা করে
পরিপূর্ণ সার্থকতা লাগি।
সুপ্তিমাঝে প্রতীক্ষিয়া আছে জাগি
নির্মল নির্ভয়
কোন্ দিব্য অভ্যুদয়।"

এইগুলোকে একসঙ্গে মিলিয়ে দেখলে যে সমগ্র ছবিটি ভেসে উঠবে, বলা যেতে পারে সেইটিই রবীন্দ্রনাথর মানসী-মূর্তি। বাংলা দেশের শ্যামল বনবীথির মধ্য দিয়ে তার শান্ত পদচারণা, তার বর-

বর্ণে সেই শ্যামলতার ছায়াপাত, তার চোখের দৃষ্টিতে কালো দীঘি-জলের গভীরতা। প্রভাতের শিশির-মাখানো শেফালিকার মতো দেহে মনে তার অম্লান শুচিতা। স্বল্পভাষিণী, অন্তর্মগ্না এই নারী যেন নিজের হৃদয়ের মধ্যে লীন হয়ে আছে—বাইরে উচ্ছ্বলিত হয়ে পড়ে না, সে অন্তর-রহস্যের অতল-শায়িনী। প্রগল্‌ভ মুখরতা নিয়ে তার কাছে অগ্রসর হওয়া যায় না—মৌনসন্ধ্যায় শান্ত-সুরের সান্ত্বনা দিয়ে তাকে স্পর্শ করা যায়।

নানা কবিতার টুকরো থেকে আরো কিছু আহরণ করা যাক—

"মনে হল, তুমি অসীম একা
দাঁড়িয়ে আছ যেন আমার একটি বিজন-ক্ষণে,
আর কেহ নাই কোথাও ত্রিভুবনে।
সামনে তোমার মুক্ত আকাশ—অরণ্যতল নীচে
ক্ষণে ক্ষণে ঝাউয়ের শাখা প্রলাপ মর্মরিছে।
মুখ দেখা না যায়,
পিঠের পরে বেণীটি লোটায়—"

"ধারাযন্ত্রে সিনান করি যত্নে তুমি এসো পরি'
চাঁপা বরণ লঘু বসনখানি,
ভালো আঁকো ফুলের লেখা চন্দনেরি তিলক রেখা
কোলের পরে সেতার লহো টানি।
দূর দিগন্তে মাঠের পারে সুনীল ছায়া গাছের সারে
নয়ন দুটি মগন করি চাও—"

"আঁখি চাহে তব মুখ-পানে
তোমারে জেনেও নাহি জানে।
কিসের নিবিড় ছায়া
নিয়েছে স্বপন কায়া
তোমার মর্মের মাঝখানে।
হাসি কাঁপে অধরের শেষে
দূরতর অশ্রুর আবেশে—"

যথেচ্ছভাবে এগুলি চয়ন করা হয়েছে—কোনো পরিকল্পনা অনুযায়ী নয়। রবীন্দ্রনাথের ভাবালোকে যে নারীটির নিঃশব্দ পদচারণা, সে এমনি ভাবেই কবির গোচর-অগোচরে আপনার শান্ত মহিমায় থেকে থেকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

কথা-সাহিত্যেও এই মর্মবাসিনী বিভিন্ন নায়িকার ভেতরে বার বার ধরা দিয়েছে। যে-সমস্ত নারী-চরিত্র রচনার নেপথ্যে লেখকের কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য বর্তমান—তাদের অবশ্য নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়েই গড়ে তোলা হয়েছে—যেমন 'চোখের বালি'র বিনোদিনী, যেমন 'ঘরে বাইরে'র বিমলা। বিনোদিনী বেরিয়ে এসেছে বঙ্কিমচন্দ্রের রোহিণীর উত্তর-পর্যায় হয়ে, বঙ্কিমের নিষ্করুণ সামাজিক বিচারে মৃত্যুদণ্ড বিধান না করে সহানুভূতি দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিনোদিনীকে গ্রহণ করেছেন—বিহারীর আলোকে তার আন্তর-তামসী দীপিত করে তুলেছেন। বিমলার তীব্র মানস-দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন ঘরে কিংবা বাইরে নারীর সত্যকারের স্থানটি কোথায়। 'চতুরঙ্গ'র দামিনী মনস্তত্ত্বের এক গূঢ়-গহনলোকে অবস্থান করছে, কাহিনীর পরোক্ষ ভাষ্যকার শ্রীবিলাসও যেন তাকে সম্পূর্ণভাবে আবিষ্কার করতে পারেনি। অতীন আর এলার কাহিনীও বিশিষ্ট উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

স্বদেশ-জিজ্ঞাসায় এবং ব্যাপকতায় এপিক-ধর্মী 'গোরা' উপন্যাসও তত্ত্বমুখ্য। ঘটনার ভিড় এবং কথার কলোচ্ছ্বাসের মধ্যে সুচরিতাকেও আসতে হয়েছে, যোগ দিতে হয়েছে আলোচনায়, প্রয়োজন মতো তর্কও করতে হয়েছে। কিন্তু চরিত্রটির আসল সৌন্দর্য তার নিভৃত মর্মকোষের মধ্যেই লুকানো। ললিতার উন্মুখর প্রগল্‌ভতার পাশাপাশি কল্পনা করলেই সুচরিতাকে চেনা যাবে। আধুনিকাদের প্রতি যে কৌতুক-কটাক্ষ বর্ষিত হয়েছে তাঁর 'অনসূয়া'য়ঃ 'সে নয় ইকনমিকস্ পরীক্ষাবাহিনী, আতপ্ত বসন্তে আজ নিঃশ্বসিত যাহার কাহিনী'—সেই মনোভাবের সংযোগ সূত্রেই গোরার দৃষ্টিতে সুচরিতার স্নিগ্ধ মহিমাটি এই রকম—

"গোরা শিক্ষিত মেয়েদের মধ্যে যে ঔদ্ধত্য, যে প্রগল্‌ভতা কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিল, সুচরিতার মুখশ্রীতে তাহার আভাসমাত্র কোথায়! তাহার মুখে বুদ্ধির একটা উজ্জ্বলতা নিঃসন্দেহ প্রকাশ পাইতেছিল, কিন্তু নম্রতা ও লজ্জার দ্বারা তাহা কী সুন্দর কোমল হইয়া আজ দেখা দিয়াছে! মুখের ডোলটি কী সুকুমার! ভ্রূযুগলের উপর ললাটটি যেন শরতের আকাশ-খণ্ডের মতো নির্মল ও স্বচ্ছ। ঠোঁট দুটি চুপ করিয়া আছে, কিন্তু অনুচ্চারিত কথার মাধুর্য সেই দুটি ঠোঁটের মাঝখানে যেন কোমল একটি কুঁড়ির মতো রহিয়াছে।"

'বুদ্ধি তার ললাটিকা, চক্ষুর তারায় বুদ্ধি জ্বলে দীপশিখা'—তবু সুচরিতা 'নাগরী' নয়। অন্তরলোকে সে শ্যামলী-করুণীদেরই একজন। তার অনুধ্যানে গোরার মনে হয়ঃ 'নির্মল নীলাকাশের নীচে দিনগুলি যেন কাহার চোখের উন্মীলিত দৃষ্টি এবং রাতগুলি যেন কাহার চোখের আনত পল্লবের লজ্জাজড়িত ছায়া!'

এই সুকুমার সৌন্দর্যকে ঘিরে একটি দীপ্ত পবিত্রতার আবরণ। সেই পবিত্রতার আলোকে কল্যাণী জয়তী হয়ে ওঠে—শ্যামলী উষসী-রূপে একটি নির্মল সূর্যোদয়ের প্রতীক্ষা করে। সাংসারিক জীবনের স্থূলতা, লোভ-স্বার্থপরতা-দীনতার অশুচি স্পর্শের ঊর্ধ্বে তপতীর মতো তার অবস্থান। এই শুচিস্মিতা শান্তোজ্জ্বলাকে দেখতে পাই 'যোগাযোগ'-এর কুমুদিনীতে।

"দেখতে সে সুন্দরী, লম্বা ছিপছিপে, যেন রজনীগন্ধার পুষ্প দণ্ড; চোখ বড়ো না হোক, একেবারে নিবিড় কালো, আর নাকটি নিখুঁত রেখায় যেন ফুলের পাপড়ি দিয়ে তৈরি। রঙ শাঁখের মতো চিকণ গৌর; নিটোল দুখানি হাত; সে হাতের সেবা কমলার বরদান, কৃতজ্ঞ হয়ে গ্রহণ করতে হয়। সমস্ত মুখে একটি বেদনার সকরুণ ধৈর্যের ভাব।"

কুমুদিনীর সঙ্গে বিবাহ হল স্থূল-বৈষয়িক মধুসূদন ঘোষালের —যার সঙ্গে চেহারায়, চরিত্রে, রীতিতে—কোনোখানে কুমুদিনীর কোনো মিল নেই। কুমুদিনীর বেদনা-গভীর ব্যর্থ আত্মদানের

মধ্যে যোগাযোগের কাহিনী শেষ হয়েছে—সেই সঙ্গে লেখকেরও দীর্ঘশ্বাস পড়েছে।

শিল্পী এবং শিল্পচেতনার সঙ্গে বৈষয়িকতার ও সাংসারিক হীনবুদ্ধির বিরোধে একটি করুণ ইতিহাস পৃথিবীর দেশে দেশে বার বার রচিত হয়েছে। সে ইতিহাস কীট্‌সের মৃত্যুতে, ভ্যানগগের মর্মদাহী আত্মবিনাশে, পল গগ্যাঁর পরিণামে। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি নায়িকাই তাঁর নিজস্ব শিল্পিসত্তার অপঘাতের বিবরণ। কুমুদিনী তাদেরই একজন।

ছোটগল্পেও এই মনোভঙ্গির প্রতিফলন। 'খাতা' গল্পের উমার চরিত্রে যা অঙ্কুর-সংকেতিত, তাই স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে 'হৈমন্তী'তে। হৈমন্তীর সঙ্গে কুমুর মর্মসম্বন্ধ দুর্লক্ষ্য নয়। তাকে হিমালয়ের নির্মল তুষারের পবিত্রতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে এমন একটি পরিবেশের মধ্যে এনে ফেলা হয়েছে—যেখানে নিঃশব্দ যন্ত্রণার অগ্নিদহনে সে তিলে তিলে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে।

> "আমাদের সংসারে অপমানের কণ্টকশয়নে সে বসিয়া।...এই গিরি-নন্দিনী সতেরো-বৎসর-কাল অন্তরে বাহিরে কতোবড়ো একটা মুক্তির মধ্যে মানুষ হইয়াছে।...হৈম যে অন্তরে অন্তরে মুহূর্তে মরিতেছিল। তাহাকে আমি সব দিতে পারি কিন্তু মুক্তি দিতে পারি না—তাহা আমার নিজের মধ্যে কোথায়? সেইজন্য কলিকাতার গলিতে ঐ গরাদের ফাঁক দিয়া নির্বাক আকাশের সঙ্গে তাহার নির্বাক মনের কথা হয়।"

কুমুদিনী তবু হয়তো সন্তানের মধ্য দিয়ে জীবনের একটি সামান্য বিকল্প খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু এ-কালের অ্যাডোনিসের মতো মৃত্যু-মুক্তি ছাড়া হৈমন্তীর আর পথ ছিল না।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মধ্যে জয়তীও আছে—যে আত্মার সঙ্গিনী, হীন-প্রাণ দুর্বলের স্পর্ধার প্রতি যার উদ্যত ঘৃণা; তাই শ্যামলীর শ্যাম মেঘকান্তি থেকে কেবল অশ্রুই বর্ষিত হয় না—কখনো কখনো খরধার বিদ্যুতের খড়্গও ঝলসিত হয়ে ওঠে। এই খড়্গধারিণী 'স্ত্রীর পত্র'র মেজো বউ। রূপসী, বুদ্ধিমতী ও হৃদয়বতী—চিরা-

চরিত রক্ষণশীল পরিবারের মাঝখানে সে বিপর্যয় বিশেষ। শেষ পর্যন্ত এই পরিবারের সংকীর্ণ প্রাকার ভেঙে সে বেরিয়ে পড়েছে—জেনেছে সে নারী—সে মহীমময়ী।

বাইরের প্রখর উজ্জ্বলতায় রবীন্দ্রনাথের অন্তর্মগ্না নারীদের থেকে মেজো বউ পৃথক। কিন্তু—

"আমি লুকিয়ে কবিতা লিখতুম। সে ছাই-পাঁশ যাই হোক-না, সেখানে তোমাদের অন্দরমহলের পাঁচিল ওঠেনি। সেইখানে আমার মুক্তি; সেইখানে আমি আমি।...আমি যে কবি সে এই পনেরো বছরেও তোমাদের কাছে ধরা পড়েনি।"

মেজো বউ যখন ঘরের বন্ধন ভেঙে বেরুল, তখন সে ইবসেনের নোরা হয়ে দেখা দিল না। গল্পটির বক্তব্যে যতই ধার এবং ঝাঁজ থাকুক—তার মুক্তি কবির মুক্তি—সাংসারিক তুচ্ছতার বৃত্তরেখার বাইরে শিল্পীর আনন্দময় নিষ্ক্রমণ—

"আমার সমুখে আজ নীল সমুদ্র, আমার মাথার উপরে আষাঢ়ের মেঘ-পুঞ্জ।...আজ বাইরে এসে দেখি, আমার গৌরব রাখবার আর জায়গা নেই। আমার এই অনাদৃত রূপ যাঁর চোখে ভালো লেগেছে সেই সুন্দর সমস্ত আকাশ দিয়ে আমাকে দেখছেন।"

আসলে হৈমন্তীর সঙ্গে অন্তরের দিক থেকে মেজো বউয়ের কোনো পার্থক্য নেই। তাই বাইরের প্রখরতা রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যে উন্মুখ—মনোলোকে সে কবির চিরন্তনী নায়িকা।

এই আত্মলীনা, শুচিস্নিগ্ধা নারী 'রবিবার'-এর বিভা—এরই প্রকারভেদ 'শেষ কথা'র অচিরা। আরো একটি জিনিস লক্ষ্য করবার আছে। সুচরিতা, কুমুদিনী, হৈমন্তী, বিভা, অচিরা—এরা কেউই ঠিক স্বাভাবিক বাঙালী পরিবারের মধ্যে বড়ো হয়ে ওঠেনি। একটি শিল্পরুচিসম্মত পরিবেশে—কোনো বিদ্যাজীবীর সৌম্য প্রাজ্ঞতার স্নেহছত্রের তলায় এরা লালিত হয়েছে এবং সেই জন্যই ব্যবসায় বুদ্ধি চালিত ও হীনতায় কণ্টকিত সংসারের মধ্যে এরা সামঞ্জস্য রচনা করতে পারেনি। মৃত্যুতে, অবক্ষয়ে অথবা মেজো বউয়ের

বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে শ্যামলী-করুণী-প্রতিমা উষসীর মতো একটি অম্লান আলোকাবির্ভাবের প্রতীক্ষায় তপস্যা করেছে।

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র মানস-গঠনে, তাঁর চিন্তায়, তাঁর কল্পনায়—যে শান্তি, সংযম এবং সৌন্দর্য সত্যের বৃন্তে বিধৃত হয়ে আছে, তাঁর ধ্যাননায়িকা তারই রূপায়ণ মাত্র। এই নারী তাঁর শিল্প-শতদলের কেন্দ্রবাসিনী, তাঁর কল্পলক্ষ্মী। রবীন্দ্র-সাহিত্যের সম্পূর্ণ পরিক্রমার মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত এই কথাই মনে হবে—এ ছাড়া তাঁর নায়িকা অন্য রকম হতে পারত না—হওয়া সম্ভবও ছিল না।

কুমুদিনী আত্মদানের মধ্য দিয়ে জীবনের দাবির কাছে নিজেকে নিবেদন করেছে। আর শিল্পের সঙ্গে ব্যাবহারিক প্রয়োজনের শেষ পর্যন্ত একটি সামঞ্জস্য ঘটিয়েছে 'শেষের কবিতা'র লাবণ্য—

"যে আমারে দেখিবারে পায়
অসীম ক্ষমায়
ভালোমন্দ মিলায়ে সকলি,
এবার পূজায় তারি আপনারে দিতে চাই বলি।"

এই হল জীবনের দায় মোচন। আর—

"সব-চেয়ে সত্য মোর, সেই মৃত্যুঞ্জয়
সে আমার প্রেম।
তারে আমি রাখিয়া এলেম,
অপরিবর্তন অর্ঘ্য তোমার উদ্দেশে।"

এই তার শিল্পের কাছে স্বীকৃতি।